সুপ্রকাশ রায়

ভারতের বৈপ্লবিক

DNBA BROTHERS ডিএনবিএ ব্রাদার্স

সংগ্রামের ইতিহাসে

৬১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট :: কলিকাতা ৭০০০০৯

দ্বিতীয় সংস্করণ
এপ্রিল ১৯৭০

ডিএনবিএ ব্রাদার্সের পক্ষে সন্দীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রদীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক টাইপোগ্রাফার্স অব্ ইণ্ডিয়া, ৩৩এ কে. জি. বসু সরণী কলিকাতা ১০ হইতে মুদ্রিত।

মুখবন্ধ

গ্রন্থের নাম সম্বন্ধে

'ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' প্রথম প্রকাশিত হইবার পর ইহা প্রগতিশীল পাঠকগণের দ্বারা বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য পাঠকগণ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। বিভিন্ন কারণে এই আগ্রহ পূর্ণ করিতে বিলম্ব হইল। এই বিলম্বের জন্য, আশা করি, সহৃদয় পাঠকগণ মার্জনা করিবেন।

'ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম'-এর বিষয়বস্তু ছিল বঙ্গদেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-বিদ্রোহ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৃষকই ছিল একমাত্র সংগ্রামী শক্তি। সংগ্রামের দিক হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল কৃষকের যুগ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কৃষক-সংগ্রামের যুগ, প্রাক্-বিপ্লব যুগ। এবার দ্বিতীয় ও পরবর্তী খণ্ডগুলির বিষয়বস্তু হইবে বঙ্গদেশ সহ সমগ্র ভারতবর্ষের বিংশ শতাব্দীর শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও অন্যান্য শ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রাম।

বিংশ শতাব্দী বৈপ্লবিক যুগ এবং এই বৈপ্লবিক যুগে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সকল গণ-সংগ্রাম বাস্তবত বৈপ্লবিক চরিত্র গ্রহণ করিয়াছে, সেই হেতু দ্বিতীয় ও পরবর্তী খণ্ডগুলির নাম পরিবর্তন করিয়া 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস' রাখা হইল [১] ইহা একাধিক খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। 'ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম'-এর এই পরবর্তী খণ্ডগুলির নাম ভিন্ন বলিয়া আলোচ্য গ্রন্থ 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড হিসাবে প্রকাশিত হইতেছে।

বর্তমানে প্রথম খণ্ডটি (১৯০১-১৮) প্রকাশিত হইল। ভারতের শ্রমিকশ্রেণী সমগ্র ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী শ্রেণী। শ্রমিকশ্রেণী একটি সর্বভারতীয় শ্রেণী, বিভিন্ন জাতি-উপজাতিতে বিভক্ত হইলেও শ্রেণীহিসাবে ইহা এক ও অখণ্ড, কোন অঞ্চল বিশেষের নহে। ভারতবর্ষে এই বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব ও উহার নেতৃত্বের ফলে বিংশ শতাব্দীর গণ-সংগ্রাম আঞ্চলিক চরিত্রের পরিবর্তে ক্রমশ সর্বভারতীয় চরিত্র গ্রহণ করিয়াছে। সেই হেতু বিংশ শতাব্দীর গণ-সংগ্রামের ইতিহাস কেবল বঙ্গদেশ বা অন্য কোন অঞ্চলের ভিত্তিতে রচনা করা অসম্ভব বলিয়া 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস'-এর একাধিক খণ্ডে সমগ্র ভারতবর্ষের বিংশ শতাব্দীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণিত হইবে।

প্রথম খণ্ডে ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের পটভূমি হিসাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের, অর্থাৎ মহাবিদ্রোহের পরবর্তী কালের আর্থনীতিক ও রাজনীতিক অবস্থা এবং দাক্ষিণাত্য-বিদ্রোহ, মোপলা-বিদ্রোহ, মুণ্ডা-বিদ্রোহ প্রভৃতি কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৃষক-সংগ্রামের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কারণ, এই সকল সাম্রাজ্যবাদ-

১। বহু পূর্বে এই নামে লেখকের একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমান 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস'-এর একাধিক খণ্ড একত্রে উহারই পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ।

জমিদার-মহাজন-বিরোধী সংগ্রামের প্রভাব বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় জমিদার-মহাজনগোষ্ঠী ভারতের সর্বত্র যে অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নের তাণ্ডব চালাইয়াছিল এবং কৃষক জনসাধারণ প্রথম হইতেই এই সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট সমাজ-শত্রুদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করিয়াছিল, তাহার শিক্ষা বিংশ শতাব্দীর সংগ্রামী শক্তিসমূহের পক্ষে এক মহামূল্য বৈপ্লবিক সম্পদ। মহাবিদ্রোহ ভারতের বিভিন্ন সংগ্রামী শক্তির জন্য যে বৈপ্লবিক শিক্ষা রাখিয়া গিয়াছে তাহা দ্বারা বলীয়ান হইয়াই ইহার পরবর্তীকালের গণ-সংগ্রামগুলি নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে, সেগুলি বহুগুণ অধিক ব্যাপক ও সংগঠিত আকার লাভ করিয়াছে এবং বহুগুণ অধিক সংগ্রামী দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছে। তাই 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ডে বিংশ শতাব্দীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের পটভূমি হিসাবে ঐ সংগ্রামের কাহিনীগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং উনবিংশ শতাব্দীর সংগ্রামী ঐতিহ্য তুলিয়া ধরিয়া বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস আরম্ভ করা হইয়াছে।

গ্রন্থের নামের এই পরিবর্তন, অর্থাৎ 'কৃষক-বিদ্রোহের ইতিহাস'-এর পরিবর্তে 'বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস' নামকরণের যুক্তি হিসাবে আরও কয়েকটি কথা বলা কর্তব্য মনে করি। এই নামকরণের সহিত একটি মূল তত্ত্বগত প্রশ্ন জড়িত।

'ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম'-এর প্রধান বিষয়বস্তু ছিল ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ ও আত্মরক্ষার জন্য কৃষকের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ। এই সকল বিদ্রোহ মূলত নেতৃত্বহীন, লক্ষ্যহীন ও বৈপ্লবিক আদর্শহীন অবস্থাতেই ঘটিয়াছিল। এই সময় সমাজে কৃষক ব্যতীত আর কোন সংগ্রামী শক্তি না থাকায় এই কৃষক-বিদ্রোহগুলিই ছিল একমাত্র গণ-সংগ্রাম। উক্ত গ্রন্থে প্রধানত বঙ্গদেশের আর্থনীতিক-রাজনীতিক অবস্থা এবং কৃষক-বিদ্রোহের কাহিনী বর্ণিত হইলেও সাধারণভাবে উহাই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষেরও চিত্র। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতবর্ষকে মূলত একই ছাচে গড়িয়া তুলিতেছিল এবং এই সময়ের গণ-সংগ্রামগুলিও সর্বত্র প্রায় একই রূপে ঘটিয়াছিল। তাই বঙ্গদেশের উনবিংশ শতাব্দীর গণ-সংগ্রামের ইতিহাসকে সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের নমুনা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের অবস্থা ও গণ-সংগ্রামের তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ভারতবর্ষে নূতন নূতন শ্রেণী দেখা দিয়াছে এবং উহারা ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। শ্রমিকশ্রেণী একটি শক্তিশালী শ্রেণীরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। উন্নত বৈপ্লবিক আদর্শ ও ভূমিকা লইয়া শ্রমিকশ্রেণী ভারতের গণ-সংগ্রামের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হওয়ায় এবং উহার নেতৃত্ব গ্রহণ করায় বিংশ শতাব্দী কার্যত বৈপ্লবিক যুগে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিংশ শতাব্দীর গণ-সংগ্রামও বৈপ্লবিক তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছে। তাই বিংশ শতাব্দীতে ভারতের শ্রমিক-কৃষকের গণ-সংগ্রাম হইল বৈপ্লবিক সংগ্রাম এবং এই সংগ্রামের ইতিহাস হইল 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস'।

[সাত]

বিংশ শতাব্দীতে কৃষকের ভূমিকা

কৃষক হইল বহু স্তরে বিভক্ত, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বন্ধনে আবদ্ধ, ক্ষুদ্র শোষক-শোষিতদের লইয়া গঠিত এবং মধ্যশ্রেণীর নিম্নতম স্তরে অবস্থিত একটি সম্প্রদায় মাত্র। কৃষি মানব-সমাজের প্রথম ও মূল উৎপাদন-ব্যবস্থা হইলেও ইহা অতি নিম্নস্তরের উৎপাদন-ব্যবস্থা। আর নিম্নস্তরের উৎপাদন-ব্যবস্থাই কৃষকের জীবিকা ও জীবনের ভিত্তি। এই প্রকার একটি অনুন্নত উৎপাদন-ব্যবস্থার ভিত্তিতে গঠিত কোন সম্প্রদায় স্বভাবতই একটি বিপ্লবী শ্রেণী হইতে পারে না, কিংবা স্বাধীনভাবে কোন বিপ্লব সম্পন্ন করিতেও পারে না। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থার জালে আবদ্ধ কৃষক-সম্প্রদায় কোন বিপ্লবী শ্রেণী দ্বারা চালিত হইলেই বিপ্লবের একটি সহায়ক বাহিনীতে (Reserve force) পরিণত হইতে পারে। ইতিহাসে কৃষক-সম্প্রদায় চিরকালই কোন উন্নত, বিপ্লবী শ্রেণী দ্বারা সংগঠিত ও চালিত হইয়া বিপ্লবের বাহিনী রূপে ইহার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করিয়া আসিয়াছে, কোন স্বাধীন বিপ্লবী শ্রেণীরূপে নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইউরোপের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কৃষক-সম্প্রদায় তৎকালের বিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণী দ্বারা চালিত হইয়াই ঐ বিপ্লবের বাহিনীরূপে কার্য করিয়াছে এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পুনরায় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের শোষণের জালে আবদ্ধ হইয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদী যুগে সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস না করিয়া বুর্জোয়াশ্রেণী উহাকে শোষণের সহযোগী করিয়া লইয়াছে। তাই এই সাম্রাজ্যবাদী যুগে বুর্জোয়াশ্রেণীর আর কোন বিপ্লবী ভূমিকা নাই। সুতরাং সমাজ-বিকাশের পথ বাধামুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে শ্রমিকশ্রেণীই এই যুগে কৃষকের সহযোগিতায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া কৃষককে শোষণ হইতে মুক্ত করে, সমাজতন্ত্রের পথ প্রস্তুত করে। তাই গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হইয়াছে; বিংশ শতাব্দীর এই সাম্রাজ্যবাদী যুগ তাই গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ রূপে দেখা দিয়াছে। এই বৈপ্লবিক যুগে কৃষক-সম্প্রদায় বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী দ্বারা সংগঠিত ও চালিত হইয়া এবং শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান সহায়ক বাহিনীরূপে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিয়া সমাজতন্ত্রের পথে পূর্ণমুক্তি লাভ করিতেছে।

সাম্রাজ্যবাদ-একচেটিয়া মূলধনী-সামন্ততন্ত্র-শাসিত ভারতেও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের জালে আবদ্ধ কৃষক-সম্প্রদায় এখন শ্রমিকশ্রেণী দ্বারা সংগঠিত ও চালিত হইয়াই প্রধান বাহিনীরূপে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিবে—স্বাধীন বিপ্লবী শক্তিরূপে নয়। ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রধান অংশ যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সহযোগী, সেইহেতু তাহারা বিপ্লব-বিরোধী। সুতরাং ভারতের শ্রমিকশ্রেণীই কৃষক-সম্প্রদায়কে বিপ্লবের প্রধান বাহিনীরূপে সংগঠিত ও পরিচালিত করিয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করিতে পারে। ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীই হইবে কৃষকের পরিচালক।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ক্রমবর্ধমান শিল্পের মারফত বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবের নায়ক শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব এবং বিংশ-শতাব্দীর প্রথম হইতে সংগ্রামের

ক্ষেত্রে উহার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রাক্-বিপ্লব যুগের অবসান ঘটিয়াছে, গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগের উদ্বোধন হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহগুলি নেতৃত্বহীন, বৈপ্লবিক আদর্শ ও লক্ষ্যহীন ছিল বলিয়া সেইগুলি বৈপ্লবিক সংগ্রামের স্তরে আরোহণ করিতে পারে নাই। তাহা এই বিদ্রোহগুলির পক্ষে কোন প্রকারেই সম্ভব ছিল না। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, অন্ধভাবে হইলেও সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া কৃষক-সম্প্রদায় এক বিপুল তাৎপর্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করিয়া গিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের স্রষ্টা ও নায়ক শ্রমিকশ্রেণী কৃষকেরই সন্তান। এই সন্তানের বৈপ্লবিক ভূমিকা পালনের পথ সুগম করিয়া দেওয়াই ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর সংগ্রামী কৃষকের ঐতিহাসিক কর্তব্য। কৃষক-সম্প্রদায় উহার সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা এক মহান সংগ্রামী ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়া শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের পথ, গণ-সংগ্রামে উহার বৈপ্লবিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়া গিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে কৃষক-সম্প্রদায় অন্ধভাবে যে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছে, শ্রমিকশ্রেণী সচেতনভাবে উহার নেতৃত্ব ও বৈপ্লবিক আদর্শ দ্বারা কৃষক ও অন্যান্য সংগ্রামী শ্রেণীর সহায়তায় সেই সংগ্রামকেই আরও উন্নত স্তরে লইয়া গিয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করিবে এবং জনসাধারণকে লইয়া সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রা করিবে—ইহাই ইতিহাসের নির্দেশ।

বিভিন্ন শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকা

"বৈপ্লবিক সংগ্রাম শ্রেণী-সংগ্রাম ব্যতীত অন্য কিছু নয়।" ভারতবর্ষের বিংশ শতাব্দীর বৈপ্লবিক সংগ্রামও শ্রেণী-সংগ্রাম। ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রাম হইল বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, স্বাধীনতা লাভ ও আর্থিক দুর্দশা হইতে মুক্তিলাভের জন্য মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও ছাত্র-সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতান্ত্রিক শোষণ-উৎপীড়ন-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ও আদর্শে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষক-সম্প্রদায়ের সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রাম, দেশীয় রাজ্যসমূহের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-উৎপীড়ন ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে কৃষক ও প্রজা সাধারণের সশস্ত্র ও নিরস্ত্র সংগ্রাম এবং জাতি-উপজাতিসমূহের শোষণ-উৎপীড়ন হইতে মুক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের সংগ্রাম। এই সকল সংগ্রামের সমষ্টিই ভারতের বিংশ শতাব্দীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস। স্বভাবতই প্রত্যেক শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের সংগ্রামই উহার চরিত্র, আদর্শ ও লক্ষ্য অনুযায়ী বিকাশ লাভ করিয়াছে। এই ইতিহাসে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১. **বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকা :** ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ উহার উপনিবেশ ভারতবর্ষে প্রথম হইতেই শিল্পের বিকাশের পথ রুদ্ধ করিবার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াই ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীকে উহার শিল্প-কলকারখানা

স্থাপন এবং শিল্পের বিকাশ সাধন করিতে হইয়াছিল। বুর্জোয়াশ্রেণীর এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালনার জন্যই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রথম যুগের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা ও বৈপ্লবিক তাৎপর্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একাকী সংগ্রাম চালানো অসম্ভব বুঝিয়া বুর্জোয়াশ্রেণী সে সময় উহার নিজস্ব সংগঠনে যোগদান করিবার জন্য অন্যান্য শ্রেণীকেও আহ্বান করিতে বাধ্য হয়। এই আহ্বানে সাড়া দিয়া অন্যান্য শ্রেণীও কংগ্রেসকেই একমাত্র জাতীয় সংগঠন হিসাবে গ্রহণ করে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে যোগ দেয়। শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-সম্প্রদায় জাতীয় সংগ্রামের অংশ হিসাবেই নিজ নিজ শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিলে তাহা স্বভাবতই বৈপ্লবিক সংগ্রামের রূপ ধারণ করে। কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব তাহাতে ভীত হইয়া কয়েকবার সংগ্রাম বন্ধ করে এবং সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপসরফা করিয়া জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

একদিকে রুশিয়ার শ্রমিক-বিপ্লবে ধনতন্ত্রের ধ্বংস এবং অপর দিকে ১৯১৮-২২ সালের জাতীয় আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের রূপ দেখিয়া বৃহৎ বুর্জোয়া-গোষ্ঠী তখন আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া পড়ে এবং অবিলম্বে সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপস করিয়া লয়। তাহার পর ঐ একই কারণে বিপ্লবের ভয়ে ভীত বৃহৎ বুর্জোয়া-গোষ্ঠী নিজেদের মূল স্বার্থ রক্ষার জন্য জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়া সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে প্রবেশ করে এবং শেষ পর্যন্ত ভারতের শাসন পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হয়। ইহাই বৃহৎ বুর্জোয়া-গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর বৃহৎ অংশের শ্রেণী-ভূমিকা।

২ **মধ্যশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রাম ঃ** বঙ্গদেশ তথা ভারতের মধ্যশ্রেণী ব্রিটিশ-সৃষ্ট সামন্তপ্রথামূলক ভূমি-ব্যবস্থার মধ্য হইতে জন্মগ্রহণ করিবার পর বিংশ শতাব্দীর আর্থিক সংকটের চাপে তাহার এক অংশ কৃষি-ভূমির সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং হতাশাচ্ছন্ন হইয়া আর্থিক সংকট হইতে পরিত্রাণ ও দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তা ও আপসের মনোভাবের ফলে বুর্জোয়া নেতৃত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাহারা নিজস্ব পন্থায় এক বিশেষ প্রকারের সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথ অবলম্বন করে। মধ্যশ্রেণীসুলভ ভূম্যধিকারীর মনোবৃত্তির বশে তাহারা শ্রমিক-কৃষককে বৈপ্লবিক শক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার ফলেই তাহারা তাহাদের সংগ্রামের প্রধান উপায় হিসাবে সন্ত্রাসবাদ অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। কারণ, যে চরমপন্থা বা সশস্ত্র সংগ্রাম জনসাধারণ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া চলে, শ্রমিক-কৃষককে এড়াইয়া যায়, সেই সংগ্রামের সন্ত্রাসবাদ অবলম্বন করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না। এই সংগ্রামের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দূর পরিকল্পনা থাকিলেও প্রধানত অর্থ সংগ্রহের জন্য ডাকাতি এবং গুপ্তহত্যার মধ্যেই তাহাদের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ

সীমাবদ্ধ থাকে। অন্যরা রাজনীতিক ডাকাতিকে গেরিলাযুদ্ধের এক বিশেষ রূপ হিসাবে এবং গুপ্তহত্যাকে জনসাধারণকে জাগ্রত করিবার ও গণ-অভ্যুত্থান ঘটাইবার উপায় হিসাবে গ্রহণ করে। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের গণ-সংযোগহীন সশস্ত্র অভ্যুত্থান ব্যতীত তাহাদের অভ্যুত্থানের অন্য সকল পরিকল্পনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৮৯৮ সালে বোম্বাই প্রদেশ হইতে এই সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রামের সূচনা হয় এবং ১৯৩৪ সালে বঙ্গদেশে ইহার সমাপ্তি ঘটে। ৩৬ বৎসর ব্যাপী এই সংগ্রাম ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট অধ্যায় যোজনা করিয়াছে।

এই সংগ্রামগুলির বৈপ্লবিক অবদান অনস্বীকার্য। মধ্যশ্রেণীর এই বিপ্লববাদীরাই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার ধ্বনি তুলিয়াছিল। তাহারা উনবিংশ শতাব্দীর কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম ও বিদেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের অনুকরণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সশস্ত্র সংগ্রামের পন্থা অবলম্বন করে এবং স্বাধীনতার জন্য অকাতরে ফাঁসিকাঠে ও অন্যান্যভাবে প্রাণ বলি দিয়া দুর্জয় সাহস, অতুলনীয় আত্মত্যাগ ও দেশভক্তির পরিচয় দেয়। ইহাই ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে এই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের বিশিষ্ট অবদান।

ছাত্র-সম্প্রদায়ঃ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে মধ্যশ্রেণীর একটি বিশিষ্ট অংশ হিসাবে ছাত্র-সম্প্রদায়ের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যশ্রেণীর দুই প্রধান নায়ক, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু সর্বপ্রথম ছাত্র-সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম হইতেই এই সম্প্রদায় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহিত যুক্ত হইয়া এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করিয়া আসিয়াছে। মধ্যশ্রেণী সুলভ ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও প্রথমে ১৯০৫-০৮ সালের 'স্বদেশী-আন্দোলন'-এ এবং পরে ১৯৩০-৩২ সাল, ১৯৪২ সাল ও ১৯৪৫-৪৬ সালের বৈপ্লবিক সংগ্রামে ছাত্র-সম্প্রদায় যে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করিয়াছে, তাহা ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট অধ্যায় রচনা করিয়াছে। এই সকল সংগ্রামে, বিশেষত ১৯৩০ সালে পেশোয়ারে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে দশ দিনের জন্য যে স্বাধীন গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের সহিত ছাত্র-সম্প্রদায়ও অভূতপূর্ব সংগ্রাম-শক্তি, সাহস ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়াছে। এই সকল সংগ্রাম এবং পরবর্তী কালের আরও বহু বৃহৎ সংগ্রামে যোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়া ছাত্র-সম্প্রদায় একটি বৈপ্লবিক শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই সকল সংগ্রামে ছাত্র-সম্প্রদায়ের ভূমিকা চূড়ান্তরূপে প্রমাণ করিয়াছে যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ভারতের ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লবে ছাত্র-সম্প্রদায় হইবে একটি বিশিষ্ট সহায়ক বাহিনী। এই সম্পর্কে ইহার একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, গত দীর্ঘকালের ছাত্র-সংগ্রাম কার্যত শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব মানিয়া লইয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই বৈপ্লবিক পথে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে।

৩. শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকাঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মিল-কারখানার কল্যাণে শ্রমিকশ্রেণী ভারতের সমাজে আবির্ভূত হইতে থাকে। ১৯০৫-০৮

সালের 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর দেশব্যাপী ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের ফলে বহু নূতন মিল-কারখানা গড়িয়া উঠায় শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণী ইহার সহজাত চরিত্র হিসাবেই অসংগঠিত অবস্থা সত্ত্বেও বুর্জোয়াশ্রেণীর শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং ক্রমশ সংগঠিত হইতে থাকে। সংগঠিত সংগ্রামের মধ্যে দিয়া শ্রমিকশ্রেণী ক্রমে ক্রমে ভারতের বৈপ্লবিক গণ-সংগ্রামে নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা অর্জন করে। মিল-কারখানার ধর্মঘট সংগ্রাম এবং রাজপথে ব্রিটিশ শাসনের সামরিক শক্তির সহিত সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়া শ্রমিকশ্রেণী ধীরে ধীরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও বুর্জোয়া শোষণ-ব্যবস্থার রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখা দেয়। তাহার পতাকায় অঙ্কিত হইতে থাকে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রণধ্বনি। বিভিন্ন স্থানের যুক্ত-সংগ্রামের মধ্য দিয়া শ্রমিকশ্রেণী কৃষক-সম্প্রদায়কে লাভ করে উহার সংগ্রামী সহযোগী রূপে, বাস্তবক্ষেত্রে কৃষক-সম্প্রদায় পরিণত হইতে থাকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান বাহিনীতে। জন্মের পর মাত্র পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্রে উহার ইতিহাস-নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনের ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণের পক্ষে মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

১৯০৭-০৮ সালে শ্রমিকশ্রেণী পাঞ্জাব ও মাদ্রাজের কৃষক ও ছাত্র-শক্তিকে সঙ্গে লইয়া ব্রিটিশ শাসনের সামরিক শক্তির সহিত রাজপথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং পাঞ্জাব ও ত্রিবাঙ্কুরের সামন্ততান্ত্রিক শাসনের বনিয়াদ ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়। ১৯০৮ সালে বোম্বাই নগরীতে বাল গঙ্গাধর তিলকের কারাদণ্ডের প্রতিবাদে সাত দিন পর্যন্ত রাজনীতিক ধর্মঘট-সংগ্রাম ও রাজপথে সামরিক বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া শ্রমিকশ্রেণী বোম্বাইয়ের অন্যান্য শ্রেণীকেও সংগ্রামের পথে টানিয়া আনে, সাত দিন পর্যন্ত বোম্বাই নগরীর রাজপথের যুদ্ধে ব্রিটিশ শাসন ও উহার সামরিক শক্তিকে প্রচণ্ড আঘাত দেয়। বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর এই সংগ্রামকেই অভিনন্দিত করিয়া লেনিন লিখিয়াছিলেন : ভারতের শ্রমিকশ্রেণী এখন রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘনাইয়া আসিয়াছে।

১৯২৮-২৯ সালে বৎসরাধিক কাল সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং বৈদেশিক ও দেশীয় মালিকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব দৃঢ়তার সহিত ধর্মঘট-সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া ভারতের শ্রমিক শ্রেণী-সংগ্রামের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এই সংগ্রামে সমগ্র ভারতের বুকে আপসহীন সংগ্রামের রক্ত-পতাকা উড্ডীন করিয়া শ্রমিকশ্রেণী জনসাধারণকে আসন্ন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতির ইঙ্গিত জানায়। ১৯৩০-৩২ সালের জাতীয় সংগ্রামের অংশরূপে সেই বৈপ্লবিক সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যায়। লেনিনের ১৯০৮ সালের ভবিষ্যৎ-বাণী সত্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ১৯৩০-৩২ সালেই উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ১৯৩০ সালে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী কৃষকের সহায়তায় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মারফত উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পেশোয়ার আর দক্ষিণ-ভারতের শোলাপুর হইতে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘোষণা করে এবং এই দুই শহরে

যথাক্রমে দশদিন ও সাতদিনের জন্য শ্রমিক-কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভবিষ্যতের জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ স্থাপন করে। উপযুক্ত বিপ্লবী রাজনীতিক নেতৃত্ব লাভ করিলে ১৯৩০-৩২ সালেই শ্রমিকশ্রেণীর পরিচালনায় জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী শ্রমিক-কৃষক-মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রামে পরিণত হইত এবং সেই বৈপ্লবিক সংগ্রামের আগুনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র আর একচেটিয়া মূলধনের শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়া যাইত, ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হইত।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে একদিনের যুদ্ধ-বিরোধী রাজনীতিক ধর্মঘট পালন করিয়া বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের উদ্বোধন করে, তাহাই বহু ক্ষুদ্র-বৃহৎ সংগ্রামের মধ্য দিয়া ১৯৪৬ সালে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। সচেতন ও সুপরিকল্পিত পরিচালনার অভাবে পূর্বের মত এবারেও সেই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হইয়া যায়।

৪. **কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম** : প্রত্যেক বারের ব্যাপক শ্রমিক-সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষক-সম্প্রদায়ের সংগ্রাম এবং সংগ্রামের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর সহিত কৃষকের মিলন ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ১৯০৭-০৮ সালে যেমন পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের মিলিত সংগ্রাম হয়, তেমনই ১৯১৮-১৯ সাল হইতে ১৯২২ সাল পর্যন্ত ভারতব্যাপী শ্রমিক-সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে 'খিলাফৎ আন্দোলন'-এর অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন স্থানে কারিগরশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক-অভ্যুত্থান, শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে পাঞ্জাবে কৃষক-অভ্যুত্থান, পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা অভ্যুত্থান, ১৯২০-২১ সালে জাতীয় আন্দোলনের অংশ হিসাবে শ্রমিক-সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবে কৃষক-অভ্যুত্থান, মালাবারে মোপলা কৃষকদের পঞ্চম অভ্যুত্থান এবং কারিগরশ্রেণীর নেতৃত্বে তিনটি জেলায় কৃষক-রাজ প্রতিষ্ঠা, ১৯২১-২২ সালে যুক্ত প্রদেশে (বর্তমান উত্তর প্রদেশে) শহরাঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে অযোধ্যা, বেরিলি ও গোরক্ষপুর জেলায় 'চৌরিচৌরা-বিদ্রোহ' প্রভৃতি কৃষক-অভ্যুত্থান এবং লক্ষ্ণৌ ও পাঞ্জাবের মুলতান জেলার ও বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক-জনসাধারণের ব্যাপক অভ্যুত্থান ১৯১৮ সাল হইতে ১৯২২ সাল পর্যন্ত সময়কে ভারতের ইতিহাসে এক বিশেষ বৈপ্লবিক কাল রূপে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে।

ইহার পর হইতে এই বৈপ্লবিক সংগ্রাম আর এক উন্নততর পর্যায়ে আরোহণ করিয়াছে। এই পর্যায়ে ভারতবর্ষের উপর দিয়া শ্রমিক-সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক-সংগ্রামেরও ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ১৯২৮ সালে গুজরাট প্রদেশের বারদৌলি-বিদ্রোহ, ১৯৩০ সালে ভারতের জাতীয় সংগ্রামের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-উৎপীড়নের অবসান ও স্বাধীনতার দাবিতে কৃষক-অভ্যুত্থান, ১৯৩০ সালে পেশোয়ারে শ্রমিকশ্রেণীর সহিত

একযোগে কৃষক-অভ্যুত্থান ও শ্রমিক-কৃষক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, বঙ্গদেশে কিশোরগঞ্জ-বিদ্রোহ, উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ ও অযোধ্যা জেলায় কৃষকের রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসাবে সরকারী কর-বন্ধের সংগ্রাম, মধ্যপ্রদেশের বেরাঁর ও বুলদানা জেলায় কৃষি-শ্রমিকদের নেতৃত্বে কৃষক-অভ্যুত্থান, বুলদানা জেলায় মহাজন-বিরোধী কৃষক-অভ্যুত্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে উপজাতীয় কৃষকদের অভ্যুত্থান, ১৯৩১ সালে উত্তর প্রদেশের কৃষক-অভ্যুত্থান এবং ১৯৩১-৩৩ সালে অন্ধ্র প্রদেশে কৃষক-সম্প্রদায়ের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-বিরোধী সংগ্রামের সহিত জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সংগ্রাম, ১৯২৮ সাল হইতে ১৯৩২-৩৩ সাল পর্যন্ত সময়কে উন্নততর বৈপ্লবিক সংগ্রামের যুগরূপে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে।

বৈপ্লবিক সংগ্রামের পরবর্তী কাল ভারতব্যাপী সংগঠিত কৃষক-সংগ্রামের কাল। শ্রমিকশ্রেণীর সর্বভারতীয় ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের অনুসরণে ১৯৩৬ সালে 'নিখিল ভারত কৃষক-সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর হইতে আরম্ভ হয় কেন্দ্রীয় পরিচালনায় সংগঠিত কৃষক-সংগ্রাম। ১৯৩৭ সালে শ্রমিক-সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে বিহারে আরম্ভ হয় জঙ্গী কৃষক-আন্দোলন, উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, কেরালা ও বঙ্গদেশে ব্যাপক কৃষক-সংগ্রাম। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় কৃষক-সংগ্রাম আর এক উন্নততর স্তরে আরোহণ করে। ১৯৪২ সালের 'আগস্ট-আন্দোলন'-এ বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষক-সম্প্রদায় স্বাধীনতার জন্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়; তাহারা সাতারা, বালিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে শ্রমিক-সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বঙ্গদেশে তেভাগার দাবিতে প্রায় ৫০ লক্ষ ভাগচাষীর ঐতিহাসিক সংগ্রাম, টঙ্ক-প্রথার বিরুদ্ধে ময়মনসিংহের হাজং-বিদ্রোহ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক-বিদ্রোহ, বোম্বাইয়ের কর্নাটক জেলায় কৃষক-সংগ্রাম, উত্তর মালাবারের কৃষকদের জমিদার-মহাজন-মজুদদার-বিরোধী সংগ্রাম, গুজরাটে ও আসামের সুরমা উপত্যকায় ভাগচাষীদের সংগ্রাম, পাঞ্জাবের অমৃতসর, মণ্টোগোমারি ও অন্যান্য জেলায় কৃষকের সংগ্রাম, পাতিয়ালার ১৮০ খানি গ্রামে কৃষক-সংগ্রাম, উড়িষ্যার চারটি জেলায় ভাগচাষীদের সংগ্রাম, মহারাষ্ট্রে ভূমিদাস-প্রথা ও বেগার-প্রথার বিরুদ্ধে এবং মজুরি বৃদ্ধির জন্য ওয়ার্লি কৃষকের সংগ্রাম, মাদ্রাজের কৃষ্ণা জেলায় কৃষকের সংগ্রাম, তামিলনাদের চারিটি জেলায় কৃষক-সংগ্রাম, বিহারের এগারোটি জেলায় বকাস্ত জমির জন্য এবং ভাওয়ালি-প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রাম প্রভৃতি নূতন ইতিহাস রচনা করে। এই সংগ্রামের প্রত্যেকটি ছিল দৃঢ়তায় ও জঙ্গী চরিত্রে অভূতপূর্ব এবং এই সংগ্রামগুলি পরবর্তী কালের বহুগুণ উন্নত বৈপ্লবিক সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখে।

পরবর্তী কাল আরও উন্নত স্তরের বৈপ্লবিক সংগ্রামের কাল, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাল। প্রথম জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হিসাবে 'তেলেঙ্গানা বিপ্লব' ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্লবী জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যুগের উদ্বোধন করিয়াছে। ১৯৪৬ সালে (ব্রিটিশ শাসনকালে) আর্থনীতিক দাবি লইয়া তেলেঙ্গানা-সংগ্রামের

আরম্ভ, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ভারতের সামন্ততন্ত্রের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ হায়দরাবাদের নিজামশাহীর ধ্বংস-সাধনের উদ্দেশ্যে বৈপ্লবিক সংগ্রামের স্তরে এই সংগ্রামের উত্তরণ, আড়াই হাজার গ্রামব্যাপী বিশাল অঞ্চলে নিজামশাহীর ধ্বংস-সাধন ও জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা—আজ পর্যন্ত ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসের বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারূপে জাজ্বল্যমান।

৫. সামন্তরাজ্যের কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম ঃ ভারতের পাঁচ শতাধিক দেশীয় সামন্তরাজ্য ছিল প্রাচীন কালের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-উৎপীড়ন-স্বেচ্ছাচারিতার লীলাভূমি। এই রাজ্যসমূহের দশ কোটি কৃষক-প্রজা সামন্ততান্ত্রিক পেষণযন্ত্রে পিষ্ট হইয়া নির্জীব, নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯৩০-৩২ সালে ব্রিটিশ ভারতের শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম দেশীয় রাজ্যের প্রজাসাধারণের মধ্যেও প্রাণ-স্পন্দন জাগাইয়া তোলে, তাহাদিগকে সংগ্রামের পথে টানিয়া আনে। তাহার পর হইতে সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথ বাহিয়া দেশীয় সামন্তরাজ্যগুলির দশ কোটি কৃষক-প্রজাও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম প্রধান সহায়ক-বাহিনীতে পরিণত হয়। সামন্তরাজ্যসমূহের সংগ্রাম ছিল স্থানীয় শ্রমিক ও কৃষক জনসাধারণের মিলিত সংগ্রাম এবং শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বেই এই রাজ্যসমূহের কৃষক-প্রজাসাধারণের সংগ্রাম প্রথম হইতে বিকাশ লাভ করিয়াছে। ব্রিটিশ ভারতের ১৯৩০-৩২ সালের বৈপ্লবিক সংগ্রামই দীর্ঘকালের শোষণ-উৎপীড়নে জর্জরিত, হতাশাচ্ছন্ন কৃষক-প্রজাসাধারণের মনে সাহসের সঞ্চার করিয়াছে, সংগ্রামের পথ দেখাইয়াছে। ব্রিটিশ ভারতের সেই সংগ্রামের আহ্বানে সাড়া দিয়াই একে একে সকল সামন্তরাজ্যে শ্রমিক-কৃষকের মিলিত সংগ্রামের ঝড় উঠিয়াছে।

সামন্তরাজ্যের কৃষক-সংগ্রামকে কাল হিসাবে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা—

১৯৩১-৩৩ সাল ঃ দক্ষিণ-ভারতের ত্রিচিনাপলির নিকটবর্তী পদুকোটা রাজ্যে কৃষক-প্রজাসাধারণের বিদ্রোহ (১৯৩১), কাশ্মীর রাজ্যের ডোগরা রাজের কুশাসনের বিরুদ্ধে জম্মু ও কাশ্মীরের কৃষক-প্রজাসাধারণের বিদ্রোহ (১৯৩১-৩২), আলোয়ার রাজ্যের কৃষক-প্রজা-বিদ্রোহ (১৯৩২-৩৩) এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পুলরা ও দীর রাজ্যের বিদ্রোহ (১৯৩২-৩৩) সামন্ত রাজ্যসমূহের শ্রমিক-কৃষক প্রজাসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের উদ্বোধন করিয়াছে।

ইহার পর ভারতব্যাপী সামন্তরাজ্যসমূহের শ্রমিক-কৃষক প্রজাসাধারণের বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতির সময়। আবার নূতন সম্ভাবনা ও নূতন দাবি লইয়া আরম্ভ হয় বৃহত্তর সংগ্রাম। এবার সামন্তরাজ্যসমূহের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল শিল্পের শ্রমিক ও কারিগরশ্রেণী এবং কৃষি-শ্রমিকগণ প্রত্যক্ষভাবে সকল কৃষক-প্রজাসাধারণের বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে, সামন্ততান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে সামন্তরাজ্যসমূহের কৃষক-প্রজা সাধারণের সংগ্রাম সামন্ততন্ত্রবিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রামে পরিণত হয়।

১৯৩৮-৩৯ সাল : সামন্তরাজ্যসমূহের গণ-সংগ্রাম এক নূতন, বৈপ্লবিক স্তরে আরোহণ করে। সামন্তরাজ্যসমূহের শ্রমিকশ্রেণী উহার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মারফত কৃষক-প্রজাসাধারণের সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া কৃষক-সংগ্রামের জঙ্গী চরিত্র, দৃঢ়তা ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী মনোভাব শতগুণ বর্ধিত করে। ১৯৩৮ সালে সামন্ততান্ত্রিক উৎপীড়ন ও ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে বরোদা, রাজকোট, ত্রিবাঙ্কুর, গোয়ালিয়র, ইন্দোর প্রভৃতি সামন্তরাজ্যের শ্রমিকশ্রেণী এক নূতন সংগ্রাম আরম্ভ করে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল সামন্তরাজ্যে আরম্ভ হয় খাজনা হ্রাসের জন্য ও বেগার-প্রথার বিরুদ্ধে কৃষক-প্রজাসাধারণের ব্যাপক সংগ্রাম। ইহা ব্যতীত বরোদা রাজ্যের ল্যাভেট অঞ্চলে কৃষি-শ্রমিকের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজাসাধারণের বিদ্রোহ (১৯৩৮), গুজরাটের রাজকোট রাজ্যের বিদ্রোহ (১৯৩৮), কাশ্মীর রাজ্যের বিদ্রোহ (১৯৩৮), উড়িষ্যা প্রদেশের ঢেনকানল, তালচের ও রামপুর রাজ্যের কৃষক-বিদ্রোহ (১৯৩৮), গুজরাটের নিম্বদি রাজ্যের কৃষক-বিদ্রোহ (১৯৩৮-৩৯), রাজস্থানের মেবার রাজ্যের বিদ্রোহ (১৯৩৮), উড়িষ্যার রামপুর ও ঢেনকানল রাজ্যের কৃষক-বিদ্রোহ (১৯৩৯) এবং ত্রিবাঙ্কুর ও মহীশূর রাজ্যের কৃষক-বিদ্রোহ (১৯৩৯) ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে নবযুগের সৃষ্টি করে।

১৯৪৬-৪৭ : এই দুইটি বৎসর ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসের 'স্বর্ণযুগ'। এই সময় সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী যে বৈপ্লবিক আলোড়ন আরম্ভ হয়, তাহাতে সামন্তরাজ্যসমূহের শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-সম্প্রদায় যোগ্য স্থান গ্রহণ করিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের 'কয়ার' শ্রমিকদের অভূতপূর্ব সংগ্রাম, পুন্নাপ্রা-ভায়লারের শ্রমিক-কৃষকের বিদ্রোহ (১৯৪৬), মহীশূরের স্বর্ণখনি ও বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের অভূতপূর্ব ধর্মঘট-সংগ্রাম (১৯৪৬), তেহ্‌রি-গাড়োয়াল সামন্তরাজ্যের কৃষক-বিদ্রোহ (১৯৪৬), হায়দরাবাদ রাজ্যের তেলেঙ্গানা-সংগ্রাম (১৯৪৬-৪৭), 'ডোগরারাজ কাশ্মীর ছাড়ো' ধ্বনি লইয়া কাশ্মীরের সর্বত্র শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-বিদ্রোহ (১৯৪৬-৪৭ , জয়পুর, মেবার প্রভৃতি রাজপুতানার সামন্তরাজ্য ও ভরতপুরের কৃষক-প্রজাসাধারণের বিদ্রোহ (১৯৪৬-৪৭) এবং ইন্দোর সামন্তরাজ্যের কৃষকপ্রজা-বিদ্রোহ ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসের এক রক্তরঞ্জিত অধ্যায় রচনা করিয়াছে।

এই সকল বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে হায়দরাবাদ সামন্তরাজ্যের তেলেঙ্গানার কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে তেলেঙ্গানার কৃষক নিজামী শাসন হইতে মুক্ত আড়াই হাজার গ্রামের বিশাল অঞ্চলে প্রথম জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামকে উহার লক্ষ্যের দিকে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে।

৬ জাতি-উপজাতিসমূহের ভূমিকা : ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতি-উপজাতির আবির্ভাব এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে জাতি-উপজাতিগুলির সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে বহুকাল পূর্ব হইতে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের পূর্বাঞ্চল হইতে পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত সমতল ভূমিতে ও

পাহাড় অঞ্চলে বসবাসকারী প্রায় সকল জাতি-উপজাতি সাম্রাজ্যবাদ-একচেটিয়া বুর্জোয়া-সামন্ততন্ত্র ও মহাজন-বণিকগোষ্ঠী-পুরোহিত-পাদ্রী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের শোষক-উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনা করিয়া ভারতের বৈপ্লবিক গণ-সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে এই সকল জাতি-উপজাতির সংগ্রাম নূতন দাবি ও নূতন তাৎপর্য লইয়া দেখা দিয়াছে। তাহাদের সংগ্রাম একালে শোষণ-পীড়ন-মুক্ত বাসভূমির জন্য সংগ্রাম—আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম। এই সংগ্রামের মারফত তাহারা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি প্রধান শক্তিরূপে ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের সম্মুখ সারিতে স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

৭ **ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বৈপ্লবিক ভূমিকা :** ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামে দেশীয় সৈন্যবাহিনী এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া আসিয়াছে। ১৮৫৭-৫৮ সালে মহাবিদ্রোহে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বৈপ্লবিক ভূমিকা স্মরণ করিয়া সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা প্রথম হইতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে দেশীয় সৈন্যবাহিনীকে বৈপ্লবিক সংগ্রামে যোগদানের জন্য অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ১৯০৭ সালে পাঞ্জাবী সৈন্যগণ পাঞ্জাবের শ্রমিক-কৃষকের সহিত একযোগে অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। বিপ্লবীদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ দেশীয় সৈন্যদের মনোভাব জানিয়াই ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর ১৯০৮ সালের ঐতিহাসিক রাজপথের যুদ্ধে দেশীয় সৈন্যদের নিয়োগ না করিয়া ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে নিয়োগ করিয়াছিল। গদর-বিপ্লবীদের প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া ১৯১৫ সালে সিঙ্গাপুরে অবস্থিত শিখসৈন্য-বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সিঙ্গাপুর শহর অধিকার করিয়াছিল এবং সাতদিন পর্যন্ত উহা দখলে রাখিয়াছিল। ব্রহ্মদেশে অবস্থিত বালুচ ও অন্যান্য সৈন্যদলগুলিও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের আয়োজন করিয়াছিল। ১৯১৫ সালে বিপ্লবীদের প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া ঢাকায় অবস্থিত পাঞ্জাবী সৈন্যবাহিনী এবং বেনারস ক্যান্টনমেন্ট, পাঞ্জাব, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত দেশীয় সৈন্যদলগুলি অভ্যুত্থানের আয়োজন করিয়াছিল এবং অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ায় বহু সৈন্য ফাঁসিকাষ্ঠে ও কামানের মুখে হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল।

১৯৩০ সালে পেশোয়ারে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের অভ্যুত্থান দমনের জন্য প্রেরিত গাড়োয়ালী সৈন্যগণ বিদ্রোহী শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের রাইফেলগুলি বিদ্রোহীদের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল এবং হাসিমুখে কঠোর শাস্তি মাথা পাতিয়া লইয়াছিল। সামন্তরাজ্যসমূহের শ্রমিক-কৃষক-জনসাধারণের প্রত্যেকটি বিদ্রোহে দেশীয় সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল বলিয়াই এই সকল বিদ্রোহ দমনের জন্য ব্রিটিশ সৈন্য নিয়োগ করা হইয়াছিল। সর্বশেষে ১৯৪৬ সালে দেশীয় সৈন্যবাহিনী, বিশেষত ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর দেশীয় সৈন্যগণ শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের পন্থা অনুসরণ করিয়া ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা

করিয়াছে। ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে সংগ্রামের এক নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছে যে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীও ভারতের বিপ্লবী জনসাধারণেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের এক যোগ্য অংশীদার।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৬ সালে শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহে, স্থল-বাহিনীর বিদ্রোহে ও বিমান-বাহিনীর বিদ্রোহে ভীত হইয়াই ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আপসে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের হাতে ভারত-শাসনের ভার ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়ায়। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রধানত কৃষক-সন্তানদের লইয়াই গঠিত। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী তাই ভারতের শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশীদারের ভূমিকাই পালন করিয়াছে।

ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের শিক্ষা

(১) ভারতের মধ্যশ্রেণীর বিপ্লববাদ নির্ভুলভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদই ভারতবর্ষের প্রধানতম শত্রু। তাই এই বিপ্লবীরা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধেই তাহাদের সকল শক্তি সংহত করিয়াছিল। কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের কৌশল হিসাবে তাহাদের সকল ক্রিয়াকলাপ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কতিপয় কর্মচারীকে হত্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মধ্যশ্রেণীর যুবশক্তি আর্থনীতিক ও রাজনীতিক দিক হইতে হতাশাচ্ছন্ন হইয়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেও তাহারা তাহাদের সহজাত শ্রেণী-বিদ্বেষ বশত শ্রমিক-কৃষকের দিকে তাকাইতে পারে নাই, তাই তাহারা তাহাদের বৈপ্লবিক ক্রোধ প্রকাশের জন্য ব্যক্তিগত গুপ্তহত্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহাদের ধারণা ছিল, গুপ্তহত্যার ফলেই সাম্রাজ্যবাদী শাসনযন্ত্র অচল হইয়া পড়িবে এবং জনসাধারণ উৎসাহিত হইয়া সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মারফত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ করিবে।

বিপ্লব সম্বন্ধে এবং কোন সমাজ-ব্যবস্থা পাল্টাইবার উপায় সম্বন্ধে এই পেতিবুর্জোয়া বিপ্লববাদীদের কোন ধারণা না থাকায় তাহারা কেবল গুপ্তহত্যা দ্বারাই সাম্রাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থাকে পাল্টাইবার দিবাস্বপ্নে মশগুল হইয়াছিল। তাহারা ইহা বুঝিতে চাহিত না যে, কয়েকজন মূলধনীকে হত্যা করিয়া যেমন ধনতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটানো যায় না, অথবা কয়েকজন জমিদার বা জোতদার হত্যা করিয়া যেমন সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ করা যায় না, ঠিক সেইরূপ কয়েকজন পুলিস বা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করিয়া সাম্রাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থা ধ্বংস করা যায় না; শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণকে সংগঠিত ও ক্ষুদ্র-বৃহৎ সংগ্রামের মধ্যে পরিচালিত করিয়া বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুত্থানের দ্বারাই রাষ্ট্র-ক্ষমতা অধিকার করিতে হয় এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসন, একচেটিয়া ধনতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ করিতে হয়। ইহা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল বলিয়াই ইহার পরিবর্তে সন্ত্রাসবাদীরা ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে দুঃসাহসিক, বীরত্বপূর্ণ কার্য

দ্বারা আত্মাহুতি দানের দৃষ্টান্ত স্থাপনের মারফত বিপ্লব সাধনের সহজ পন্থা আবিষ্কারে প্রয়াসী হইয়াছিল।

সন্ত্রাসবাদের দ্বারা সমাজ-ব্যবস্থাকে পাল্টানো যায় না। প্রকৃতপক্ষে ইহা দ্বারা রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটিকেও এড়াইয়া যাওয়া হয় এবং জনসাধারণের বৈপ্লবিক উদ্যম নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। তাই জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন এই সকল সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়াকলাপ মূলত প্রতিক্রিয়াশীল।

মধ্যশ্রেণীর যুব-সম্প্রদায়ের এই গণ-সংযোগহীন, সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম কার্যত গণ-বিরোধী, বিপ্লব বিরোধী ও অর্থহীন বীরত্ব প্রকাশের ঝোঁক হিসাবে বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে এবং বৈপ্লবিক সংগ্রামের একটি কৌশল হিসাবে ইহা চিরকালের জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছে। তথাপি এখনও ইহার বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবেই লেনিন রাশিয়ার সন্ত্রাসবাদের স্বরূপ ও পরিণাম বিশ্লেষণ করিয়া উহার সম্বন্ধে যে সতর্কবাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। লেনিন তাঁহার ***What 'The Friends of the People Are'*** গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, বৈপ্লবিক আন্দোলনের পক্ষে সন্ত্রাসবাদ অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারণ, ইহা গণ-সংগ্রামের পরিবর্তে বীরপুরুষদের ব্যক্তিগত সংগ্রামকেই প্রাধান্য দেয়।

প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসবাদ কোন বৈপ্লবিক মতবাদ নহে, ইহা স্বতঃস্ফূর্ততা ও ক্রোধ প্রকাশের একটি সহজ পন্থা মাত্র। সন্ত্রাসবাদ ও অর্থনীতিবাদ যে একই মূল হইতে উদ্ভূত তাহা ব্যাখ্যা করিয়া লেনিন লিখিয়াছেন :

"অর্থনীতিবাদীরা আর সন্ত্রাসবাদীরা একই শিকড় হইতে গজাইয়াছে। সেই শিকড় হইল স্বতঃস্ফূর্ততার (spontaneity) নিকট আত্মসমর্পণ। যাহারা একঘেয়ে 'দৈনন্দিন সংগ্রাম'-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে, আর যাহারা সর্বাপেক্ষা আত্মত্যাগী ব্যক্তির আত্মাহুতি দানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে—এই দুই দলের মধ্যে পার্থক্য অনেক। অর্থনীতিবাদীরা ও সন্ত্রাসবাদীরা স্বতঃস্ফূর্ততার দুই ভিন্ন ভিন্ন দিকের নিকট মাথা নত করে। অর্থনীতিবাদীরা মাথা নত করে শ্রমিক-আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততার নিকট, আর সন্ত্রাসবাদীরা মাথা নত করে বুদ্ধিজীবীদের গভীর উত্তেজনাময় ক্রোধের নিকট। শ্রমিক-আন্দোলনকে বৈপ্লবিক সংগ্রামের অঙ্গীভূত করিবার ক্ষমতা বা সুযোগ এই বুদ্ধিজীবীদের নাই। এই দুইকে এক করা যে সম্ভব সেই সম্বন্ধে যাহারা বিশ্বাস হারাইয়াছে, অথবা কোন কালেই এ সম্বন্ধে যাহাদের বিশ্বাস ছিল না, তাহাদের পক্ষে সন্ত্রাসবাদের পথ ব্যতীত ক্রোধ ও বৈপ্লবিক উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রকাশের আর কোন পথ খুঁজিয়া পাওয়া কষ্টকর।"

[***What Is to Be Done? Collected Works, Vol 6, p. 418***]

"আমাদের বিশ্বাস, হাজার হাজার শ্রমিকের কেবল সভাসমিতিতে যোগদান এবং সেখানে তাহাদের মূল স্বার্থ ও তাহার সহিত রাজনীতির সম্পর্ক সম্বন্ধীয় আলোচনা হইতে যে উদ্দীপনা ও শিক্ষার ফল পাওয়া যায় তাহা একশতটা জারকে (রুশিয়ার

সম্রাটকে—লেঃ) হত্যা করিয়াও পাওয়া যাইবে না। কারণ, এই ধরনের আন্দোলন ক্রমশ অধিক সংখ্যায় নূতন নূতন শ্রমিককে আরও সচেতন করিয়া তোলে, তাহাদিগকে আরও ব্যাপক বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্যে টানিয়া আনে।"

[*New Events and Old Questions*, Collected Works, Vol. 6, p. 280]

'রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি'র দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের প্রস্তাব :

"এই কংগ্রেস ব্যক্তিগত হত্যার নীতি হিসাবে সন্ত্রাসবাদকে চূড়ান্তরূপে অগ্রাহ্য করে। কারণ, এই ধরনের রাজনীতিক সংগ্রাম বিপ্লবীদের সহিত বিপ্লবী শ্রেণীসমূহের জনসাধারণের সম্পর্ক বিনষ্ট করে এবং স্বেচ্ছাচারীশাসন-বিরোধী সংগ্রামের উদ্দেশ্য ও পন্থা সম্বন্ধে বিপ্লবীদের ও জনসাধারণের মধ্যে সম্পূর্ণ বিকৃত ধারণার সৃষ্টি করে।"

[Collected Works, Vol. 6, p. 474]

সংক্ষেপে, সন্ত্রাসবাদ শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে অস্বীকার করে, সংগ্রামে শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণের অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে এবং সংগ্রামে জনসাধারণের অংশ গ্রহণের পরিবর্তে কতিপয় দুঃসাহসী ব্যক্তি বা দলের দ্বারা বিচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি কার্যকে সকল কিছুর উপরে স্থান দেয়, আর এই সকল কার্যকেই 'বিপ্লব' বলিয়া প্রচার করে। কিন্তু ইহা যে বিপ্লব নয় তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বহু পূর্বেই স্তালিন ইহাদের সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন :

"কেবল একটি অগ্রণী দলের দ্বারা অথবা একটি পার্টি দ্বারা বিপ্লব হয় না, কিংবা ব্যক্তি বিশেষ 'যত বড়ই' হউক না কেন, তাহাদের দ্বারাও বিপ্লব হয় না, বিপ্লব হয় প্রথমত ও প্রধানত লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের দ্বারা।"

[J. V. Stalin : *Comment on Current Affairs* : On China]

(২) ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা বর্তমান কালে বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কংগ্রেস শাসনের গোড়ার দিকে শিল্পে স্থায়িভাবে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল পঁয়ষট্টি লক্ষ। তাহার পর তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পসংস্থার বৃদ্ধির ফলে স্থায়ী শ্রমিক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া এখন প্রায় ৯০ লক্ষে পৌঁছিয়াছে। ইহার সহিত অনিয়মিত বা অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা যোগ করিলে মোট শ্রমিক-সংখ্যা হইবে প্রায় দেড় কোটি। ভারতের অধিকাংশ শিল্পই গ্রামাঞ্চলে (অর্থাৎ বড় শহরের বাহিরে) অবস্থিত। সেন্সাস্ রিপোর্ট প্রভৃতি বিভিন্ন সূত্র হইতে দেখা যায়, মোট শ্রমিক-সংখ্যার প্রায় ষাটভাগ বাস করে গ্রামাঞ্চলে এবং গ্রাম হইতেই তাহারা নিজ নিজ কল-কারখানায় কাজ করিতে আসে। গ্রামে বসবাসকারী শ্রমিকদের প্রায় সকলের সহিত জমির সম্পর্ক বর্তমান। সুতরাং বলা যায়, ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এক বিরাট অংশই অর্ধশ্রমিক-অর্ধকৃষক।

শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ইহা নিঃসন্দেহে এক প্রকাণ্ড দুর্বলতা। শ্রমিকশ্রেণীর শ্রমিক-সুলভ বৈপ্লবিক গুণাবলী আয়ত্ত করিবার পক্ষে ইহা এক প্রকাণ্ড বাধাস্বরূপ। তথাপি ক্রমশ কল-কারখানার সংগ্রামের মধ্য দিয়া শ্রমিকশ্রেণী উন্নত দৃষ্টি ও উন্নত চেতনা লাভ করিতেছে, এই সংগ্রামের মধ্য দিয়া শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামী মনোভাব,

শ্রেণীচেতনা এবং শ্রমিকশ্রেণী-সুলভ বৈপ্লবিক চেতনার বিকাশ ঘটিতেছে। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন দুর্বলতা সত্ত্বেও সংগ্রামী ট্রেড য়ুনিয়ান-আন্দোলন এবং নিরবচ্ছিন্ন রাজনীতিক প্রচার প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আরও উন্নত শ্রেণী-চেতনা, বৈপ্লবিক চেতনা এবং উহার ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধীয় চেতনার বিকাশ অনিবার্য। শ্রমিক-সংগ্রামের অতীত ইতিহাসই তাহা প্রমাণিত করিয়াছে। বিভিন্ন সময়ের সংগ্রামের মধ্য দিয়া শ্রমিকশ্রেণীর যে গুণাবলী প্রকাশ পাইয়াছে তাহা হইতে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, উপযুক্ত রাজনীতিক পরিচালনায় ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কেবল সম্ভবই নয়, তাহা অনিবার্য।

শ্রমিকশ্রেণীর সহিত গ্রামের ঘনিষ্ঠ সংযোগ একদিকে দুর্বলতার পরিচায়ক হইলেও আর এক দিকে তাহা বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ। ইহার ফলে শ্রমিক-কৃষকের যুক্ত-সংগ্রামের পক্ষে এক মহাসুযোগের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার ফলে শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে অচ্ছেদ্য নাড়ীর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে কৃষক-সংগ্রাম গড়িয়া তোলার ভিত্তি রচিত হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন স্থানের শ্রমিক-কৃষকের যুক্ত-সংগ্রামই তাহার প্রমাণ।

শ্রমিক-কৃষকের এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের রূপই আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি ১৯০৭ সালে মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক সংগ্রাম, ১৯০৮ সালে বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর রাজপথের যুদ্ধে, ১৯২৬-২৭ সালে লিলুয়ার রেল-কারখানার শ্রমিক-ধর্মঘটে, ১৯৩০ সালে পেশোয়ার ও শোলাপুরের শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্র-ক্ষমতা অধিকারের সংগ্রামে, ১৯৪২ সালের আগস্ট সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে শ্রমিক-কৃষকের যোগদানে, ১৯৩৬ সাল হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দেশীয় সামন্তরাজ্যসমূহের প্রায় সকল সংগ্রামে এবং প্রায় সকল রেল-শ্রমিকদের সংগ্রামে কৃষকের আর সকল কৃষক-সংগ্রামে রেল-শ্রমিকদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায়। ভারতের শ্রমিক-সংগ্রাম ও কৃষক-সংগ্রাম পরস্পরের সহিত সংযুক্ত এবং একই বৈপ্লবিক সংগ্রামের দুই অচ্ছেদ্য অংশ। ইহা ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা ভারতের ইতিহাসের শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করারই নামান্তর।

(৩) ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রাম সকল শোষকের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সকল শোষিতের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম—সাম্রাজ্যবাদ-একচেটিয়া-বুর্জোয়া-সামন্ততন্ত্র এই সম্মিলিত শোষক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক-বিভিন্ন উপজাতি-ছাত্র-কর্মচারী ও শহরের দরিদ্র জনসাধারণের মিলিত শক্তির (ঐক্যফ্রন্টের) সংগ্রাম—শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে দেশের সমগ্র জনসাধারণের সংগ্রাম। এই প্রকারের বৈপ্লবিক গণফ্রন্টের মূল আমাদের জাতীয় ইতিহাসের গর্ভেই নিহিত। ভারতের জাতীয় সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে নিজ হইতেই এই গণফ্রন্ট গড়িয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে। ইহা ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, দীর্ঘকালের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য।

উপযুক্ত নেতৃত্ববিহীন হওয়া সত্ত্বেও, কেবল উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-বিদ্রোহের

সংগ্রামী ঐতিহ্যে বলীয়ান হইয়া বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতেই শ্রমিক-কৃষক অন্যান্য সংগ্রামী শ্রেণীর সহায়তায় সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়া দেশব্যাপী জনগণের ঐক্যফ্রন্ট গঠনের প্রয়াস পাইয়াছিল। শ্রমিক কৃষক-ছাত্র ও জাতীয়-বুর্জোয়াদের এই সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র-বিরোধী ঐক্যফ্রন্টই গড়িয়া উঠিয়াছিল ১৯০৭ সালে পাঞ্জাব ও মাদ্রাজ প্রদেশের বিভিন্ন শহরের রাজপথের যুদ্ধে, এই ঐক্যফ্রন্টই গড়িয়া উঠিয়াছিল ১৯০৮ সালে বোম্বাই নগরীর রাজপথে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর সহিত যুদ্ধের মধ্য দিয়া। ভারতের জনগণের এই ঐক্যফ্রন্টই আবার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল ১৯১৮-২২ সালে ভারতের শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে। ১৯৩০-৩২ সালের জাতীয় সংগ্রামের মধ্যেও ভারতবর্ষব্যাপী শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র ও শহরের দরিদ্র জনসাধারণের ঐক্যফ্রন্ট সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ভিত্তি কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল।

১৯৩০-৩২ সালের জাতীয় সংগ্রামে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র ও দরিদ্র জনসাধারণের ঐক্যফ্রন্টই সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কবল হইতে দশদিনের জন্য পেশোয়ার, সাতদিনের জন্য শোলাপুর, দুইদিনের জন্য কলিকাতা এবং একদিনের জন্য বোম্বাই, লাহোর, মাদ্রাজ ও কানপুর শহরের শাসন-ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিল, পেশোয়ার ও শোলাপুরে জনগণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই বিপ্লবী গণফ্রন্টই আবার ভারতের বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলের রাজপথের যুদ্ধের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল ১৯৪২ এবং ১৯৪৬ সালে। ১৯৪২ সালের 'আগস্ট অভ্যুত্থান'-এ ইহার নেতৃত্বের মারাত্মক ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সংগ্রামী জনসাধারণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'জাতীয় সরকার' প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালেও ভারতব্যাপী গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যে এই বিপ্লবী গণফ্রন্ট সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের উচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তেলেঙ্গানার বৈপ্লবিক সংগ্রাম শ্রমিক-কৃষকের ঐক্যফ্রন্টেরই সার্থক রূপ। প্রসঙ্গক্রমে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই সময় এক নূতন শক্তি জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রামে যোগদান করিয়া ভারতের বিপ্লবী গণফ্রন্টকে বহুগুণ শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল, ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের সম্ভাবনা শতগুণ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। সেই শক্তি ভারতীয় সৈন্যবাহিনী।

(৪) ভারতের বিপ্লবের স্তর সাম্রাজ্যবাদ-একচেটিয়াবুর্জোয়া-সামন্ততন্ত্র-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর। ভারতের বিশেষ সামাজিক-আর্থনীতিক-রাজনীতিক অবস্থার পটভূমিকায় এবং এতকালের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে—অন্য কোনভাবে, অন্য কোন দেশের অবিকল অনুকরণ করিলে ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লব ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘকাল পূর্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। বিশেষত ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী-বিপ্লবের পর হইতেই য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু চরম লক্ষ্যের দিক হইতে এক হইলেও, অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের

বাধা অপসারিত করিয়া আর্থনীতিক বিকাশের পথ প্রস্তুত করা এই সকল বিপ্লবের চরম লক্ষ্য হইলেও বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের চরিত্র, তাহার বিষয়বস্তু এবং কৌশল ভিন্ন ভিন্ন। ফরাসী বিপ্লবে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হইয়াছিল এবং ফরাসীদেশের ভূমিদাস কৃষক সেদিন বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়াছিল। রাশিয়ার ১৯০৫ সালের বিপ্লব এবং ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি-বিপ্লবও গণতান্ত্রিক বিপ্লব। কিন্তু রাশিয়ার এই দুই বিপ্লবের চরিত্র, বিষয়বস্তু এবং কৌশল ফরাসী-বিপ্লব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাশিয়ার গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিয়াছিল সাম্রাজ্যবাদী যুগে—যখন ধনতন্ত্র উহার বৈপ্লবিক ভূমিকা ত্যাগ করিয়া সামন্ততন্ত্রের সহিত আপস করিয়াই বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাই কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় শ্রমিকশ্রেণীই বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের দ্বারা সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া কৃষককে সামন্ততন্ত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিল এবং সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস সাধন করিয়া আর্থনীতিক বিকাশের পথ বাধামুক্ত করিয়াছিল। তাই কৃষক-সম্প্রদায় শ্রমিকশ্রেণীর সহায়ক বাহিনীতে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং রাশিয়ার গণ-তান্ত্রিক বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া-সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিপ্লব।

চীন-বিপ্লবও সাম্রাজ্যবাদী যুগের গণতান্ত্রিক বিপ্লব হইলেও তাহা রাশিয়ার গণ-তান্ত্রিক বিপ্লব হইতে ভিন্ন চরিত্রের, উহার কৌশলও ভিন্ন। রাশিয়া ছিল একটি স্বাধীন ও সাম্রাজ্যবাদী দেশ। রাশিয়ার মধ্যে কোন বৈদেশিক শক্তির ঘাঁটি ছিল না এবং চীনের মত স্বাধীন সমর-নায়কদেরও কোন অস্তিত্ব ছিল না। আর চীন ছিল একটি অর্ধ-স্বাধীন, অর্ধ-ঔপনিবেশিক দেশ এবং চীনের বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রধান অংশটি ছিল সাম্রাজ্যবাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ও সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য। আর বুর্জোয়াশ্রেণীর অপর অংশটি ছিল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সহায়ক। সুতরাং চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব হইল সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র-দালালবুর্জোয়াগোষ্ঠী-বিরোধী বিপ্লব।

চীনের সহিত ভারতের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকিলেও দুই দেশের সামাজিক রাজনীতিক অবস্থা, বৈপ্লবিক ঐতিহ্য প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট। সুতরাং দুই দেশের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্র, বিষয়বস্তু এবং কৌশলও ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক।

দেশের নিজস্ব বৈপ্লবিক কর্মধারা ও রীতি অর্থাৎ বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের সহিত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের সমন্বয় সাধন এবং তাহার ভিত্তিতে রচিত কর্মপন্থার অনুসরণই প্রত্যেক দেশের বিপ্লবের সাফল্যের মূলকথা। দেশের ইতিহাসই দীর্ঘকাল হইতে অনুসৃত বৈপ্লবিক রীতির উৎস। সুতরাং জাতীয় ইতিহাসকে মার্কসবাদের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া তাহা হইতে জাতীয় বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করিতে হইবে। সংক্ষেপে, জাতীয় ইতিহাসকে বিপ্লবের কার্যে ব্যবহার করিতে হইবে—তাহাতেই জাতীয় ইতিহাসের সার্থকতা। ভারতের দীর্ঘকালের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসের মধ্যেই ভারতীয় বিপ্লবের সাফল্যের মূল নিহিত। চীন-বিপ্লবের মহানায়ক মাও সে-তুঙ জাতীয় ইতিহাসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া যে-ভাবে ইহাকে বিপ্লবের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার নির্দেশ দিয়াছেন তাহা চিরস্মরণীয়:

"আমাদের জনসাধারণের কয়েক হাজার বৎসরের ইতিহাসের মধ্যে বহু প্রকারের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবান গুণাবলী দেখা যায়। ...আমরা মার্কসবাদী হিসাবেই ইতিহাস অনুশীলন করি, আমরা ইতিহাস বিকৃত করি না। আমাদিগকে অবশ্যই কনফুসিয়াস্ হইতে সুন ইয়াৎ-সেন পর্যন্ত সমগ্র ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়া ইহার সার গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা কিছু মূল্যবান তাহাই আমরা উত্তরাধিকারীরূপে গ্রহণ করিব। প্রত্যেক কমিউনিস্টই মার্কসীয় আন্তর্জাতিকতাবাদী। কিন্তু মার্কস্‌বাদকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার পূর্বে ইহাকে অবশ্যই জাতীয় রূপ দান করিতে হইবে। নির্বিশেষ মার্কস্‌বাদ বলিয়া কিছুই নাই। মার্কস্‌বাদ বলিলেই বুঝিতে হইবে বাস্তবভিত্তিক মার্কস্‌বাদকে। যে মার্কস্‌বাদ জাতীয় রূপ লাভ করে তাহাকেই আমরা বলি বাস্তবভিত্তিক মার্কস্‌বাদ। ...চীনের প্রত্যেক কমিউনিস্টই চীনের মহান জনসাধারণের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাহার দেশবাসীর সহিত তাহার রক্তমাংসের সম্পর্ক। কিন্তু সে যদি চীনের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়াই মার্কস্‌বাদের কথা বলে, তবে সেই মার্কস্‌বাদ শূন্যগর্ভ, নির্বিশেষ, বাস্তবভিত্তিহীন। সুতরাং মার্কস্‌বাদকে চীনের মার্কস্‌বাদে পরিণত করা, অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে মার্কস্‌বাদের প্রয়োগের সময় ইহাকে নিশ্চিতরূপে চীনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করা একটি বিশেষ সমস্যা। এই সমস্যাটিকে বুঝিতে হইবে এবং অবিলম্বে সমগ্র পার্টিকে সমবেতভাবে এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।...আমাদিগকে গোঁড়ামি ত্যাগ করিতেই হইবে এবং তাহার পরিবর্তে এরূপ নূতন ও জীবন্ত চৈনিক পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে হইবে—যাহা হইবে চীনের সাধারণ মানুষের নিকট দৃষ্টিমধুর ও শ্রুতিমধুর।"

[Mao Tse-tung : *Report to the Sixth Plenum of the Central Committee of the Chinese Communist Party, 1938*]

* * * * *

দীর্ঘকালব্যাপী এই গ্রন্থ রচনার কার্যে বহুজনের নিকট হইতে বহু মূল্যবান সাহায্য লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র প্রধান গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবদাস চৌধুরী মহাশয় বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। বন্ধুবর শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন সময় বহু পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন এবং শ্রীমান বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেবল পরামর্শ দানই নয়, গ্রন্থখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার ও প্রুফ দেখিবার কার্যে আমার পুত্র শ্রীমান চিন্ময় ও কন্যা শ্রীমতী মৃন্ময়ার নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছি। ইহার পরেও যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায়, তাহার এবং অন্যান্য বিষয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার।

সুপ্রকাশ রায়

প্রকাশকের নিবেদন

কয়েক বৎসর পূর্বে, ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে, আমরা শ্রীসুপ্রকাশ রায়ের 'ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' প্রকাশ করি। গ্রন্থখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকসাধারণের মধ্যে কেবল অসাধারণ ঔৎসুক্য ও আলোড়নই সৃষ্টি করে নাই, এই জাতীয় ইতিহাস-গ্রন্থ রচনায় অনেকে গ্রন্থখানিকে অগ্রপথিক অভিধায়ও অভিনন্দিত করিয়াছেন। সেইসঙ্গে পাঠকসাধারণের নিকট হইতে বারবার তাগাদাও আসিয়াছে পরবর্তী খণ্ড প্রকাশের জন্য।

অবশেষে পরবর্তী খণ্ড প্রকাশিত হইল, এবং তাহা পরিবর্তিত নামে। এই নাম-পরিবর্তনের কারণ লেখক ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছেন, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আলোচ্য 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থখানি একাধিক খণ্ডে সমাপ্য হইলেও, বলা বাহুল্য, ইহার প্রতিটি খণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ অধীন ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শাসন-শোষণ ও অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের তীব্র অসন্তোষ বারংবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল বিদ্রোহের দুর্বার বিস্ফোরণে। কিন্তু, বলা বাহুল্য, সেগুলি ছিল মূলত একই চরিত্রের এবং মুখ্যত একই ধারায় প্রবাহিত। পক্ষান্তরে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল হইতে সেই বিক্ষুব্ধ অসন্তোষ ও দেশাভিমানের যে অসংখ্য বহিঃপ্রকাশ বিদ্রোহ ও বিপ্লবান্দোলনের রূপে বারবার কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝার মত ভারতভূমির উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্ততন্ত্রের ভিত্তিমূল পর্যন্ত বারংবার প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে সেগুলি যেমন ভিন্ন, তেমনি বিভিন্ন ধারা-উপধারায় প্রবাহিত।

বিংশ শতাব্দীর ভারতের এই সকল বিদ্রোহ ও বিপ্লবান্দোলনের ইতিহাস আংশিকভাবে বা খণ্ডত, পূর্বে কিছু কিছু রচিত হইলেও, ইহা অনস্বীকার্য যে, সামগ্রিক-ভাবে উহা এই প্রথম রচিত ও প্রকাশিত হইল। এ গ্রন্থে লেখক বিভিন্ন তথ্য ও ঘটনার যে সকল বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং ঐ সকল বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাদের কোন কোনটি সম্পর্কে মতদ্বৈধ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সামগ্রিক ভারত-ইতিহাস রচনায় এ জাতীয় তথ্যবহুল গ্রন্থ প্রকাশের একান্ত প্রয়োজন আছে মনে করিয়াই 'ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম'-এর পরবর্তী খণ্ড বা পর্ব হিসাবে বিংশ শতাব্দীর ভারতের এই 'বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস' প্রকাশে আমরা উৎসাহ বোধ করিয়াছি।

গ্রন্থখানি 'ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম'-এর মত সর্বস্তরের পাঠক-পাঠিকার নিকট সমাদৃত হইলে আমরা এই প্রচেষ্টা সার্থক জ্ঞান করিব।

বিষয়-সূচী

চতুর্থ ভাগ

● প্রথম ভাগ ●

বিপ্লবী ভারতের পটভুমি

(১৮৫৮-১৯০০)

প্রথম অধ্যায়

ভারতে বৃটিশ শাসনের ভিত্তিভূমি

বৃটিশ শাসনে কৃষি-বিপ্লব

কৃষিভূমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ছিল প্রথম যুগের ধনতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি। সুতরাং ইংলণ্ডের ব্যবসায়ী ধনিকশ্রেণী অর্থাৎ 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'ও পলাশীর যুদ্ধ এবং বঙ্গদেশ-বিহার-উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে শাসন-ক্ষমতা অধিকার করিয়া নিজশ্রেণীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদের আদর্শ অনুসারেই অধিকৃত অঞ্চলের শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের প্রয়াস পাইয়াছিল। বিদেশী বণিকগোষ্ঠীর এই পুনর্বিন্যাসের ফলেই প্রথমে বঙ্গদেশ-বিহার-উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের এক বৃহৎ অংশের এবং পরে সমগ্র ভারতবর্ষের গ্রাম-সমাজভিত্তিক প্রাচীন কৃষি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ইংরেজ শাসনের পূর্বে কৃষিভূমির উপর পূর্ণ ব্যক্তিগত অধিকার প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। গ্রামের সমস্ত জমিজমার উপর ব্যক্তিগত অধিকার থাকিলেও তাহা ছিল নামমাত্র। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত কৃষিভূমি গ্রাম-সমাজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত। সাধারণত ভূমি-রাজস্ব ধার্য হইত ব্যক্তির উপর নহে, সমগ্র গ্রামের উপর। সেই হেতু, প্রকৃত-পক্ষে সকল ভূ-সম্পত্তি গ্রাম-সমাজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত। ভূমি-রাজস্বের দায়িত্ব সমস্ত গ্রামের উপর থাকিত বলিয়াই গ্রাম-সমাজের অনুমতি ব্যতীত ব্যক্তিগতভাবে কাহারও কৃষিভূমি বিক্রয় বা দান করিবার অধিকার থাকিত না।[১]

কিন্তু নূতন শাসকগোষ্ঠী ভূমি-রাজস্বের যে নূতন বন্দোবস্ত করে তাহাতে ভূ-সম্পত্তির উপর গ্রাম-সমাজের যৌথ নিয়ন্ত্রণাধিকারের পরিবর্তে প্রথমে বঙ্গদেশ-বিহার-উড়িষ্যা-বারাণসী রাজ্যে ও মাদ্রাজের কয়েকটি অঞ্চলে জমিদার নামক একটি মধ্যশ্রেণীর, এবং পরবর্তীকালে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে কৃষকের, ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ শাসনের পূর্বে ব্যক্তিগতভাবে রাজস্ব দেওয়া ছিল সাধারণ নিয়মে ব্যতিক্রম মাত্র। কিন্তু বৃটিশ শাসনে ব্যতিক্রমই হইল সাধারণ নিয়ম, আর সাধারণ নিয়ম হইল ব্যতিক্রম।

এই নূতন ভূমি-রাজস্ব প্রথার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার প্রয়োজনেই ভূ-সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপন করা আবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং নূতন শাসকগণ মোগলযুগের ভূমি-রাজস্ব আদায়কারী 'জমিদার' নামক কর্মচারীদেরই ভূমি-রাজস্ব আদায়ের কার্যে নিযুক্ত করিয়া প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিবার শর্তে চিরকালের জন্য তাহাদিগকে ভূমিস্বত্ব দান করে। তাহার ফলে কৃষিভূমি জমিদারগণের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এইভাবে বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও

১। সুপ্রকাশ রায়: ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, প্রথম খণ্ড, পৃ ২৬১।

বারাণসী রাজ্য এবং মাদ্রাজের একটা বৃহৎ অংশে ভূ-সম্পত্তির উপর জমিদারগণ ব্যক্তিগত অধিকার লাভ করে। এইভাবে ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের আদর্শে এক নূতন ভূমি-ব্যবস্থা ও একটি নূতন ভূস্বামিশ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এই ভূস্বামিশ্রেণীর সৃষ্টি ভূ-সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠারই প্রত্যক্ষ ফল।[১]

এইভাবে জমিদারগোষ্ঠীর সহিত কৃষিভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার ফলে ভবিষ্যতে জমির মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও তাহাদের দেয় রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যায়। শাসকগণ শীঘ্রই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এই ত্রুটি উপলব্ধি করিয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে ভূমি-রাজস্বের ভিন্নরূপ বন্দোবস্ত করে। এই উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজের কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রধানত তিন প্রকারের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই সকল প্রদেশে জমিদারগোষ্ঠীর হস্তে কৃষক শোষণের নিরঙ্কুশ অধিকার ন্যস্ত না করিয়া বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীই প্রধান শোষকের ভূমিকা গ্রহণ করে। মাদ্রাজের কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত দক্ষিণ-ভারতের সর্বত্র এবং বোম্বাই প্রদেশের কয়েকটি অঞ্চলে 'রায়তওয়ারী' ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে কৃষকগণকে সরাসরি সরকারের নিকট রাজস্ব দিতে হইত। বঙ্গদেশ প্রভৃতি জমিদারী প্রথামূলক অঞ্চলের জমিদারগোষ্ঠীর মত দক্ষিণ-ভারতে শাসকগণ ইচ্ছামত খাজনা বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করে। গ্রামের সকল কৃষকের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হয় গ্রামের প্যাটেল বা মোড়লদের উপর। উত্তর-ভারতে প্রবর্তিত হয় 'মহলওয়ারী' প্রথা। এই প্রথা অনুসারে গ্রামাঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন মহল সৃষ্টি করিয়া তাহা কোন এক ব্যক্তিকে অথবা যৌথভাবে কয়েক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট রাজস্ব দিবার শর্তে ইজারা দেওয়া হইত। ইজারাদারদের বলা হইত 'তালুকদার'। এই ব্যবস্থা প্রায় জমিদারী ব্যবস্থারই অনুরূপ। পাঞ্জাবে প্রবর্তিত হয় ভাইয়াচারী প্রথা'। এই প্রথা অনুসারে কোন গ্রামের প্রত্যেক চাষীর উপর পৃথক পৃথকভাবে রাজস্ব ধার্য করিয়া গ্রামের মোট রাজস্ব আদায়ের ভার ঐ গ্রামেরই একজন প্রধান ব্যক্তির উপর দেওয়া হয়। এই তিন প্রকার ভূমি-ব্যবস্থাতেই কয়েক বৎসর অন্তর রাজস্ব পুনর্নির্ধারণের, অর্থাৎ শাসকগণের ইচ্ছানুযায়ী রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা ছিল।[২]

এই সকল নূতন ব্যবস্থাও জমিদারিপ্রথা অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতই মারাত্মক হইয়া উঠে। বৃটিশ শাসনের পূর্বে গ্রাম-সমাজের কৃষকগণ চিরাচরিত প্রথানুসারে কেবলমাত্র জমি চাষের অধিকার ভোগ করিত, কিন্তু কৃষিভূমি বিক্রয় বা দান করিবার অথবা বন্ধক রাখিবার অধিকার তাহাদের ছিল না। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী একদিকে কৃষিভূমির উপর কৃষকের পূর্ণ ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে উহা দান, বিক্রয় বা বন্ধক রাখিবার এবং অন্যান্য সকল প্রকারে উহা হস্তান্তরের অধিকার দান করে; অপরদিকে ফসলের পরিবর্তে মুদ্রাদ্বারা রাজস্ব দিবার নিয়মের প্রবর্তন করে। এইভাবে কৃষকের জমি 'মহাজন' নামক এক নূতন

১। সুপ্রকাশ রায়: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৬২। ২। সুপ্রকাশ রায়: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৬২-৬৩।

শোষকের গ্রাসে পতিত হইবার পথ প্রস্তুত করা হয়। জমির উপর কৃষকের পূর্ণ ব্যক্তিগত অধিকার (অর্থাৎ ভোগদখলের সঙ্গে দান-বিক্রয়-বন্ধকের অধিকার) প্রতিষ্ঠা, ফসলের পরিবর্তে মুদ্রাদ্বারা রাজস্ব দিবার নিয়ম প্রবর্তন (অর্থাৎ মুদ্রার ভিত্তিতে নূতন অর্থনীতির প্রবর্তন) এবং ক্রমবর্ধমান হারে রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়।

জমিদারিপ্রথার রাজনীতিক, সামাজিক ও অর্থনীতিক উদ্দেশ্য

(ক)

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টির পশ্চাতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক উদ্দেশ্য ছিল দেশের অধিবাসিগণের মধ্য হইতে এরূপ একটি নূতন শ্রেণী তৈরী করা, যে শ্রেণী এই দেশে ইংরেজ শাসনের একটি সুদৃঢ় স্তম্ভরূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া জনসাধারণের অর্থাৎ বিদ্রোহী কৃষকের ক্রোধানল হইতে এই শাসনকে রক্ষা করিতে পারিবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ভারতের সকল ইংরেজাধিকৃত অঞ্চলে যে ব্যাপক-কৃষক-বিদ্রোহের ঝড় বহিতেছিল, তাহার প্রচণ্ড আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করা দেশীয় সমর্থকহীন একক ইংরেজ শক্তির পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। এই ভয়ঙ্কর অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সুচতুর ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বৈদেশিক শাসকগণের বিলম্ব হয় নাই। এইজন্যই ক্রমবর্ধমান গণ-বিদ্রোহের আঘাত হইতে নবপ্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক শাসনকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে দেশের মধ্যেই একদল কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন সমর্থক সৃষ্টির জন্য ইংরেজ শাসকগণ নিজেদের কৃষক শোষণের অবাধ অধিকার নবসৃষ্ট জমিদারগোষ্ঠীর হস্তে আংশিকভাবে অর্পণ করে এবং এইভাবে নবসৃষ্ট জমিদারগোষ্ঠীকে নিজদলভুক্ত করিয়া লয়।"[১]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টির প্রধান নায়ক লর্ড কর্নওয়ালিশ ইংলণ্ডে প্রেরিত তাঁহার স্মারকলিপিতে সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, যে জমির উপর কোন কালেই মোগলযুগের খাজনা আদায়কারী জমিদারগণের ব্যক্তিগত অধিকার ছিল না, সেই জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই একটি নূতন শ্রেণী সৃষ্টি করিতেছেন।

গণবিপ্লবের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসনের রক্ষাস্তম্ভরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মারফত সৃষ্ট জমিদারশ্রেণীর মূল ভূমিকা বর্ণনা করিয়া গভর্নর-জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক স্পষ্টতম ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন :

"আমি ইহা বলিতে বাধ্য যে, ব্যাপক গণবিক্ষোভ বা গণ-বিপ্লব হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষ কার্যকর হইয়াছে। অন্যান্য বহু দিকে, এমনকি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যর্থ হইলেও, ইহার ফলে এরূপ একটি বিপুল সংখ্যক ধনী ভূস্বামিশ্রেণী তৈরী হইয়াছে যাহারা বৃটিশ শাসন অব্যাহত রাখিতে বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত এবং জনগণের উপর যাহাদের অখণ্ড প্রভুত্ব রহিয়াছে।"[২]

১। সুপ্রকাশ রায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৩৩-৩৪। ২। Lord William Bentinck : Speech.

কৃষক-বিদ্রোহের আঘাতে ভারতের বৃটিশ শাসন যতই ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠিতেছিল, ততই শাসকগোষ্ঠী আত্মরক্ষার জন্ম জমিদার, তালুকদার ও সমগোষ্ঠীভুক্ত মধ্যশ্রেণীর গণসংগ্রাম-বিরোধিতা ও বৃটিশ শাসনের প্রতি তাহাদের সক্রিয় সমর্থনের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় জনগণের মহাবিদ্রোহ এবং ১৮৫৯-৬১ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গদেশব্যাপী নীল-বিদ্রোহে জমিদার, তালুকদার ও মধ্যশ্রেণী বৃটিশ শাসনকে বাঁচাইবার জন্ম সকল শক্তি লইয়া উহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছিল।

(খ)

জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জমিদার-তালুকদারগোষ্ঠীকে সৃষ্টি করিবার পশ্চাতে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র অর্থের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূর্ণ করা। তৎকালে বঙ্গদেশ ও বিহারের সর্বত্র কৃষক-বিদ্রোহ দমনের জন্ম কোম্পানির শাসকগণের অর্থের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু সেই অর্থের চাহিদা ইংলণ্ড হইতে পূর্ণ করা কোম্পানির কর্তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পূর্বের ভূ-সম্পত্তিহীন রাজস্ব আদায়কারী জমিদারগণের দ্বারা কোম্পানির প্রয়োজন অনুযায়ী অধিক রাজস্ব আদায় করাও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ ইংলণ্ডে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র অংশীদারগণের ক্রমবর্ধমান লভ্যাংশের দাবিও কোম্পানির বঙ্গদেশে অবস্থিত কর্মচারিগণকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। এই অবস্থায় কোম্পানির কর্মচারিগণ "মৎস্যের তৈলে মৎস্য ভাজিবার নীতি" গ্রহণ করিল। বিহার ও বঙ্গদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতেই কোম্পানির যুদ্ধ পরিচালনা ও শাসনকার্যের সকল ব্যয় নির্বাহ করা হইয়াছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা সৃষ্ট ভূস্বামিগোষ্ঠীই প্রতি বৎসর কৃষকের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ভূমি-রাজস্ব হিসাবে শাসকদিগকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিল।

'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' উহার শাসনের সংকটকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা একটি নিশ্চিত আয়ের বন্দোবস্ত করিল। এই বন্দোবস্তের ফলে জনসাধারণের নগণ্য অংশ (ভূস্বামী ও তালুকদারগণ) কৃষকদের লুণ্ঠনের যে ভাগ পাইল তাহার পরিবর্তে তাহাদের প্রভু বৃটিশ শাসকগণকে কৃষক জনসাধারণের বিদ্রোহের আঘাত হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব তাহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইল। বঙ্গদেশ ও বিহার তথা ভারতের জমিদার-তালুকদারগোষ্ঠী এই দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিয়াছে।

জমিদারী ব্যবস্থার বিস্তার ও কৃষিতে অরাজকতা

"গ্রাম-সমাজ ধ্বংস করিয়া, ভূমির উপর জমিদার ও কৃষকের ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং বনভূমি ও উহার ব্যবহারের উপর হইতে কৃষকের সমস্ত অধিকার হরণ করিয়া বৃটিশ শাসন ভারতের কৃষিতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিল। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ভূমি-সংস্কার করিতে ব্যর্থ তো হইলই, উপরন্তু পূর্বে যে উপায়ে গ্রামাঞ্চলের কৃষি-ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা

করা হইত তাহাও তাহারা ধ্বংস করিয়া ফেলিল। এই সকল পরিবর্তনের পর হইতে ভারতীয় কৃষির ইতিহাস কেবলমাত্র ধারাবাহিক ও ক্রমবর্ধমান হট্টগোলের ইতিহাসে পরিণত হইল।"[১]

বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে বৃটিশ শাসন বলপূর্বক যে ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থার প্রচলন করে তাহার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল এরূপ একটা বিশেষ আর্থনীতিক শোষণ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা, যাহাতে ভারতীয় কৃষক কেবল বৃটিশ শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা পূরণ করিবে এবং বৃটিশ কলকারখানায় যন্ত্রদ্বারা উৎপন্ন পণ্যসম্ভার ক্রয় করিবে। বৃটিশ শিল্পের প্রয়োজনেই ভূমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা দ্বারা নূতন কৃষি-বিপ্লব সম্পন্ন করা হয় এবং সেই প্রয়োজনেই গ্রামাঞ্চলে মুদ্রা-অর্থনীতির প্রচলন করিয়া প্রাচীন গ্রাম-সমাজের ধ্বংসাবশেষ এবং বস্ত্র, রেশম লবণ প্রভৃতি কৃষকদের শিল্পগুলিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করা হয়। দেশীয় শিল্পগুলির ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ পণ্য দ্বারা সমস্ত দেশ প্লাবিত করা হইতে থাকে। কেবল বঙ্গদেশেই নহে, সমগ্র ভারতবর্ষেই সুপরিকল্পিতভাবে এই ব্যবস্থা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। একে একে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল গ্রাস করিবার পর সেই সকল অঞ্চলে ভূমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার ও পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপযোগী মুদ্রা-অর্থনীতির প্রচলন করা হয়। তাহার ফলে সেই সকল জমিদারী প্রথা-বহির্ভূত অঞ্চলেও বৃটিশ শাসনের ভিত্তিস্বরূপ একটি নূতন ভূস্বামিশ্রেণী দেখা দেয়। গ্রামাঞ্চলের মহাজন ও 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র 'বেনিয়ান', তহশীলদার প্রভৃতি কর্মচারিগণই হইল সেই ভূস্বামিশ্রেণী। এইভাবে ক্রমশ বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের ন্যায় ভারতের সর্বত্র এক নূতন জমিদারিপ্রথার আবির্ভাব ঘটে এবং তাহাই গ্রামাঞ্চলে বৃটিশ শাসন ও কৃষক-শোষণের মূলভিত্তি হইয়া উঠে।[২]

মহাজন শ্রেণীর আবির্ভাব

বৃটিশ শাসকগণ প্রথম হইতেই ফসলের দ্বারা রাজস্ব দিবার পূর্ব নিয়ম বাতিল করিয়া তাহার পরিবর্তে তাহাদের দ্বারা জমির ইচ্ছামত নির্ধারিত মূল্যের ভিত্তিতে নগদ অর্থ দ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দিবার নিয়ম প্রবর্তন করে।

"জমির ফসল ভাল হউক কি মন্দ হউক, অজন্মা হউক আর না হউক, কি পরিমাণ জমি চাষ করা হইয়াছে বা হয় নাই, চাষী নিজ হাতে জমি চাষ করে কি করে না ইত্যাদি কোন বিষয়ই বিচার-বিবেচনা করা হইবে না, কেবল প্রতিবৎসর নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কর হিসাবে শাসকগণের হস্তে অর্পণ করিতেই হইবে, ইহাই হইল ইংরেজদের নূতন আইন। ইংরেজ শাসনের প্রথম ভাগে উচ্চ-রাজকর্মচারি-মহলে এবং সরকারী কাগজপত্রে এই প্রকার কর 'খাজনা' নামে অভিহিত হইত। ইহার অর্থ এই যে, কৃষকগণ প্রকৃতপক্ষে রায়ত হইয়া দাঁড়াইল—তাহারা হইল কোথাও সরকারের রায়ত, আবার কোথাও বা সরকার-নিযুক্ত ভূম্যধিকারীর রায়ত।"[৩]

১। K. S. Shelvankar : Problem of India, p. 168. ২। সুপ্রকাশ রায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৬৮-৬৭। ৩। R. P. Dutt : India Today, p. 214.

সুতরাং বৃটিশ শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থায় অর্থই হইল মূল বিষয়। ফসলের পরিবর্তে অর্থদ্বারা ভূমি-রাজস্ব প্রদানের নিয়ম প্রবর্তনের ফলে রাজস্ব দান ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য কৃষক তাহার ফসল বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু ফসল বিক্রয় করিয়াও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব না হইলে অর্থ ঋণ করা ব্যতীত তাহার কোন উপায় রহিল না। কৃষককে ঋণ দিবার জন্য 'মহাজন' নামক একদল বিত্তশালী মানুষ গ্রামাঞ্চলে দেখা দিল। এইভাবে মহাজনের ঋণই ক্রমশ কৃষকেরজীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইল। এই বিত্তশালী মহাজন বৃটিশ শাসনের পূর্বেও ঋণ দান করিত। সেই সময় তাহারা গ্রাম-সমাজের অনুমতি অনুসারে ঋণ দিয়া সমাজের সেবা করিত, ঋণের দায়ে কৃষকের জমি গ্রাস করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। কারণ, সে সময় গ্রাম-সমাজের অনুমতি ব্যতীত কৃষিভূমি হস্তান্তর করা চলিত না। এবার বৃটিশ-পূর্ব যুগের "সমাজ-সেবক মহাজন বৃটিশ শাসকগণের নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে দেখা দিল বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীকে কৃষকের দেয় ভূমি-রাজস্বের প্রকৃত সরবরাহকারীরূপে"। ঋণদাতা হিসাবে তাহারা হইল কৃষকের 'ত্রাণকর্তা' ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এবং গ্রামের সর্বেসর্বা। বৃটিশ পূর্ব যুগে মহাজন ছিল সমাজের সেবক। তৎকালে ভারতীয় সমাজে অবাধ পণ্য প্রচলন আরম্ভ না হওয়ায় এবং ভূমি-রাজস্ব দিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন দেখা না দেওয়ায় মহাজনের অর্থের বিশেষ চাহিদা ছিল না। সুতরাং সমাজে মহাজনের ভূমিকাও ছিল নগণ্য। ইহা ব্যতীত, মহাজনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার সময় গ্রাম-সমাজের নির্দেশ উভয় পক্ষকেই মানিয়া চলিতে হইত। তৎকালে ঋণগ্রস্ত কৃষকের জমিজমা আত্মসাৎ করিবার অধিকার মহাজনের ছিল না।[১]

"ভারতীয় সমাজে মহাজন আর ঋণ কোন নূতন ব্যাপার নয়। কিন্তু ধনতান্ত্রিক শোষণের এবং বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী শোষণের যুগে মহাজনের ভূমিকা এক নূতন রূপ ও নূতন তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছে।"[২]

বৃটিশ শাসনকালে পূর্বের সকল ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই বৈদেশিক শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থায় নিরীহ সমাজ-সেবক মহাজন প্রাণঘাতী শোষকে পরিণত হইল, গ্রামের কৃষক-সমাজ মহাজনে অবাধ শোষণের শিকার হইয়া উঠিল। বৃটিশ আইনে মহাজন কর্তৃক ঋণগ্রস্ত কৃষকের সম্পত্তি ক্রোক এবং জমি হস্তান্তরের ব্যবস্থা থাকায় মহাজনগণের মহাসুযোগ উপস্থিত হইল। বৃটিশ আইনের ব্যবস্থা হইতে মহাজন তাহার এই শোষণ-কার্যে পুলিস ও আইনের সক্রিয় সমর্থন লাভ করিল। এইভাবে গ্রামাঞ্চলে ধনতান্ত্রিক শোষণের একটি প্রধান স্তম্ভরূপে দেখা দিল মহাজনগোষ্ঠী। যেহেতু মহাজনের নিকট হইতে ঋণ না পাইলে কৃষক তাহার ভূমি-রাজস্ব দিতে পারে না, সেই হেতু মহাজনগণ বৃটিশ শাসনের ভূমি-রাজস্ব আদায়ের প্রধান ও অপরিহার্য অঙ্গরূপে দেখা দিল।[৩]

১। সুপ্রকাশ রায়: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৬৫। ২। R. P. Dutta: India Today & Tommorrow, p. 87. ৩। সুপ্রকাশ রায়: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৬৫।

মহাজনগোষ্ঠী ক্রমশ কৃষক-সমাজে দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করিতে থাকে। সেই দুই ভূমিকা হইল একদিকে কৃষকের প্রয়োজনীয় ঋণের একমাত্র সরবরাহকারী এবং অন্যদিকে একচেটিয়া শস্য-ব্যবসায়ীর ভূমিকা। মহাজনের নিকটেই ফসল বিক্রয় করিয়া কৃষককে অর্থ সংগ্রহ করিতে হয় এবং মহাজনই তাহার ঋণ ও উহার সুদের দায়ে কৃষকের ফসল হস্তগত করে। এইভাবে গ্রামাঞ্চলে শস্যের ব্যবসা মহাজনগোষ্ঠীর একচেটিয়া হইয়া পড়ে। এইভাবে কৃষক-সমাজ মহাজনগোষ্ঠীর একচেটিয়া শোষণের শিকারে পরিণত হয়।

মহাজনগোষ্ঠী আর একটি নূতন ভূমিকায় দেখা দেয়। নূতন বৃটিশ আইনে ঋণের দায়ে ঋণগ্রস্তের সম্পত্তি ক্রোকের ব্যবস্থা থাকায় ঋণগ্রস্ত কৃষকের জমিজমা মহাজনের গ্রাসে পতিত হইতে থাকে। এইভাবে ক্রমশ মহাজন হইল জমির স্বত্বাধিকারী, আর কৃষক হইল কৃষি-শ্রমিক আর ভাগচাষী। এই রূপান্তরের ফলে মহাজন জমির স্বত্ব লাভ করিলেও তাহার শোষণের রূপ হইল সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামিগোষ্ঠীর শোষণ হইতে ভিন্ন। মহাজনগোষ্ঠী এক নূতন প্রকারের ভূস্বামিশ্রেণীতে পরিণত হয়। তাহারা কৃষকগণকেই শ্রমিক হিসাবে কৃষির কার্যে নিযুক্ত করিয়া ক্রমশ গ্রামের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র মূলধনীর ভূমিকা গ্রহণ করে। "মহাজনই হইল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও মহাজনী মূলধনের সমগ্র শোষণচক্রের একটি অপরিহার্য মূলদণ্ডস্বরূপ।"[১] জমিদারদের মতই মহাজনগোষ্ঠীও গ্রামাঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের এক প্রধান রক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। এই রক্ষকগোষ্ঠীকে হৃতসর্বস্ব কৃষকগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধ্বংস করিয়া ফেলিতে না পারে তাহার জন্যই বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী উহাদের সমস্ত শক্তি লইয়া মহাজনগোষ্ঠীকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করে।

এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বঙ্গদেশ তথা সমগ্র ভারতের হতভাগ্য কৃষকের উপর তিনটি ভয়ঙ্কর শোষকশক্তি উহাদের সমস্ত ভার লইয়া চাপিয়া বসে— বৃটিশ শাসকগণ আদায় করে তাহাদের ভূমি-রাজস্ব, এই ভূমি-রাজস্বের উপরেই বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন নামের জমিদার আদায় করে তাহাদের খাজনা ও বিভিন্ন প্রকারের কর, আর মহাজনগণ কৃষকের অবশিষ্ট ফসলের প্রায় সমস্তটুকুই কাড়িয়া লয় তাহাদের ঋণের সুদ হিসাবে।[২]

মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব ও উহার ভূমিকা

বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী এদেশে তাহাদের একটি সমর্থকগোষ্ঠী সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে মোগলযুগের ভূমি-রাজস্ব আদায়কারী জমিদারগণের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে। কিন্তু কালক্রমে এই জমিদারগণ বিভিন্ন কারণে দেউলিয়া হইয়া গিয়া শহরের ব্যবসায়ীদের নিকট জমিদারি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। শহরের ব্যবসায়িগণ আবার 'পত্তনিদার' নামক একটি "উত্তরাধিকার প্রাপ্ত" শ্রেণী সৃষ্টি করিয়া তাহাদের নিকট নির্দিষ্ট খাজনায় চিরকালের জন্য জমি পত্তনি দেয় এবং নিজেরা স্থায়িভাবে শহরবাসী হয়। এই পত্তনিদারগণ আবার তাহাদের অধীনে আর একদল পত্তনিদার

১। R. P. Dutt : Ibid. p. 88. ২। সুপ্রকাশ রায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৬৬।

সৃষ্টি করে এবং তাহারা আর একদল সৃষ্টি করে। এইভাবে পত্তনিদারদের একটি নিখুঁত শৃঙ্খল গড়িয়া উঠিয়াছে। আর এই শৃঙ্খলটি ইহার সমস্ত ভার লইয়া হতভাগ্য কৃষকের মাথার উপর চাপিয়া বসিয়াছে। এই পত্তনিদারগোষ্ঠীই হইল বঙ্গদেশ বিহার-উড়িষ্যার এবং মাদ্রাজের এক অংশের মধ্যশ্রেণী।[১]

এই পত্তনিদারগণ অপেক্ষাকৃত "নিম্নস্তরের ভূস্বামী"। নূতন জমিদারগণ তাহাদের ভূমিস্বত্ব নির্দিষ্ট খাজনায় চিরকালের জন্য পত্তনিদারদের নিকট হস্তান্তরিত করিবার ফলে পত্তনিদারদের যে দীর্ঘ শৃঙ্খল গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের উপস্বত্ব পর্যায়ক্রমে কোন স্থানে সাতটি, কোথাও আটটি, কোথাও বা সতেরটি, আবার কোথাও বা পঞ্চাশটি পর্যন্ত অধস্তন মধ্যশ্রেণীর নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে। জমিদার যেরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ বাৎসরিক রাজস্ব নির্দিষ্ট সময়ে সরকারের নিকট প্রদান করে, ঠিক সেইরূপ প্রত্যেক স্তরের পত্তনিদারও উহার উপরের স্তরের পত্তনিদারের নিকট "চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট করা বাৎসরিক খাজনা" প্রদান করিয়া নিশ্চিত মনে ইচ্ছামত কৃষক শোষণের অধিকার লাভ করিয়াছে।

"অধস্তন ভূমিস্বত্বাধিকারিগণও জমিদারগোষ্ঠীর পন্থা অনুসরণ করিবার ফলে মধ্যবর্তী স্বত্বাধিকারীগণের অধীনেও নূতন নূতন মধ্যবর্তী স্বত্বাধিকারীদের বহু দল সৃষ্টি হইতে থাকে। ভূসম্পত্তির এই প্রকার ভাগ-বিভাগের নীতি ব্যাপকভাবে অনুসরণ করিবার ফলে বিপুল-সংখ্যক খাজনাভোগী উপশ্রেণী সমাজে আবির্ভূত হয়।......বঙ্গদেশের বহু জমিদার তাহাদের জমিদারির বাহিরে বাস করে। কেবল খাজনার অর্থ হস্তগত করাই তাহাদের সহিত জমিদারির একমাত্র সম্বন্ধ। আমরা বঙ্গদেশে যে পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার ও সে-পত্তনিদারগণকে দেখিতে পাই তাহারা এবং জমিদারদের প্রতিনিধি ও কর্মচারিগণই প্রবাসী জমিদারগোষ্ঠীর একমাত্র প্রতিনিধ।"[২]

মধ্যশ্রেণীর সামাজিক ও রাজনীতিক ভূমিকা

বৃটিশ শাসকগণের নূতন ভূমি-ব্যবস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্ট এই তালুকদারগণ কৃষিভূমির মধ্যস্বত্বভোগী মধ্যশ্রেণীরূপে একটি বিশেষ সামাজিক রাজনীতিক ভূমিকা লইয়া বঙ্গদেশ, বিহার এবং পরবর্তীকালে উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাই ও দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র সমাজে আবির্ভূত হয়। বৃটিশ শাসকগণের নূতন ভূমি-ব্যবস্থার পরিকল্পনা অনুসারে সৃষ্টিকরা এই মধ্যশ্রেণীও জমিদারশ্রেণীর ন্যায় ভারতের ইংরেজ শাসনের সামাজিক ও রাজনীতিক স্তম্ভরূপে গড়িয়া উঠিতে থাকে। ভারতে বৃটিশ শাসনের সামাজিক ও রাজনীতিক স্তম্ভরূপে জমিদারগোষ্ঠীর সহিত মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টিও যে বৃটিশ শাসকগণের পূর্বপরিকল্পিত তাহা শাসকগণই পরবর্তীকালে বিশেষ জোরের সহিত ঘোষণা করিয়াছে। ১৮৬২ সালে ভারত-সচিব তৎকালের বড়লাটের নিকট ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত এক বার্তায় এই পরিকল্পনাটি ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন:

১। Karl Marx: An Article on India (Moscow). ২। Radha Kamal Mukherjee: Land Problem of India, p. 90-91.

"বর্তমান ভূস্বামী ও জমিদারগণকে সম্পত্তিচ্যুত না করিয়া ভূ-সম্পত্তির সহিত সম্পর্কযুক্ত মধ্যশ্রেণীর ক্রমবিকাশের সকল সুযোগ দান করা বিশেষ বাঞ্ছনীয়।........ এই মধ্যশ্রেণীর লোকেরা যখন ভূ-সম্পত্তির অধিকার লাভ করিয়া সম্পদশালী হইয়া উঠে, তখন তাহারাও তাহাদের সুযোগদানকারী শাসন-ব্যবস্থার প্রতি অনুরক্ত না হইয়া পারে না। কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর (অর্থাৎ জমিদারশ্রেণীর—সু. রা.) অধিকাংশ এবং প্রধানত ইহাদের (মধ্যশ্রেণীর—সু. রা.) সন্তুষ্টি বিধানের উপরেই সরকারের নিরাপত্তা নির্ভর করে। এই মধ্যশ্রেণীটি যদি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে, তবে অন্য কোন শ্রেণীর আকস্মিক বিদ্রোহ আরম্ভ করিলে সেই বিদ্রোহ বিপজ্জনক হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা হ্রাস পায় এবং সেই অবস্থায় প্রয়োজনীয় সামরিক ব্যয়ভারও সেই অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়।"[১]

লর্ড কর্নওয়ালিশ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' দ্বারা যে জমিদারিপ্রথা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন এবং আরও পরে শাসকগণ ভারতের সর্বত্র যে ভূমি-ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহারই অনিবার্য পরিণতি এই মধ্যশ্রেণী। পরবর্তীকালে শাসকগণ এই নূতন শ্রেণীটিকে ভারতীয় সমাজে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া এবং ইহার ভূমিকা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া সযত্নে ইহার বর্ধন ও লালন-পালন করিয়াছে।

নূতন ভূমি-ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের তালুকদারগণই ভূমির মধ্যস্বত্বভোগী, সুতরাং ইহারাই বঙ্গদেশের ও ভারতের বিভিন্ন স্থানের মধ্যশ্রেণী। বৃটিশ শাসকগণের নূতন ভূমি-ব্যবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিল জমিদারশ্রেণীকে, আবার জমিদারশ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদের সহকারী এই মধ্যশ্রেণীকে।

সৃষ্টির পর হইতেই মধ্যশ্রেণীর রূপান্তর আরম্ভ হয়। অবাধ কৃষক-শোষণের ফলে তাহারা দ্রুত বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদের অধিকারী হইয়া উঠে। তাহাদের এই ধনসম্পদ তাহাদিগকে আর একটি সুযোগ আনিয়া দেয়। তাহা হইল ইংরেজ শাসকগণের দ্বারা অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রবর্তিত ব্যয়বহুল আধুনিক শিক্ষালাভের সুযোগ। ইংরেজ শাসকগণ তাহাদের ক্রমবর্ধমান শাসনকার্যের জন্য প্রথমে কেরানী (writer) আমদানি করিত খাস ইংলণ্ড হইতে। কিন্তু ইহাতে অত্যধিক অর্থব্যয় হইত বলিয়া ব্যয় সংকোচের উদ্দেশ্যে তাহারা এই দেশ হইতেই কেরানী তৈরী করিবার সিদ্ধান্ত করে। মূলত এই কেরানী সৃষ্টির জন্যই এদেশে ধীরে ধীরে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হইতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে জেলায় জেলায় স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এদেশে ইংরেজী শিক্ষা ব্যয়বহুল ছিল বলিয়া সেই শিক্ষালাভের সুযোগ গ্রহণ করা কেবলমাত্র ধনসম্পদশালী জমিদারগোষ্ঠী ও মধ্যশ্রেণীর পক্ষেই সম্ভব ছিল। ইহার ফলে কেবল ধনসম্পদেই নহে, আধুনিক উন্নত শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই দুইটি শোষকশ্রেণী শোষিত কৃষক জনসাধারণ অপেক্ষা সমাজের বহু উচ্চস্তরে আরোহণ করে। কলিকাতা ছিল মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টি-কার্যের প্রধান কেন্দ্র। এইভাবে ভারতীয় সমাজে মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া কার্ল মার্কস্ লিখিয়াছেন:

১। Despatch from the Secretary of State for India to the Viceroy of India. 6th July, 1862.

"ভারতীয়গণের মধ্য হইতে কলিকাতায় অনিচ্ছুক ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে সরকারী প্রয়োজনে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং য়ুরোপীয় বিজ্ঞানে অনুপ্রাণিত একটি নূতন শ্রেণী (শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী—সু. রা.) দেখা দিতেছে।"[১]

নূতন জমিদারগোষ্ঠী ও মধ্যশ্রেণী ভূসম্পত্তির একচ্ছত্র অধিকারবলে বৃটিশ শাসনের রক্ষণাবেক্ষণে থাকিয়া সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হইবার এবং সামাজিক নেতৃত্ব লাভের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। উন্নত য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা তাহাদিগকে সামাজিক নেতৃত্ব লাভের সংগ্রামে বিশেষভাবে সহায়তা করে। এই সামাজিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রেরণায় তাহারা একত্রে য়ুরোপীয় 'রিনাসান্স'-এর অনুকরণে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রথমে বঙ্গদেশে এবং পরে সমগ্র ভারতে 'রিনাসান্স' বা 'নব জাগরণ' আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দেয়। এই আন্দোলন কেবল উক্ত দুই শোষকশ্রেণীর নিজ স্বার্থে চালিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা শোষিত কৃষক সম্প্রদায়কে প্রথম হইতেই বর্জন করিয়া চলিয়াছিল, এমনকি ইহা বিভিন্ন সময় কৃষক-সংগ্রামের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল।[২]

ধনসম্পদ ও উন্নত শিক্ষাই আবার মধ্যশ্রেণীর অধিকাংশকে জমির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে থাকে। তাহারা "ভাগচাষী", "আধিয়ার", কৃষি শ্রমিক প্রভৃতিদের হস্তে কৃষিকার্যের ভার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া "ভদ্রলোক" সাজিয়া বসে। এইভাবে বঙ্গদেশ ও সমগ্র ভারতের মধ্যশ্রেণী ভূমির সম্পর্ক হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া "ভদ্রলোক" বা "বাবুশ্রেণী"তে পরিণত হয়। জমিদারগোষ্ঠীর ন্যায় ইহাদেরও একটি অংশ কালক্রমে কৃষিক্ষেত্র হইতে বহুদূরে থাকিয়া কৃষক শোষণের দ্বারা জীবিকা নির্বাহের পন্থা অবলম্বন করে, কিন্তু অপর একটি অংশ গ্রামাঞ্চলে থাকিয়াই কৃষক শোষণের কার্য চালাইতে থাকে।

মধ্যশ্রেণীর এই ভূমিকা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত একটানা চলিয়া আসে এবং ইহার পর ক্রমবর্ধমান কৃষি-সংকট, বৃটিশ শোষণের বৃদ্ধি এবং শিক্ষিত বেকার সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মধ্যশ্রেণীর ভূমিকাও ধীরে পরিবর্তিত হইতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বেকার সমস্যা ক্রমশ তীব্র হইয়া উঠিতে থাকিলে ক্রমশ ইহাদের বৃটিশ বিরোধী ভূমিকাও স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই সংকট ও বৃটিশ শোষণের বৃদ্ধির ফলে এমনকি জমিদারশ্রেণীর এক বৃহৎ অংশের মধ্যেও বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব জাগিয়া উঠিতে থাকে। এই সময় বহু কল-কারখানা স্থাপন করিয়া ভারতের ধনিক বা বুর্জোয়াশ্রেণী একটি বিশিষ্ট শ্রেণীরূপে ভারতের সমাজে আবির্ভূত হয়। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী এই বুর্জোয়াশ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধিতে বাধা দিতে থাকিলে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীরও বৃটিশ-বিরোধিতা আরম্ভ হয় এবং শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী উহার আশ্রয়ে থাকিয়া বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে উহার তথাকথিত জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ করে। সেই সময় হইতে মধ্যশ্রেণী একদিকে বিক্ষুব্ধ জমিদারগোষ্ঠী এবং অপরদিকে

১। Karl Marx : Future Results of British Rule in India. ২। সুপ্রকাশ রায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৭৫।

ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি ও মুখপাত্ররূপে "জাতীয় সংগ্রাম"-এর পরিচালকপদে নিযুক্ত হয়।

শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টিকাল হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত এই শ্রেণীর বিভিন্ন ভূমিকার একটি পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিয়া দরদী বৃটিশ লেখক রেজিনাল্ড রেনল্ড লিখিয়াছেন:

"বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায়ের জন্ম ও উহার বিক্ষোভের মূল খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে বিশেষভাবে মেকলের[১] নীতির মধ্যে। এই নীতিদ্বারা 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' ভারতের জনসাধারণের মধ্য হইতে একটি বিশেষ শ্রেণী সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। ইহাদিগকে য়ুরোপীয় আদর্শে শিক্ষিত করিয়া তোলাও হইয়াছিল। শাসনকার্যের নিম্নপদগুলি পূর্ণ করাই ছিল এই শ্রেণীটিকে সৃষ্টি করিবার পশ্চাতের উদ্দেশ্য। এই সকল পদ ইংরেজদের পক্ষে তেমন সম্মানজনক বা অর্থকরী ছিল না। এইরূপ একটি পুরাতন নীতি লইয়াই প্রয়োজন অপেক্ষা অতিরিক্ত সংখ্যায় 'কেরানীবাবু' সৃষ্টি করিয়া সরকার ইহার শ্রমের মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে কমাইয়া রাখে। ব্যবসায়ী সংস্থাগুলির পক্ষে সামান্য কিছু বেশী সংখ্যায় শিক্ষিত বেকার থাকা শিক্ষিত শ্রমিক বাবদ ব্যয়ের পক্ষে লাভজনক হইলেও ইহা নিশ্চয়ই অবিমিশ্র সন্তুষ্টির কারণ হইতে পারে না। কারণ ইহা হইতেই উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে নূতন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম হইয়াছিল।"[২]

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কৃষি-সংকট ও বেকার-সমস্যা তীব্র হইয়া উঠিবার পরেই মধ্যশ্রেণীর একাংশের মোহভঙ্গ হইতে আরম্ভ করে এবং ইহাদের প্রগতিশীল অংশ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রুদ্ধ আক্রোশে ফাটিয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু তখনও তাহারা বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদের জন্য কৃষক ও শ্রমিকের বৈপ্লবিক সংগ্রামে যোগদান করিতে পারে নাই। তৎকালে তাহাদের সেই রুদ্ধ আক্রোশ দুইটি ভিন্ন কর্মধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই দুইটি কর্মধারার একটি বুর্জোয়া-জমিদারগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত আপসমূলক কংগ্রেসী কর্মপন্থা এবং অপরটি হতাশাচ্ছন্ন মধ্যশ্রেণীর সন্ত্রাসবাদী কর্মপন্থা। মধ্যশ্রেণীর এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শেষ পর্যন্ত আপসমূলক হইলেও এবং ইহা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম এড়াইয়া চলিলেও ভারতের ইতিহাসে ইহা বিশেষ ধরনের এক বৈপ্লবিক সংগ্রাম বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। এইভাবে মধ্যশ্রেণীর প্রগতিশীল অংশ বিংশ শতাব্দীতে আসিয়া রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের চরম কৃষি-সংকটের পর হইতে মধ্যশ্রেণীর ভূমিস্বত্বহীন দরিদ্র অংশ আরও গভীর ও ব্যাপক আর্থনীতিক দুর্দশায় পতিত হইয়া জীবিকার জন্য দলে দলে শ্রমিকরূপে কল-কারখানায় প্রবেশ করিতে থাকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী যুবকগণ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি করিয়া চলে।

১। টমাস্ ব্যাবিংটন মেকলে। ইনি ছিলেন ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী এবং ভারতের 'পীনাল কোড'-এর রচয়িতা। ভারতবর্ষের মধ্যশ্রেণীকে বৃটিশ শাসনের একনিষ্ঠ সমর্থকরূপে তৈরী করিবার উদ্দেশ্যে ইনিই সর্বপ্রথম এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। Reginald Reynolds : White Shahibs in India, p. 118.

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ

ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার শক্তিবৃদ্ধি

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর হইতে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর ভারত শাসনের নীতি ও পদ্ধতিতে একটা আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। মহাবিদ্রোহের পূর্বে বৃটিশ শাসকগণ ছলে-বলে-কৌশলে ভারতের প্রাচীন রাজন্যবর্গের রাজ্য অধিকার করিয়া নিজেদের রাজ্যসীমা বর্ধিত করিয়া চলিয়াছিল এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষে আর্থনীতিক শোষণ-ব্যবস্থা ক্রমশ শক্তিশালী করিয়া তুলিবার নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। মহাবিদ্রোহের পূর্বেই উক্ত দুই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছিল। মহাবিদ্রোহের পর উহা হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শাসকগোষ্ঠী এবার তাহাদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় নীতি পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করে। মহাবিদ্রোহে ভারতীয় গণশক্তির বৈপ্লবিক রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারা আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল। এই বৈপ্লবিক গণশক্তির সহিত বুঝাপড়া করিবার উদ্দেশ্যেই তাহাদের নূতন নীতির প্রয়োজন দেখা দেয় এবং এই নূতন নীতির সাহায্যেই তাহারা নবজাগ্রত গণশক্তির সহিত বুঝাপড়ার জন্য প্রস্তুত হয়।

মহাবিদ্রোহের সময় শাসকগোষ্ঠী উপলব্ধি করিয়াছিল যে, ভারতের গণশক্তির ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক সংগ্রাম-শক্তি সামরিক বলের দ্বারা সাময়িকভাবে পরাজিত করা সম্ভব হইলেও, এই শক্তিকে চিরতরে পদানত করিয়া রাখা একাকী বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর সাধ্যাতীত এবং ইহার জন্য ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা অপরিহার্য। সুতরাং শাসকগোষ্ঠী এবার ক্রমবর্ধমান গণশক্তির বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সমাবেশের উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী মহাবিদ্রোহের মধ্যেই ভূতপূর্ব গভর্নর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসির ভারতীয় সামন্তরাজ্যগুলি গ্রাস করিবার নীতি এবং সামন্ততান্ত্রিক জমিদারগোষ্ঠীর অধিকৃত কৃষিভূমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিবার নীতি পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মহাবিদ্রোহের মধ্যেই শাসকগোষ্ঠী বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, সামন্তরাজন্য ও জমিদারগোষ্ঠীর শত্রুতা অপেক্ষা মিত্রতাই শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে অধিক লাভজনক। কারণ, সামন্তরাজন্য ও জমিদারগোষ্ঠীকে কৃষক শোষণের অবাধ সুযোগ দিলে, মহাবিদ্রোহের মত আবার কোন বিদ্রোহ যদি দেখা দেয় তবে এই সামন্তরাজন্য ও জমিদারগোষ্ঠীই বৃটিশ শাসনকে কৃষকের বৈপ্লবিক আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আগাইয়া আসিবে, তাহারাই হইবে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। সুতরাং মহাবিদ্রোহের পরেই বৃটিশ শাসকগণ সামন্তরাজন্যবর্গ ও জমিদারগোষ্ঠীর সহিত বন্ধুত্ব ও ঐক্য গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করে। এই বন্ধুত্ব ও

ঐক্য গড়িয়া তুলিবার জন্ত তাহাদের সহিত নূতন কৃষি-সম্পর্ক স্থাপন করা অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। কৃষি-ভূমির উপর সামন্তরাজন্ত ও জমিদারগোষ্ঠীর অবাধ দখলী-স্বত্ব ও কৃষক শোষণের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠাই সেই নূতন কৃষি-সম্পর্কের মূল বিষয়বস্তু।

বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল যে ভারতের জনসাধারণের উপর প্রাচীন রাজন্তবর্গের প্রভাব অতি গভীর। এত দিনের বৃটিশ বণিকগোষ্ঠীর উন্মত্ত শোষণ ও শাসনের ফলে এই প্রভাব পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, বিশেষত মহাবিদ্রোহের পরাজয়ের পর ভারতের জনসাধারণ প্রাচীন রাজন্তবর্গকেই একমাত্র রক্ষাকর্তা বলিয়া মনে করিতেছিল। কিন্তু প্রাচীন সামন্তরাজন্তবর্গই যে ভারতের প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রধান স্তম্ভ তাহাও উপলব্ধি করিতে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিলম্ব হয় নাই। সুতরাং মহাবিদ্রোহের পর বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী প্রাচীন রাজন্তবর্গকেই ভারতের বৃটিশ শাসনের প্রধান স্তম্ভরূপে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার সিদ্ধান্ত করে। কেবল পূর্বের রাজন্তবর্গের রাজ্যগ্রাসনীতিই বন্ধ হইল না, ইহাদের স্বাধীন, সার্বভৌম নরপতি বলিয়া মানিয়া লওয়া হইল এবং এইভাবে ভারতবর্ষের বুকের উপর "শতবর্ষব্যাপী চরম প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক শোষণের ও একটি নিকৃষ্টতম কুশাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।"[১] পাঁচ শতাধিক করদ ও মিত্ররাজ্যে চিত্রিত হইয়া ভারতবর্ষের মানচিত্রখানি উৎকট রূপ ধারণ করিল।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের প্রয়োজনে যে সামান্ত সামাজিক সংস্কারের কার্য আরম্ভ করিয়াছিল তাহা এই সময় হইতে পরিত্যক্ত হয় এবং তাহার পরিবর্তে সকল প্রকারের সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার সুরক্ষিত করিবার নীতি গৃহীত হয়।[২] মহারানী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণায় "ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকিবার" দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করা হয় এবং ভারতীয় সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়গুলিকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে "ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য, প্রাচীন প্রথা ও অধিকার সর্বপ্রযত্নে সুরক্ষিত করা হইবে।" '১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের রাজকীয় অধিকার আইন' (The Royal Titles Act of 1876) দ্বারা ইংলণ্ডের রানীকে ভারত-সম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। পর বৎসর বড়লাট লর্ড লিটন এই আইনের ব্যাখ্যা করিয়া ঘোষণা করেন:

"ইংলণ্ডেশ্বরী যে ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অভিজাত-সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার একমাত্র রক্ষক, তাহাই এই আইন দ্বারা সুচিত হইতেছে।"[৩]

হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যই ছিল মহাবিদ্রোহের সমস্ত শক্তির মূল উৎস। বৃটিশ শাসকগণ এবার ভারতীয় জনসাধারণের সংগ্রাম-শক্তির এই মূল উৎসটিকে চিরকালের

১। K. S. Shelvankar: Problems of India. p. 81. ২। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতে বৃটিশ শাসনের একমাত্র প্রগতিশীল কার্য হইল '১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের বিবাহের সম্মতি দানের বয়স সম্পর্কীয় আইন' (Age of Consent Act of 1891) পাশ। এই আইনে কন্যার বিবাহের বয়স ১০ বৎসর হইতে বর্ধিত করিয়া ১২ বৎসর করা হয়। ৩। R. P. Dutt: India Today, p. 287.

জন্য বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত করে। এই সময় হইতেই ভারতীয় সমাজে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের বীজ বপনের আয়োজন চলিতে থাকে। ১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ—এই একশত বৎসরকাল মুসলমান জনসাধারণ বৃটিশ শাসকশক্তির সহিত বিরোধিতা ও সংগ্রামের পথ অবলম্বন করিয়াছিল; 'ওয়াহাবী বিদ্রোহ' প্রভৃতি বহু গণবিদ্রোহে মুসলমান জনসাধারণই বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রধান শক্তিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অপর দিকে, বৃটিশ শাসনের আরম্ভকাল হইতেই হিন্দু-সম্প্রদায় ছিল বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রধান সহযোগী এবং ভারতে বৃটিশ শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রধান অবলম্বন।[১]

মহাবিদ্রোহের পর হইতেই এই ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। হিন্দু মূলধনিশ্রেণীর আবির্ভাব এবং উহার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মেষে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া বৃটিশ শাসকগণ ক্রমশ হিন্দু বিরোধী নীতি গ্রহণ করিতে থাকে এবং অপরদিকে চির-বিদ্রোহী মুসলমান-সম্প্রদায়কে শিক্ষা, সরকারী চাকরি প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দান করিয়া তাহাদিগকে নবজাগরণোন্মুখ জাতীয়তা-বাদী আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। এই সময় হইতেই শাসকগোষ্ঠী জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতাকে একটি প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে।[২]

ভারতীয় মূলধনিশ্রেণীর জন্ম

ভারতের সভ্যতা প্রধানত কৃষিভিত্তিক। গ্রামাঞ্চল ও রাষ্ট্রকে ভিত্তি করিয়াই এই সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্র ছিল একটি সংযোগ সাধক প্রতিষ্ঠান মাত্র। গ্রামাঞ্চলের সহিত সংযোগ রক্ষার জন্যই ইহাকে কৃষির পক্ষে অপরিহার্য দেশব্যাপী সেচ-ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইত। কারণ, কৃষিকার্য ব্যতীত সমগ্র দেশ ও রাষ্ট্র অচল হইয়া পড়িত। কিন্তু কৃষিকার্যকে সচল রাখার ব্যবস্থা দ্বারা প্রাচীন সমাজকে বাঁচাইয়া রাখা ব্যতীত আর কোন উদ্যোগ বা প্রয়াস সেকালের রাষ্ট্রের ছিল না। ইহার ফলে সেকালের সমাজ একটি অচলায়তন রূপে টিকিয়া ছিল।

কার্ল মার্কস্ তাঁহার 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে এবং ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলীতে[৩] এই সমাজ-ব্যবস্থাকেই "এশিয়ার উৎপাদন-প্রণালী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং সুদূর প্রাচীন যুগ ও য়ুরোপীয় সামন্ত-প্রথার সহিত এই সমাজের পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নির্ণয় করিয়াছেন। য়ুরোপে সামন্ততন্ত্রের গর্ভ হইতেই বুর্জোয়াশ্রেণী বা মূলধনিশ্রেণীর জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের এই বিশেষ ধরনের সামন্ততন্ত্রের প্রকৃতিই এরূপ ছিল যে, ইহা হইতে বুর্জোয়া বা মূলধনিশ্রেণীর জন্ম কোন প্রকারেই সম্ভব ছিল না।

"ইহা (ভারতীয় সামন্তপ্রথা—লেঃ) ছিল এরূপ একটি আর্থনীতিক ব্যবস্থা যাহার তুলনা য়ুরোপের সমাজে মিলে না। ইহাই প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা ছিল সম্পূর্ণ

১। সুপ্রকাশ রায়: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৩৭১। ২। সুপ্রকাশ রায়: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৩৭১।
৩। Karl Marx: Capital (Kerr Ed.) Vol. I, p. 391-92; The East India Company (Article); Future Results of British Rule in India (Article).

অপরিবর্তনীয়। তাহার ফলে ইহা ছিল চিরকাল নীতিবিগর্হিত কলুষতার অতলগর্ভে নিমজ্জিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাতে কোনই পরিবর্তন ঘটে নাই। সুতরাং য়ুরোপের সামন্তপ্রথার সহিত ইহার কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও য়ুরোপীয় সমাজের মত কোন প্রকারের কোন পরিবর্তনই এখানে দেখা দেয় নাই। আর য়ুরোপের সমাজের মত এই ভারতীয় সমাজে ধনতন্ত্রের জন্মলাভের প্রশ্নই উঠে না।"[১]

"ভারতবর্ষের অর্থনীতি যে বিকাশ লাভ করে নাই, প্রাচীন অর্থনীতির কোনই পরিবর্তন ঘটে নাই, তাহার প্রধান কারণ ছিল শিল্পের মালিক ও ব্যবসায়িশ্রেণীগুলি দ্বারা পরিচালিত উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্র, আর রাষ্ট্র এবং উহার প্রতিনিধি ও কর্মচারিবৃন্দের স্থায়ী অন্তর্বিরোধ।"[২]

বৃটিশ শাসন এই অচলায়তন ভাঙিয়া ভারতবর্ষের সমাজকে মুক্ত করে। এই শাসন বিপুল রাজনীতিক ও আর্থনীতিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রাচীন সমাজের ভিত্তি চূর্ণবিচূর্ণ করে এবং এইভাবে ধনতান্ত্রিক বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেয়। ভারতবর্ষ নিজে স্বাভাবিকভাবে যাহা করিতে পারে নাই, বৈদেশিক শাসন তাহা সহজেই করিতে সক্ষম হইয়াছে।

বৃটিশ শাসন কেবল আভ্যন্তরিক বাজারই ক্রমশ সংহত করিয়া তোলে নাই, নিজ প্রয়োজনে ভারতীয় সমাজে ধনতান্ত্রিক বিকাশের বিভিন্ন উপাদানগুলিকেও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। নিজেদের প্রয়োজনেই বৃটিশ শাসন সেই উপাদানগুলির ভিত্তিতে গঠিত ভারতের নূতন অর্থনীতিকে বৃটেনের স্বার্থের জোয়ালে আবদ্ধ করিয়াছে। বিদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বহু প্রাচীনকালের। কিন্তু বৃটেনের সহিত ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য এরূপ বিপুল আকার ধারণ করে যে, তাহা পূর্বে কেহ কখনও কল্পনাও করিতে পারিত না। এই ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। কারণ, ইহা ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের নামে প্রত্যক্ষ লুণ্ঠন এবং ইহা একদিকে বৃটেনের অভাবনীয় সমৃদ্ধির এবং অপর দিকে ভারতবর্ষের জনজীবনের সর্বাত্মক ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করে। ভারতবর্ষের সমস্ত আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপ বৃটেনকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠা আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া পড়ে।

এই নূতন অবস্থা হইতে একটি বিপুল তাৎপর্যপূর্ণ পরিণতি দেখা দেয়। ভারতের ব্যবসায়ী মূলধন ভূস্বামিশ্রেণীর দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করে, কিন্তু ইহা শত-সহস্রগুণ উন্নত ও শক্তিশালী বৃটিশ মূলধনের প্রভুত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। ভারতের ব্যবসায়িমূলধনীরা এতকাল ছিল ভূস্বামিগোষ্ঠীর আজ্ঞাবহ, এবার তাহারা হইল বৃটিশ মূলধনীদের আজ্ঞাবহ। পূর্বে ভারতের ভূস্বামিগোষ্ঠী এই ব্যবসায়িশ্রেণীকে বিকাশ লাভ করিবার কোন সুযোগ দেয় নাই। আর এবার বৃটিশ

১। K. S. Shelvankar: Problem of India, p. 165. ২। Shelvankar: Ibid, p. 166.

মূলধনীরাও ইহাদিগকে শিল্প গড়িয়া তুলিবার এবং তাহার মারফত বিকাশলাভের সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী তাহাদিগকে কেবলমাত্র ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা ও মহাজনী ব্যবসার মাধ্যমে মুনাফা লাভের পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য করে। অবশ্য বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা নূতন অর্থনীতির প্রচলন ও নূতন ভূমি-রাজস্ব-ব্যবস্থার ফলে এই ভারতীয় ব্যবসায়িশ্রেণী মহাজনী ব্যবসা দ্বারা মুনাফা লুণ্ঠনের অবাধ সুযোগ লাভ করে।

কালক্রমে এই ব্যবসায়িশ্রেণী এইভাবে বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়। তাহার পর আমেরিকার গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি বৃটেনের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিপদ-আপদের সুযোগ লইয়া এই সম্পদশালী ব্যবসায়িগোষ্ঠী সর্বপ্রথম বস্ত্রশিল্প স্থাপন করিয়া ভারতীয় মূলধনী বা বুর্জোয়াশ্রেণীরূপে আবির্ভূত হয় এবং শীঘ্রই বৃটিশ বুর্জোয়াশ্রেণীর সহিত তাহাদের স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়।

*　　*　　*　　*

প্রধানত বৃটিশ বণিকগোষ্ঠীর বাণিজ্যিক শোষণ-ব্যবস্থার সহিত সহযোগিতার মধ্য দিয়াই ভারতীয় সমাজে ধীরে ধীরে বুর্জোয়াশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটিতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্ম আরম্ভ হয়। প্রথমে ইহারা 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র গোমস্তারূপে য়ুরোপে কাঁচা তুলা ও চীনদেশে আফিম রপ্তানির ব্যবসা আরম্ভ করে। এই ব্যবসায়িগণ ছিল ভারতের পশ্চিম উপকূলের অধিবাসী পার্শীসম্প্রদায়। এই ব্যবসায়ের মারফত পার্শীসম্প্রদায় বিপুল ধনসম্পদ আহরণ করে এবং ক্রমশ এই ধনসম্পদ স্বাধীন ব্যবসায় নিযুক্ত করিয়া বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয়।[১]

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র ভারতীয়দের এই ব্যবসা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পূর্বে বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকগণ আমেরিকা হইতে তুলা আমদানি করিত। গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইলে সেই তুলা-আমদানি প্রায় বন্ধ হইয়া যায় এবং তাহার ফলে বৃটিশ বস্ত্রশিল্প প্রায় অচল হইয়া পড়ে।[২] এই গৃহযুদ্ধের ফলে তুলার জন্য বৃটেনকে বাধ্য হইয়া বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং তাহার ফলে ভারতীয় তুলার রপ্তানি বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ডি ই. ওয়াচা লিখিয়াছেন:

"ইংলণ্ডের লিভারপুল বন্দরে তুলা রপ্তানি হইতে যে বিপুল মুনাফা লাভ হয় তাহার সর্বাধিক অংশ যায় বোম্বাইয়ের তুলা-ব্যবসায়ীদের ভাগে।" ইনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই তুলার ব্যবসায়ে বোম্বাইয়ের তুলা-ব্যবসায়ীদের মোট মুনাফা হইয়াছিল একান্ন কোটি টাকা।[৩]

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সি. এন. দাভার নামক এক ব্যবসায়ী বোম্বাই নগরীতে একটি বস্ত্রশিল্প স্থাপন করেন। ইহাই ভারতের প্রথম বস্ত্রশিল্প। প্রথমে ভারতের বস্ত্রশিল্পের

১। S. Upadhyay: Growth of Industries in India, p. 45 46.
২। D. E. Wacha: A Financial Chapter in the History of Bombay, p. 8.
৩। D. E. Wacha: Ibid, p. 28-29.

প্রসারের গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩টি। কিন্তু ইহার পর হইতে এই শিল্প দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বস্ত্রশিল্পের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫১টি। এই শিল্পগুলির অর্ধেক স্থাপিত হয় বোম্বাইয়ের শহরাঞ্চলে এবং বাকি অর্ধেক স্থাপিত হয় নাগপুর, শোলাপুর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে এবং গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, বঙ্গদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে। বোম্বাই প্রদেশের বাহিরে বস্ত্রশিল্পের বৃহত্তম কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠে নাগপুর।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বস্ত্রশিল্পের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৬টি এবং ইহার শ্রমিক-সংখ্যা ছিল মোট ৪৪ হাজার। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১২৭টি। এই সময় এই শিল্পে নিযুক্ত মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ১১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা এবং শ্রমিক-সংখ্যা ছিল মোট ১ লক্ষ ১৬ হাজার। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বস্ত্রশিল্পের মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১৯৩টি, মোট শ্রমিক-সংখ্যা হয় ১ লক্ষ ৬২ হাজার এবং মোট মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১৬ কোটি টাকা।

এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রসার অতি দ্রুত না হইলেও ইহার গতি কোন সময়েই ব্যাহত হয় নাই এবং ইতিমধ্যে কোন গুরুতর শিল্প-সংকটও দেখা দেয় নাই। ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের বিকাশ এবং একটি মূলধনী শিল্পপতিশ্রেণীর আবির্ভাবের আনুষঙ্গিক অবস্থাও দেখা দিতেছিল। এই আনুষঙ্গিক অবস্থা হইল শিল্পপতিদের একটি সহায়ক শ্রেণীর আবির্ভাব। নূতন ও উন্নত ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত একটি মধ্যশ্রেণীই ভারতের নূতন শিল্পপতিদের সেই সহায়ক শ্রেণী। পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত আইনজ্ঞ, ডাক্তার, শিক্ষক, শিল্প-পরিচালক প্রভৃতিদের লইয়া এই মধ্যশ্রেণীটি গঠিত। এই শ্রেণীটি যে ভূমিকা লইয়া দেখা দিয়াছিল সেই ভূমিকা ছিল নিম্নরূপ :

"এই শ্রেণীটি ছিল নাগরিকত্ব সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক ধারণায় উদ্বুদ্ধ। ধনতান্ত্রিক শিল্প ও পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীদের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে এই আরম্ভ অপেক্ষাকৃত অল্প গুরুত্বপূর্ণ হইলেও এই নূতন শ্রেণীটি আবির্ভূত হইয়া অনিবার্যভাবেই বৃটিশ বুর্জোয়াশ্রেণীকে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর অসম প্রতিযোগী রূপে এবং ইহার অগ্রগতির পথে দুরতিক্রম্য বাধারূপে দেখিতে পাইল। সুতরাং এই শ্রেণীটির কণ্ঠেই প্রথম ভারতের জাতীয় দাবি ধ্বনিত হইল, ইহাদেরই উপর অর্পিত হইল এই জাতীয় দাবির নেতৃত্ব করিবার দায়িত্ব।"[১]

বৃটিশ ও ভারতীয় মূলধনের সংঘাত

ভারতবর্ষে যে সকল শিল্প গড়িয়া উঠে তাহার মধ্যে একমাত্র বস্ত্রশিল্পই ছিল ভারতীয় মালিকদের অধিকারে। এই শিল্প এবং ভারতীয় মালিকশ্রেণীর জন্ম ও ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণের, বিশেষত ইংলণ্ডের প্রবল প্রতাপান্বিত বস্ত্র-শিল্পপতিদের মধ্যে এক ভয়ংকর আতঙ্ক দেখা দেয়। প্রথম হইতেই

১। R. P. Dutt: India Today, p. 288.

ভারতীয় শিল্পের প্রসার রোধ করিবার জন্য তাহারা চিৎকার আরম্ভ করে এবং ইহার অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য তাহারা ভারত-সরকারকে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য করে। তাহাদের চাপে ভারত-সরকার দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে কর বসাইয়া দেশীয় শিল্পের প্রসারে বাধা দেওয়ার নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দেই ইংলণ্ডের পশমী, তূলাজাত ও রেশমী বস্ত্র, সূতা এবং বিভিন্ন ধাতুদ্রব্যের আমদানি-শুল্ক যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করিয়া ভারতের বাজার অধিকার করিবার জন্য ইংরেজ-বণিকদের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। অন্যদিকে যাহাতে ভারতের কাঁচামাল সহজেই ইংলণ্ডে প্রেরণ করা যায় তাহার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ইহার ফলে একদিকে বৃটিশ পণ্য ভারতের বাজার তলাইয়া ফেলে এবং তাহার ফলে ভারতীয় শিল্পের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, অপর দিকে ভারতের কাঁচামাল অল্প মূল্যে লাভ করিয়া বৃটিশ শিল্প দ্রুত বাড়িয়া উঠে।[১] এই উদ্দেশ্যেই বৃটিশ সরকার ভারতে অবাধ বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ করে। এই অবাধ বাণিজ্যের নীতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্ বুকানন সাহেব বলেন :

"অবাধ বাণিজ্যই ছিল ভারত-সরকারের সুপরিকল্পিত নীতি, এই নীতি দ্বারা বৃটিশ ব্যবসা ও শিল্পের জন্য ভারতের বাজার সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। ভারতীয় শুল্কের ইতিহাসে ম্যাঞ্চেস্টারের মালিকগোষ্ঠীর প্রভাব গভীর দাগ কাটিয়া রাখিয়াছে। ইংলণ্ডের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্ক-মালিক ও জাহাজ-ব্যবসায়ীদের স্বার্থে ভারতীয় বাজার সংরক্ষিত করিবার জন্যই তাহারা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে।[২] ভারত-সরকারের মুদ্রানীতি এবং সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যেও এই উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও ভারত-সরকার অবাধ বাণিজ্যের নীতিই অনুসরণ করিয়া চলে। এই অবাধ বাণিজ্য-নীতির ফলে বৃটিশ পণ্য অবাধে ভারতের বাজার তলাইয়া ফেলে, আর ভারতের নবজাত শিল্পের পণ্য অল্প দামের বৃটিশ পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে না পারিয়া বাজার হারাইয়া ফেলে। ইহার ফলে ভারতের নবজাত শিল্প বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং উহার অগ্রগতি রুদ্ধ হয়। উক্ত সময়ে বিদেশী পণ্যের আমদানির উপর সাধারণভাবে শতকরা দশ টাকা হারে শুল্ক বসান ছিল, কিন্তু বৃটিশ পণ্যকে এই শুল্কের বাধা হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য ইহার উপর নামমাত্র শুল্ক বসান হয়। ভারতবর্ষের বিশাল বাজার হইতে ভারতের ও অন্যান্য দেশের পণ্য বিতাড়িত করিয়া ইহাকে বৃটিশ পণ্যের একচেটিয়া বাজারে পরিণত করাই ছিল এই নীতির একমাত্র উদ্দেশ্য।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ দমনের ব্যয় মিটাইতে গিয়া ভারত সরকারের বাজেটে বিরাট ঘাটতি দেখা দিলে ভারত-সরকার বৃটিশ পণ্যের আমদানির উপরেও

১। Reginald Reynolds : White Shahibs in India, p. 109-110.

২। D. H. Buchanan : The Development of Capitalist Enterprise in India, p. 464-65.

সামান্য শুল্ক বসাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইহাকে উপলক্ষ করিয়া, অর্থাৎ শুল্ক রদ করাইবার জন্য, ম্যাঞ্চেস্টারের ধনিকগোষ্ঠী ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ করে তাহার নিকট ভারত-সরকার মাথা নত করিতে বাধ্য হয় এবং ম্যাঞ্চেস্টারের ধনিকগোষ্ঠীকে শান্ত করিবার জন্য ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রসারের পক্ষে অপরিহার্য লম্বা আঁশযুক্ত তুলার আমদানির উপর শতকরা পাঁচ টাকা হারে শুল্ক ধার্য করে। ভারতবর্ষে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা জন্মে না বলিয়া ইহা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইত। ইহার আমদানিতে বাধা দিবার অর্থ হইল ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। কিন্তু ইহাতেও ম্যাঞ্চেস্টারের ধনিকগোষ্ঠী শান্ত হইল না, তাহারা আরও প্রবলভাবে আন্দোলন চালাইতে থাকে। এই আন্দোলনের ফলে তৎকালীন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকটি বৃটিশ পণ্যের উপর হইতে আমদানি-শুল্ক তুলিয়া লওয়া হয়, এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সরকার মদ ও লবণ ব্যতীত ইংলণ্ডের বস্ত্র ও অন্যান্য সকল পণ্যের উপর হইতে আমদানি-শুল্ক সম্পূর্ণ তুলিয়া দেয়। কিন্তু ইহাতেও বৃটিশ মালিকগোষ্ঠী সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া ভারতীয় শিল্পের প্রসার বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে উৎপাদন-কর বসাইবার জন্য প্রবলভাবে চাপ দিতে থাকে। ইহার ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না, ভারত সরকার সকল দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উপর বসানো উৎপাদন-কর শতকরা সাড়ে তিন টাকা হইতে বাড়াইয়া পাঁচ টাকায় পরিণত করে।[১]

এই বর্ধিত করভার ও বৃটিশ পণ্যের অবাধ আমদানি একত্রে মিলিয়া ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়। মাদ্রাজে ও সমগ্র দাক্ষিণাত্যে এই করভার কিভাবে ভারতীয় শিল্পের শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল তাহার একটি নগ্নচিত্র জনৈক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষ্য হইতেই পাওয়া যায়:

"এই করভার চাষী ব্যতীত সকলের উপরেই চাপানো হইয়াছিল।...এমনকি যে বৃদ্ধা বাজারে গিয়া পথের এক কোণে বসিয়া শাক-সব্জি বিক্রয় করে তাহার উপরেও কর বসান হইয়াছে।...কিন্তু কোন ইংরেজ ব্যবসায়ীর উপর কোন কর বসানো হয় নাই। যদি কোন লোক বৎসরে কয়েকটি টাকাও আয় করে তবে তাহাকেও কর দিতে হয়, কিন্তু তাহার পাশের বাড়ীর যে ইংরাজ বণিক শত শত টাকা আয় করে তাহাকে কোন কর দিতে হয় না।"[২]

এইভাবে "ভারতের নবজাত শিল্পের উপর কর বসানো, রেলপথ ও অন্যান্য যানবাহন শিল্পে নিযুক্ত বিদেশী মূলধনের একচেটিয়া প্রভুত্ব রক্ষা করা এবং সাধারণভাবে ভারতীয় ধনতন্ত্রের আর্থনীতিক বিকাশে বাধা দেওয়ার নীতি গ্রহণ করিয়া ইংরেজ শাসকগণ দেশীয় মালিকদিগকে রাজনীতিক সংগ্রামের পথ বাছিয়া লইতে বাধ্য করে।"[৩]

১। S. Upadhyay: Growth of Industries in India p, 52-53,

২। Evidence of I. W. B. Dykes, House of Commons Fourth Report.

৩। Joan Beauchamp: British Imperialism in India, p. 164.

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বিপুল পরিমাণ ভারতীয় মূলধন গড়িয়া উঠে এবং সেই মূলধন প্রধানত তুলা ও পাটশিল্প, আন্তঃ-প্রাদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে লগ্নি করিয়া ভারতীয় মালিকগণ ভারতের অর্থনীতি-ক্ষেত্রে বৃটিশ ধনিকশ্রেণীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেয়। তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ ধনিকশ্রেণীর দ্বারা ভারতীয় জনবল ও ধন-সম্পদ শোষণে বাধাদান করা। কারণ, ইহা ব্যতীত ভারতীয় মালিকদের আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্য কোন পথ ছিল না।

প্রথম হইতেই ভারতীয় বস্ত্রশিল্প একটি বৈশিষ্ট্য লইয়া দেখা দিয়াছিল। ইহা গড়িয়া উঠিয়াছিল সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় মূলধনের দ্বারা এবং ভারতীয় মূলধনীদের দ্বারাই ইহা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হইত। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই ভারতীয় শিল্পটি প্রথম হইতেই বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিয়াছিল এবং ইহাকে বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকগোষ্ঠীর প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। প্রথম হইতেই বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকগোষ্ঠী ও বৃটিশ সরকার ভারতের এই নূতন বস্ত্রটিকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। ভারতের নূতন শিল্পপতিশ্রেণী ও বৃটিশ শিল্পপতিশ্রেণীর মধ্যে এই মৌলিক আর্থনীতিক সংঘাত ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দেই তীব্র আকারে দেখা দেয়। ভারতে বৃটিশ বস্ত্রের উপর যে আমদানি-শুল্ক বসানো ছিল তাহা বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকগোষ্ঠীর দাবি অনুসারে ভারত-সরকার ঐ বৎসর তুলিয়া দেয়। ইহার ফলে ভারতের নূতন বস্ত্রশিল্পকে বহুগুণ উন্নত বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। ইহার তিন বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর সংকট

"যে নীতি অনুসারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের জনসাধারণের মধ্য হইতে পাশ্চাত্য আদর্শে শিক্ষিত একটি বিশিষ্ট শ্রেণী গঠনের প্রয়াস পাইয়াছিল, ভারতের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক উৎপত্তি ও তাহাদের বিক্ষোভ সেই নীতিরই অনিবার্য পরিণতি। শাসন-বিভাগের যে সকল পদ ইংরেজদের পক্ষে যথেষ্ট সম্মানজনক বা অর্থকরী নয়, সেই পদগুলি পূর্ণ করাই ছিল এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীটিকে গড়িয়া তোলার পিছনের উদ্দেশ্য। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী প্রয়োজনাতিরিক্ত 'বাবু' (কেরানী)-সরবরাহের ব্যবস্থা দ্বারা সরকার কেরানীদের শ্রমের ব্যয় (বেতনের হার) সকল সময়ে নিম্নমুখী করিয়া রাখিয়াছিল।"[১]

ইংরেজ শাসনের সর্বব্যাপী শোষণ গভীরতর হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে স্বল্প বেতনের কেরানীকুলের দুর্দশাও ক্রমশ বাড়িয়া যাইতে থাকে। ইহার উপর প্রতি বৎসর শত শত ছাত্র স্কুল-কলেজ হইতে বাহির হইয়া শিক্ষিত বেকারের দল ভারী করিয়া তোলে। ক্রমশ শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, তাহাদের সকলের

১। Reginald Reynolds: White Shahibs in India, p. 113.

চাকরি লাভের সম্ভাবনা লোপ পায়। সুতরাং বেকারের সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া চলে। কারণ,—

"শাসন-বিভাগের লাভজনক উচ্চপদগুলি ইংলণ্ড হইতে আমদানি-করা ইংরেজদের একচেটিয়া হইয়া থাকিত, আর অন্য চাকরির দরজাও তাহাদের নিকট বন্ধ ছিল। তাহাদের বড় একটা অংশ গেল আইন পড়িতে, কিন্তু শীঘ্রই যুবক-উকিলের সংখ্যা মোট মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা ছাড়াইয়া গেল এবং বেকার উকিলে আদালত পূর্ণ হইয়া উঠিল। অন্য যে সকল চাকরির দরজা তাহাদের নিকট খোলা ছিল তাহা হইল বিলাতী ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মাল-গুদাম ও সরকারী অফিসের চাকরি আর কেরানীগিরি। কিন্তু এখানেও কেরানীর চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ অনেক বেশী এবং বেতনের হার অবিশ্বাস্য রকমে নীচু। সুতরাং দীর্ঘকাল যাবৎ বহু অর্থব্যয়ে শিক্ষা শেষ করিবার পর ভারতীয় ছাত্রগণকে অনিবার্য বেকারির মুখোমুখি দাঁড়াইতে হয়, না হয় তাহারা কোন অফিসে জীবিকার মান অপেক্ষাও অল্প বেতনে চাকরি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ইহাই যেন তাহাদের বিধিলিপি।"[১]

ভারতবর্ষে, বিশেষত বাঙলাদেশে, বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও সেইগুলির শিক্ষকের পদও ক্রমশ পূর্ণ হইয়া গেল এবং প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সরবরাহ প্রায় দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইল। ইহা ব্যতীত ভারতীয় শিক্ষকদের বেতনের হার অত্যন্ত নীচু। তাহার ফলে শিক্ষকদের মধ্যেও চরম আর্থিক দুর্দশা দেখা দিল। শাসকগোষ্ঠীর মুখপাত্র ভেরিনি লোভেট-এর কথায় "সাধারণ স্তরের স্কুল-শিক্ষকদের সংখ্যা অত্যধিক, তাহাদের বেতন সামান্য। বাঁচিবার শেষ উপায় হিসাবেই তাঁহারা এই চাকরি গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও বিক্ষোভের অন্ত নাই।"[২]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এই বেকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে। বৃটেনের আর্থিক সংকট হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য ইংরেজদের ভারত-শোষণ আরও উগ্র হইয়া উঠে। শাসকগোষ্ঠী তাহাদের আর্থিক সংকটের সকল বোঝা ভারতীয় জনগণের উপর চাপাইয়া দিয়া তাহাদের জীবন ধারণের সকল ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। ইহার ফলে একটা ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ সমগ্র ভারতের উপর স্থায়ী হইয়া বসে। কেবলমাত্র ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষেই পঞ্চাশ হইতে ষাট লক্ষ ভারতবাসী প্রাণ দেয় এবং তখন হইতে দুর্ভিক্ষই ভারতের সাধারণ অবস্থায় পরিণত হয়। কৃষক ও মধ্যশ্রেণীর সম্মুখে ধ্বংসের ছবি ফুটিয়া উঠে।

শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর এই চরম আর্থিক দুর্দশা তাহাদের মধ্যেও একটা ব্যাপক বিক্ষোভ জাগাইয়া তোলে। তাহাদের আর্থনীতিক দুর্দশা চরম জাতীয়তাবাদের মধ্যে রাজনীতিক রূপ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। তাহারা স্পষ্ট দেখিতে পায় যে, বিদেশী ইংরেজ শাসনই তাহাদের দুঃখদুর্দশা ও জাতীয় অধঃপতনের একমাত্র কারণ। এই বিদেশী শাসনের প্রতি তীব্র ঘৃণা তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত করিয়া

১। Lester Hutchinson : Empire of the Nabobs, p. 189.

২। Vereney Lovett : History of the Indian National Movement, p. 232.

তোলে। ভারতের, বিশেষ করিয়া বাঙলাদেশের, স্কুল-কলেজগুলি হইয়া উঠে সেই বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল, আর সেই স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ এক নূতন বৈপ্লবিক মন্ত্রের প্রচার-কার্যে অবতীর্ণ হন। এইভাবে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে ধীরে ধীরে বৈপ্লবিক আন্দোলনের বীজ উপ্ত হয় এবং সেই বীজ দ্রুত বাড়িয়া উঠে। চরম আর্থনীতিক দুর্দশাই যে মধ্যশ্রেণীর সেই বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রধান উৎস তাহা শাসকগোষ্ঠীর মুখপাত্রগণও স্বীকার করিয়াছেন। ঝানু আমলাতান্ত্রিক লেখক ভেরিনি লোভেটের কথায়:

"ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, বাঙলাদেশের স্কুল-কলেজগুলিতে বৈপ্লবিক ভাবধারা এরূপ বিস্তার লাভ করিবার আংশিক কারণ হইল এই সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সামান্য বেতন। ভয়াবহ দারিদ্র্য ও জ্বালাময়ী ভাষায় লিখিত সাহিত্য দ্বারাই তাঁহাদের মনোভাব গড়িয়া উঠে। অনেক সময় তাঁহারা আবার সাংবাদিকতাবৃত্তি গ্রহণ করেন এবং তাহার মারফত তাঁহাদের এই ভাবধারা প্রচার করিয়া সামান্য জীবিকা উপার্জন করেন।"[১]

জাতীয় চেতনার উন্মেষ

ভারতের ইতিহাসে যুগান্তকারী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর একদিকে ভারতের উপর বিজয়-গর্বে উন্মত্ত হইয়া ইংরেজ শাসকগণের উৎপীড়ন ও শোষণের বন্যা বহিতে থাকে এবং অপর দিকে উহার ফলে ভারতীয় সমাজের সকল দিকে একটা আলোড়ন আরম্ভ হয়। সেই আলোড়নের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে এক নূতন ভারতবর্ষের, জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ এক নূতন জাতির জন্ম আরম্ভ হয়।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের মধ্য দিয়া পুরাতন সামন্তশ্রেণীর ইংরেজ-বিরোধিতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ হইতে চিরপুরাতন ধর্ম ও সংস্কারের বাধাও বিলুপ্ত হইতে থাকে। তাহার পরিবর্তে নূতন আর্থনীতিক ব্যবস্থার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসে বিভিন্ন আর্থনীতিক শ্রেণী। তাহারা সঙ্গে লইয়া আসে বিদেশী শাসকের সর্বগ্রাসী শোষণ হইতে আত্মরক্ষা ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এক নূতন চেতনা, এক নূতন ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের ধ্বনি। ভিন্ন দিক হইতে আর একটা সংগ্রামের ধ্বনি ভারতবর্ষকে কাঁপাইয়া তোলে।

"গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সংগ্রাম নূতন করিয়া আরম্ভ হয়; শহরে আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ভারতীয় ধনতন্ত্র উহার শিল্প-বিকাশের জন্য সাম্রাজ্যবাদের অনিচ্ছুক হস্ত হইতে আর্থনীতিক ও রাজনীতিক সুবিধা আদায় করিবার সংকল্প লইয়া অগ্রসর হয়; নবজাত শিল্পসমূহের মধ্য হইতে শ্রমিকশ্রেণী বাহির হইয়া শহরের সহিত গ্রামাঞ্চলের সংযোগ সাধন করে এবং ইংরেজী ও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর ভিতর আর্থনীতিক বিক্ষোভ উগ্র হইয়া উঠে।"[২]

জাতীয়তাবাদের নিম্নোক্ত তিনটি প্রধান উপাদান ইতিমধ্যেই ভারতের সমাজের মধ্যে তৈরী হইয়া গিয়াছিল: (১) বিপুল আর্থনীতিক স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে এবং

১। Vereney Lovett: History of the Indian National Movement, p. 233.
২। L. Hutchinson: Empire of the Nabobs, p. 183.

ভারতের নিজস্ব শিল্প-বিকাশের ঘোরতর বিরোধীরূপে একটা স্বেচ্ছাচারী ও উৎপীড়ক বিদেশী সরকার ; (২) ভারতের ক্রমবর্ধমান ধনিকশ্রেণী ; এবং (৩) উন্নত ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও অর্থনীতিক কারণে বিশেষ বিক্ষুব্ধ ভারতীয় বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায়। এই তিনটি উপাদান লইয়াই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি গড়িয়া উঠে। উৎপীড়নকারী বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় বিদ্রোহের অগ্রদূতরূপে বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়।

বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশরূপে দেখা দেয় কয়েকখানি নূতন সংবাদপত্র। এই সংবাদপত্রগুলি তীব্র ভাষায় লিখিত তীক্ষ্ণ সমালোচনার কশাঘাতে ভারতের ইংরেজ-সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, তাহাদের সমালোচনা ইংরেজ শাসনের উৎপীড়ন ও শোষণের বর্বররূপ উদ্ঘাটিত করিয়া জনগণের চোখ খুলিয়া দিতে থাকে। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে জাতীয়তার উন্মেষ আরম্ভ হয়।

ইংরেজ শাসকগণ এই আক্রমণ এবং মধ্যশ্রেণীর জাতীয়তাবাদের বাহনস্বরূপ এই সংবাদপত্রগুলিকে বেশী দিন বরদাস্ত করিতে পারে নাই। এই সকল সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ শাসকগণ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে "দেশীয় প্রেস-আইন" নামে একটি দমনমূলক আইন পাশ করে। ইহাতে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা বহুলাংশে খর্ব করা হয়। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতে ইংরেজ শাসনের উপর আক্রমণ সমানভাবেই চলিতে থাকে। এই সময় বাঙলাদেশে 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'দি বেঙ্গলী', 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'; মাদ্রাজে 'হিন্দু'; বোম্বাইয়ের 'মারাঠা' ও 'কেশরী' প্রভৃতি ইংরেজী সংবাদপত্রগুলি নির্ভীকভাবে ইংরেজ শাসনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া দিতে থাকে।

এই সকল সংবাদপত্রের প্রভাব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং এই সংবাদপত্রগুলির উদ্যোগেই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সংগঠন গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলাদেশের 'দি বেঙ্গলী' নামক ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনটির উদ্দেশ্য ছিল "শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মতের প্রতিনিধিত্ব করা এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপে তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা।" এই সংগঠনটি সর্বপ্রথম সরকারী কার্যে ভারতীয়দের সমান অধিকারের দাবি লইয়া ভারতব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ করে এবং ইহার প্রতিনিধি হিসাবে লালমোহন ঘোষকে ভারতের অনুকূলে ইংলণ্ডের জনমত গঠনের জন্য প্রেরণ করে।

বাঙলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদ্যোগে জাতীয় সংগঠন সৃষ্টির প্রথম প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। ঐ বৎসর "দেশের সকল শ্রেণীর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং মঙ্গল বিধানের উদ্দেশ্য" লইয়া 'বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই সংগঠন 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' নামক আর একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত মিলিত হয়।[১] এই সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানটি

১। Ambika Charan Mazumder : Indian National Evolution, p. 5-6.

পর বৎসর ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের নিকট "জাতীয় দাবি" হিসাবে নিম্নলিখিত দাবিগুলি পেশ করে : করভার হ্রাস, শিল্প-বিকাশে সরকারী সাহায্য, শিক্ষার প্রসার, শাসনকার্যে ভারতীয়দের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা, জনস্বার্থের প্রতিনিধিস্বরূপ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া আইনসভা গঠন ইত্যাদি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ, লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র নির্ভীক সাংবাদিক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র। ঠিক এই সময়েই বোম্বাই প্রদেশেও জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ, ভি. এন. মাণ্ডলিক, দাদাভাই নৌরোজি প্রভৃতির নেতৃত্বে 'বম্বে এসোসিয়েশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতার জন্য এই সকল প্রতিষ্ঠানের কোনটিই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। ইহার পরেই বাঙলাদেশে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা শিশিরকুমার ঘোষের উদ্যোগে 'বেঙ্গল ন্যাশনাল লীগ', বোম্বাই প্রদেশের মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের উদ্যোগে পুণাশহরে 'সার্বজনিক সভা' এবং মাদ্রাজে 'নেটিভ এসোসিয়েশন' গঠিত হয়। মাদ্রাজের এই সংগঠনটি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মহাজনসভা'র সহিত মিলিত হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কোনটিই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হইতে না পারিলেও মধ্যশ্রেণীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার পক্ষে এইগুলির দান অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই প্রতিষ্ঠানগুলিই ছিল পরবর্তী কালের জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত।

তৎকালে এই সকল প্রতিষ্ঠান ইংরেজ শাসনের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে জাতীয় জাগরণের সঠিক পথের সন্ধান লাভের জন্য অন্ধকারে ঘুরিতেছিল। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্যাপক জাতীয় প্রতিরোধের প্রয়োজন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছিল। এই প্রয়োজনীয়তা-বোধই তাহাদের সাংগঠনিক প্রচেষ্টা আরও বাড়াইয়া তোলে। বিদেশী ইংরেজ শাসনের উৎপীড়ন ও শোষণ প্রতিদিন বীভৎসরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া দেশের মধ্যে যে ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার ফলেই এক সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্ম অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ভারতে এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষের ফলে পঞ্চাশ হইতে ষাট লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। কিন্তু এই দুর্ভিক্ষের মধ্যেই মহারানী ভিক্টোরিয়ার "ভারত-সম্রাজ্ঞী" খেতাব গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীতে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে এক দরবার বসে। কেবল তাহাই নহে, এই সময়েই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীগণ তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য ভারতবর্ষের বহু কোটি টাকা ব্যয়ে কাবুল আক্রমণ করে। তাহারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতীয় অধিবাসীদের দমনের জন্য সামরিক অভিযান চালাইতে গিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করে এবং ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পের মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থে ইংলণ্ডের তুলাজাত দ্রব্যের উপর হইতে আমদানি-শুল্ক হ্রাস করিয়া ভারতের নূতন বস্ত্রশিল্পের অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তোলে। এই সকল উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দেশীয় সংবাদপত্রগুলির তীব্র প্রতিবাদ স্তব্ধ করিয়া দিবার জন্য ইংরেজ শাসকগণ 'দেশীয় সংবাদপত্র আইন' পাশ করে।

ইহার ফলে ভারতবর্ষে যে অবস্থার উদ্ভব হয় তাহা নিম্নরূপ : "এক দিকে

একটা পতনোন্মুখ মিথ্যা বাজেটের উপর প্রতিষ্ঠিত বেপরোয়া আমলাতান্ত্রিক সরকার ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠে, এবং অপর দিকে দেশের বিপুল জনসমষ্টি একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িতে থাকে।"[১]

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের 'ইলবার্ট-বিল' উপলক্ষ করিয়া এই গণ-বিক্ষোভ দেশব্যাপী একটা বিরাট আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। ইংরেজদের ঔদ্ধত্য ও উৎপীড়নে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে জাতীয় অপমানবোধ জাগ্রত হইবার ফলে তাহাদের ধূমায়িত বিক্ষোভ দাবাগ্নিতে পরিণত হয়।

জাতীয় অপমান

ইংরেজগণ ভারতবর্ষে শাসকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিবার পর হইতেই "কৃষ্ণকায়" ভারতবাসীদের প্রতি তাহাদের ঘৃণা-মিশ্রিত আচরণ ও উৎপীড়ন দিন দিন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর হইতে পরাজিত ভারতবাসীর উপর বিজয়ী শাসকগোষ্ঠীর এই উৎপীড়ন ও বর্বর-সুলভ আচরণ অবাধে চলিতে থাকে। কেবল ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজ কর্মচারীরাই নহে, এমন কি ভারত সরকারও ভারতবাসীদের প্রতি জাতীয় অপমানকর রীতি-নীতির প্রচলন করিতে ইতস্তত: করে নাই। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার এই প্রকারের এক নূতন নীতির প্রচলন করে। এই নীতি অনুসারে দেশীয় ভদ্রলোকেরা চটি প্রভৃতি ভারতীয় পাদুকা পরিয়া কোন সরকারী দরবার বা উৎসবে যোগদান করিতে পারিতেন না, সরকারী দরবার ও উৎসবে যোগদান করিতে হইলে তাহাদিগকে বুট প্রভৃতি য়ুরোপীয় জুতা পরিতে হইত। ভারত সরকারের এই অপমানকর আচরণ পরবর্তীকালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব বহুগুণ বৃদ্ধি করে।

ভারতবাসীদের প্রতি সরকারী ইংরেজ কর্মচারী ও চা-বাগানের মালিকদের আর একটি বর্বর-সুলভ নিষ্ঠুর আচরণে ভারতবাসীদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া যায়। ইংরেজ-সাহেবদের নিকট ভারতীয় শ্রমিক ও সামান্য বেতনের কর্মচারীদের জীবনের কোন মূল্যই ছিল না, তাহাদের জীবন ছিল ইংরেজ সাহেবদের খেলার সামগ্রী। ভারতবাসীদের "বাধ্য" ও "সভ্য" করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তাহারা কথায় কথায় দেশীয় শ্রমিক ও অল্প বেতনের কর্মচারীদের দেহে সবুট পদাঘাত করিতেও অভ্যস্ত ছিল। ইহা ছিল অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর একটি দৈনন্দিন ও "তুচ্ছ" ঘটনা। এইভাবে সবুট পদাঘাতের ফলে কয়েকজনের মৃত্যু ঘটে। এই সকল হত্যাকারী সাহেবদের বিচার করিবার অধিকার ছিল একমাত্র ইংরেজ বিচারকদের। তাহাদের বিচারে এই হত্যাকারীরা সামান্য অর্থদণ্ড দিয়াই অব্যাহতি লাভ করিত। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রাজেলায় ফুলার নামক এক ইংরেজ একটা তুচ্ছ কারণে তাহার সহিসকে পেটের উপর সবুট পদাঘাত করিলে সহিসের মৃত্যু ঘটে। আগ্রার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ফুলারকে মাত্র ত্রিশ টাকা অর্থদণ্ড করেন এবং গভর্নর-জেনারেল এই প্রকার আচরণের প্রতি কেবলমাত্র "ঘৃণা" প্রকাশ করিয়াই কর্তব্য শেষ করেন। কিন্তু

১। A. C. Mazumder: Evolution of Indian National Congress, p. 28-29.

ভারতবাসীরা এই বর্বর আচরণ নীরবে সহ্য করিল না। ফুলারের এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া সারা ভারতে এক বিরাট বিক্ষোভ দেখা দেয়। দেশের জাগরণোন্মুখ যুবশক্তি ইংরেজ সাহেবদের এই ঔদ্ধত্য ও নৃশংসতার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদীদের হস্তে ইংরেজ সাহেব হত্যার জন্য জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "সন্ত্রাসবাদীরা জীবনের কোন মূল্যই দেয় না।"[১] কিন্তু ইংরেজ সাহেবদের নিষ্ঠুরতা ও অসহনীয় ঔদ্ধত্যই যে ভারতের যুবসম্প্রদায়কে নিষ্ঠুর করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা এই ইংরেজ-লেখকগণ সম্পূর্ণ ভুলিয়া যান।

'ইলবার্ট বিল'

ইংরেজ শাসকগণ ভারতবর্ষ জয় করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বিজয়ী ও বিজিতদের মধ্যে বৈষম্য এবং বিজয়ী শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ অধিকার নানাভাবে প্রয়োগ করিতে থাকে। এই বৈষম্য ও বিশেষ অধিকারসূচক আইনসমূহের মধ্যে একটি ছিল কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গ-বিচারকদের দ্বারা শ্বেতাঙ্গ-অপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা। এই আইন অনুসারে, শ্বেতাঙ্গ-অপরাধীদের অপরাধ যতই গুরুতর হউক না কেন, তাহাদের বিচারের ক্ষমতা কোন দেশীয় বিচারকের ছিল না। জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এই বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে দেশের মধ্যে একটা তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বৈষম্যমূলক আইনের ফলে এমন কি শাসন-কার্যেও বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি হইতে থাকে। শাসন-কার্যের এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে এবং দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ শান্ত করিবার চেষ্টা হিসাবে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে শাসকগণ একটি আইনের খসড়া তৈরী করেন। তৎকালীন বড়লাট লর্ড রিপনের আইন-সচিব স্যার সি. পি. ইলবার্ট-এর নামানুসারে এই আইনের খসড়াটি 'ইলবার্ট বিল' নামে খ্যাত।

এই আইনের খসড়াটি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিরুদ্ধে ভারতের শ্বেতাঙ্গ-মহল হইতে তীব্র বিরোধিতা দেখা দেয়, ইহার বিরুদ্ধে সকল শ্বেতাঙ্গ দলবদ্ধ হইয়া এক প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করে। লেস্টার হাচিন্সন্ লিখিয়াছেন :

"(বিচার ঘটিত) অসংগতি দূর করিবার সামান্য চেষ্টাস্বরূপ এই আইনের খস্‌ড়াটির বিরুদ্ধে ভারতের সকল শ্বেতাঙ্গ-সাহেবের তীব্র আক্রমণ শুরু হয়, দেখিতে না দেখিতে একটা 'য়ুরোপীয় আত্মরক্ষা-সমিতি' গঠিত হয় এবং বিজয়ী শেতাঙ্গদের বিশেষ অধিকার অব্যাহত রাখিবার ও কৃষ্ণাঙ্গ-বিচারকদের বিচার হইতে শ্বেতাঙ্গ অপরাধীদের রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দেড়লক্ষ টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়। শ্বেতাঙ্গ-আন্দোলনকারীরা যাহা খুশি প্রচার করিতে থাকে ; বড়লাট লর্ড রিপন ও তাঁহার আইন-সচিব স্যার সি. পি. ইলবার্ট এবং সাধারণভাবে সকল ভারতীয় বিচারকদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস্য ভাষায় জঘন্যতম কুৎসা বর্ষিত হইতে থাকে। তাহারা এমনকি

১। V. Lovett : A History of the Indian National Movement, p. 257.

ইহাও প্রচার করে যে, যদি ভারতীয় বিচারকদের হাতে এই প্রকারের সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তাঁহারা তাঁহাদের বিচার-ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া শ্বেতাঙ্গ-মহিলাদের দ্বারা তাহাদের হারেমে (অন্তঃপুর) ভরিয়া ফেলিবেন।"[১]

সরকারী ইতিহাস-প্রণেতা বাক্‌ল্যাণ্ড লিখিয়াছেন :

"কলিকাতার একদল শ্বেতাঙ্গ স্থির করে যে, সরকার যদি তাহাদের প্রস্তাবিত আইন পাশ করে তবে তাহারা বড়লাটের বাড়ীর পাহারাদার সিপাহিদের পরাজিত করিয়া বড়লাটকে (লর্ড রিপনকে) চাঁদপাল ঘাঁট হইতে ষ্টীমারে চাপাইয়া উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিবে। এই ষড়যন্ত্রের কথা (বাংলার) লেফ্‌টনাণ্ট্‌ গভর্নরের অজ্ঞাত ছিল না।"[২]

'ইলবার্ট বিল'-এর বিরুদ্ধে সারা ভারতের শ্বেতাঙ্গগোষ্ঠী ভারত সরকারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। তাহাদের আন্দোলনে ভারত সরকার ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। কিন্তু ভারতীয়দের দিক হইতে এই বিলের স্বপক্ষে কোন জোর প্রচার ও আন্দোলন হইল না। ইংরেজ শাসকগণের বিচার-সংক্রান্ত এই বৈষম্য ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট বিক্ষোভ সৃষ্টি করিলেও সেই বিক্ষোভ এতদিন কোন সাংগঠনিক রূপ গ্রহণ করে নাই। ইহার পূর্বে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে গঠিত 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' এতদিন ভারতীয়দের বিভিন্ন অধিকারের কথা বলিলেও এই সংগঠন এপর্যন্ত এই প্রকারের কোন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় নাই। এইবার 'ইল্‌বার্ট বিল' উপলক্ষে শ্বেতাঙ্গদের বিরোধিতা ও উহার ভয়ংকর রূপ দেখিয়া 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'-এর নেতৃবৃন্দ ভয়ে পশ্চাৎপদ হন। শক্তিশালী শ্বেতাঙ্গগোষ্ঠীর বাধার বিরুদ্ধে ও বিলের স্বপক্ষে তাঁহারা কোন কার্যকরী আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইলেন না। তাঁহাদের এই অক্ষমতা দেশের জাগ্রত যুবশক্তির নিকট 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'-এর দুর্বলতা ও ভীরুতা স্পষ্ট করিয়া তোলে। এই আন্দোলনের ফলে ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গগোষ্ঠীর তীব্র বিরোধিতার নিকট মাথা নত করিয়া বিলটি তুলিয়া লয়।

'ইলবার্ট বিল'-এর পরাজয়ের ফলে ভারতের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মন জাতীয় অপমানের গ্লানিতে ভরিয়া যায়। বিজয়ী শাসক-জাতি বলিয়া শেতাঙ্গদের দম্ভ ও ঔদ্ধত্য তাহাদের নিকট অসহ্য হইয়া উঠে। 'ইলবার্ট বিল'-এর পরাজয়কে তাহারা চরম জাতীয় অপমান বলিয়া গ্রহণ করে। সরকারী ইতিহাস-প্রণেতা বাক্‌ল্যাণ্ডও তাঁহার গ্রন্থে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন : "'ইলবার্ট বিল'-এর শিক্ষা কোন ভারতবাসীই কোন দিন ভোলে নাই।"[৩] তাহারা ইহাও উপলব্ধি করে যে, ভারতবাসীরা যতদিন নিজেদের শক্তিদ্বারা তাহাদের দাবি পূর্ণ করিতে না পারিবে, তাহারা যতদিন শাসকদের সদাশয়তার উপর নির্ভর করিবে, ততদিন তাহাদের পরাধীনতার গ্লানি ও

১। L. Hutchinson : Empire of the Nabobs, p. 183-84.
২। C. F. Buckland : Bengal under Lieut. Governors, Vol. II, p. 787.
৩। C. E. Buckland : Bengal under Lieut. Governors, Vol. II, p. 789

দুঃখ-দুর্দশার অবসান তো দূরের কথা, বরং তাহা প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিবে। এই জাতীয় অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাহাদের মধ্যে এক দুর্জয় বিদ্রোহী মনোভাব দ্রুত গড়িয়া উঠিতে থাকে।

কংগ্রেসের জন্ম

দেশব্যাপী একটা প্রবল বিক্ষোভ ও সংগ্রামের মধ্য হইতেই কংগ্রেসের জন্ম হয়। ইহার পূর্ব হইতেই দেশের প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যে একটা বিরাট সংগ্রামের আলোড়ন দেখা দিতেছিল, বিশেষত কৃষক জনসাধারণের মধ্যে এই বিক্ষোভ ও সংগ্রামের প্রস্তুতির লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। এতদিন তাহাদের সংগ্রাম চলিত বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিতভাবে, এবার তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়াই সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার আয়োজন করে।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলার লেফ্‌টনান্ট-গভর্নর বড়লাটের নিকট প্রেরিত এক রিপোর্টে লিখিয়া পাঠান:

'পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে রায়তদের মধ্যে লীগ ও য়ুনিয়ন গঠনের মনোভাব দেখা যাইতেছে। এই সকল সংঘের উদ্দেশ্য বহু প্রকারের হইতে পারে। এই উপায়ে তাহারা যদি কিছুমাত্র সফলতা লাভ করিতে পারে তাহা হইলে সকল সময়েই একটা আশঙ্কা থাকিবে যে, হয়ত চাষীরা পরে খাজনা বন্ধের জন্যও সংঘবদ্ধ হইবে এবং তাহা হইলে জমিদারগণও বলপ্রয়োগে খাজনা আদায় করিতে পারে। বাঙলাদেশের বর্তমান অবস্থায় এই উদ্দেশ্য লইয়া সংগঠন সৃষ্টির পরিণাম ভয়াবহ হইবে। এই অবস্থা উদ্ভবের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে আমাদের বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে।"[১]

তখন ইহা কেবল বাঙলাদেশেরই অবস্থা নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক-জনগণের মধ্যেই এই নূতন সংগ্রামী মনোভাব দেখা দেয়। তখন মালাবার উপকূলের মোপলা-চাষীরা বারবার বিদ্রোহ করিয়া শাসক গোষ্ঠীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল; বোম্বাই প্রদেশের মারাঠা-চাষীরা এক ব্যাপক সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল; দাক্ষিণাত্যের চাষীরা এক বিরাট বিদ্রোহের দ্বারা 'মহাজনী আইন' পাশ করিতে শাসকদের বাধ্য করিয়াছিল; উত্তরবঙ্গের চাষীদের বিদ্রোহের ফলস্বরূপ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্‌ট' পাশ হইয়াছিল এবং অযোধ্যা ও পাঞ্জাব প্রদেশেও কৃষক-সংগ্রামের ফলে শাসকগণ পুরাতন কৃষি-আইনের সংস্কার সাধনের উদ্যোগ করিতেছিল।

ঠিক এই সময় ভারতের নবজাত শিল্পের মধ্য হইতে শ্রমিকশ্রেণী এক নূতন সংগ্রামী শক্তিরূপে দেখা দেয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরের শিল্প-কেন্দ্রে ভারতের প্রথম শ্রমিক-ধর্মঘট হয়। ১৮৮২ হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজে কয়েকটি বড় বড় ধর্মঘট করিয়া শ্রমিকগণ তাহাদের দাবি আদায় করিতে সক্ষম হয়। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে নূতন উৎসাহ-উদ্দীপনা ও চেতনার সঞ্চার হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে

[১] C. E. Buckland: Bengal under Lieut. Governors, Vol. I, p. 544.

বোম্বাই শহরে "মিলহ্যাণ্ডস্ এসোসিয়েশন" নামে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের, বিশেষ করিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্পের মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থে ভারত সরকারের দ্বারা ক্রমাগতভাবে ভারতের নবজাত বস্ত্রশিল্পের বিকাশে বাধাদানের ফলে দেশীয় মালিকদের মধ্যে বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব তীব্র হইয়া উঠে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের তুলাজাত দ্রব্যের উপর হইতে সকল প্রকার আমদানি-শুল্ক তুলিয়া দেওয়ার ফলে ইংলণ্ডের বস্ত্রের প্রতিযোগিতার মুখে দেশীয় বস্ত্রশিল্পের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়ে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই এবার ভারতীয় মালিকদের পক্ষে বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রাম অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের আর্থিক দুর্দশা ও জাতীয় অপমানের গ্লানি তাহাদেরও সংগ্রামের পথে পদক্ষেপ করিতে বাধ্য করে।

"ইহা প্রতিদিনই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, ভারতের পরাধীন অবস্থা ভারতবাসীর মনে কেবল একটা গভীর ক্ষতই সৃষ্টি করে নাই, ইহা ভারতীয় মালিকদের পকেটও স্পর্শ করিতেছে। আত্মমর্যাদা এবং আত্মস্বার্থ সমানভাবেই ক্ষুণ্ণ হইতেছে। স্বভাবতই মালিকদের নেতৃত্বে…একটা জাতীয় আন্দোলন এবার দেখা দিতে পারে। সুতরাং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের জন্ম ছিল একটা স্বাভাবিক ঘটনা।"[১]

'ইলবার্ট বিল'-এর ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'-এর ব্যর্থতাও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, অথচ এই বিলের ব্যর্থতা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মন লৌহ-শলাকার মত বিদ্ধ করিতেছিল। ইহার ফলে আরও শক্তিশালী একটা রাজনীতিক আন্দোলন এবং 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' অপেক্ষা শক্তিশালী একটা প্রকৃত জাতীয় সংগঠনের আবশ্যকতা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মনে বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহার বহু পূর্বেই ভারতীয়দের পক্ষ হইতে জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়াস আরম্ভ হইয়াছিল। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের প্রচেষ্টায় যে সকল প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল, সেই প্রতিষ্ঠানগুলিই ছিল ভারতীয়দের পক্ষে জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত স্বরূপ।

প্রথমে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 'ব্রাহ্ম সমাজ'। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান সোসাইটি'। এই সোসাইটির ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল "সকল শ্রেণীর দেশবাসীর মঙ্গলসাধন এবং সকলের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা।" ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই সোসাইটি 'বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন'-এর সহিত মিলিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান আবেদনপত্র-যোগে বৃটিশ পার্লামেণ্টের নিকট বহু প্রকারের অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে এবং ভারতের জনপ্রতিনিধিদের লইয়া আইনসভা গঠনের দাবি জানায়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান

১। Hirendra Nath Mukherjee: India Struggles for Freedom, p. 64.

এ্যাসোসিয়েশন'ই ছিল ভারতের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর একমাত্র রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন'-এর কলিকাতা শাখা সর্বপ্রথম একটি সর্ব-ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করে। এই সম্মেলনে বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আনন্দমোহন বসু। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে তিনি এই সম্মেলনকে 'ভারতের জাতীয় পার্লামেণ্ট' আখ্যা দান করিয়াছিলেন।

এইভাবে দেখা যায়, সরকারী উদ্যোগে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আয়োজন আরম্ভের বহু পূর্বেই ভারতের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীও নিজস্ব জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্যের নিকটবর্তী হইয়াছিল। তাহাদের সাফল্য যখন আসন্ন হইয়া উঠে তখনই বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ভারতীয়দের সেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়াসকে ইংরেজ শাসনের স্বার্থের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। হিউম সেই ষড়যন্ত্রের মারফত ভারতীয়দের জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগকে সাময়িকভাবে সরকারী প্রভাবে আনয়ন করিয়া নিজের উদ্যোগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করিতে সক্ষম হন।

"প্রকৃতপক্ষে বড়লাটের সাহায্যে সংগোপনে রচিত পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে এবং বৃটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ও পরিচালনায় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হইয়াছিল। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ গণশক্তির পুঞ্জীভূত ক্রোধ হইতে ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্ররূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা হইয়াছিল।

"বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে ভারতের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার এই প্রয়াসের উদ্দেশ্য ছিল আসন্ন বিপ্লবকে (কৃষক-বিদ্রোহকে—লেঃ) পরাজিত করা, অথবা আরম্ভের পূর্বেই উহা ব্যর্থ করা।"[১]

সাধারণভাবে এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমকেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করা হয়। 'সিভিলিয়ান' হিউম ১০৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণের পরেই ইনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। সরকারী কার্যে নিযুক্ত থাকিতেই হিউম গোপনে প্রাপ্ত পুলিস রিপোর্ট হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষ এক গভীর বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ আসন্ন এবং চারদিকে গোপন বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া উঠিতেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকটি ছিল ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের কাল। একদিকে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে পঞ্চাশ হইতে ষাট লক্ষ ভারতবাসী মৃত্যুমুখে পতিত

১। R. P. Dutt: Ibid, p. 289-90.

হইয়াছিল, অপরদিকে ইংলণ্ডের রানীকে "ভারতেশ্বরী" বলিয়া ঘোষণা উপলক্ষে দিল্লী নগরীতে অজস্র অর্থব্যয়ে এক দরবারের আয়োজন চলিতেছিল। ইহার ফলে জনসাধারণের বিক্ষোভ শতগুণ বাড়িয়া যায়। এই বিক্ষোভ দমনের জন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতে থাকে। ভারত সরকার ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'সংবাদপত্র-আইন' পাশ করিয়া সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা করে, অস্ত্র-আইন প্রয়োগ করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে সকল প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করে এবং সভাসমিতি বন্ধ করিয়া গণবিক্ষোভ দমনের প্রয়াস পায়। ইহারই পরিপূরক হিসাবে এবং গণবিদ্রোহের সংকট হইতে ভারতের ইংরেজ শাসনকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে অক্টাভিয়ান হিউম ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। হিউমের জীবনীকার স্তার উইলিয়াম ওয়েডরবার্ন লিখিয়াছেন:

"এই সকল অবিবেচনা-প্রসূত সরকারী ব্যবস্থা ও তৎসহ রুশিয়ার অনুরূপ পুলিসী দমননীতির ফলে বড়লাট লর্ড লিটনের শাসনাধীন ভারতবর্ষ এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। ঠিক সেই মুহূর্তেই মিঃ হিউম ও তাঁহার ভারতীয় পরামর্শদাতাগণ উদ্বিগ্ন হইয়া কার্যে অবতীর্ণ হন।"[১]

হিউম তাঁহার কার্যের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন:

"সেই সময়, এমনকি এখনও, আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না বা নাই যে, আমরা সেই সময় একটা ভয়ঙ্কর গণ-বিপ্লবের ঘোরতর বিপদের মধ্যে ছিলাম।

"বিভিন্ন তথ্য হইতে আমি নিশ্চিত হইয়াছিলাম যে, আমরা একটা ভয়ঙ্কর গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। বিভিন্ন অঞ্চলের রিপোর্ট ও সংবাদের সাতটি বিরাট 'ফাইল' আমাকে দেখানো হইয়াছিল।··· রিপোর্ট ও সংবাদগুলি বিভিন্ন জেলা, মহকুমা, নগর, শহর ও গ্রাম হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। রিপোর্ট ও সংবাদ-গুলির সংখ্যা অতি বিপুল। এইগুলি ত্রিশ সহস্রাধিক সংবাদদাতার নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। বহু রিপোর্টে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে আলোচনার সংবাদ ছিল। এই সকল আলোচনা হইতে দেখা যায়, 'এই দরিদ্র জনসাধারণ (শ্রমিক-কৃষক, নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর লোক) দেশের বর্তমান অবস্থার ফলে একটা হতাশার মনোভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা নিশ্চিতরূপে ধরিয়া লইয়াছে যে, তাহাদের অনাহারে মৃত্যু অনিবার্য; মরিবার পূর্বে একটা কিছু করিবার জন্ত তাহারা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। একটা কিছু করিবার জন্তই তাহারা প্রস্তুত হইতেছে, দলবদ্ধ হইতেছে। এই একটা কিছুর অর্থ হিংসামূলক ক্রিয়াকলাপ।' বহু পুলিস-বিবরণীতে পুরাতন তরবারি, বল্লম ও গাদাবন্দুক লুকাইয়া রাখিবার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যখনই প্রয়োজন হইবে, তখনই এই সকল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হইবে। ইহা কেহ ভাবে নাই যে, ইহার ফলে প্রথম স্তরে আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিবে, অথবা বিদ্রোহ বলিতে যাহা বুঝায় সেই প্রকারের কিছু ঘটিবে। আশঙ্কা

১। Sir William Wedderburn: Allan Octavian Hume, Father of Indian National Congress, p. 101.

করা হইয়াছিল যে, আকস্মিকভাবে চারিদিকে ইতস্তত হিংসামূলক অপরাধ, দোষী ব্যক্তিদের হত্যা, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, বাজার লুট প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবে। দেশের নীচু স্তরের অর্ধাহারী শ্রেণীসমূহ যে অবস্থায় রহিয়াছে তাহাতে ইহাই আশঙ্কা করা হইয়াছিল যে, পাতার উপর অসংখ্য জলবিন্দুর মত দেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট ছোট দলসমূহ ঐক্যবদ্ধ হইয়া কতকগুলি বৃহৎ দলে পরিণত হইবে; দেশের সকল দুষ্টলোক একত্র হইবে, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুণ্ডাদলগুলি একত্র হইবার পর,......সরকারের বিরুদ্ধে গভীর অসন্তোষের ফলে ক্ষিপ্ত হইয়া সকলে ঐ দলগুলিতে যোগদান করিবে; তাহারা বিভিন্ন স্থানে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবে এবং উহাকে একটা জাতীয় অভ্যুত্থানের আকারে পরিচালিত করিবে।"১

এই সকল বিপদ-সূচক সংবাদ প্রাপ্তির পর বৃটিশ সরকার একদিকে প্রচণ্ড দমন-নীতি অবলম্বন করে এবং অপরদিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রচনা করিতে থাকে। এইভাবে দমননীতি প্রয়োগের পর বৃটিশ সরকার যখন নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিল যে জনসাধারণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আর সম্ভাবনা নাই, কেবল, তখনই জনসাধারণের গণ-বিক্ষোভকে শান্তিপূর্ণ ও বৈধপথে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে অনুগত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহায়তায় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার জন্য অবসরপ্রাপ্ত 'সিভিলিয়ান' অক্টাভিয়ান হিউম বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিন কর্তৃক আদিষ্ট হইলেন। "ভারতের বৃটিশ শাসনের কেন্দ্রস্থল শিমলায় বসিয়াই বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিন ও হিউম কর্তৃক ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রচিত হয়।"২ কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ডব্লিউ. সি. বোনার্জি মহাশয়ও এই সত্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া লিখিয়াছেন:

"সম্ভবত ইহা বড়লোকের নিকটেই একটি সংবাদ যে, যেভাবে প্রথমে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহার পর হইতে যেভাবে তাহা পরিচালিত হইতেছে, তাহা ভারতের বড়লাট হিসাবে ডাফ্‌রিন ও আভার মার্কুইস্-এরই (বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিন—লেঃ) কীর্তি।"৩

দেশব্যাপী একটা ভয়ঙ্কর কৃষক-বিদ্রোহের "বিপদ" হইতে ভারতের বৃটিশ শাসনকে রক্ষা করিবার উপায় হিসাবেই যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন:

"১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বের বৎসরগুলি ছিল সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। বৃটিশ শাসকদের মধ্যে হিউমই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি একটা বিপর্যয় আসন্ন বলিয়া অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন এবং ইহাতে বাধা দিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন।.........অবস্থা কতখানি বিপজ্জনক হইয়াছিল তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি শিমলায় উপস্থিত হন। সম্ভবত তাঁহার এই সাক্ষাতের ফলেই

১। W. Wedderburn: Ibid, p. 80-81

২। R. P. Dutt: India Today, p. 298

৩। W. C. Bonerjee: Introduction to Indian Politics [Article, 1898]

চমৎকার কাজের লোক নূতন ভাইসরয় (লর্ড ডাফ্রিন) অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কার্যে অগ্রসর হইতে হিউমকে উৎসাহিত করেন। এই সময়টা ছিল এই সর্বভারতীয় আন্দোলনের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। কৃষক-বিদ্রোহ আরম্ভ হইলেই তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করিত। সেই কৃষক-বিদ্রোহের পরিবর্তে এই সর্বভারতীয় আন্দোলন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্ম একটা জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি করিয়া দিল। সেই জাতীয় আন্দোলন হইতেই নূতন ভারতবর্ষ সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিল। ইহার পরিণতি শেষ পর্যন্ত খুবই ভাল হইল এই কারণে যে, একটা হিংসামূলক ঘটনা আবার ঘটিতে দেওয়া হয় নাই।"[১]

কৃষক-বিদ্রোহের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হিউম লিখিয়াছিলেন :

"আমাদের শাসনের অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ একটা ক্রমবর্ধমান বিরাট শক্তির আঘাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য একটা রক্ষা-কবচের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেস আন্দোলন অপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ কোন কৌশল উদ্ভাবন করা সেই সময় সম্ভব ছিল না।"[২]

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর এই উদ্দেশ্য অপূর্ণ থাকে নাই। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে মোট বাহাত্তর জন প্রতিনিধি অধিবেশনে যোগদান করেন। এই প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিস্টার ডব্লিউ. সি. বোনার্জি। হিউম সাহেব নিজেই নিজেকে কংগ্রেসের সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া কার্য পরিচালনা করেন। এই অধিবেশনের প্রতিনিধিদের অধিকাংশ ছিল ব্রাহ্ম-সমাজ ও আর্য-সমাজের সদস্য। তাহারা শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর সম্পর্কে অনুসৃত সরকারী নীতির সমালোচনা করিলেও কোন ক্রমেই ইংরেজ-বিরোধী, এমনকি সরকার-বিরোধী মনোভাবের প্রশ্রয় দিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। কংগ্রেস সম্পর্কে যাহাতে শাসকদের মনে কোন প্রকারের ভুল ধারণার সৃষ্টি না হইতে পারে তাহার জন্য সভাপতির চেষ্টার অন্ত ছিল না। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার ভাষণে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া বলেন :

"আমাদের প্রিয় লর্ড রিপনের স্মরণীয় শাসনকালে জাতীয় ঐক্যের যে মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার পূর্ণ বিকাশ ও সংহতি সাধনই"[৩] কংগ্রেসের একমাত্র উদ্দেশ্য।

অধিবেশনের প্রতিনিধিদের "একমাত্র জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ছিল এই যে, ব্যাপক ভিত্তিতে সরকার গঠিত হইবে এবং তাহাতে ভারতের জনগণ উপযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে,"[৪] অর্থাৎ ভারত-সরকারের আইনসভায় দেশের কয়েকজন

১। C. F. Andrews & Girija Mukherjee : Rise and Growth of the Congress in India, p. 128-29.

২। Quoted from Wedderburn : Ibid. p. 77.

৩। Ambika Ch. Mazumder : "Indian National Evolution", p. 271.

৪। R. P. Dutt : India Today, p. 268.

নির্বাচিত সদস্য গ্রহণের অনুরোধই ছিল প্রধান জাতীয় দাবি। সংক্ষেপে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যে মূল কথাটি ঘোষণা করা হয় তাহা এই : "ইংরেজ শাসনের প্রতি অবিচল আনুগত্যই হইবে এই প্রতিষ্ঠানের মূল ভিত্তি।"[১]

ইংরেজ শাসনের প্রতি কংগ্রেস অনুগত থাকিবে—এই মনে করিয়া ভারত-সরকার প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ দেয়। শাসকগণ মনে করিয়াছিল যে, হিউম ও ভারতের "সম্ভ্রান্তবংশীয়" নেতৃবৃন্দ বর্তমান থাকিতে ইহা ইংরেজ ও সরকার-বিরোধী হইবে না। বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিন পূর্বেই কংগ্রেসকে "আশীর্বাদ" জানাইয়াছিলেন। প্রথম হইতেই তিনি চাহিয়াছিলেন "চরমপন্থী" বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে "নরমপন্থী"দের লইয়া একটা দুর্গরূপে কংগ্রেসকে গড়িয়া তুলিতে। এই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বুঝিয়া ইংরেজ সরকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। প্রকৃতপক্ষে তখনই তাহাদের আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। বাঙলার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বোম্বাইয়ের গোপাল কৃষ্ণ গোখেল ও ফিরোজশা মেটা, মাদ্রাজের সুব্রহ্মণ্যম আয়ার ও দাদাভাই নৌরজি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের রাজনীতিক মতামত ছিল ইংলণ্ডের শাসকগোষ্ঠী উদারনীতিক দলেরই অনুরূপ। তাঁহারা "চরমপন্থা" ও বৃটিশ-বিরোধিতার পথ প্রাণপণে পরিহার করিয়াই চলিয়াছিলেন। ইংরেজ শাসকগণের সহৃদয়তার উপর নির্ভর করিয়া আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে কিছু রাজনীতিক সুবিধা আদায় করাই ছিল তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য।

কিন্তু সেই সময়ের কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য ও মনোভাব যাহাই থাকুক না কেন, দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় কংগ্রেসকেই নিজস্ব জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া বরণ করিয়া লয়। প্রথম অধিবেশন হইতে দেশবাসীর নিকট যে ক্ষীণ আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছিল তাহাই দেশের শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী, উকিল প্রভৃতি শিক্ষিত-শ্রেণীর মধ্যে এক বিপুল সাড়া জাগাইয়া তোলে, সেই আহ্বানকেই তাহারা জাতীয় আহ্বান বলিয়া গ্রহণ করে। প্রত্যেকটি কংগ্রেস-অধিবেশনে প্রতিনিধি-সংখ্যা এরূপভাবে বৃদ্ধি পায় যে, নেতৃবৃন্দ ভীত হইয়া প্রতিনিধি-সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-অধিবেশনে প্রতিনিধি-সংখ্যা ছিল মাত্র বাহাত্তর জন, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা-অধিবেশনে প্রতিনিধি-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হয় চারিশত চৌত্রিশ, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ-অধিবেশনে তাহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়শত সাত। চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশন হয় এলাহাবাদ ও বোম্বাই নগরীতে, আর এই দুই অধিবেশনের প্রতিনিধি-সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১২৪৮ ও ১৮৮৯ জন।

বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ—এই তিনটি অধিবেশনে কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য স্থির হইবার পর ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সমগ্র ভারতে ও ইংলণ্ডে প্রচারের ব্যবস্থা হয়। কংগ্রেসের পক্ষে প্রচারের জন্য ইংলণ্ডেও একটি কংগ্রেস-কমিটি গঠিত হয়। এক সময় এই কমিটিতে বৃটিশ পার্লামেণ্টের দুই শত সদস্য যোগদান করিয়াছিলেন। এই সময় আয়ার্লণ্ডে 'হোমরুল'-এর দাবি লইয়া আন্দোলন

১। Ambika Ch. Mazumder : Indian National Evolution, p. 274.

চলিতেছিল। পার্লামেন্টের আইরিশ সদস্যগণ ইংলণ্ডের কংগ্রেস-কমিটিতে যোগদান করিয়া ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাইয়াছিলেন। ভারতেও প্রত্যেক প্রদেশে এবং জেলায় জেলায় কংগ্রেস-কমিটি গঠিত হয়। সেই সকল প্রাদেশিক ও জেলা-কমিটি নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটির অধীনে পরিচালিত হইতে থাকে। এইভাবে "উচ্চ সম্ভ্রান্তবংশীয়" প্রতিনিধিদের গণ্ডির মধ্যে কংগ্রেসকে আবদ্ধ রাখিবার সকল প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া কংগ্রেস শীঘ্রই একটি সর্ব-ভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

* * * *

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সর্বশক্তি দিয়া পূর্ণ করিয়াছিল এবং এখনও করিতেছে। সে দিনের মত আজিও কংগ্রেস ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও কৃষি-বিপ্লবের প্রধান শত্রুরূপে সক্রিয়। উপরোক্ত তথ্যসমূহ হইতে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের বিরুদ্ধ শক্তিরূপে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান ভূমিকা নির্ধারণ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নিজস্ব অবদান নহে, কংগ্রেসের এই বিপ্লব বিরোধী ভূমিকা প্রথম হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের দ্বারাই নির্ধারিত হইয়াছিল। গান্ধী কেবল বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী দ্বারা নির্ধারিত সেই নীতি কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন মাত্র। ভারতের বৃটিশ শাসন এবং প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ-ব্যবস্থার রক্ষাকবচ হিসাবেই হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হিউমের উদ্দেশ্যের অনুরূপভাবেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর হইতে শেষ পর্যন্ত ইহাকে গণ-বিপ্লবের বিরুদ্ধে একটি রক্ষাকবচরূপে গড়িয়া তোলা ও পরিচালিত করা হইলেও অন্য কোন গণ-সংগঠনের অভাবে দীর্ঘ-কাল পর্যন্ত ভারতের জনসাধারণ ইহাকেই নিজস্ব সংগঠনরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল এবং ইহাতে অগণিত সংখ্যায় যোগদান করিয়াছিল। শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণ শোষণ ও উৎপীড়ন হইতে নিজ নিজ শ্রেণীর মুক্তিলাভের এবং জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সংগঠনরূপে কংগ্রেসকে গড়িয়া তুলিবার ও পরিচালনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। তাই দেখা যায়, অল্পকাল পরেই বৃটিশ শাসকগণ এই প্রতিষ্ঠানটিকে "রাজদ্রোহের কেন্দ্র" মনে করিয়া ইহার উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। অপরদিকে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বও শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে সর্বশক্তি দিয়া বাধাদান করিয়া আসিয়াছে। গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন তুলিয়া প্রত্যেকটি সংগ্রামের শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণের যোগদানে বাধা দিয়া এবং শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ভয়ে বারংবার সংগ্রাম প্রত্যাহার করিয়া বুর্জোয়া ও জমিদারগোষ্ঠীর শ্রেণীস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

শ্রমিক-কৃষক প্রভৃতি দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া কেবলমাত্র মূলধনী ও জমিদারগোষ্ঠীর জন্য রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক সুবিধা আদায়—ইহাই প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য হইয়া রহিয়াছে। এই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্যই কংগ্রেস নেতৃত্বে পরবর্তীকালে দ্বৈত ভূমিকা অবলম্বন করিতে

বাধ্য হইয়াছিল। প্রথমত, বুর্জোয়া-জমিদারগোষ্ঠীর জন্য সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর অনিচ্ছুক হস্ত হইতে রাজনীতিক ও আর্থনীতিক সুবিধা আদায়ের যন্ত্র হিসাবে কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্বকে জাতীয় নেতৃত্বের ভূমিকা অবলম্বন করিতে এবং জাতির প্রতিনিধিরূপে কয়েকবার জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, জাতীয় ক্ষেত্রে শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সেই নেতৃত্বে জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়াস ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যেই কংগ্রেস-নেতৃত্বকে বারংবার ক্রমবর্ধমান গণ-সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর সহিত সহযোগিতার পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এই সহযোগিতার অপরিহার্য শর্ত হিসাবেই শ্রমিক-কৃষক গণশক্তিকে নিজস্ব বৈপ্লবিক পন্থায় জাতীয় সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিতে দেখিয়া কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বকে বারংবার অর্ধপথে জাতীয় সংগ্রাম প্রত্যাহার করিতে হইয়াছিল। শাসকগোষ্ঠীকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংগ্রামের আরম্ভ, অর্ধপথে উহা প্রত্যাহার এবং শাসকগোষ্ঠীর দিকে আপসের হস্ত প্রসারণ—ইহাই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের চিরাচরিত নীতি ও পদ্ধতি।

কৃষি-সংকট

ভারতে বৃটিশ শাসনের আরম্ভকাল হইতে যে কৃষি-সংকট দেখা দিয়াছিল তাহা মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ৩০ বৎসরে চরম আকার ধারণ করে। ইহার অনিবার্য ফলস্বরূপ ভারতব্যাপী এক কৃষি-বিপ্লবের অবস্থা ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। বিভিন্ন সরকারী তথ্য হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের কৃষির যে ভয়ঙ্কর চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয় তাহার সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নরূপ:

'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র শাসনকালের প্রথম যুগে বোম্বাই প্রদেশের কৃষকদের মোট রাজস্ব দিতে হইত ৮০ লক্ষ টাকা, মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া হয় ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। এই রাজস্বের অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য কৃষক জনসাধারণকে মারোয়াড়ী, গুজরাটী ও ভাটিয়া সাউকার মহাজনদের নিকট চিরদাসত্ব বরণ করিতে হইত।[১] 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র শাসনকালে মাদ্রাজ অঞ্চলে যে ভূমি-রাজস্ব আদায় হইত, মহারানীর শাসনকালে তাহা অপেক্ষা দশলক্ষাধিক টাকা অধিক ভূমি-রাজস্ব আদায় করা হয়। ইহার ফলে মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।[২] ১৮৮১ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাকি খাজনার দায়ে মাদ্রাজ সরকার ৮,৪০,৭১৩ জন কৃষকের ১৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৬৪ বিঘা জমি নিলামে বিক্রয় করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত আরও ১২ লক্ষ বিঘা জমি ক্রেতার অভাবে মাদ্রাজ সরকারকেই ক্রয় করিতে হইয়াছিল।[৩] মধ্যপ্রদেশের সকল জেলায় শতকরা ১০২ হইতে ১০৫ টাকা হারে কৃষকের রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয়।

১। সখারাম গণেশ দেউস্কর: দেশের কথা, পৃ ১১২। ২। Editorial, The Englishman 28 Feb. (দেশের কথা, পৃ ১২৪)। ৩। সখারাম গণেশ দেউস্কর: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১১৪।

তাহার ফলে কৃষকের দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে।[১] ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব প্রদেশ অধিকৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের ভূমি-রাজস্ব প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি করা হয়। ইহার ফলে পাঞ্জাবের অধিকাংশ স্থানের কৃষিজীবীদের প্রায় অর্ধাংশ সর্বস্বান্ত হইয়া যায়।[২] সরকারী বিবরণ হইতে জানা যায়, অযোধ্যা প্রদেশের শতকরা ৭৫ জন কৃষকের ঘরে খাদ্য নাই, শীতের জন্য লেপ বা কম্বল নাই। এই অঞ্চলের অধিকাংশ কৃষকের উপবাস ও অর্ধাহার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়ায়।[৩] বিহার প্রদেশে প্রায় ৬ লক্ষ কৃষকের প্রতিজনকে মাত্র ১৭ টাকায় সারা বৎসর জীবন ধারণ করিতে হয়। এরূপ লক্ষ লক্ষ কৃষক আছে যাহারা কেবল দুই বিঘা করিয়া জমি চাষ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। "শতকরা দশবারো জন কৃষকের কোন জমিজমা নাই, তাহারা কেবল দিন মজুরি করিয়া দিন কাটায়। শ্রমজীবীরাও বৎসরের মধ্যে আট মাসের অধিক কাজ পায় না। মজঃফরপুর, সারণ, চাম্পারণ ও দ্বারভাঙ্গা জেলার অনেক অংশে শ্রমজীবীদিগকে অর্ধভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাইতে হয়।"[৪] বঙ্গদেশে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' ফলে সরকার ইচ্ছামত কৃষকের ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে না পারিলেও 'পথকর,' 'চৌকিদারী কর,' 'পূর্তকর' প্রভৃতি নানাবিধ কর বসাইয়া জমিদারী শোষণের উপর সরকারী শোষণের বিপুল ভার চাপাইয়া দিয়াছিল। উইলিয়াম ডিগ্‌বী দেখাইয়াছেন, "বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর লোকের বার্ষিক গড় আয় পনের টাকা তিন আনা মাত্র। অর্থাভাবে বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই সুপানীয়ের অভাব ঘটিয়াছে। ফলে ম্যালেরিয়া ও কলেরায় প্রতি বৎসরই বাংলাদেশের মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সুখাদ্যের অভাবে ও শিশুদের যকৃতের রোগে বহু মৃত্যু ঘটিতেছে।"[৫]

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ঐতিহাসিক উইলিয়াম হাণ্টার ইংলণ্ডে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের কুড়ি কোটি মানুষের মধ্যে চার কোটিরও অধিক মানুষ অর্ধাশনে দিন যাপন করে। বঙ্গদেশের ছোটলাট চার্লস ইলিয়ট্ ভারতের কৃষকদের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন :

"আমি মুহূর্তমাত্র ইতস্তত না করিয়া বলিতে পারি, বৃটিশ ভারতের কৃষিজীবী প্রজার অর্ধাংশ সারা বৎসরের মধ্যে একদিনও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ক্ষুধার সম্পূর্ণ নিবৃত্তিতে যে কি সুখ, তাহা ইহারা কখনও জানিতে পারে না।[৬]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের, বিশেষত শেষ ত্রিশ বৎসরের এই অতি ভয়ঙ্কর কৃষক-শোষণের অনিবার্য পরিণতি ঘটিয়াছে সাধারণ লোকক্ষয়ে এবং লোকক্ষয়কারী মহাদুর্ভিক্ষে। উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে লোকক্ষয়ের হিসাব নিম্নরূপ :

বেরার প্রদেশে ৫ লক্ষ ৮০ হাজার, পাঞ্জাব প্রদেশে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার, মধ্যপ্রদেশে ১৩ লক্ষ ৭০ হাজার, এবং এলাহাবাদে, গোরক্ষপুরে ও বারাণসী জেলায় ১২ লক্ষ ৪৪ হাজার ২ শত। সমগ্র ভারতবর্ষে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ৩৯ লক্ষ ২৮ হাজার ৬ শত

১। দেশের কথা, পৃ ১১৫। ২। দেশের কথা, পৃ ১১৭-১৮। ৩। দেশের কথা, পৃ ১২৪।
৪। দেশের কথা, পৃ ১৩৬-৩৭। ৫। William Digby : Prosperous India, p. 218
৬। দেশের কথা, পৃষ্ঠা ২৭।

৩১ জনের এবং ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৮৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ১ শত ৫৫ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল।[১]

বৃটিশ শাসনকালের প্রথম হইতেই ভারতবর্ষ স্থায়ী দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বৎসরে দুর্ভিক্ষের অবস্থা চরম আকার ধারণ করে। বৃটিশ শাসনের প্রথম ভাগে ১৮০১ হতেই ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে দুর্ভিক্ষে ১০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটিয়াছিল, আর ১৮৬০ হইতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৬ বৎসরে ভারতবর্ষে ৬ বার ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল এবং তাহাতে ৫০ লক্ষাধিক ভারতবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।[২] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল মাত্র ৭ বার এবং তাহাতে মোট ১২½ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। আর ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল ২৪ বার এবং তাহার ফলে মৃত্যু ঘটিয়াছিল ২ কোটি ২৫ লক্ষ মানুষের। এই ২৪টি দুর্ভিক্ষের ১৮টি দেখা দিয়াছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ২৫ বৎসরে।[৩]

ঐতিহাসিক হাণ্টার লিখিয়াছেন :

"প্রকৃত দুর্ভিক্ষের সময় সরকার বহু কষ্টে অনশন পীড়িত মানুষের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু নিত্য-অনশনক্লিষ্ট প্রজাসমূহ যে প্রতিবৎসর বিভিন্ন রোগের আক্রমণে অসময়ে ইহলোক ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার কোন প্রতিকার করিতে সরকার অসমর্থ।"[৪]

কৃষি ও কৃষক-সম্প্রদায়ের এই চরম বিপর্যয় অনিবার্যভাবেই ভারতব্যাপী কৃষক-বিদ্রোহ আসন্ন করিয়া তোলে। ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তের 'পাবনা (সিরাজগঞ্জ) বিদ্রোহ' এবং অপর প্রান্তে 'দাক্ষিণাত্য-বিদ্রোহ' ভারতবর্ষব্যাপী কৃষকের সেই মহাবিদ্রোহের অগ্নিময় ইঙ্গিত বহন করিয়া আনে। ভারতের বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী সেই ভয়ঙ্কর ইঙ্গিতে দিশাহারা হইয়া বৃটিশ শাসন আর ভারতীয় শোসকগোষ্ঠীকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই "একটা কিছু" করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ হইতে এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম কর্তৃক ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণই ছিল সেই "একটা কিছু" করিবার শশব্যস্ত প্রয়াস।

১। দেশের কথা, পৃ ১৩৯ এবং ১৪০। ২। দেশের কথা, পৃ ১৩৩ ও ১৩৬। ৩। R. P. Dutt : Ibid. p. 288. ৪। W. W. Hunter : Imperial Gazetteer of India, Vol. IV. p. 131.

তৃতীয় অধ্যায়

মহাবিদ্রোহের পূর্বে মহাজন-বিরোধী কৃষক-বিদ্রোহ

বিদ্রোহের পটভূমিকা

"কৃষক সম্প্রদায় সম্পর্কে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতি মধ্যযুগের সহস্রমুখী শয়তানী চক্রান্তের মত। এই শয়তানী চক্রান্ত দ্বারা শিকারকে লোহার খাঁচায় আবদ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা উহাকে ক্ষত-বিক্ষত করা হইত।"[১]

সাম্রাজ্যবাদের কৃষক-শোষণের পন্থা ছিল একটা নয়, শত শত। এই সকল পন্থাই একসঙ্গে কৃষককে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিয়া তাহার রক্ত শোষণ করিত, তাহাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিত। সাম্রাজ্যবাদের ভূমি-রাজস্ব-ব্যবস্থা কৃষকের শেষ পাইটি পর্যন্ত কাড়িয়া লইত। সেই রাজস্ব এরূপভাবে ব্যয় করা হইত যে, তাহার সহিত কৃষকের জীবনের কোনই সম্পর্ক থাকিত না। সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতিক ব্যবস্থা কৃষককে গ্রামের রক্ষণাবেক্ষণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে পুলিস ও সামরিক বাহিনীর হস্তে সমর্পণ করিত। আর ইহার আর্থনীতিক ব্যবস্থা কৃষককে বাধ্য করিত বৈদেশিক শিল্পের জন্য সস্তায় কাঁচামাল উৎপাদন করিতে। কৃষকের কাঁচামালের স্বল্প মূল্যের জন্য যদি অন্যান্য শোষকদের লুটের বখরা আদায় না হইবার আশঙ্কা দেখা দিত, তবে তাহারা সকলে মিলিয়া কৃষকদের ঘটিবাটি সমস্তকিছু কাড়িয়া লইত—অবশ্য যদি কিছু থাকিত। ইহাও অবশ্যই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আর্থনীতিক ব্যবস্থারই অনিবার্য পরিণতি।

সাম্রাজ্যবাদের শিল্পনীতির ফলে শিল্পদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি পাইল, আর সেই মূল্য দিতে হইল কৃষককে। এই শিল্পনীতির ফলেই গ্রামাঞ্চলের বেকার-সংখ্যা ও জমির জন্য প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইল। সকল কিছুর পরিণতি হিসাবেই কৃষির অবস্থা ক্রমশ চরম বিপর্যয়ের দিকে অগ্রসর হইল। কৃষকের মাথার উপর ট্যাক্সের যে বিরাট বোঝা চাপানো হইয়াছিল তাহা দিতে তাহারা অক্ষম। সেই ট্যাক্সের দায়ে কৃষকের যে সামান্য জমিজমা ছিল তাহাও কাড়িয়া লওয়া হইল। কৃষক মহাজনগোষ্ঠীর ঋণদাসে পরিণত হইল, অথবা সে চিরতরে কৃষি-শ্রমিকরূপে দেখা দিল। সাম্রাজ্যবাদ এইভাবে ভারতের কৃষকের জন্য সৃষ্টি করিল "এক চমৎকার সমৃদ্ধির স্বর্গ"—নিঃস্ব ও সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত এক ভিখারী-জীবন।

"কৃষক উহার উৎপীড়নের সমগ্র যন্ত্রটির পশ্চাতে সকল সময় সাম্রাজ্যবাদের শাসনযন্ত্রটিকে দেখিতে নাও পাইতে পারে, কিন্তু মহাজন আর জমিদারগোষ্ঠীর রক্ত-কলুষিত হস্ত সকল সময় তাহার চোখে না পড়িয়া পারে না। কারণ, তাহারাই তাহার জমি কাড়িয়া লয়, তাহারাই তাহাকে চিরদাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে।

১। K. S. Shelvankar : The Problem of India, p. 218.

সাম্রাজ্যবাদীরা তাহাদের নিজস্বার্থে যে ভূমি-ব্যবস্থার প্রচলন করিয়াছে সেই ভূমি-ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ সুযোগ-সুবিধা এই মহাজন আর জমিদারগোষ্ঠীই গ্রহণ করে।

"এই সর্বনাশকর ভূমি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতীয় কৃষকের বিদ্রোহ কোন নূতন ঘটনা নয়। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার শেষ উপায় হিসাবেই তাহাদিগকে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র আর সামরিক আক্রমণের দ্বারা রাজবংশের ঘন ঘন পরিবর্তনের মতই কৃষক-বিদ্রোহের ফলে রাজবংশের পরিবর্তন ঘটিবার দৃষ্টান্ত অল্প নয়। উনবিংশ শতাব্দীতেও এই প্রকারের বহু কৃষক-অভ্যুত্থানের দৃষ্টান্ত আছে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের অভ্যুত্থান তাহাদের মধ্যে বৃহত্তম। এই অভ্যুত্থানে উত্তর ও মধ্যভারতের এক বিশাল অঞ্চলের কৃষক ঐক্যবদ্ধ হইয়া জনসাধারণের অন্যান্য অংশের সহিত একত্রে ঘৃণ্য, উৎপীড়ক-শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, তাহার ধ্যান-ধারণা ও জীবনধারার সম্পূর্ণ বিপরীত এক শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি লইয়া আক্রমণ করিয়াছিল।

"১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল কৃষক মহাজন ও জমিদারগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একলক্ষাধিক সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী গঠন করিয়া সমতল ভূমির উপর দিয়া কলিকাতার দিকে অভিযান করিয়াছিল।"[১]

বৃটিশ শাসনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ স্বরূপ মহাজনগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়ন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছিল। ইহার বিরুদ্ধে কৃষক জনসাধারণের সংগ্রামও প্রথম হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পূর্ববর্তী ভীল-বিদ্রোহ, শোলাপুর-বিদ্রোহ ও সাঁওতাল-বিদ্রোহ তাহারই সাক্ষ্য বহন করে।

ভীল বিদ্রোহ (১৮৪৫)

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ভীল বিদ্রোহ প্রধানত মারোয়াড়ী সাউকারদের বিরুদ্ধে রাজস্থানের ভীল চাষীদের বিদ্রোহ। মারোয়াড়ী মহাজনদের শোষণ-উৎপীড়নের ফলে ভীল চাষীরা এতই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা মারোয়াড়ী মহাজন দেখিলেই তাহাদের নাক ও কান কাটিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিত। কিন্তু মহাজনদের হত্যা করিবার দৃষ্টান্ত বিরল। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন ভাংগ্রিয়া নামে একজন ভীল সর্দার। এই বিদ্রোহের ফলে রাজস্থানের গ্রামাঞ্চল হইতে সকল মারোয়াড়ী মহাজন পলায়ন করিয়াছিল।[২]

শোলাপুর বিদ্রোহ (১৮৫২)

বোম্বাই প্রদেশের সোলাপুরের গ্রামাঞ্চলটি ছিল মহাজনদের, বিশেষত মারোয়াড়ী মহাজনদের শোষণের স্বর্গ। মারোয়াড়ী মহাজনগণ ঋণের দায়ে বহু কৃষককে সর্বস্বান্ত করিয়া দিয়াছিল। জমিজমা আর ভিটামাটি হইতে উচ্ছিন্ন কৃষকগণ অবশেষে মরিয়া হইয়া মারোয়াড়ী মহাজনদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। কৃষকদের আক্রমণে মারোয়াড়ী মহাজনগণ গ্রামাঞ্চল হইতে পলায়ন করিতে থাকে।

১। Shelvankar: Ibid, p. 218-19.

২। Report of the Deccan Riot Commission

কৃষকগণ গোপনে একটি বৃহৎ গ্রামের সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত এক মারোয়াড়ী মহাজনকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প করে। একদিন উক্ত মারোয়াড়ী মহাজনটি দ্বিপ্রহরে গ্রামের মধ্য দিয়া যাইবার সময় গ্রামের সকল কৃষক সমবেত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে। গ্রামের অন্যান্য মারোয়াড়ী মহাজনগণ তাহাকে রক্ষা করিতে ছুটিয়া আসে। কিন্তু গ্রামবাসীদের হস্তে মার খাইয়া তাহারা নিজেদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পলাইয়া যায়। তাহার পর অত্যাচারী মহাজনটিকে সকলে মিলিয়া পিটাইয়া হত্যা করে। পরে পুলিশ আসিয়া বহু কৃষককে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু পুলিস বহু চেষ্টা করিয়াও কোন সাক্ষী সংগ্রহ করিতে না পারায় এই হত্যাকাণ্ডের জন্য কাহাকেও শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ইহার পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই গ্রামে কোন মহাজন প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই। কয়েক বৎসর পরে তাহারা পুলিসের রক্ষণাবেক্ষণে আবার আসিয়া গ্রামের মধ্যে জাঁকিয়া বসে।

অনুরূপ ঘটনা ঘটে গুজরাটের একটি গ্রামে। এখানে একদিন গ্রামের সকল কৃষক একত্র হইয়া গ্রামের সকল গুজরাটী মহাজনদের আক্রমণ করে এবং অনেককে পিটাইয়া পঙ্গু করিয়া দেয়, আর সর্বাপেক্ষা অত্যাচারী মহাজনকে লাঠিদ্বারা প্রহার করিয়া হত্যা করে।[১]

সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫)

১৮৫৫-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সাঁওতাল পরগনা ও বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চল জুড়িয়া সাঁওতাল কৃষকদের যে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয় তাহা প্রথমে জমিদার ও মহাজনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আরম্ভ হইলেও ক্রমশ ইহা সাঁওতাল পরগনার স্বাধীনতার সংগ্রামে পরিণত হয়। সাঁওতাল নায়ক সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবের নেতৃত্বে লক্ষাধিক সাঁওতাল সৈন্য কলিকাতা অভিমুখে অভিযান করে। প্রথমে জমিদার ও মহাজনগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নের প্রতিকারের জন্যই এই অভিযান চালিত হইয়াছিল। কিন্তু পথিমধ্যে জমিদার-মহাজনগোষ্ঠী এবং পুলিস এই অভিযাত্রী বাহিনীর উপর আক্রমণ করিলে সাঁওতাল বিদ্রোহ পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইয়া যায়। প্রায় দুই বৎসর কাল এই বিদ্রোহ চলিয়াছিল। এই দুই বৎসরে কয়েকটি বৃটিশ সৈন্যবাহিনী সাঁওতালদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং সমগ্র সাঁওতাল পরগনা, এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের কতিপয় অঞ্চলও বৃটিশ শাসন হইতে মুক্ত হয়। অবশেষে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠি ও জমিদার-মহাজনগণ তাহাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল এবং সামরিক শক্তি সমবেত করিয়া এই বিদ্রোহ দমন করিতে সক্ষম হয়।[২]

১। Ibid.

২। এই বিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সুপ্রকাশ রায়ের 'ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ অধ্যায়

মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালের কৃষক-বিদ্রোহ

১. ওয়াহাবী বিদ্রোহ (১৮৩১-৭০)[১]

ওয়াহাবী বিদ্রোহের তাৎপর্য

বৃটিশ শাসকগণ ভারতে যে শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে প্রথম তাহে তাহার প্রধান শিকার হইয়াছিল সংখ্যাধিক মুসলমান চাষী। বৃটিশ শক্তি প্রধানত মুসলমান শাসকদের নিকট হইতেই এদেশের শাসন-ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছিল। তাই বৃটিশ শক্তি প্রথমে মুসলমানদের শত্রু বলিয়াই গণ্য করিয়াছিল। অন্যদিকে মুসলমানগণও একই কারণে বৃটিশ শাসনের আরম্ভ হইতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর সহিত অসহযোগিতা ও বিরোধিতা করিয়াছিল। সেই হেতু ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তিত হয়, তখন প্রধানত হিন্দুরাই বৃটিশ শাসকদের সহিত সহযোগিতা করে এবং প্রায় সকল জমিদারিই হিন্দুদের হস্তগত হয়। ইহার ফলে বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যার প্রায় সকল জমিদারই হিন্দু, আর তাহাদের অধীনস্থ চাষীদের অধিকাংশই মুসলমান। সেই সময় হইতে বরাবর বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী, জমিদার-মহাজন ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলগণ এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশ ও বিহারের সকল কৃষক-বিদ্রোহকে "সাম্প্রদায়িক" আখ্যা দিয়াছে এবং উহাকে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। তাহার ফলে বহু কৃষক-বিদ্রোহ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

বৈদেশিক বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতবর্ষের মুসলমানদের হস্ত হইতেই ভারত সাম্রাজ্য ও উহার রাজনীতিক ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছিল। তাই বৃটিশ শাসনের আরম্ভ হইতে দীর্ঘ একশত বৎসরকাল মুসলমানগণ এই বিদেশীদের আপসহীন শত্রুরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষে মুসলমান কৃষকই হিন্দুদের অপেক্ষা অধিক বিদ্রোহ করিয়াছিল, তাহারাই ভারতবর্ষের মাটি হইতে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদের জন্য সকল প্রকারে চেষ্টা এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিল। তাই মুসলমানদের শান্ত করিতে ও তাহাদের সহযোগিতা লাভ করিতে ব্যর্থ হইয়া ভারতের বড়লাট লর্ড মেয়ো এই হতাশাব্যঞ্জক খেদোক্তিটি করিয়াছিলেন :

"মহারানীর (ভিক্টোরিয়ার) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই কি ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মের অনুশাসন ?"[২]

১। W. W. Hunter : The Indian Musalmans, 'A sketch of the Wahabis in India (Calcutta Review, 1866) এবং M. Hussain's 'Origin of Indian Wahabism (Proceedings of the Indian History Congress, 1939)—এই সকল গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হইতে 'ওয়াহাবী বিদ্রোহের' তথ্যসমূহ সংগৃহীত। ২। W. W. Hunter : Ibid, Preface.

লর্ড মেয়োর এই খেদোক্তি সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। যে বিদেশী শাসকগোষ্ঠী মুসলমানদের হস্ত হইতে ভারতবর্ষের বিশাল সাম্রাজ্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে মুসলমানগণ তাহাদের ধর্মের অনুশাসন হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'ওয়াহাবী বিদ্রোহের' যে আগুন সারা ভারতময় ছড়াইয়া পড়িয়া ভারতের বৃটিশ শাসন নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাও প্রথমে মুসলমানদের "ধর্মের অনুশাসন" হিসাবেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং পরে উহা বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও জমিদার-মহাজন বিরোধী শ্রেণী-সংগ্রামে পরিণত হয়।

ওয়াহাবী বিদ্রোহের পূর্ব-ইতিহাস

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। এক পাঞ্জাব ব্যতীত সমগ্র ভারতের বুকের উপর দিয়া বৃটিশ শাসনের অত্যাচারের তাণ্ডব অবাধে চলিয়াছে, তাহা ভারতের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, ভারতের সাধারণ মানুষ মৃত্যু-যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে। সকল সম্প্রদায়ের মানুষের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন উচ্ছন্নে গিয়াছে। এমন সময় মুসলমান ধর্মের সংস্কারসাধনের সংকল্প লইয়া রায়বেরিলির সৈয়দ আহম্মদ মক্কা হইতে ফিরিয়া আসেন। তিনি মক্কা হইতে লইয়া আসেন ওয়াহাবী আন্দোলনের নূতন আদর্শ।

ওয়াহাবী আন্দোলনের আদর্শ ছিল মুসলমানদের ভিতর হইতে সেই সময়ের প্রচলিত বহু কুসংস্কার দূর করিয়া মুসলমান ধর্মকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিবার আদর্শ। 'ওয়াহাবী' শব্দের তাৎপর্যগত অর্থ 'নবজাগরণ'। আরবের আব্দুল ওয়াহাব এই আদর্শের প্রবর্তক। তাঁহার নামানুসারেই এই আন্দোলনের নাম হইয়াছিল 'ওয়াহাবী আন্দোলন'। মুসলমান ধর্মের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে এই আন্দোলন আরম্ভ হইলেও এই আদর্শের ভিতরে ছিল সেই সময়ের প্রচলিত মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের আহ্বান। এই বিদ্রোহের আহ্বান লইয়াই সৈয়দ আহ্‌ম্মদ মক্কা হইতে ফিরিয়া আসেন।

সৈয়দ আহ্‌ম্মদের জীবন-কাহিনী ভারতের বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেরই কাহিনী। তিনি কৈশোরেই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পর ভারতের স্বাধীনতার শত্রু বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে লইয়াই তিনি 'পিণ্ডারী' নামক কৃষকদের বিদ্রোহে যোগদান করেন। পিণ্ডারী বিদ্রোহীদের এক সৈন্যদলের সেনাপতিরূপে সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধেই তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। 'পিণ্ডারী-বিদ্রোহ' শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয় এবং বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। ইহার পর সৈয়দ আহ্‌ম্মদ তীর্থ করিবার উদ্দেশ্যে মক্কা যাত্রা করেন।

মক্কা হইতে ফিরিয়া সৈয়দ আহ্‌ম্মদ নূতন ওয়াহাবী আদর্শ চারিদিকে প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার এই নূতন আদর্শে গোঁড়ামি ছিল বটে, কিন্তু এই গোঁড়ামির

ফলেই বিদেশী বৃটিশ শাসন হইল ভারতের মুসলমানদের প্রধান শত্রু। সৈয়দ আহ্‌মদ বৃটিশ-অধিকৃত ভারতবর্ষকে "শত্রুর দেশ" (অর্থাৎ শত্রু-কবলিত দেশ, 'দার-উল-হারাব') বলিয়া অভিহিত করেন। সৈয়দ আহ্‌মদের আদর্শে অনুপ্রাণিত ওয়াহাবী মুসলমানগণ এই বৈদেশিক শত্রুর উচ্ছেদ ও সকল প্রকার অত্যাচারের মূলোৎপাটন এবং "ধর্মরাজ্য" (দার-উল-ইসলাম) স্থাপনের শপথ গ্রহণ করে।

১৮২০ হইতে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সৈয়দ আহ্‌মদ ভারতের উত্তরাঞ্চল ঘুরিয়া তাঁহার ধর্মমত প্রচার করেন। উত্তর-ভারতের লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ইহার পর তিনি বিহারে ঘুরিয়া বিহারের মুসলমানদের সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলেন। বিহারের পাটনা হইল ওয়াহাবীদের প্রধান কেন্দ্র। বিহারের পর তাঁহার প্রচারকার্য চলে বঙ্গদেশে। বঙ্গদেশের মুসলমানদের অধিকাংশই চাষী। তাহারা সেই সময় জমিদার ও নীলকর সাহেবদের শোষণ-উৎপীড়নে জর্জরিত হইয়া এক বিদ্রোহের আয়োজন করিতেছিল। সৈয়দ আহ্‌মদের নূতন আদর্শ বাঙলার চাষীদের মধ্যে উৎসাহের জোয়ার আনিয়া দেয়।[১]

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহ্‌মদ উপস্থিত হইলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং এই প্রদেশের মুসলমানদের ওয়াহাবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন। তিনি তখনকার মত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেই তাঁহার কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। এই অঞ্চলে তাঁহার কর্মকেন্দ্র স্থাপনের পশ্চাতে ছিল একটি গভীর উদ্দেশ্য। সেই সময় পাঞ্জাবে চলিতেছিল রঞ্জিত সিংহের নেতৃত্বে শিখদের অখণ্ড আধিপত্য। বঙ্গদেশের মতই পাঞ্জাবের অধিকাংশ মানুষ, বিশেষত অধিকাংশ চাষীই মুসলমান। মুসলমান চাষীদের উপর শিখ জায়গীরদার ও জমিদারদের নিরঙ্কুশ শোষণ-উৎপীড়ন মুসলমান চাষীদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, তাহারা শিখ জায়গীরদার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুযোগ খুঁজিতেছিল। এমন সময় সৈয়দ আহ্‌মদের প্রচারের ফলে পাঞ্জাবের মুসলমান চাষীদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে।

সৈয়দ আহ্‌মদ কেবল একটা নূতন ধর্মমতের প্রচারক ছিলেন না, তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে বিদ্রোহী, তাঁহার ওয়াহাবী আদর্শ বিদ্রোহেরই আদর্শ। বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সক্ষম। পাঞ্জাবের মুসলমান চাষীদের বিদ্রোহে তিনি নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই এই বিদ্রোহ পাঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধের, অর্থাৎ 'জেহাদ'-এর রূপ গ্রহণ করে। এই জন্যই কেহ কেহ ওয়াহাবী বিদ্রোহকে হিন্দু-বিরোধী আন্দোলন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু কৃষক-বিদ্রোহই এই আন্দোলনের মূলকথা। অবশ্য এই ধর্মযুদ্ধ বা 'জেহাদ'-এর ফলে মুসলমান চাষী আর শিখ চাষীদের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয় এবং শিখ জায়গীরদার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে শিখ চাষীদের সংগ্রাম বন্ধ হইয়া যায়।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে শিখদের বিরুদ্ধে সৈয়দ আহ্‌মদের নেতৃত্বে ওয়াহাবীদের ঘোরতর

১। বাঙলাদেশে তিতুমীরের নেতৃত্বে ওয়াহাবী বিদ্রোহের পূর্ণ বিবরণ সুপ্রকাশ রায়ের 'ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

যুদ্ধ আরম্ভ হয়। আহ্‌মদ উত্তর-ভারতে তাঁহার শিষ্যদের লইয়া যে বিপুল ওয়াহাবী কর্মিসংঘ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, এবার তিনি তাহাদিগকে এই ধর্মযুদ্ধে যোগদানের জন্য আহ্বান করেন। এই ধর্মযুদ্ধের সংবাদ শুনিবামাত্র সারা ভারতের ওয়াহাবীরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দিকে যাত্রা করে। যুদ্ধের গোড়ার দিকে শিখরা ওয়াহাবীদের নিকট কয়েকবার পরাজিত হয়। ওয়াহাবীদের একটা বিরাট বাহিনী পাঞ্জাবের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পশ্চিম-পাঞ্জাবের রাজধানী পেশোয়ার অবরোধ করে।

কিন্তু ওয়াহাবীদের আক্রমণ-শক্তি অধিক কাল অব্যাহত থাকে নাই। অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে এবং উপযুক্ত সেনাপতির অভাবে ওয়াহাবী বাহিনী পশ্চাৎ অপসরণ করিতে বাধ্য হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে শিখদের সহিত এক খণ্ডযুদ্ধে স্বয়ং সৈয়দ আহ্‌মদ নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর ফলে ওয়াহাবী বাহিনীর মধ্যে সাময়িক হতাশা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

অল্প সময়ের মধ্যেই ওয়াহাবীদের হতাশা ও বিশৃঙ্খলা কাটিয়া যায় এবং তাহাদের মধ্যে উৎসাহ ফিরিয়া আসে। তাহারা আবার পাঞ্জাবের শিখ রাজ্যের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মধ্যবর্তী সিতানা নামক স্থানে ওয়াহাবীরা এক শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিল। এবার এই দুর্গই হইল সারা ভারতের ওয়াহাবী বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র। ইহার পর কেবল পাঞ্জাবই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে ওয়াহাবীরা বিদ্রোহ আরম্ভ করে। এবার সেই বিদ্রোহের আঘাত পড়ে বৃটিশ শাসনের উপর।

এতদিন বৃটিশ শাসকগণ একটা গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া পাঞ্জাবে ওয়াহাবীদের আন্দোলন ও প্রচারে বিশেষ কোন বাধা দেয় নাই। বৃটিশ শক্তি তখনও পর্যন্ত পাঞ্জাব জয় করিতে সক্ষম হয় নাই। "পাঞ্জাব-কেশরী" রঞ্জিত সিংহের শিখরাজ্য পাঞ্জাবের উপর আক্রমণ ও উহা অধিকার করিয়া লইবার সাহস ও শক্তি তখন বৃটিশের ছিল না। বৃটিশ শক্তি একটা উপযুক্ত সুযোগের সন্ধান করিতেছিল। শিখ ও মুসলমানদের এই ভ্রাতৃবিরোধকে ধূর্ত বৃটিশ শাসকগণ তাহাদের পাঞ্জাব জয়ের পক্ষে সুযোগ বলিয়াই গ্রহণ করে। ওয়াহাবীরা যখন শিখরাজ্য আক্রমণ করে তখন বৃটিশ শক্তি নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, এমনকি তাহারা তখন শিখদের বিরুদ্ধে ওয়াহাবীদের আক্রমণ পরোক্ষভাবে সমর্থনই করিয়াছিল। বৃটিশ শাসকগণ মনে করিয়াছিল যে, হিন্দু-মুসলমানের এই আত্মঘাতী যুদ্ধের ফলে ওয়াহাবীরা ও শিখশক্তি উভয়েই দুর্বল হইয়া পড়িবে, তখন পাঞ্জাব জয় করা এবং ওয়াহাবীদের দমন করা উভয়ই সহজ হইবে।

কিন্তু ওয়াহাবী মুসলমানদের নিকট শিখ জায়গীরদার ও জমিদারগোষ্ঠী শত্রু হইলেও তাহাদের অপেক্ষাও বড় শত্রু বৈদেশিক বৃটিশ শাসন। তাই ওয়াহাবীরা সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ করে। এই আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ওয়াহাবীদের প্রতি বৃটিশ শক্তির নিষ্ক্রিয়তার অবসান ঘটে।

এবার ধূর্ত বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী তাহাদের রাজনীতিক খেলা শেষ করিয়া পূর্বের মত পশুশক্তি লইয়া দেখা দেয়।

সমগ্র উত্তর ভারতে ওয়াহাবী বিদ্রোহের আঘাতের ফলে ভারতের বৃটিশ শাসন এক মহাসংকটের মুখে আসিয়া পড়ে। সুতরাং বৃটিশ শক্তি পাল্টা আঘাতের জন্য প্রস্তুত হয়। বৃটিশ সেনাপতি সিড্‌নি কটনের পরিচালনায় এক বিরাট সৈন্যবাহিনী ওয়াহাবী বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র সিতানার দুর্গটিকে ধূলিসাৎ করিতে ছুটিয়া আসে। পনের দিন ধরিয়া বৃটিশ বাহিনীর সহিত ওয়াহাবীদের ঘোরতর যুদ্ধ চলে। কিন্তু সামান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ওয়াহাবীরা সুশিক্ষিত বৃটিশ বাহিনীর উন্নত অস্ত্র-শক্তির নিকট পরাজিত হয়। পরাজয়ের পর ওয়াহাবীরা সিতানার দুর্গ ত্যাগ করে এবং পশ্চাৎ অপসরণ করিয়া মহবান্ পার্বত্য প্রদেশের মলকা নামক একটি উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু এই বিপর্যয় সত্ত্বেও ওয়াহাবীদের সংগ্রাম বন্ধ হইল না, তাহারা এই অঞ্চলে গেরিলা কৌশলে যুদ্ধ চালাইতে থাকে। এই স্থান ব্যতীত ওয়াহাবীরা সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও বঙ্গদেশে আক্রমণ অব্যাহত রাখে।

সিতানার দুর্গের পতনের পর যুদ্ধের অবসান না হইলেও ইহার পর হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পরিবর্তে বিহার প্রদেশের পাটনা শহরই ওয়াহাবীদের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ক্রমশ পাটনার সহিত সমগ্র ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়াহাবীরা পাটনায় এক প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার প্রতিষ্ঠা করে। বিহারের কয়েকটি অঞ্চল বৃটিশ শাসনের কবল হইতে মুক্ত হয় এবং সেই সকল অঞ্চলে বিদ্রোহীদের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল অঞ্চলে বৃটিশ প্রবর্তিত বিভিন্ন প্রকার শোষণ-ব্যবস্থার অবসান ঘটে। বিদ্রোহী সরকারের কর্মচারীরা স্বাধীন সরকারের নামে কর আদায়, জমির নূতন বিলি-ব্যবস্থা প্রভৃতি করিতে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহী সরকারের বিচারালয় প্রভৃতি সরকারী দপ্তরও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্র হইল পাটনা। যে সকল অঞ্চলে বিদ্রোহীরা বৃটিশ শক্তিকে উৎখাত করিতে পারিল না, সেই সকল অঞ্চলে তাহারা গোপনে জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন চালাইতে থাকে।

বঙ্গদেশে তিতুমীরের নেতৃত্বে ২৪ পরগণা, নদীয়া ও যশোহর এই তিনটি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া ওয়াহাবীদের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশের বৃটিশ শাসক ও জমিদারগোষ্ঠী সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া তিতুমীরের স্বাধীন রাজ্য ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি সামরিক অভিযান চালনা করে। কয়েকবার তিতুর বাহিনীর সহিত যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনী পরাজিত হয়। অবশেষে কামান বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বৃটিশ বাহিনী শেষ অভিযান করে। তিতুমীর এক অপূর্ব বাঁশের কেল্লা তৈরি করিয়া বৃটিশ বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে তিতুমীর নিহত হন এবং তাঁহার বাহিনী পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের পর সাময়িকভাবে বঙ্গদেশে ওয়াহাবী বিদ্রোহের অবসান ঘটে।[১]

১। সুপ্রকাশ রায়ের 'ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র এবার বঙ্গদেশ হইতে পুনরায় পাটনায় স্থানান্তরিত হয়। এই সময় পাটনা কেন্দ্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন সৈয়দ আহ্‌ম্মদের দুইজন প্রধান শিষ্য, উলায়েত আলি আর এনায়েত আলি। তাঁহাদের নেতৃত্বে পাটনা আবার সমগ্র ভারতের ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁহারা সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া আন্দোলনে নূতনভাবে শক্তি সঞ্চারের চেষ্টা করেন। আলিভ্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টায় বঙ্গদেশে আবার আন্দোলন গড়িয়া উঠিতে থাকে। তাঁহাদের সংগ্রামের ধ্বনি ছিল নিম্নরূপ: যদি নরক-যন্ত্রণা হইতে ত্রাণ পাইতে চাও, তবে হয় বিদেশী বিজেতার বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম কর, আর না হয় অভিশপ্ত "শত্রুদেশ" হইতে পলাইয়া যাও।

এই দুই নায়কের চেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত বঙ্গদেশে ওয়াহাবীদের কার্যকলাপ আবার জঙ্গীরূপ ধারণ করে। বঙ্গদেশে এই আন্দোলন ক্রমশ বারাসত, সাতক্ষীরা, যশোহর, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, নদীয়া, পাবনা, রাজশাহী, রংপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ময়মনসিং ও শ্রীহট্ট জেলায় বিস্তার লাভ করে। এই আন্দোলনের অঙ্গরূপে এই সকল স্থানের কৃষকগণ জমিদার ও নীলকুঠির সাহেবদের বিরুদ্ধেও প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ করে। এই সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও আবার ওয়াহাবী আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠে। পাঞ্জাবের উপরেও ওয়াহাবীদের আক্রমণ নূতনভাবে আরম্ভ হয়। ইতিপূর্বে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবে শিখ শক্তির পতন ঘটিয়াছিল এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বৃটিশ শক্তি সমগ্র পাঞ্জাব অধিকার করিয়া লইয়াছিল। ওয়াহাবীরা পাঞ্জাবের বৃটিশ শাসনের উপর প্রবলভাবে আক্রমণ আরম্ভ করে।

এইভাবে সৈয়দ আহ্‌ম্মদের দুই শিষ্য, উলায়েত ও এনায়েত আলির নেতৃত্বে ওয়াহাবী আন্দোলন ও ওয়াহাবী বিদ্রোহ নূতন শক্তি সঞ্চয় করিয়া সমগ্র ভারতে আত্মপ্রকাশ করে। সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে বাংলার পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত দুই হাজার মাইলের মধ্যে বিদ্রোহীদের বহু ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল কর্মকেন্দ্রে প্রচারকদের প্রচার শিক্ষা এবং সৈনিক ও সেনাপতিদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে প্রচার ও আন্দোলনের ফলে সমগ্র উত্তর-ভারত একটা বিরাট আগ্নেয়গিরির মত ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের বিদ্রোহীরাও বৃটিশ শত্রুর উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দেয়। বৃটিশ শাসকগণও তাহাদের সকল শক্তি লইয়া বিদ্রোহীদের ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ১৮৫০ হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কেবলমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধেই ষোলটি অভিযান এবং ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আরও কুড়িটি অভিযান চালনা করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এই সকল আক্রমণের সময় সমগ্র ভারতের ওয়াহাবীরা ধনবল ও জনবল দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করে।

মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালের ওয়াহাবী বিদ্রোহ

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন পথের সন্ধান দিয়া ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের অবসান হইয়াছিল। কিন্তু ওয়াহাবী-বিদ্রোহ সেই মহাবিদ্রোহের পরেও অব্যাহত গতিতে চলিয়াছিল। ওয়াহাবীরা ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহেও তাহাদের সমগ্র শক্তি লইয়া যোগদান করিয়াছিল। অবশ্য মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার পর কিছুদিনের জন্য ওয়াহাবী আন্দোলনেও স্তব্ধতা দেখা দেয়। কিন্তু ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দেই ওয়াহাবীরা আবার বৃটিশ শাসনের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। মহাবিদ্রোহকে পরাজিত করিয়া বৃটিশ শাসকগণ যে বিপুল শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল। তাহা লইয়াই এবার তাহারা ওয়াহাবী বিদ্রোহকেও প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ করিবার জন্য এক বিরাট আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া তোলে।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে বৃটিশ শক্তি সর্বত্র ওয়াহাবীদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। বৃটিশ সেনাপতি স্যার নেভিল চেম্বারলেন প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ করে। আম্বালা গিরিসংকটে ওয়াহাবী বাহিনীর সহিত বৃটিশ বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। দুইদিন ধরিয়া এই যুদ্ধ চলে। বৃটিশ বাহিনী কামান-বন্দুকের জোরে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিলেও তাহাদের ক্ষতি হয় অপূরণীয়। দুইদিনের যুদ্ধের পর তাহাদের অল্প সৈন্যই বাঁচিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মকলহের ফলে ওয়াহাবীরা তাহাদের আক্রমণ-শক্তি, এমনকি সংগ্রাম-শক্তিও হারাইয়া ফেলে। এই সুযোগে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী কূটনীতির সাহায্যে ওয়াহাবীদের শক্তি ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। এবার তাহাদের মধ্যে দেখা দেয় দারুণ বিশৃঙ্খলা। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই শাসকগোষ্ঠী আর একটা সামরিক অভিযান চালাইয়া উত্তর-পশ্চিমের ওয়াহাবীদের শক্তি চূর্ণ করিয়া ফেলে।

এই অঞ্চলের ওয়াহাবীরা আবার তাহাদের ছত্রভঙ্গ শক্তি সংহত করিয়া তুলিতে থাকে এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আবার তাহারা বৃটিশ শাসকদের উপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে। এই সংবাদ পাইবামাত্র শাসকগণ কূটনীতির মারফত ওয়াহাবীদের সমর্থক উপজাতীয় মুসলমানদের ওয়াহাবী আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সরকারের জঙ্গিলাট স্বয়ং এক বিরাট বাহিনী লইয়া ওয়াহাবীদের পার্বত্য ঘাঁটি আক্রমণ করেন। স্থানীয় উপজাতীয় অধিবাসীরা ওয়াহাবীদের সাহায্য বন্ধ করিয়া দেয়। তাহার ফলে শেষ পর্যন্ত বৃটিশ বাহিনীই জয়লাভ করে। প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও বৃটিশ বাহিনীর উন্নত সমর-কৌশল ও অস্ত্রশস্ত্রের নিকট ওয়াহাবী সেনা পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ওয়াহাবীদের পক্ষে এই পরাজয়ের ফল হয় মারাত্মক। এই সামরিক বিপর্যয় ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে এই অঞ্চলের ওয়াহাবী বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। ইহার পর তাহাদের যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।

এই সামরিক বিপর্যয়ের ফলে সমগ্র ভারতের ওয়াহাবীদের মধ্যে দারুণ হতাশা দেখা দেয়। সমগ্র ভারতের ওয়াহাবীরা উত্তর সীমান্তের এই যুদ্ধ জয়যুক্ত করিয়া

তুলিবার জন্য সমস্ত শক্তি দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতে দেখিয়া তাহাদের মনে আর জয়ের কোন আশাই রহিল না। অন্যদিকে, বিজয়ী শাসকগণ বিদ্রোহীদের হতাশায় ভাঙিয়া পড়িতে দেখিয়া তাহাদের ধ্বংসাবশিষ্ট শক্তি শেষ আঘাতে চূর্ণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। ভারতের সর্বত্র একই সময় আক্রমণ আরম্ভ হয়। হতাশাচ্ছন্ন বিদ্রোহীরা সেই আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। চারিদিকে বিদ্রোহী নায়কগণ শাসকদের হাতে বন্দী হন। শাসকগণ বিদ্রোহের প্রধান নায়কদের গ্রেপ্তার করিবার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করিয়া হত্যা করে।

ঠিক এই সময় ওয়াহাবী আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ গোপন তথ্য শাসকদের হস্তগত হয়। এই সকল গোপন তথ্য শত্রুর হস্তগত হইবার ফলে বিদ্রোহীদের সকল আশা নির্মূল হইয়া যায়। বৃটিশ সরকার বিদ্রোহীদের সকল কেন্দ্রের শক্তি-সামর্থ্যের হিসাব, মূল সংগঠক ও নেতৃবৃন্দের নামধাম, তাহাদের প্রচার-কৌশল, প্রচারের পুস্তক-পুস্তিকা, কোষাগার প্রভৃতির সন্ধান জানিয়া ফেলে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে চলে চারিদিকে খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার। এইভাবে ভারতের বিদ্রোহী মুসলমান কৃষক প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল ধরিয়া বৈদেশিক বৃটিশ শক্তির সহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া অবশেষে ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মেই বৈদেশিক শত্রুর উন্নততর শক্তির নিকট পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়।

এবার ধৃত বিদ্রোহী নায়কদের লইয়া আরম্ভ হয় বিচারের প্রহসন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই, ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের আম্বালা শহরে একদল বিদ্রোহী নায়কের বিচার আরম্ভ হইয়াছিল। এই মামলায় এগারজন বিদ্রোহী নায়কের প্রত্যেকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহার পর ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মামলা আরম্ভ হয় পাটনা শহরে। ১৮৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে পৃথক পৃথক ভাবে মামলা আরম্ভ হয় রাজমহল, মালদহ, রাজসাহী প্রভৃতি স্থানে। এই সকল মামলার বিচারেও প্রায় সকল বন্দীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কলিকাতার কলুটোলার বিখ্যাত ব্যবসায়ী আমীরখাঁর মামলাটি। এই মামলা সমগ্র ভারতবর্ষে চাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিয়াছিল। আমীর খাঁ কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিলেন। হাইকোর্টে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন বোম্বাই হাইকোর্টের বিখ্যাত এ্যাডভোকেট এনেস্টি সাহেব। স্বদেশী ও বিদেশী বহু ভুয়া ঐতিহাসিকের মনগড়া ইতিহাস মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, ওয়াহাবী বিদ্রোহ মূলত কোন সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয়, এই বিদ্রোহ ছিল ভারতের বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য কোটি কোটি ভারতবাসীর বিদ্রোহ। কলিকাতা হাইকোর্টে এনেস্টি সাহেবের বক্তৃতার মধ্য দিয়া যে সকল তথ্য প্রকাশিত হয়, সেই সকল তথ্য যে স্বদেশী যুগের শত শত কর্মীকে জ্বলন্ত প্রেরণা যোগাইয়াছিল, ভারতের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহা সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।[১]

১। যোগেশচন্দ্র বাগল: মুক্তিসন্ধানে ভারত, পৃঃ ৯৯।

কলিকাতার মামলার বিচারে আমীর খাঁ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই দণ্ডাদেশের ঠিক পরেই, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই মামলার বিচারপতি নর্ম্যান সাহেব ওয়াহাবীদের গুলিতে নিহত হন। ইহার কিছুদিন পর ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড মেয়ো আন্দামান ভ্রমণে গেলে ঐ স্থানে দ্বীপান্তরিত ওয়াহাবীদের একজনের ছুরিকাঘাতে তিনি নিহত হন। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী এই বিদ্রোহ চূড়ান্তরূপে পরাজিত করিতে সক্ষম হইলেও বিদ্রোহীরা ছড়াইয়াছিল জেলের মধ্যে, বাহিরে, এখানে-ওখানে, সর্বত্র। বিদ্রোহ পরাজিত করা সম্ভব হইলেও বিদ্রোহী মনকে পরাজিত করা, তাহাকে চূর্ণ করা যে-কোন শাসক শক্তির সাধ্যাতীত।

* * *

ওয়াহাবী বিদ্রোহ একটা সাম্প্রদায়িক অথবা প্রকৃত স্বাধীনতা-সংগ্রাম কিনা সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ ও বিতর্কের অন্ত নাই। কিন্তু ইহা সত্য যে, বিদ্রোহের প্রধান নায়কদের ধর্মের ধ্বনি এই বিদ্রোহের ব্যর্থতার বিভিন্ন কারণের অন্যতম। বহু ক্ষেত্রে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক ধর্মের ধ্বনির ফলেই এই বিদ্রোহ যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করিতে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনগণকে এই সংগ্রামের মধ্যে টানিয়া আনিতে পারে নাই। কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, ধনতন্ত্র ও শিল্প-বিকাশের পূর্বযুগে প্রায় সকল দেশেই এই প্রকারের ধর্মীয় ধ্বনির সাহায্যেই বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ যুদ্ধ বা বিদ্রোহের জন্য ব্যাপক জনসমাবেশের প্রয়াস পাইত। শ্রেণী ও শ্রেণীচেতনার বিকাশের অভাবই ইহার কারণ। ভারতের তৎকালীন সামাজিক অবস্থায় বিদ্রোহের নায়কগণের দৃষ্টির এই সংকীর্ণতা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়, বরং তৎকালীন অবস্থায় জনসমাবেশের জন্য ধর্মীয় ধ্বনির ব্যবহারই ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অনিবার্য ঘটনা।

২. নীল-বিদ্রোহ (১৮৬০-৬১)

১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দের নীল-বিদ্রোহ প্রধানত য়ুরোপীয় নীলকরগণের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সমগ্র বঙ্গদেশের কৃষক সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই য়ুরোপীয়গণ বঙ্গদেশে নীলের চাষ আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা বঙ্গদেশের চাষীদের দিয়া তাহাদের জমিতে বলপূর্বক নীলগাছের চাষ করাইয়া এবং নিজেদের কুঠির কারখানায় নীল উৎপাদন করিয়া তাহা য়ুরোপে রপ্তানি করিত এবং তাহা হইতে প্রচুর মুনাফা লাভ করিত।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ-অধিকৃত ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ক্রীতদাস প্রথা রহিত হইবার ফলে ঐ স্থানের রবার বাগিচাগুলি বন্ধ হইয়া গেলে বাগিচার যে সকল বৃটিশ কর্মচারী নিগ্রো ক্রীতদাসদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালাইতে সিদ্ধহস্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকেই বঙ্গদেশে লইয়া আসা হয় এবং নীলচাষের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে বঙ্গদেশের জমিজমা ক্রয় ও কৃষকদের দিয়া নীলের চাষ করাইবার অধিকার দান করা হয়। এই শয়তানতুল্য নীলকর সাহেবগণ বঙ্গদেশের কৃষকদের উপর যে বর্বরতার অনুষ্ঠান করিয়া

গিয়াছে, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণ' নাটকে তাহার আংশিক সাক্ষ্য বহন করে। বঙ্গদেশের কৃষক জনসাধারণকে প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল অজস্রধারায় বুকের রক্ত ঢালিয়া য়ুরোপীয় নীলকরদের মুনাফার ক্ষুধা মিটাইতে হইয়াছিল। নীলের চাষ কৃষকদের পক্ষে সর্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এমন কি বঙ্গদেশের অর্থনীতি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। বঙ্গদেশের অধিকাংশ জমিতে নীলের চাষ হইবার ফলে বাঙালীদের প্রধান খাদ্য চাউলের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়।

বঙ্গদেশের কৃষক এই সর্বনাশ হইতে নিজেদের অস্তিত্ব ও বঙ্গদেশকে রক্ষা করিবার জন্য ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র বঙ্গদেশময় বিদ্রোহ আরম্ভ করে। প্রথমে যশোহর-খুলনা হইতে এই বিদ্রোহ আরম্ভ হয় এবং তাহা অবিলম্বে সমগ্র বঙ্গদেশে বিস্তার লাভ করে। প্রায় দেড়লক্ষ চাষী এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল এবং বিদ্রোহ ১৮৬০ হইতে '৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল।

এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য শাসকগোষ্ঠী এক বিশাল পুলিস ও সামরিক বাহিনী নিযুক্ত করে। "বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে বিশাল সৈন্যবাহিনী ও দুইখানি ছোট যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরিত হইয়াছিল।"[১] বিভিন্ন স্থানে নীলকরদের সহিত কৃষকদের বহু সংঘর্ষ ঘটে এবং নীলের চাষ বন্ধ হইয়া যায়। অবশেষে বৃটিশ শাসকগণ ভীত হইয়া নীলকরদের শোষণ-উৎপীড়ন বন্ধ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ইহার জন্য এক 'অনুসন্ধান-কমিটি' নিযুক্ত হয়। এই সময় য়ুরোপে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নীল উৎপাদন আরম্ভ হইলে বঙ্গদেশ হইতে নীলের চাষ উঠিয়া যায়। সেদিন এই নীল-বিদ্রোহের ফলেই কেবল কৃষক জনসাধারণই নয়, সমগ্র বঙ্গদেশে চরম বিপর্যয় হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।[২]

৩. আসামের কৃষক-বিদ্রোহ (১৭৬১-৯৪)

বিদ্রোহের সংগঠনরূপে 'রাইজ-মেল'

"রাইজ্-মেল" গ্রামের সাধারণ মানুষের সংগঠন। প্রথমে এই সংগঠনগুলি ধর্মীয় নায়ক, সম্মানিত ভূস্বামী অথবা গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হইত। এইগুলি ছিল আসামের বিশেষ জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। প্রথমে এই সকল সংগঠন সামাজিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যেই গঠিত হইত এবং কখনও কখনও এই সকল প্রতিষ্ঠানের মারফত জনসাধারণের আর্থনীতিক ও রাজনীতিক বিক্ষোভ প্রকাশ করা হইত। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কয়েক দশক ব্যাপিয়া যে স্বাধীনতা-আন্দোলন চলিয়াছিল, সেই আন্দোলনের প্রভাবেই এই সকল গণ-সংগঠনের নেতৃত্বের এবং সাধারণ মানুষের বুদ্ধি ও চেতনায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। সময় সময় যে সকল সমস্যা দেখা দিত তাহাও ছিল ভিন্ন চরিত্রের। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে এই

১। L. S. S. O' Malley. Bengal, Bihar and Orissa under British Rule, p. 485.

২। নীল-বিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সুপ্রকাশ রায়ের 'ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', ১ম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

প্রকারের বহু 'রাইজ্-মেল' অথবা 'মেল' আসাম উপত্যকায় জেলাসমূহে, বিশেষত কামরূপ, দরং ও নওগঙ্গ জেলায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমাদের বৈদেশিক ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী দ্বারা বিভিন্ন কর ও বর্ধিত ভূমি-রাজস্ব আদায়ের বিরুদ্ধে বাধাদানের উদ্দেশ্যেই সে সময় এই সকল সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছিল।"[১]

'রাইজ্-মেল' নামক গণ-সংগঠনগুলি প্রথমে সামাজিক সংগঠন রূপেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী এই সকল সংগঠনকে তাহাদের শাসন-কার্যের সহায়ক রূপেই গণ্য করিত। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসক ও জমিদারগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়ন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন কৃষক সংগ্রামের ঝড় উঠিতে থাকে তখন কৃষকগণ 'রাইজ্-মেল' সংগঠন-গুলিকেই তাহাদের সংগ্রামের সংগঠনে পরিণত করে। তাহার পর হইতেই শাসকগোষ্ঠী এই সংগঠনগুলিকে শত্রুরূপে গণ্য করিয়া ইহাদের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়। এই 'রাইজ-মেল' সংগঠনের নেতৃত্বেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমাদের বিভিন্ন জেলায় বহু কৃষক-বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। তাহার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

ফুলাগুঁড়ি বিদ্রোহ (১৮৬১)

আসামের নওগঙ্গ জেলায় ফুলাগুঁড়ি অঞ্চল প্রধানত উপজাতীয় আদিবাসীদের বাসভূমি। আদিবাসীদের প্রায় সকলেই ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। তাহারা ধান, পান ও পপির চাষ করিয়া কোন প্রকারে কায়ক্লেশে জীবিকা নির্বাহ করিত। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে আসামের বৃটিশ শাসকগণ এই অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর প্রথম আয়কর ধার্য করে। তাহারা চাষীদের সুপারী এবং পানের উপরেও কর ধার্য করে। পপি হইতে আফিম জাতীয় একটি দ্রব্য তৈরি করা চলিত বলিয়া চাষীদের পপির চাষও নিষিদ্ধ করা হয়। পপির চাষ নিষিদ্ধ করিবার যুক্তি থাকিলেও ইহার ফলে চাষীদের আর্থিক আয় যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায় এবং চাষীদের দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে। এই আকস্মিক উৎপীড়নে চাষীরা দিশেহারা হইয়া পড়ে।

তাহারা প্রথমে তাহাদের 'মেল'-এর অধিবেশন আহ্বান করে এবং হাজার হাজার কৃষক স্বাক্ষর ও টিপসহি দিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন-পত্র পেশ করে। কিন্তু নওগঙ্গ জেলার কমিশনার চাষীদের এই আবেদন-নিবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে কৃষকগণ বিদ্রোহের পথে এই শোষণ-উৎপীড়ন বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিদ্রোহের সময় ধার্য হয় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে। কিন্তু তাহার পূর্বে আর একবার আপস-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিবার সিদ্ধান্ত হয়।

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কৃষকদের এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন হয়। বহু সহস্র কৃষক এই সমাবেশে যোগদান করে। পুলিস প্রথম হইতেই সমবেত

১। K. N. Dutt: The Post mutiny Raij-mels of Assam—An Aspect of the Freedom Movement (Indian History Congress, 1955, Proceedings. p. 216.)

কৃষকদের ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। কিন্তু তাহারা দৃঢ়তার সহিত পুলিসের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়। এই সমাবেশে উপস্থিত হইয়া তাহাদের দাবি শুনিবার জন্য কৃষকগণ নওগঙ জেলার ডেপুটি কমিশনারকে আহ্বান করে। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার তাচ্ছিল্যভরে কৃষকদের সেই দাবি অগ্রাহ্য করেন এবং স্বয়ং সেই সমাবেশে উপস্থিত না হইয়া অল্পবয়স্ক সহকারী কমিশনারকে সেই সমাবেশে প্রেরণ করেন।

১৮ই অক্টোবর সহকারী কমিশনার একদল সশস্ত্র পুলিস লইয়া সমাবেশে উপস্থিত হন। কৃষকদের দাবি ছিল, ডেপুটি কমিশনার স্বয়ং আসিয়া তাহাদিগকে আয়কর প্রভৃতি রদ করিবার প্রতিশ্রুতি দিবেন। কিন্তু তাঁহার পরিবর্তে সহকারী কমিশনারকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া কৃষকগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। জনতাকে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতে দেখিয়াই সহকারী কমিশনার তাহাদিগকে অবিলম্বে ছত্রভঙ্গ হইবার নির্দেশ দেন। কৃষকগণ চিৎকার করিয়া জানাইয়া দেয়, তাহারা আয়কর ও পপির চাষের নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইবার নির্দেশ না শুনিয়া স্থানত্যাগ করিবে না। সহকারী কমিশনার ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠেন এবং কৃষকদের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য পুলিসদলকে নির্দেশ দেন। পুলিসদল তাঁহার আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইলে প্রচণ্ড সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়া যায়। কৃষকদের আক্রমণে কয়েকজন পুলিস ধরাশায়ী হইলে সহকারী কমিশনার তাঁহার রিভলভার উদ্যত করিয়া কৃষকদের দিকে ধাবিত হন। কিন্তু তিনিও কৃষকদের লাঠির আঘাতে ধরাশায়ী হন। কৃষকগণ তাঁহাকে লাঠি দ্বারা প্রহার করিয়া হত্যা করে। এই ঘটনা দেখিবামাত্র সকল পুলিস প্রাণের ভয়ে ছুটিয়া পলাইতে থাকে।

এই ঘটনা শুনিবামাত্র আসামের চীফ কমিশনারের নির্দেশে ডেপুটি কমিশনার 'আসাম পদাতিক বাহিনী'-এর কয়েক শত সৈন্য লইয়া ফুলাগুঁড়ি উপস্থিত হন। তাঁহার নির্দেশে সৈন্যগণ বহু কৃষককে গুলি করিয়া হত্যা করে এবং বিদ্রোহী কৃষকদের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করিয়া এক ভয়ঙ্কর বিভীষিকা সৃষ্টি করে। ফুলাগুঁড়ি 'মেল'-এর প্রায় সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি গ্রেপ্তার হন।

প্রথমে দরং জেলার ডেপুটি কমিশনার অভিযুক্তদের বিচার করেন। পরে আসামের বিচার বিভাগের কমিশনার স্বয়ং বিচারের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার বিচারে 'মেল'-এর নায়কগণের মধ্যে নরসিং লালুং, সম্বর লালুং, লখন কোচ ও সুরেন কোচ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন; শিবসিং ও বাবু ডোম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লাভ করেন; মণি কাছাড়ী ও মররা সিং লাভ করেন ১৪ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড; আর লাহু চুতিয়া তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এইভাবে আসামের বিখ্যাত ফুলাগুঁড়ি-বিদ্রোহের অবসান ঘটে।[১]

সরকারী বিবরণীতে এই বিদ্রোহকে "দাঙ্গা-হাঙ্গামা" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ এখনও এই বিদ্রোহকে "ফুলাগুঁড়ি ধাওয়া" অর্থাৎ

১। K. N. Dutt: Ibid, p. 218.

ফুগাওঁড়ির যুদ্ধ বলিয়া স্মরণ করে এবং তাহা হইতে সংগ্রামের প্রেরণা লাভ করে।[১]

জয়ন্তিয়া বিদ্রোহ (১৮৬০ ও ১৮৬২)

আসামের জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চলে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসরই এই পার্বত্য অঞ্চলের রাজাকে অবসর-ভাতা দিয়া 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' এই অঞ্চলটিকে নিজ শাসনাধীনে আনয়ন করে। এই অঞ্চলটি সিণ্টেঙ্গ উপজাতির বাসভূমি। ইহারা খাসী উপজাতীয় আদিবাসীদের সমগোষ্ঠীভুক্ত। সিণ্টেঙ্গরা অত্যন্ত স্বাধীনতা প্রিয়। ইহাদের জীবনে কোনদিন ইহারা বাহিরের হস্তক্ষেপ সহ্য করে নাই। ইহা শাসকগোষ্ঠীর বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে, ইহারা নির্বিবাদে বিজাতীয় বৃটিশ শাসন মানিয়া লইবে না। ইহা বুঝিয়াই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ প্রথমেই জয়ন্তিয়া অঞ্চলের কেন্দ্র জোয়াই নামক স্থানে একটি থানা বা পুলিসঘাঁটি স্থাপন করে। এই পুলিসঘাঁটি স্থাপন করিবার পরই বৃটিশ বণিক শাসকগোষ্ঠী নিজমূর্তি ধারণ করে। নূতন শাসকগণ উপজাতীয় কৃষকদের উপর একে একে শোষণমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে থাকে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে উপজাতীয় কৃষকগণও বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া সেই সকল শোষণ-ব্যবস্থায় বাধা দেয়।[২]

সমসাময়িক কালের সরকারী বিবরণে সিণ্টেঙ্গদের বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রাম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

"সিণ্টেঙ্গদের কখনও সম্পূর্ণ জয় করা সম্ভব হয় নাই। ভারত সাম্রাজ্যের বিপুল ধনসম্পদ সম্পর্কে তাহাদের কোন ধারণা ছিল না। যতদিন তাহাদের নিজেদের জীবনধারার উপর হস্তক্ষেপ করা হয় নাই, ততদিন তাহারা কোন উৎপাত সৃষ্টি করিবার কারণ খুঁজিয়া পায় নাই। কিন্তু তাহাদের উপর কর ধার্য প্রভৃতি অসন্তোষ-জনক ব্যবস্থা প্রয়োগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা তাহার বিরুদ্ধে বাধা দান করিয়াছে।"[৩]

সিণ্টেঙ্গদের অসন্তোষ উদ্দীপক এই প্রকার কর ধার্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য আসামের বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিল এবং শাসকগোষ্ঠীর এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধেই সিণ্টেঙ্গ উপজাতীয় কৃষকগণ বারংবার বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল।[৪]

১

বৃটিশ বণিক শাসকগণ প্রথম উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। এই বৎসর শাসকগণ সিণ্টেঙ্গদের প্রতি গৃহের উপর কর ধার্য করে। সিণ্টেঙ্গ উপজাতীয় কৃষকগণ প্রথমে এই গৃহকর রদ করাইবার জন্য শাসকদের নিকট বহু আবেদন-পত্র পেশ করে। ইহাতে কোন ফল না হওয়ায় তাহারা বিদ্রোহের

১। K. N. Dutt: Ibid p. 217. ২। K. N. Dutt: Ibid. p. 218. ৩। Selections of Records of the Govt. of Bengal, Vol. XXIX, Proceeding relating to the Jayantia Risings. ৪। K. N. Dutt: Ibid, p. 219.

উদ্দেশ্যে 'মেল'-এ সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং গ্রামে গ্রামে সভা করিতে থাকে। অবশেষে তাহারা লাঠি, তীরধনুক, বল্লম প্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়া পাহাড় অঞ্চলের বিভিন্ন পুলিসঘাঁটি আক্রমণ করে। তাহাদের আক্রমণে বহু পুলিস নিহত ও আহত হয়। এই সময় পাহাড় অঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রকাণ্ড সৈন্যবাহিনীকে বিদ্রোহ দমনের কার্যে নিযুক্ত করা হয়। তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিয়া বহু সিন্টেঙ্গ প্রাণ বিসর্জন দেয়। অবশেষে সংগ্রামের অবসান হইলেও সিন্টেঙ্গদের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাব অব্যাহত থাকে। তাহারা আবার বিদ্রোহের সুযোগ খুঁজিতে থাকে।

২

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ দমন করিয়া শাসকগোষ্ঠীর সাহস ও লোভ বাড়িয়া যায়। তাহারা গৃহকরের সঙ্গে সিন্টেঙ্গদের উপর আয়কর ধার্য করে। প্রথমে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৩১০ জনের উপর এই আয়কর ধার্য হয় এবং আরও বহু ব্যক্তির উপর আয়কর ধার্যের পরিকল্পনা স্থির হয়।

সিন্টেঙ্গদের 'মেল'গুলি আবার সক্রিয় হইয়া উঠে। গ্রামে গ্রামে উপজাতীয় কৃষকদের সভায় এই কর আদায়ে বাধা দানের জন্য পরামর্শ চলিতে থাকে। এবারেও আবেদন-নিবেদনের পালা শেষ করিয়া তাহারা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়। অবশেষে তাহারা বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নে বাধাদানে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া সংগ্রাম আরম্ভ করে। জয়ন্তিয়া পাহাড়ে সিন্টেঙ্গ উপজাতির দ্বিতীয় বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া যায়।

বিদ্রোহী সিন্টেঙ্গরা প্রথমেই জয়ন্তিয়ার কেন্দ্রস্থল জোয়াই-এর উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। সৈন্যগণ জোয়াই-এর রক্ষণ-ব্যবস্থাকে দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিবার জন্য জোয়াই-এর চতুর্দিকে বড় বড় গাছের একটি প্রাচীর তৈরি করিয়াছিল। বিদ্রোহীরা প্রথমেই এই প্রাচীরটির উপর আক্রমণ করিয়া ইহাকে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। তাহার পর প্রাচীরের অন্তরালে অবস্থিত থানা বা প্রধান পুলিসঘাঁটির উপর আক্রমণ আরম্ভ হয়। বিদ্রোহীরা শয়তানের ঘাঁটিস্বরূপ এই পুলিসঘাঁটিটাকে আগুন দিয়া ভস্মীভূত করে।[১] তাহারা চারিদিকে আক্রমণ চালাইয়া বৃটিশ শাসন নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলে এবং জয়ন্তিয়া পাহাড় অঞ্চলটি পুনরায় অধিকার করে।

এই বিদ্রোহের সংবাদ পাইবা মাত্র বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য এই অঞ্চলে একটি প্রকাণ্ড সৈন্যবাহিনী আসিয়া উপস্থিত হয়। সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে জোয়াই কেন্দ্রটি পুনরুদ্ধার করে। ইহারপর আরম্ভ হয় সরকারী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের নিয়মিত গেরিলা যুদ্ধ। "এই গেরিলা যুদ্ধ চলে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস পর্যন্ত। ইহার পর বিদ্রোহীরা প্রায় সকলেই আত্মসমর্পণ করে।"[২]

আসাম উপত্যকার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৬৯)

আসাম উপত্যকার বিভিন্ন জেলায় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকর বৃদ্ধি করিয়া প্রায় দ্বিগুণ করা হইলে বিভিন্ন জেলার কৃষকদের মধ্যে বিক্ষোভের ঝড় উঠে। গ্রামে

১। K. N. Dutt: Ibid, p. 219.

২। Assam District Gazetteer, Vol. X, p. 51-53.

গ্রামে 'মেল'-এর অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করে আসাম উপত্যকার কামরূপ ও দরং জেলার কৃষকগণ। এই দুই জেলার প্রায় সকল গ্রামের 'মেল'গুলির অধিবেশনে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের ঝড় বহিতে থাকে।

কামরূপ জেলার বাজালি তহশিলের গোবিন্দপুর নামক স্থানে 'মেল'-এর সমাবেশে কয়েক হাজার কৃষক উপস্থিত হয়। স্থানীয় পুলিস এই সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। দরং জেলার পাথারুঘাট নামক স্থানের 'মেল'-এর সমাবেশে কয়েক হাজার কৃষক উপস্থিত হয়। তাহাদের সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য ডেপুটি কমিশনার, মহকুমা শাসক আর জেলার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একদল সশস্ত্র পুলিস লইয়া উপস্থিত হইলে সমবেত কৃষকগণ পুলিসদলকে আক্রমণ করিয়া বিতাড়িত করে এবং ডেপুটি কমিশনার, মহকুমা শাসক এবং পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে "বন্দী" করিয়া নিকটবর্তী ডাক-বাংলোতে আটক করিয়া রাখে।[১] ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এই পাথারুঘাটই কৃষক-বিদ্রোহের প্রধান রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।

আসাম উপত্যকার কৃষক-বিদ্রোহ (১৮৯৪-৯৫)

আসামের শাসকগণ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আসাম উপত্যকার সকল জেলায় ভূমিকর শতকরা ৭০ ভাগ হইতে ১০০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত করে। এই সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র চারিদিকে বিক্ষোভের ঝড় বহিতে থাকে। গ্রামে গ্রামে 'মেল'-এর সমাবেশ আহ্বান করা হয়। প্রথমে আসামের চীফ কমিশনার ও ভারত সরকারের নিকট করবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত রদ করিবার দাবি জানানো হয়। তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় কৃষকগণ নূতন আন্দোলন আরম্ভ করে।

এই আন্দোলন ব্যাপক আকারে আরম্ভ হয় দরং ও কামরূপ জেলায়। এই দুই জেলার সকল 'মেল' হইতে একটি মাত্র সিদ্ধান্তই ঘোষিত হয়: "কেহ সরকারকে ভূমিকর দিও না। যে ব্যক্তি 'মেল'-এর সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া সরকারকে বর্ধিত ভূমিকর দিবে, তাহাকে সমাজচ্যুত ও একঘরে করিয়া রাখা হইবে।[২]

আসামের সমগ্র কৃষক জনসাধারণের দাবি ও প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া চীফ কমিশনার বর্ধিত হারে ভূমিকর আদায়ের নির্দেশ দিলে সমগ্র আসাম উপত্যকায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। গ্রামে গ্রামে 'মেল'-এর অধিবেশন চলিতে থাকে এবং সেই সকল অধিবেশন হইতে সংগ্রামের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। অবশেষে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া যায়। এই বিদ্রোহ প্রবল আকারে দেখা দেয় কামরূপ জেলার রঙ্গিয়া, লছিমা ও পাথারুঘাট নামক স্থানে।

রঙ্গিয়ার বিদ্রোহ (১৮৯৪-৯৫)

কামরূপ জেলার রঙ্গিয়া প্রধানত কাছারী আদিবাসীদের বাসভূমি। এবার প্রথম রঙ্গিয়ার কাছারীরাই বিদ্রোহ আরম্ভ করে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর বিদ্রোহী কাছারীরা রঙ্গিয়ার প্রকাণ্ড বাজারটি আক্রমণ করে এবং কুখ্যাত মহাজনদের দোকান

১। K. N. Dutt: Ibid, p. 219. ২। K. N. Dutt: Ibid, p. 220.

ও ব্যবসা-কেন্দ্রগুলি লুণ্ঠন করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে। ৩০শে ডিসেম্বর প্রায় তিন হাজার বিদ্রোহী বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সারারাত্রি বিদ্রোহাত্মক ধ্বনি দিতে দিতে বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে। তাহার পর পুলিসঘাঁটি, পোস্ট অফিস এবং কর আদায়কারী তহসিলদারদের কাছারি বাড়ী আক্রমণ ও ধ্বংস করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। জেলার পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সশস্ত্র পুলিস ও সৈন্যদের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়া রঙ্গিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু বিদ্রোহী জনসাধারণের বিপুল সমাবেশ ও মরিয়া মনোভাব দেখিয়া তিনি তাহাদের বাধা দিতে সাহসী হন নাই। ইহার পর গৌহাটি হইতে বহু সশস্ত্র পুলিস ও সৈন্য লইয়া ডেপুটি কমিশনার স্বয়ং রঙ্গিয়ায় উপস্থিত হন। কিন্তু তিনিও অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া এবং পুলিস ও সৈন্যসংখ্যা যথেষ্ট নয় মনে করিয়া বিদ্রোহীদের বাধা দিতে সাহসী হন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের পুলিস ও সৈন্যবাহিনী লইয়া দূরে অবস্থান করিতে থাকেন।

এই অবস্থায় ডেপুটি পুলিস কমিশনার, পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং স্থানীয় জোতদার ও মহাজনগণ পরামর্শ করিয়া বিদ্রোহী কৃষকদিগকে সংযত রাখিবার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখাইয়া 'জরুরী কনেস্টবল' হইতে বাধ্য করা হয়। তাহাদের দিয়া কেবল শান্তিরক্ষাই নয়, কৃষকদের নিকট হইতে ভূমিকর আদায়েরও চেষ্টা চলে। কিন্তু বিদ্রোহীদের বাধাদানের ফলে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ইতিমধ্যে এই বিদ্রোহ রঙ্গিয়ার পার্শ্ববর্তী পতিদরং, নলবাড়ী, বরোমা ও বাজালি তহসিলে এবং উপর বড়ভাগ ও সারুক্ষেত্রী মৌজায় বিস্তার লাভ করে। এই সকল স্থানেও 'মেল'-এর সমাবেশে কর আদায়ে বাধাদানের জন্য রঙ্গিয়ার অনুরূপ সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। এই সকল স্থানের 'মেল' হইতেও ঘোষণা করা হয়: "কেহ বর্ধিত ভূমিকর দিও না। কোন ব্যক্তি বর্ধিত ভূমিকর দিলে সে সমাজচ্যুত ও একঘরে হইবে।" রঙ্গিয়ার মত এই সকল স্থানেও করের দায়ে সম্পত্তি ক্রোকে সাফল্যের সহিত বাধা দান করা হয় এবং কেহ গোপনে বর্ধিত কর দিলে তাহাকে সমাজচ্যুত বা তাহার নিকট হইতে ভূমিকরের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা বাবদ আদায় করা হয়। বিজয় চৌধুরী নামক একব্যক্তি ২৫ টাকা ভূমিকর দিলে ২৫ টাকা জরিমানা দিয়া সে অব্যাহতি লাভ করে।

পুলিস দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগে ১৫ জন কৃষককে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদিগকে থানায় আটক করিয়া রাখিয়াছিল। এই সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, ১০ই জানুয়ারী রঙ্গিয়া এবং পার্শ্ববর্তী নলবাড়ী, হাজো প্রভৃতি সহ সকল তহসিল ও মৌজা হইতে বহু সহস্র বিদ্রোহী কৃষকের এক বিশাল জনতা রঙ্গিয়া থানার সংলগ্ন বিস্তৃত ময়দানে সমবেত হইয়া ঘাঁটি স্থাপন করে। ইহার পরের ঘটনা ম্যাক্‌কেবি নামক একজন উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারীর বিবরণ হইতে জানা যায়। বিবরণটি নিম্নরূপ:

"বিদ্রোহী কৃষকগণ দলবদ্ধভাবে দীর্ঘ লাঠি লইয়া ঘুরিত। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, সৈন্য ও পুলিসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিয়া তাহারা কিছুতেই ছত্রভঙ্গ হইত না।

আমি তাহাদিগকে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাইতে বলিলে তাহারা উত্তরে জানাইয়া দিল, তাহারা আসিবে না, তবে আমি কেবলমাত্র পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রিলিকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের নিকট গিয়া কথা বলিতে পারি; তবে কোন দেহরক্ষী নেওয়া চলিবে না। আমি গিয়া তাহাদের নিকট 'মেল'-এর অধিবেশন বন্ধ করিবার এবং বর্ধিত হারে খাজনা দিবার নির্দেশ দিলাম এবং তাহাদিগকে অবিলম্বে ছত্রভঙ্গ হইতেও বলিলাম। তাহারা সকলে একসঙ্গে চিৎকার করিয়া জানাইয়া দিল, তাহারা খাজনাও দিবে না, ছত্রভঙ্গও হইবে না। 'ব্যাটাকে ধর ধর' বলিয়া তাহারা চিৎকার করিয়া উঠিল।"[১]

কর্তৃপক্ষ এইভাবে আপসের ভান করিয়া চূড়ান্ত সংগ্রাম এড়াইয়া চলিতে থাকে। তাহারা আরও সৈন্য ও পুলিসের অপেক্ষায় ছিল। আরও সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিস আসিয়া পড়িলেই বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ আরম্ভ হইবে। বিদ্রোহীরা কর্তৃপক্ষের এই দুষ্ট পরিকল্পনা বুঝিতে না পারায় থানা আক্রমণের চেষ্টা না করিয়া কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ইতিমধ্যে শিলং হইতে গুর্খা ও 'আসাম রাইফেলস্'-এর সৈন্যদের এক বিশাল বাহিনী রঙ্গিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সৈন্যবাহিনী আসিয়াই রঙ্গিয়ার চারিদিকে বড় বড় গাছের এক প্রাচীর নির্মাণ করে এবং রঙ্গিয়ার রক্ষাব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়া তোলে। ইহার পর এই বিশাল বাহিনী অভিযান আরম্ভ করে। বিদ্রোহীরা বিভিন্ন স্থানে শত্রু সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিয়া পলায়ন করে। বিভিন্ন স্থানের সংঘর্ষে বহু কৃষক বিদ্রোহী এবং সৈন্য ও পুলিস নিহত ও আহত হয়।[২] রঙ্গিয়া ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই অবস্থা চলিতে থাকে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিদ্রোহীরা কর্তৃপক্ষের নিকট মাথা নত করে নাই, কিংবা কর্তৃপক্ষও বর্ধিত কর আদায় করিতে সক্ষম হয় নাই।

লছমার বিদ্রোহ

রঙ্গিয়ার বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেলেও নলবাড়ী, বরমা, বাজালি প্রভৃতি স্থানে 'মেল'-এর বৃহৎ সমাবেশ চলিতে থাকে। বিদ্রোহীদের নেতৃবৃন্দ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কৃষকদিগকে বর্ধিত কর না দিবার জন্য প্রচারকার্য চালাইতে থাকেন।

"বরমা তহসিলে 'মেল'-এর নেতৃবৃন্দ এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের জন্য নিজস্ব ডাক-পিওন নিযুক্ত করে এবং বর্ধিত করের দায়ে সম্পত্তি ক্রোকে বাধা দানের জন্য একটি বৃহৎ লাঠিয়াল-বাহিনী গঠন করে।"[৩]

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী বড়পেটা মহকুমার লছিমা তহসিলে মহকুমা শাসক মাধবচন্দ্র বড়দলই একদল সশস্ত্র পুলিস সঙ্গে লইয়া বর্ধিত কর আদায় করিতে গেলে তাহাদের সহিত বিদ্রোহীদের এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। এই স্থানেই মৌজাদার ও মণ্ডল একদল সশস্ত্র পুলিসসহ কর আদায় করিতে গেলে বিদ্রোহীরা তাহাদিগকে ঘেরাও

১। K. N. Dutt: Ibid, p. 222. ২। K. N. Dutt: Ibid, p. 226. ৩। K. N. Dutt: Ibid, p. 224.

করিয়া প্রচণ্ড প্রহার করে। এই প্রহারের ফলে কয়েকদিন পর মণ্ডল মারা যায়। পরে একটি সৈন্যদল আসিয়া ৭৫ জন কৃষককে গ্রেপ্তার করে। সৈন্যগণ তাহাদিগকে মহকুমা হাকিমের ক্যাম্পে আনিয়া উপস্থিত করে। গ্রেপ্তারের পর অল্পকালের মধ্যেই প্রায় তিন হাজার বিদ্রোহী কৃষক মহকুমা হাকিমের ক্যাম্পে উপস্থিত হইয়া ঐ ৭৫ জন কৃষকের মুক্তি দাবি করে এবং মহকুমা হাকিমকে জানাইয়া দেয় যে, অবিলম্বে তাহাদের মুক্তি না দিলে তাহারা হাকিমের ক্যাম্প ভস্মীভূত করিবে। মহকুমা হাকিম ভীত হইয়া অবিলম্বে ৭৫ জন কৃষকের মুক্তি দান করেন। মুক্ত কৃষকদের লইয়া বিদ্রোহীরা চলিয়া গেলে মহকুমা হাকিম রাত্রির অন্ধকারে লছিমা হইতে বড়পেটা পলায়ন করেন। অবিলম্বে লছিমায় একদল সৈন্য প্রেরণের জন্য তিনি কমিশনারের নিকট আবেদন জানান। তাঁহার আবেদন অনুযায়ী পরদিনই ডেপুটি কমিশনার বহু সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিস লইয়া লছিমায় উপস্থিত হন। ইহার পর হইতে বিদ্রোহীদের সহিত সৈন্য ও পুলিসের সংঘর্ষ চলিতে থাকে। এই সকল সংঘর্ষে বহু কৃষক নিহত ও আহত এবং অনেকে গ্রেপ্তার হয়।[১]

২৫শে জানুয়ারী ছয় হাজার কৃষক তাহাদের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র লইয়া ডেপুটি কমিশনারের নিকট উপস্থিত হয়। এই পত্রে ধৃত কৃষকদের মুক্তির দাবি লিখিত ছিল এবং ইহাতে জানানো হইয়াছিল যে, তাহাদের মুক্তি না দিলে লছিমার থানা ও সরকারী অফিসসমূহ অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করা হইবে। ডেপুটি কমিশনার তাহাদের দাবির প্রতি কর্ণপাত না করায় বিদ্রোহীরা থানায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। এই স্থানে পুলিস ও সৈন্যদলের সহিত তাহাদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। কেবলমাত্র লাঠি লইয়া সৈন্য ও পুলিসের রাইফেলের সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব বুঝিয়া বিদ্রোহীরা পশ্চাৎ অপসরণ করে। ইহার পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত পুলিস ও সৈন্যদলের সহিত বিদ্রোহীদের সংঘর্ষ চলে।[২]

পাথারুঘাটের বিদ্রোহ

দরং জেলার মঙ্গলদৈ মহকুমার বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই মহকুমায়ও বর্ধিত করের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। কামরূপ প্রভৃতি অন্যান্য জেলার মত দরং জেলার বিভিন্ন অঞ্চলেও 'মেল'-এর অধিবেশনে বিপুল সংখ্যায় কৃষকদের সমাবেশ চলিতে থাকে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী মঙ্গলদৈ মহকুমার প্রধান শাসক আসামের ডেপুটি কমিশনারকে টেলিগ্রাম যোগে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, সিপাঝার তহসিলের কৃষকগণ কামরূপের মতই অতি বিপুল সংখ্যায় সমবেত হইতেছে। এই সকল সমাবেশে মঙ্গলদৈ ও কলাইগাঁও তহসিলের কৃষকগণ যোগদান করিতেছে। এই সকল সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে মহকুমা শাসক একজন লেফ্‌টানান্টের অধীনে একটি সৈন্যদল নিয়োগ করেন।[৩]

২৬শে জানুয়ারী ডেপুটি কমিশনার ও পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বহু সিপাহি ও সশস্ত্র পুলিশ লইয়া তেজপুর হইতে পাথারুঘাটে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা

১। K. N. Dutt : Ibid, p. 224. ২। K. N. Dutt : Ibid, p. 224. ৩। K. N. Dutt : Ibid p. 224-25.

পাথারুঘাটের ডাক-বাংলোতে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া অবস্থা আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করেন। ২৮শে জানুয়ারী বহু সহস্র কৃষক লাঠি ও ইষ্টকখণ্ড লইয়া ডাক-বাংলাতে উপস্থিত হয়। তাহারা ডেপুটি কমিশনারকে জানাইয়া দেয়, তাহারা বর্ধিত কর দিবে না, বর্ধিত কর আদায় বন্ধ করিতেই হইবে। ডেপুটি কমিশনার ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলম্বে ছত্রভঙ্গ হইবার এবং 'মেল'-এর সমাবেশ বন্ধ করিবার নির্দেশ ঘোষণা করেন। সমবেত কৃষকগণও ক্রুদ্ধ হইয়া কর আদায় বন্ধ করিবার নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থান ত্যাগ করিতে অস্বীকার করে। ডেপুটি কমিশনারের ইঙ্গিতে সিপাহি ও পুলিস-বাহিনী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া রাইফেলে বেয়নেট চড়াইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়।

সৈন্য ও পুলিসদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে দেখিয়া বিদ্রোহী কৃষক জনতা ডেপুটি কমিশনার এবং সৈন্য ও পুলিস বাহিনীকে লাঠি ও ইষ্টকখণ্ড দ্বারা আক্রমণ করে। জনতার আর এক অংশ তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। এই সময় সরকারী বাহিনী উন্মত্তের মত রাইফেল হইতে গুলিবর্ষণ করিতে থাকে। কৃষকগণ গুলিবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া বহুক্ষণ যুদ্ধ চালায়। আহত ও মৃতদেহে যুদ্ধক্ষেত্র ছাইয়া যায়। রাইফেলের সহিত কেবল লাঠি ও ইষ্টকখণ্ড লইয়া যুদ্ধ করা অসম্ভব বুঝিয়া কৃষকগণ অবশেষে পশ্চাৎ অপসরণ করে এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। এই গুলিবর্ষণের ফলে ১৫০ জন কৃষক নিহত এবং দুইশতাধিক কৃষক আহত হয়।[১]

পাথারুঘাটের এই সংঘর্ষের পর হইতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের কৃষক-বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

৪. প্রথম কেওঞ্ঝার-বিদ্রোহ (১৮৬৮)

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের উড়িষ্যার কেওঞ্ঝার দেশীয় রাজ্যের রাজার মৃত্যু হইলে নূতন রাজার গদি আরোহণ উপলক্ষ করিয়া রাজ্যের ভুঁইয়া আদিবাসী কৃষকগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রাজার মৃত্যু হইলে তাহার এক অত্যাচারী পুত্র রাজ্যের গদি অধিকার করিলে মৃত রাজার এক পুত্রহীনা রানীও রাজ্যের গদি লাভের অধিকার দাবি করে। আদিবাসী কৃষকগণ অত্যাচারী নূতন রাজার বিরুদ্ধে রানীর দাবি সমর্থন করিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহ আরম্ভ করে। রাজ্যের অন্যান্য আদিবাসী কৃষকগণও ভুঁইয়াদের সহিত যোগদান করে। আদিবাসী কৃষকদের এই মিলিত বাহিনী রাজ্যের রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া প্রধান শাসন-দপ্তর আক্রমণ করে। তাহারা শাসন-দপ্তর লুণ্ঠন করিয়া রাজ্যের দেওয়ানসহ রাজার ৫০ জন সমর্থক কর্মচারীকে জামিন স্বরূপ বন্দী করিয়া রাখে। ইহার পর বিদ্রোহীরা বহু গ্রাম আক্রমণ করিয়া বৃহৎ ভূস্বামী ও মহাজনদের গৃহ লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করে। চারিমাস যাবৎ এই বিদ্রোহ অব্যাহত গতিতে চলে। ইতিমধ্যে রাজা ভূস্বামী ও মহাজনগোষ্ঠী এবং বৃটিশ শাসকদের সহায়তায় এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী গঠন করিয়া তাহা বিদ্রোহ দমনের কার্যে নিযুক্ত করে। বহু খণ্ডযুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা সুশিক্ষিত সৈন্য বাহিনীর হস্তে পরাজিত হয় এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে।[২]

১। K. N. Dutt: *Ibid*, p. 227. ২। L. S. S. O'Malley: *Ibid*, p. 449-50.

৫. কোলি-বিদ্রোহ (১৮৭১-৭৫)[1]

বোম্বাই প্রদেশের পুনা ও থানা জেলার মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে কোলি উপজাতির বাস। এই নিরীহ ও নিরক্ষর পর্বত-অরণ্যচারী উপজাতিটি চাষবাস করিয়া কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করিত। এক সময় মারোয়াড়ী মহাজনগোষ্ঠী এই নিরীহ মানুষগুলিকেও শোষণের শিকারে পরিণত করে। তাহারা অর্থের লোভ দেখাইয়া ইহাদিগকে ঋণ গ্রহণে অভ্যস্ত করিয়া তোলে এবং তাহার পর ঋণের দায়ে পুলিসের সাহায্যে ক্রমশ সমগ্র উপজাতিটির জমিজমা হস্তগত করিয়া তাহাদিগকে দুর্দশার চরম সীমায় পৌছাইয়া দেয়। কোলিরা জমিজমা হারাইয়া দস্যুবৃত্তিকেই জীবন ধারণের একমাত্র উপায় হিসাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ক্রমশ এই নিরীহ মানুষগুলি হইয়া উঠে দুর্ধর্ষ দস্যু। মারোয়াড়ী মহাজনগোষ্ঠীই হইল তাহাদের লুণ্ঠন আর দস্যুবৃত্তির একমাত্র শিকার।

কোলিরা লুণ্ঠনের দ্বারা জীবিকা নির্বাহের প্রয়াস পাইলেও তাহারা তাহাদের চরম শত্রু মারোয়াড়ী মহাজন ব্যতীত অপর কাহারও সম্পত্তি স্পর্শ করিত না। যে মারোয়াড়ীরা তাহাদিগকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে কেবল তাহাদেরই সম্পত্তি ও গৃহ লুণ্ঠন করিয়াই তাহারা বাঁচিয়া থাকিত। তাহাদের এই কার্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আইনের সমর্থন না থাকিলেও মানবতার নীতির সমর্থন না থাকিয়া পারে না। কারণ, মারোয়াড়ীদের সম্পত্তি তাহাদের নিকট হইতেই কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। কোলিরা মারোয়াড়ীদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিবার সময় বাধাদানকারী মহাজনদিগকে প্রহারে জর্জরিত করিত। এমনকি প্রয়োজন হইলে তাহারা বাধাদানকারী মহাজনদিগকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। এইভাবে বহু মারোয়াড়ী মহাজন তাহাদের হস্তে নিহত হইয়াছিল।

মহাজনদের কবল হইতে জমিজমা উদ্ধারের জন্য কোলিরা মারোয়াড়ী মহাজনদের উপর প্রায়ই আক্রমণ চালাইত। ১৮৭১ হইতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোলিরা বিভিন্ন মহাজনদের উপর প্রায় আড়াইশত বার আক্রমণ চালাইয়াছিল। এই সকল আক্রমণে মোট ৯ জন মহাজন নিহত, ৩৪ জন মারাত্মকরূপে আহত, ৬১ জন সামান্য আহত হইয়াছিল এবং ৩৮টি অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটিয়াছিল।

অনুরূপ ঘটনা বোম্বাই প্রদেশের আহ্‌মদনগরে এবং পুনা জেলায়ও দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছিল।

৬. সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩)

পাবনা জেলার ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ বঙ্গদেশের জমিদারি-শোষণ-বিরোধী কৃষক-সংগ্রামের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই বিদ্রোহের মাধ্যমেই বঙ্গদেশের কৃষক ভূমির উপর তাহাদের দখলী স্বত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীকে বাধ্য করিয়াছিল।

১। Deccan Riot Commission Report, 1875.

পাবনার সিরাজগঞ্জ মহকুমার কৃষক জমিদারগোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মরিয়া হইয়া এই বিদ্রোহ আরম্ভ করিলেও জমিদারগোষ্ঠীর এই প্রকার শোষণ-উৎপীড়ন সমগ্র বঙ্গদেশেই সমানভাবে চলিতেছিল। সুতরাং এই বিদ্রোহকে বঙ্গদেশের জমিদারিপ্রথা-বিরোধী সংগ্রামের প্রতিনিধিস্বরূপ বলিয়া গণ্য করা চলে।

প্রাচীন নাটোর রাজবংশের জমিদারির অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের সমস্ত জমি নিলামে উঠিলে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের পাঁচটি ধনী পরিবার সিরাজগঞ্জের সমস্ত জমি ক্রয় করিয়া "অল্প সময়ে বিপুল সম্পদ আহরণের জন্য" কৃষকদের উপর অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়ন আরম্ভ করে। নানারূপ শঠতা দ্বারা ক্রমশ খাজনাবৃদ্ধি এবং কৃষকের দখলী জমির পরিমাণ হ্রাসের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ইহা ব্যতীত জমিদারগোষ্ঠী তহুরী, বিবাহকর, পার্বণী, স্কুলখরচ, তীর্থখরচ, ডাকখরচ, ভোজখরচ প্রভৃতি ১৫ প্রকারের অবৈধ আদায়ের মারফত কৃষকদের সর্বস্বান্ত করিয়া ফেলে। এই সকল শঠতাপূর্ণ ও অবৈধ ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে কৃষকগণ আদালতে মামলা-মোকদ্দমা করিয়া কয়েকটি ক্ষেত্রে জয়লাভ করে। ইহার ফলে উৎসাহিত হইয়া কৃষকগণ জমিদারগোষ্ঠীর সমস্ত বে-আইনী আদায় বন্ধ করিয়া দেয় এবং জমিদারদিগকে খাজনা না দিয়া তাহা আদালতে দাখিল করিতে আরম্ভ করে।[১]

জমিদারগোষ্ঠী ক্রুদ্ধ হইয়া লাঠিয়াল-পাইক-বরকন্দাজদের লইয়া কৃষকদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিলে সমগ্র সিরাজগঞ্জ মহকুমায় বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া যায়। ঈশানচন্দ্র রায়, গঙ্গাচরণ পাল, রাজু সরকার, বিক্রক প্রভৃতি নায়কগণ এই বিদ্রোহ পরিচালনা করেন।[২] এই নায়কগণ সিরাজগঞ্জের সকল কৃষককে ঐক্যবদ্ধ করিয়া বর্তমান কালের কৃষক-সমিতির অনুরূপ এক কৃষক-সংগঠন তৈরি করেন। ইহার পর নায়কগণ গ্রামে গ্রামে সভা-সমিতি করিয়া নিজেদের "বিদ্রোহী" বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহারা পত্রমারফত বিভিন্ন আদালতে জমিদারিপ্রথার অবসানের দাবি তোলেন। বিদ্রোহীরা বিভিন্ন স্থানের জমিদারী কাছারিগুলির উপর আক্রমণ করিয়া ঐগুলি ধূলিসাৎ করিয়া ফেলে। এমনকি জমিদারদের সুরক্ষিত প্রাসাদের উপরেও আক্রমণ চলিতে থাকে। সিরাজগঞ্জ মহকুমার গ্রামাঞ্চলবাসী সকল জমিদার, তাহাদের নায়েব-গোমস্তা এবং সকল ধনী ব্যক্তি পলায়ন করিয়া পাবনা শহরে আশ্রয় লয়।

জমিদারগোষ্ঠী এবং তাহাদের জমিদারি রক্ষা করিবার জন্য শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন জেলা হইতে সশস্ত্র পুলিসবাহিনী সমবেত করিয়া কৃষকদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। বিদ্রোহের প্রায় সকল নায়ক এবং বহু কৃষককে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে আটক করা হয়। ইহার পর বিদ্রোহের অভিযোগে মোট ৩০২ জনের বিচার চলে এবং বহু কৃষকের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়।

শাসকগোষ্ঠী কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করিলেও এই বিদ্রোহের ফলেই তাহারা ভীত হইয়া জমিদারদের শোষণ-উৎপীড়ন সংযত করিবার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা

১। সুপ্রকাশ রায়: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৪১৯-২১।
২। পাবনা জেলার ইতিহাস, ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৯৭।

অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। শাসকগোষ্ঠী কৃষকদের বিক্ষোভের কারণ দূর করিবার উপায় হিসাবে জমির উপর তাহাদের দখলী স্বত্ব স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। অবশেষে এই বিদ্রোহের পরিণতিস্বরূপ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের জমিদারী-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সকল কৃষককে জমির উপর দখলী স্বত্ব দান করা হয়।[১]

৭. দাক্ষিণাত্য বিদ্রোহ (১৮৭৫)

(মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক-বিদ্রোহ)

দাক্ষিণাত্যে কৃষক-শোষণের রূপ

বৃটিশ শাসকগণ বঙ্গদেশে জমিদারগোষ্ঠীর সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ চিরতরে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। ইহার ফলে শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে পরবর্তীকালে রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার কোন উপায় ছিল না। এই ভুল সংশোধনের জন্যই পরবর্তীকালে শাসকগোষ্ঠী দাক্ষিণাত্যে এবং অন্যান্য স্থানে ভিন্নরূপ ভূমি-রাজস্ব-ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। দাক্ষিণাত্যে যে ভূমি-রাজস্ব-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় সেই অনুসারে চাষীদের উপর পৃথক পৃথকভাবে খাজনা ধার্য করা হয় এবং তাহা আদায়ের ভার দেওয়া হয় গ্রামের 'প্যাটেল' বা মোড়লদের উপর। মোড়ল চাষীদের নিকট হইতে ছলে বলে কৌশলে রাজস্বের নামে অধিক অর্থ আদায় করিয়া তাহা আত্মসাৎ করিত। এইভাবে দাক্ষিণাত্যে জমিদারী শোষণের পরিবর্তে মোড়লদের শোষণ-উৎপীড়ন কৃষকদের উপর চাপিয়া বসে। ইহার পর শাসকগোষ্ঠী ক্রমবর্ধমান হারে ভূমি-রাজস্ব ধার্য করিয়া কৃষকদিগকে সর্বস্বান্ত করিয়া ফেলিতে থাকে।

বৃটিশ শাসনের প্রথম ভাগে শাসকগণ বোম্বাই প্রদেশের কৃষকদের রাজস্ব দিবার ক্ষমতা যথেষ্ট মনে করিয়া এরূপ উচ্চহারে খাজনা ধার্য করিয়াছিল যে তাহা দিবার ক্ষমতা কৃষকদের ছিল না। ইহার ফলে খাজনা দিতেই কৃষকগণ সর্বস্বান্ত হইয়া মহাজনের দ্বারস্থ হইতে বাধ্য হইত। নূতন ভূমি-ব্যবস্থা এইভাবে কৃষকের পক্ষে সর্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বোম্বাইয়ের ভূমি-রাজস্ব কমিশনার স্যার জর্জ উইনগেট কৃষকের দুর্দশার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন :

"ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, কৃষকদের খাজনা দিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রথম যুগের কালেক্টরদের ভুল ধারণা এবং তাহার ভিত্তিতে খাজনা ধার্য করিবার ফলেই গ্রামাঞ্চলের কৃষি-মূলধন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় এবং তাহাই কৃষকদের বর্তমান দুর্দশার সবচেয়ে বড় কারণ।"[২]

বোম্বাইয়ের ভূমি-রাজস্ব বিভাগের আর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, লেফ্‌টানান্ট রবার্টসন্‌ লিখিয়াছেন যে, বোম্বাই প্রদেশের পুনা অঞ্চলের বহু গ্রাম ধ্বংস হইয়া বাঘের

১। এই বিদ্রোহের পূর্ণ বিবরণ সুপ্রকাশ রায়ের 'কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য। এই সময় ও ইহার পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে আরও কৃষক-বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। তাহারও বিবরণ উক্ত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। ২। Survey and Settlement Report (Bombay), 1850.

অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে, বাকীগুলিও ধ্বংসের পথে। কৃষকদের ঘরের দেওয়াল ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে।[১] অনুরূপ বিবরণ অন্যান্য অঞ্চল হইতেও পাওয়া যায়। আমেদাবাদের ভূমি-রাজস্ব বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্নেল এ্যাণ্ডারসন্ ব্যাপক তদন্তের পর লিখিয়াছেন :

"১৮১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দের খাজনা এত উচ্চহারে ধার্য হইয়াছিল যে, বহু ক্ষেত্রে রায়তদের অনিবার্য ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য পরবর্তী কালে ইহার প্রতিকারের উপায় খুঁজিতে হইয়াছিল।[২]

খুর্দে জেলার অবস্থা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কর্নেল এ্যাণ্ডারসন্ লিখিয়াছেন : "যে মারাত্মক অবস্থা দেখা দিয়াছে তাহা অত্যধিক কর আদায়েরই অনিবার্য পরিণতি।"[৩]

ইহার উপর ছিল প্যাটেল বা মোড়লদের ইচ্ছামত কর আদায় আর অমানুষিক উৎপীড়ন। প্যাটেলদের সহযোগীরূপে আসিয়া জুটিয়াছিল 'সাউকার' অর্থাৎ মহাজনগোষ্ঠী। সরকার কর্তৃক চাপানো অত্যধিক ভূমি-রাজস্ব এবং প্যাটেলদের দাবি মিটাইবার জন্য কৃষকগণ সাউকারদের নিকট ঋণপ্রার্থী হইতে বাধ্য হইত। আর সাউকারগণ এই সুযোগে অত্যধিক সুদে ঋণ দিয়া কৃষককে তাহার অমানুষিক শোষণের জালে আবদ্ধ করিত। মহাজনের সুদ চক্রবৃদ্ধিহারে (আসলের সহিত সুদ যুক্ত হইয়া আসলের পরিমাণ বৃদ্ধি) বাড়িয়া পর্বতপ্রমাণ হইয়া দাঁড়াইত। সেই বর্ধিত ঋণ শোধ করা কৃষকের সাধ্যাতীত। সুতরাং ঋণের শর্ত অনুসারে কৃষক তাহার জমিজমা ও বসতবাড়ী হারাইত এবং তাহাকে চিরকাল সাউকারের দাস হইয়া থাকিতে হইত। এইভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় দক্ষিণ-ভারতের কৃষি আর কৃষক উভয়েই গ্রামের প্যাটেল আর সাউকারের পায়ে বলিরূপে অর্পিত হয়।

সাউকারগোষ্ঠীর পরিচয়

'কুন্‌বি' চাষীরাই মারাঠা জাতির প্রধান অংশ। এই চাষীদের অধিকাংশই 'সাউকার'দের ঋণের জালে আবদ্ধ। ঋণের দায়ে চাষীরা দীর্ঘকাল হইতে মহাজনদের দাসত্ব করিয়া চলিয়াছে। সাউকার মহাজনদের প্রায় সকলেই বহিরাগত মারোয়াড়ী। মারাঠা শাসনের শেষভাগে যখন সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িয়াছিল এবং গ্রামের রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত প্যাটেলদের শোষণ-উৎপীড়ন অবাধে চলিতেছিল, তখনই 'কুন্‌বি' চাষীদিগকে "উদ্ধারের জন্য" এই মারোয়াড়ী মহাজনগোষ্ঠী রাজস্থান হইতে দাক্ষিণাত্যের বোম্বাই অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে গুজরাটী সাউকার মহাজনগণও এই অঞ্চলে আসিয়া মহাজনী ব্যবসা আরম্ভ করে। আর আসে মাদ্রাজ হইতে 'লিঙ্গায়েত' বানিয়ার দল। তবে বোম্বাই অঞ্চলের মহাজনদের মধ্যে মারোয়াড়ীদের সংখ্যাই সর্বাধিক। ইহাদের পরই গুজরাটীদের স্থান। 'লিঙ্গায়েত' বানিয়াদের সংখ্যা মারোয়াড়ী আর গুজরাটীদের তুলনায় অল্প। সাউকার মহাজনদের একটা ক্ষুদ্র অংশ ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহারা

১। Ibid. ২। Ibid. ৩। Ibid.

'কুলকর্নী' ব্রাহ্মণ। 'কুলকর্নী' শব্দের অর্থ 'গ্রামের হিসাব রক্ষক'। মারাঠা শাসনের পতনের পর বৃটিশ শাসন নূতন ভূমি-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিলে তাহার সুযোগ লইয়া এই সকল সাউকার মহাজনের দল ক্রমশ অধিক সংখ্যায় আসিয়া ঋণদাতা মহাজনরূপে দাক্ষিণাত্যের কৃষক সম্প্রদায়ের ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসে এবং তাহাদিগকে ঋণের জালে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের রক্ত লক্ষ মুখ দিয়া শুষিয়া লইতে থাকে।

মারোয়াড়ী মহাজনগণ রাজস্থান ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা পূর্বে আগত মহাজনদের কারবারে কিছুদিন কেরানীর চাকরি করিয়া সামান্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াই নিজস্ব মহাজনী প্রতিষ্ঠান খুলিয়া বসিত। এইভাবে প্রায় প্রত্যহই নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র গজাইয়া উঠিত। আমেদনগরের নিকটবর্তী বাম্বুরি শহর ছিল মারোয়াড়ী মহাজনদের প্রধান কেন্দ্র। এই শহরে সহস্র সহস্র মারোয়াড়ী মহাজন বাস করিত। এই কেন্দ্রেই চলিত তাহাদের লেনদেন ও ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের কার্য। অন্যান্য মহাজন অপেক্ষা মারোয়াড়ী মহাজনগণ অধিক নিষ্ঠুর ও কর্কশ প্রকৃতির। 'ডেকান রায়ট কমিশন'-এর রিপোর্টে তাহাদের চরিত্রের নিম্নোক্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে :

"মারোয়াড়ী মহাজনগণের ব্যবহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও রূঢ়। জনসাধারণের মতামতের পরোয়া না করিয়াই তাহারা তাহাদের ব্যবসা চালাইয়া যায়। অর্থলালসা তাহাদের চরিত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। তাহাদের আত্মবিশ্বাস অতি দৃঢ়, কষ্ট সহিষ্ণুতা অসাধারণ। কিন্তু তাহাদের ব্যবসায়ের প্রকৃতি ও পদ্ধতি এরূপ যে ইহার ফলে মানুষ নিষ্ঠুর না হইয়া পারে না। তাহারা জমিদার রূপে সুদখোরের সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয় এবং প্রজাকে কঠোরতম শর্তে আবদ্ধ করে। প্রজা আবার তাহার খাতক, আর খাতক হওয়ার অর্থ ক্রীতদাসের মত কিছু। মারোয়াড়ী মহাজনদের আইন বুঝিবার এবং মামলা সাজাইবার ক্ষমতা অসাধারণ। তাহার উকিলকে কিভাবে মামলা চালাইতে হইবে তাহাও সে উত্তমরূপেই জানে। হিসাবের কাজে সে দক্ষ। ব্যবসায়ের কাজে তাহার উপস্থিত বুদ্ধিও খুব প্রখর। কিন্তু এই সকল বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে তাহার কোন আগ্রহ নাই, অবশ্য যোগ্যতাও নাই।"[১]

এই মহাজনগোষ্ঠীর দ্বারা কৃষকদের শোষণ-উৎপীড়ন-লাঞ্ছনা এবং তাহার ফল স্বরূপ চরম দুর্দশার বর্ণনা দিয়া বোম্বাই প্রদেশের আমেদনগর জেলার কালেক্টর লিখিয়াছেন :

"কৃষকগণ যে জমি বন্ধক রাখিয়া সাউকারদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে, ঋণের অর্থ অপেক্ষা সেই জমির দখল পাইতেই সাউকারগণের আগ্রহ সর্বাধিক। সেই জমি হস্তগত করিয়া সাউকারগণ সরকারের নিকট বিশেষ অনুগত প্রজা বলিয়া নিজেদের জাহির করে।

"সাউকারগণ বীজধান, খাদ্যশস্য আর অর্থ ঋণ দেয়। ইহার জন্য তাহারা জমি বা অন্য মূল্যবান দ্রব্য জামিন রাখে।......তবে জমিই তাহাদের সকলের প্রধান কাম্যবস্তু।

১। Deccan Riot Commission Report, p. 11.

"সাউকারদের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ তাহারা তাহাদের উচ্চবর্ণ ও উচ্চ-সম্প্রদায়গত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে। ঋণের ব্যবসা করিয়া একবার কিছু জমি দখল করিতে পারিলেই তাহারা ঋণের ব্যবসা ত্যাগ করিয়া জমিদার হইয়া বসে। তখন জমির পূর্বের মালিক হয় তাহার প্রজা। তাহার উপর উচ্চহারে খাজনা ধার্য হয়। তথাপি তাহার অবস্থা সুদখোর সাউকারদের ঋণদাসদের (bond-slave) অপেক্ষা একটু ভাল। বড় বড় শহরে বিপুল সংখ্যক পুলিস মোতায়েন রাখিয়া জনসাধারণের ক্রোধ হইতে তাহাদের রক্ষা করা হয়। এইভাবে যাহারা ঋণের ব্যবসা করিয়া জমিদার হইয়া বসে, তাহারা খুব মোটা, অলস, বদমাস, আর দুর্দান্ত জমিদার হইয়া উঠে। গ্রামাঞ্চলে ইহারাই হয় সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর এবং সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের মূল উৎস।"[১]

মহাজনী শোষণের রূপ

"এই অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব হইতেই সাউকার ও ব্যবসায়ীদের নিকট কিছু সংখ্যক চাষীর ঋণ থাকিলেও বৃটিশ শাসনকালে অত্যধিক ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ফলেই সকল চাষী ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই ঋণের বোঝা ক্রমশ পর্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিয়াছে।"

"প্রজারা স্বভাবত মিতব্যয়ী এবং বুঝিয়া শুনিয়া ব্যয় করিতে অভ্যস্ত হইলেও বহু গ্রামের চাষীরাই রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের (গ্রামের প্যাটেলদের—সু. রা.) অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া সাউকার আর ব্যবসায়ীদের ঋণের জালে আবদ্ধ হইয়াছে। অনেকেরই ঋণ দীর্ঘকালের এবং প্রথম হইতেই তাহা চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার উপর ঐ একই কারণে নূতন ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। সকল ঋণই একসঙ্গে বৃদ্ধি পাইবার ফলে হিসাব অতি জটিল হইয়া উঠে। এইভাবে ঋণগ্রস্ত হইয়া কেহই আর নিজেকে সেই ঋণ হইতে মুক্ত করিতে পারে না।"[২]

'ডেকান রায়ট কমিশন'-এর রিপোর্টে মহাজনদের দ্বারা ঋণগ্রস্ত চাষীর শোষণের নিম্নোক্তরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে:

১. অধিকাংশ চাষীরই ঋণের বোঝা অত্যধিক। এই ঋণের সুদ হিসাবে চাষীকে তাহার বন্ধক দেওয়া জমির সমস্ত ফসল সাউকারের ঘরে তুলিয়া দিয়া সাউকারের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়।

২. কোন চাষী সাউকারের নিকট ঋণপ্রার্থী হইলে সাউকার তাহার অর্থের জামিনস্বরূপ কেবল দুইটি জিনিস দাবি করে, আর কোন জিনিসের উপর তাহার লোভ নাই, আর কোন জিনিস গ্রহণ করিতে সে রাজীও হয় না। এই দুইটি জিনিসের একটি চাষীর চাষের বলদ এবং আর একটি বন্ধক দেওয়া জমির সমস্ত ফসল।

৩. সুদের হার অত্যধিক, সকল ঋণেরই বেশীর ভাগ জমিয়া যাওয়া সুদের সমষ্টি অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ জমিয়াই আসলে পরিণত হইয়াছে।

১। Quoted from Deccan Riot Commission Report, p. 14.

২। Revenue Commissioner Chaplin's Report (1822).

৪. বৃটিশ শাসনের ভূমি-রাজস্ব-ব্যবস্থাই চাষীদের ঋণগ্রস্ততার প্রধান কারণ।

৫. সাউকারদের প্রত্যেকেই অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট বিত্তশালী হইয়া উঠে। তাহাদের প্রত্যেকেরই অন্তত একটি করিয়া গদি (অফিস) আছে, বহু কর্মচারীও থাকে। এই কর্মচারীরাই লেনদেন ও আদায়-তসিল করে।

৬. সাউকারগণ প্রত্যক্ষভাবে সরকারের নিকট হইতে কোন সাহায্য পায় না সত্য, কিন্তু পরোক্ষভাবে তাহারা সরকারের নিকট হইতে সকল সাহায্যই পাইয়া থাকে।

৭. বোম্বাই প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে মহাজনদের কবল হইতে চাষীদের রক্ষা করিবার জন্য যে সকল আইন তৈরী হইয়াছে তাহাতে ঋণের দায়ে মহাজন কর্তৃক চাষীর গরু ও যন্ত্রপাতি হস্তগত করা এবং বাৎসরিক শতকরা ১২ টাকার অধিক সুদ আদায় করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল আইন কার্যকরী হয় নাই। সাউকার-মহাজন আর চাষীর বিবাদ মিটাইবার জন্য এক বিশেষ ধরনের আদালত স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সকল আদালতের বিচারকগণই এরূপ ব্যবস্থা করিত যাহাতে অতি দ্রুত চাষীদের নিকট হইতে ঋণের টাকা আদায় হইতে পারে। চাষীরা এক সাউকারের ঋণ শোধ করিবার জন্য অন্য সাউকারের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে।

৮. সুদের হার সর্বত্রই শতকরা ৩৫ টাকা হইতে ৬০ টাকা পর্যন্ত।

৯. প্রায় সকল চাষীই ঋণগ্রস্ত। পুনা জেলার সহকারী কালেক্টর তাঁহার সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে এমন একজন লোকও নাই যাহার ঋণ নাই। তাঁহার অধীনস্থ একটি বড় গ্রামে মাত্র একজন লোক আছে যে ঋণগ্রস্ত নয়। আর একজন সহকারী কালেক্টর বলিয়াছেন যে, অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, মহাজন ব্যতীত চাষীদের এক দিনও চলে না।

১০. আমেদনগরের কালেক্টর বলিয়াছেন যে, চাষীদের রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে মহাজনগোষ্ঠী আরও হিংস্র, আরও বে-পরোয়া হইয়া উঠে। ঋণপত্র প্রতি বৎসরই নূতন করিয়া লিখিত হয় এবং সুদের হার প্রতিবৎসরই বাড়িয়া যায়। নূতন ঋণপত্রে আসল ও সুদ একত্রে আসল বলিয়া লিখিত হয়। এমন একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে যাহাতে ৬১ টাকার ঋণ ১৪ মাসে সুদে আসলে ১৮৯ টাকা হইয়াছে এবং তাহা নূতন ঋণপত্রে আসলরূপে লিখিত হইয়াছে। এমনকি মহাজন আদালত হইতে ঐ অর্থ আদায়ের ডিক্রীও পাইয়াছে। 'রায়ট কমিশন' মন্তব্যে লিখিয়াছেন :

"আইন-কানুন এবং উহার প্রয়োগ সকলই খাতক চাষীর বিরুদ্ধে।"

আর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী লিখিয়াছেন :

"মারোয়াড়ী মহাজনগণ চুরি-জোচ্চুরি, জালিয়াতি সবই করিয়া থাকে। ২ টাকা মূল্যের এক মণ ধান ঋণ দিয়া ঐ ধানের মূল্য বাবদ ১২ টাকা লিখিয়া রাখা হইয়াছে এবং এই ১২ টাকার উপর সুদ জমিতেছে আর মাসে মাসে সুদ আসলের সহিত যুক্ত হইতেছে। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কোন খাতক চাষী বাধা দিলে

তাহার আর রক্ষা নাই। তাহাকে আদালতে লইয়া গিয়া তাহার সর্বস্ব গ্রাস করা হয়।"১

'রায়ট কমিশন' উহার রায়ে আরও মন্তব্য করিয়াছেন :

"সাউকার-মহাজন, আইন-কানুন, আদালত সকলই যেন চাষীকে সর্বস্বান্ত করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবার জন্য।"

বোম্বাইয়ের রাজস্ব কমিশনার স্যার জর্জ উইনগেট লিখিয়াছেন :

"চাষীকে ঋণ গ্রহণে প্রলুব্ধ করিবার জন্য মারোয়াড়ী মহাজনদের শত প্রকারের ব্যবস্থা আছে। ঋণ গ্রহণের সময় সরলমতি চাষী বুঝিতেই পারে না তাহার কি সর্বনাশ হইতেছে। তবে একমাসের মধ্যেই সে সবকিছু বুঝিয়া ফেলে। কিন্তু তখন মৃত্যু ব্যতীত মহাজনের কবল হইতে পলায়নের আর কোন উপায় থাকে না।"২

এযুগের বৃটিশ ঐতিহাসিক টম্‌সন্ ও গারাট্ লিখিয়াছেন :

"বানিয়াগোষ্ঠী (মহাজনগোষ্ঠী—সু. রা.) যেভাবে জনসাধারণের অশিক্ষা ও অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া ব্যবসা চালায় তাহাই তাহাদের জঘন্যতম অপরাধ।"৩

মহাজনগোষ্ঠীর এই জঘন্যতম অপরাধ এবং চাষীরা একবার ঋণ গ্রহণ করিলে কিভাবে মহাজনদের শোষণের জালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দেই স্যার টমাস্ হোপ্ এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন :

"মিথ্যা ধাপ্পাবাজির সাহায্যে মহাজনগোষ্ঠী কিভাবে চাষীদের নিকট হইতে ঋণপত্র আদায় করে, তাহারা যে টাকা ঋণ দেয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা ঋণপত্রে লিখিয়া রাখে, তাহাতে অত্যধিক হারে কিস্তির পরিমাণ ধার্য করে, চাষীরা ঋণ পরিশোধ করিলেও তাহা পাওনা বলিয়া মিথ্যা ঋণপত্র লিখিয়া রাখে এবং তাহা আদায় করিবার জন্য আদালতে মামলা করে, মিথ্যা ঋণের দায়ে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করিয়া চাষীকে কয়েদ করিবার ভয় দেখায়, যে সুদ ঋণপত্রে লিখিত থাকে না তাহাও আদায় করিবার চেষ্টা হয়......আরও কত শত প্রকারের শঠতা ও প্রতারণা চলে তাহার হিসাব করা কঠিন। ইহা অসংখ্য তথ্য ও ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।৪

বিদ্রোহের পূর্ববর্তী অবস্থা

বোম্বাইয়ের ভূমি-রাজস্ব কমিশনার স্যার জর্জ উইনগেট ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দেই দাক্ষিণাত্যের কৃষকদের দ্বারা দুইজন মারোয়াড়ী মহাজনের হত্যার উল্লেখ করিয়া বোম্বাই সরকারকে সতর্ক করিয়া লিখিয়াছিলেন :

১। Capt. G. S. Anderson, Superintendent of the Revenue Survey (Bombay), Quoted from Deccan Riot Commission Report, p. 22. ২। Capt. G. S. Anderson : Revenue Survey Report. 1868. ৩। Rise and Fulfilment of British Rule in India, p. 488. ৪। Sir Thomas Hope : Speech in support of Deccan Agriculturists Relief Act, Quoted by M. L. Darling : The Punjab Peasant in Prosperity and Debt, p. 224.

"আমাদের প্রদেশের দুই বিপরীত প্রান্তে খাতকদের দ্বারা তাহাদের গ্রামের দুইজন মহাজনের হত্যাকাণ্ড দুইটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে দেখিলে চলিবে না। এই দুইটি ঘটনাকে দেখিতে হইবে কৃষক জনসাধারণের সহিত মহাজনগোষ্ঠীর সম্পর্ক বর্তমানে যে চরম আকার ধারণ করিয়াছে তাহারই প্রকাশ হিসাবে। এই দুইটি ঘটনাকে এইভাবে বিচার করিলে আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব, একদিক হইতে কিরূপ অত্যাচার-উৎপীড়ন চালানো হইয়াছে এবং অপরদিকে কি চরম দুর্দশা দেখা দিয়াছে। আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব, কি চরম অবস্থা স্বভাবত ও ঐতিহাসিকভাবে নিরীহ ও দুর্দশাগ্রস্ত এবং অন্যায় ও অত্যাচার-উৎপীড়নে চির-অভ্যস্ত কৃষক জনসাধারণকে মৃত্যুভয়হীন করিয়া তুলিয়াছে, হত্যাকাণ্ডের দ্বারা তাহাদের দুর্দশার প্রতিকার সাধনে অগ্রসর হইতে বাধ্য করিয়াছে; আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব, অত্যাচারের ফলে তাহাদের ন্যায়বোধ কতখানি লাঞ্ছিত হইয়াছে, তাহারা সরকার ও আইনের উপর কতখানি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে, সরকারী প্রতিকারের সমস্ত আশা কিভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে। এই সকল হত্যাকাণ্ডের পূর্বে এই চিরধৈর্যশীল ও চিরশান্ত মানুষগুলি কিরূপ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল তাহাও আমরা স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করিতে পারি।"[১]

এই সতর্কতামূলক রিপোর্ট হস্তগত হইবার পরেও বোম্বাই সরকার মহাজনগোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ শোষণ-উৎপীড়নে বাধা দিবার কোন চেষ্টাই করে নাই। বরং তাহাদের আইন ও আদালতের মারফত বৃটিশ শাসনের এই "ভূমি-রাজস্ব সরবরাহকারী" প্রধান স্তম্ভটিকে (মহাজনগোষ্ঠীকে) উহার শোষণ-উৎপীড়ন অবাধে চালাইয়া যাইতে উৎসাহিত ও সাহায্যই করা হইয়াছে। সুতরাং কৃষক জনসাধারণ মরিয়া হইয়া নিজেরাই ইহার প্রতিকার সাধনে ক্রমশ দৃঢ়সংকল্প হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার উপর উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে এক চরম আর্থনীতিক সংকট ঘনাইয়া আসে। এই আর্থিক সংকটের প্রচণ্ড আঘাতে ভারতের, বিশেষত দাক্ষিণাত্যের কৃষি ও কৃষকের জীবনে এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয় নামিয়া আসে। এই আর্থিক বিপর্যয়ও কৃষক জনসাধারণকে চরম ব্যবস্থা গ্রহণে আরও দৃঢ়সংকল্প করিয়া তোলে।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবার ফলে কৃষি-পণ্যের মূল্য দ্রুত হ্রাস পাইতে থাকে। ইহার উপর ১৮৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দেখা দেয় তীব্র অনাবৃষ্টি এবং ১৮৬৭-৬৮ ও ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দেখা দেয় ভয়ঙ্কর অজন্মা। ১৮৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে কৃষিপণ্যের মূল্য আরও হ্রাস পাইবার ফলে টাকার অঙ্কে কৃষকের আয় প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌঁছায়। ইহার পূর্ব হইতে সরকার বোম্বাই প্রদেশে রেলপথ নির্মাণ করিতেছিল, এবং তাহাতে কৃষকগণ শ্রমিকরূপে নিযুক্ত হইয়া কিছু অর্থ আয় করিতে পারিত। কিন্তু ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের পর সরকার রেলপথ নির্মাণের কার্য বন্ধ রাখে। ইহার উপর ঐ বৎসরই বোম্বাই সরকার জমির খাজনা প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি করে। এই খাজনা বৃদ্ধির ফলে চাষীরা তাহাদের জমির সমস্ত ফসল বিক্রয় করিয়াও রাজস্ব দিতে অপারগ হয় এবং মহাজনের ঋণের সুদ দেওয়াও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া

---

১. Wingate : Report to the Bombay Govt. in 1852.

পড়ে। সুতরাং উপবাস ব্যতীত তাহাদের সম্মুখে আর কোন পথ ছিল না। মহাজন-গোষ্ঠী ঋণগ্রস্ত চাষীদের জমিজমা এমনকি বসতবাড়ী পর্যন্ত আদালতের সাহায্যে কাড়িয়া লইতে থাকে।

চাষীদের চরম দুর্দশা দেখিয়া মহাজনগোষ্ঠী ঋণ দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। তাহারা খাতকদের যে সকল জমি বন্ধক রাখিয়াছিল সেই সকল জমির খাজনা দিতে তাহারা অস্বীকার করিলে অবস্থা চরমে উঠে। রাজস্ব-বিভাগ নূতন আইন করিয়া জমিজমা নিলামে তুলিয়া খাজনা আদায় করিতে থাকে। সাউকারগণ নামমাত্র মূল্যে সেই সকল জমি সরকারের নিকট হইতে নিলামে ক্রয় করিয়া প্রত্যক্ষভাবে জমির মালিক হইয়া বসে। এই অবস্থার ফলে বোম্বাই প্রদেশের সমগ্র কৃষি-ব্যবস্থায় চরম অরাজকতা দেখা দেয়। এই অসহনীয় অবস্থায় মরিয়া হইয়া কৃষক জনসাধারণ নিজেদের জীবন ও জীবিকা রক্ষার উদ্দেশ্যে তাহাদের প্রত্যক্ষ শত্রু মহাজনগোষ্ঠীর উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দেয়।

বিদ্রোহের কাহিনী

সর্বপ্রথম পুনা জেলা হইতে বিদ্রোহের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উঠিতে আরম্ভ করে। পুনা জেলার সিরুর তালুকের কারদে গ্রামের কৃষকগণ মারোয়াড়ী সাউকার মহাজনদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া কৃষক জনসাধারণের ক্রোধ ফাটিয়া পড়ে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কালুরাম নামক এক মারোয়াড়ী অন্যায়ভাবে ঋণের দায়ে এক দেশমুখের গৃহ-জমিজমা, এমনকি অলংকার প্রভৃতিও আদালতের ডিক্রী লইয়া আত্মসাৎ করিলে এবং তাহার ঘরবাড়ী ভাঙিয়া লইয়া গেলে দেশমুখ গ্রামের সকল কৃষককে আহ্বান করিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে।

বিপন্ন দেশমুখের আহ্বানে কারদে গ্রামের সকল অধিবাসী সমবেত হইয়া সঙ্কল্প গ্রহণ করে যে তাহারা মরিয়া গেলেও কোন মারোয়াড়ী মহাজনের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিবে না, তাহাদের নিকট হইতে কোন দ্রব্য ক্রয় করিবে না, এমনকি গ্রামের কোন লোক মারোয়াড়ীদের গৃহে ভৃত্যের কাজও করিবে না। তাহারা মারোয়াড়ীদের মুদি-দোকানও বয়কট করে এবং গ্রামের এক ব্যক্তি গ্রামবাসীদিগকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করিবার জন্য একটি মুদি দোকান খুলিয়া বসে। এই সামাজিক বয়কটের ফলে মারোয়াড়ীরা আতঙ্কিত হইয়া উঠে। তাহারা পুলিশের সাহায্যে গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিলে গ্রামবাসিগণ তাহাদের বাধা দেয়। মহাজনগণ স্বগৃহে বন্দী অবস্থায় পুলিশ পাহারায় অবস্থান করিতে থাকে। ক্রুদ্ধ চাষীরা মারোয়াড়ী মহাজনদের গৃহের মধ্যে কুকুর ও বিড়ালের মৃতদেহ, মলমূত্র প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে।

এইভাবে পুনা জেলার কারদে গ্রাম হইতে যে সংগ্রামের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উঠে তাহা ক্রমশ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া সমগ্র বোম্বাই প্রদেশে এক বিরাট দাবানল সৃষ্টি করে, আর তাহার ফলে ভারতের ব্রিটিশ শাসন ও উহার জমিদার-মহাজন প্রভৃতি অনুচর-গণের শোষণ-উৎপীড়নের কুৎসিত রূপটি প্রকট হইয়া পড়ে।

কারদে গ্রামের বিদ্রোহে উৎসাহিত হইয়া ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে পুনা জেলার ভীমথারি তালুকের সুপা নামক একটি বৃহৎ গ্রামের সমস্ত অধিবাসী সমবেত হইয়া গ্রাম হইতে মহাজনদিগকে বিতাড়িত করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করে। এই গ্রামের মহাজনগণ সকলেই ছিল গুজরাটী। তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া গ্রামের মধ্যে ঘাঁটি করিয়া বসিয়াছিল। ক্রোধোন্মত্ত কৃষক জনসাধারণ মহাজনদের গদি, বাড়ী ও দোকানপাট ধূলিসাৎ করিয়া তাহা ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। কৃষক জনতা কাহাকেও প্রাণে না মারিয়া কেবল তাহাদের শোষণ-উৎপীড়ন দ্বারা লব্ধ সম্পত্তি ও দোকানঘরগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলে।

সুপা গ্রামের এই বিদ্রোহের সংবাদ অবিলম্বে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। 'ডেকান রায়ট কমিশন' মন্তব্য করিয়া লিখিয়াছেন :

"সমগ্র অঞ্চলের অবস্থা এরূপ হইয়া উঠিয়াছিল যে, কারদে আর সুপা গ্রাম এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব না নিলেও কোন না কোন অঞ্চল নিশ্চয়ই ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিত। অতিদাহ্য বারুদস্তূপ সর্বত্রই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। কোন একটা সামান্য ঘটনাই এই বারুদের স্তূপ প্রজ্বলিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইত।"

কৃষকদের মহাজন-বিরোধী বিদ্রোহ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সুপা গ্রাম হইতে বিস্তার লাভ করিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে ছড়াইয়া পড়ে। সুপা গ্রামের পরেই বিদ্রোহ আরম্ভ হয় খেরগাঁও গ্রামে। কৃষক জনতা গ্রামের প্রধান সাউকারের খড়ের গুদামে আগুন লাগাইয়া উহা ভস্মীভূত করে। তাহারা সাউকারের বাসগৃহেও আগুন লাগাইয়া দেয়। পরবর্তী দুইদিনে আরও চারিটি গ্রামে বিদ্রোহ বিস্তৃত হয় এবং অল্প কয়েক দিনের মধ্যে আরও ১৭ খানি গ্রামে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। এই সকল গ্রামে কৃষক জনতা সাউকার-মহাজনদের উপর আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের বাসগৃহ, শস্যগোলা, গদি প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়া ভস্মীভূত করে।

এবার বিদ্রোহ পুনা জেলা হইতে পার্শ্ববর্তী ইন্দাপুর ও পুরন্দর জেলায় বিস্তৃত হয়। সর্বত্র গ্রামাঞ্চল হইতে সাউকার-মহাজনগণ শহরে পলায়ন করিতে থাকে। বিদ্রোহীরা সাউকার-মহাজনদের বাসগৃহ, গুদাম প্রভৃতিতে আগুন লাগাইয়া তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস করে। সাউকারগণের আকুল আবেদনে সাড়া দিয়া বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও সৈন্য গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে এবং কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করিতে থাকে। হাজার হাজার কৃষককে গ্রেপ্তার করা হয়।

ইতিমধ্যে পুনা জেলার শিরুর তালুকেও বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করে। এই তালুকের সাভ্‌রা গ্রাম বিদ্রোহের কেন্দ্র হইয়া উঠে। সাভ্‌রা গ্রামের একজন মারোয়াড়ী সাউকার প্রাণের ভয়ে তাহার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া গ্রাম হইতে পলায়নের চেষ্টা করে। সকল গ্রামবাসী একত্রিত হইয়া তাহার পলায়নে এবং সম্পত্তি অপসারণে বাধা দেয়। এই মারোয়াড়ীরা ছিল বংশপরম্পরায় সাউকার হিসাবে কুখ্যাত। ইহারা দীর্ঘকাল যাবৎ এই গ্রামে সাউকারী করিয়া বহু চাষীর সর্বনাশ করিয়াছিল, তাহাদের জমিজমা ও ঘরবাড়ী পর্যন্ত আত্মসাৎ করিয়াছিল। দুই বৎসর

পূর্বে এই মারোয়াড়ীর খুল্লতাত তাহার উৎপীড়নের পরিণাম হিসাবে খাতকদের হস্তে নিহত হইয়াছিল। মারোয়াড়ী সাউকারটি পলায়ন করিতে না পারিয়া নিজ গৃহে বন্দী হইয়া থাকে। তাহার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। গ্রামের চাষীরা তাহার নিকট হইতে সকল ঋণপত্র কাড়িয়া লইয়া আগুনে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। কাভ্‌রা গ্রাম হইতে বিদ্রোহ অন্যান্য গ্রামে বিস্তৃত হয়। কারদে ও দামারে গ্রামের বিদ্রোহ ভীষণ আকার ধারণ করে।

দামারে গ্রামের সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত মারোয়াড়ী সাউকার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া গ্রাম হইতে পলায়নের চেষ্টা করিলে ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীরা তাহাকে লাঠি দ্বারা প্রহার করিয়া পঙ্গু করিয়া দেয়। প্রহারের ফলে তাহার হাত-পা ভাঙিয়া যায়। ইহার পর গ্রামের চাষীরা তাহাকে গৃহের মধ্যে আটক করিয়া গৃহে অগ্নি সংযোগ করে। কতিপয় গ্রামবাসী তাহাকে জ্বলন্ত গৃহ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করে।

সিরুর তালুকের ১৫ খানি এবং হাভেলি তালুকের ৮ খানি গ্রাম হইতে কৃষকগণ সকল মারোয়াড়ী সাউকারের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া এবং সমস্ত দলিলপত্র পোড়াইয়া দিয়া তাহাদিগকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য সিরুর তালুকে এক বিরাট অশ্বারোহী বাহিনী প্রবেশ করে এবং অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সহিত বিদ্রোহ দমন করে। কয়েক শত কৃষককে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করা হয়।

পুনা জেলায় যখন পূর্ণবেগে বিদ্রোহ চলিতেছিল সেই সময়ই আমেদনগর জেলার বিভিন্ন তালুকের বহু গ্রামে এই প্রকারের বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। বিদ্রোহীরা মারোয়াড়ী ও গুজরাটী সাউকারদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহাদিগকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেয়। তাহারা সর্বাগ্রে বলপূর্বক সাউকারদের নিকট হইতে ঋণপত্র, জামিনপত্র ও অন্যান্য দলিলপত্র হস্তগত করিয়া পুড়াইয়া ফেলে। বহু ক্ষেত্রে কৃষকগণ সাউকারদের প্রচণ্ড প্রহারে জর্জরিত করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু মৃত্যুর ঘটনা অল্পই ঘটিয়াছে।

আমেদাবাদ জেলার শ্রীগোণ্ডা, পারনার, নাগার ও কারজাত তালুকে বিদ্রোহ অতি ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। এই সকল তালুকে এরূপ একটিও গ্রাম ছিল না যেখানকার কৃষকগণ একত্রিত হইয়া গ্রামের সকল গুজরাটী ও মারোয়াড়ী সাউকারদের বাসগৃহ, গদি, গুদাম প্রভৃতি লুণ্ঠন করে নাই এবং সকল দলিলপত্র আগুনে পুড়াইয়া ফেলে নাই। এই সকল তালুক ব্যতীত আমেদাবাদের অন্যান্য তালুকেও বিদ্রোহ ব্যাপক আকারে দেখা দিয়াছিল।

বোম্বাই সরকার অন্যান্য জেলার মত আমেদাবাদেও বহু পুলিশ ও সৈন্য আমদানি করিয়া বিদ্রোহ দমন এবং সাউকারদের রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। পদাতিক বাহিনী ব্যতীত একটি বৃহৎ অশ্বারোহী বাহিনীও বিদ্রোহ দমনের কার্যে নিযুক্ত করা হয়। পুলিস ও সৈন্যবাহিনী একত্রে বিভিন্ন গ্রামে ঘাঁটি স্থাপন করে এবং নির্মম

অত্যাচার ও ব্যাপকভাবে বিদ্রোহী কৃষকদের গ্রেপ্তার করিয়া শেষ পর্যন্ত অবস্থা আয়ত্তে আনিতে সক্ষম হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল বহু চেষ্টা করিয়াও তাহারা সাউকারদের গ্রামে ফিরাইয়া আনিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয় নাই। বিপুল পুলিস ও সামরিক বাহিনী নিযুক্ত করিয়া বিদ্রোহের বেগ, ব্যাপকতা ও তীব্রতা হ্রাস করিতে পারিলেও এবং প্রায় ৬ হাজার কৃষককে মামলায় বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দিয়াও কৃষক জনসাধারণের বিদ্রোহী মনোভাব ও প্রবল উত্তেজনা দমন করা দীর্ঘকাল পর্যন্ত সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাই বিভিন্ন বিবরণ হইতে দেখা যায়, বিদ্রোহ দমনের পরেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সাউকারদের উপর দৈহিক আক্রমণ, তাহাদের গৃহ ও গদি লুণ্ঠন, বাসগৃহে অগ্নি-সংযোগ প্রভৃতি চলিয়াছিল।

বিদ্রোহের চরিত্র

বিদ্রোহের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলে এই বিদ্রোহের কতিপয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

১. সর্বত্র বিদ্রোহী কৃষকদের প্রধান ঝোঁক ছিল ঋণপত্র, দলিল ও হিসাবগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলিবার দিকে। কারণ, তাহারা জানিত যে, এইগুলি দ্বারাই সাউকারগণ জনসাধারণকে এতকাল সর্বস্বান্ত করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। তাই এই দলিলপত্রগুলি সাউকারদের কবল হইতে কাড়িয়া লইয়া পুড়াইয়া ফেলাই ছিল বিদ্রোহীদের প্রধান কার্য। বহুস্থানে সাউকারদের শস্য-গুদাম প্রভৃতি লুণ্ঠিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু কেবল বুভুক্ষু, দরিদ্র কৃষক তাহাদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্যই ইহা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কৃষকেরাই ছিল এই শস্যের প্রকৃত মালিক। কারণ ঋণগ্রস্ত কৃষকের যে সকল জমি অন্যায়ভাবে সাউকারগণ আত্মসাৎ করিয়াছিল সেই সকল জমি হইতেই এই শস্য সঞ্চিত হইয়াছিল।

২ বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও বিদ্রোহী কৃষকদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা থাকিলেও সাউকারদের প্রাণহানি অতি সামান্যই হইয়াছে। মাত্র পাঁচজন সাউকার বিদ্রোহী কৃষকদের হস্তে নিহত হইয়াছিল। ইহারা কিছুতেই ঋণপত্র ও দলিলপত্রগুলি কৃষকদের হস্তে অর্পণ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় কৃষকগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাদিগকে লাঠির প্রহারে হত্যা করিয়াছিল। মাত্র একটি ক্ষেত্রে একজন সাউকারকে হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় জলন্ত গৃহের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল।

৩. 'ডেকান রায়ট কমিশন'-এর রিপোর্টে প্রাণহানির ঘটনার অল্পতা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই বিদ্রোহের প্রধান শক্তি কুন্‌বি চাষীদের প্রকৃতি অত্যন্ত দুর্ধর্ষ হইলেও উচ্চতর শ্রেণীর কিছু সংখ্যক লোক এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়া ইহাকে রক্তাক্ত সংগ্রামে পরিণত হইতে দেয় নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, সাউকারদের শোষণ উৎপীড়নে কেবল কৃষকগণই সর্বস্বান্ত হয় নাই, উচ্চশ্রেণীর কিছু সংখ্যক লোকও সর্বস্বান্ত হইয়া এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। তাহারাই অধিক রক্তপাত হইতে চাষীদিগকে নিরস্ত করিয়াছিল। এই উচ্চশ্রেণীর

লোক হইল সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত প্যাটেলগণ।

৪. 'ডেকান রায়ট কমিশনের' রিপোর্টে মন্তব্য করা হইয়াছে যে, দাক্ষিণাত্যের কুন্‌বি চাষীরা দুর্ধর্ষ প্রকৃতির হইলেও আইনের প্রতি তাহাদের একটা স্বাভাবিক আনুগত্য আছে। এই আনুগত্যই তাহাদিগকে সংযত রাখিয়াছিল।

৫. দাক্ষিণাত্য-বিদ্রোহ কোন কোন বিষয়ে অন্যান্য কৃষক-বিদ্রোহ হইতে ভিন্ন। কোন শ্রেণী-বিরোধ বা শ্রেণী-সংঘর্ষ এই বিদ্রোহের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল না। একটি সুনির্দিষ্ট ও প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যেই এই বিদ্রোহের আগুন অতি ধীরে ধীরে ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যটি ছিল শত্রু মহাজনগোষ্ঠীর হস্ত হইতে শোষণ-উৎপীড়নের অস্ত্রগুলি অর্থাৎ ঋণপত্র, দলিল ও হিসাবগুলি কাড়িয়া লইয়া ধ্বংস করিয়া ফেলা। ইহার জন্য গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন শক্তি ও জনসমাবেশ এবং বলপ্রয়োগ নহে, বলপ্রয়োগের উদ্যোগ ও আয়োজনই যথেষ্ট ছিল।

বিদ্রোহের পরিণতি

দাক্ষিণাত্য-বিদ্রোহের ফলে সমগ্র বৃটিশ শাসনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাত্য জোড়া এই বিদ্রোহের ফলে বৃটিশ শাসনের অন্যতম স্তম্ভ মহাজনশ্রেণীর ধ্বংস আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল এবং ততোধিক ভয়ঙ্কর এক কৃষক-বিদ্রোহের ঝড় উঠিতেছিল। মহাজনশ্রেণীকে রক্ষা করিতে না পারিলে কৃষকদের নিকট হইতে নিয়মিত ও উচ্চহারে খাজনা আদায় বন্ধ হইয়া যাইবে, আর ক্রমবর্ধমান কৃষক-বিদ্রোহে বাধা দিতে না পারিলে ভারতের বৃটিশ শাসন বিপন্ন হইবে। এই উভয় সংকট হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্যই ভীত-সন্ত্রস্ত বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য-বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান ও তাহার প্রতিকারের উপায় খুঁজিয়া বাহির করিবার উদ্দেশ্যে 'দাক্ষিণাত্য-বিদ্রোহ কমিশন' (Deccan Riot Commission) গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়াই ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 'দাক্ষিণাত্যের কৃষি-সাহায্য আইন' নামে একটি আইন পাস করা হয়। এই আইনে ঋণের দায়ে খাতকদের কারারুদ্ধ করা নিষিদ্ধ হয় এবং আদালতকে মহাজনদের হিসাব ও খাতকদের সহিত তাহাদের লেনদেনের দলিলপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অধিকার দান করা হয়। ইহা ব্যতীত এই আইনে আদালতকে মহাজনদের সুদের হার "যুক্তিসঙ্গতভাবে" হ্রাস করিয়া তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিবার অধিকার দেওয়া হয়।[১]

টমসন ও গ্যারাট্‌ এই আইনের ফলাফল ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন:

কয়েক বৎসর পর্যন্ত এই আইন মহাজনী প্রথার চরম অনিষ্টকর ক্রিয়াকলাপ সংযত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। '১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ কমিশন' (Famine Commi-

১। E. Thomson & G. T. Garrat: Rise and Fulfilment of British Rule in India, p. 487.

ssion of 1880) এই আইন অন্যান্য প্রদেশেও প্রয়োগ করিবার সুপারিশ করিয়াছিল। কিন্তু আইনজীবীরা ক্রমশ এই আইনের ব্যবস্থাসমূহ এড়াইয়া চলিবার কৌশল বাহির করিয়া লয়। প্রধান আদালতগুলির অত্যধিক আইনপ্রীতি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্য মহাজনগোষ্ঠীকে এরূপ সুযোগ-সুবিধা দান করে যে, কোন আইনই তাহাদিগকে আর সংযত করিতে পারে নাই। এমনকি সরকারী 'কৃষি ঋণ-দান আইন' অনুযায়ী কৃষকদিগকে ঋণ দিবার ব্যবস্থাও মহাজনদিগকে বাধা দিতে ব্যর্থ হয়। '১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ কমিশন'-এর বিবরণীতে লিখিত হইয়াছিল যে, 'কৃষকদের এক-তৃতীয়াংশ ভয়ঙ্কর ঋণের জালে এরূপভাবে আবদ্ধ যে ইহা হইতে তাহাদের উদ্ধার লাভের কোন আশাই নাই এবং আর এক-তৃতীয়াংশও ঋণের জালে আবদ্ধ, তবে চেষ্টা করিলে তাহাদের উদ্ধার লাভের আশা আছে।'

৮. রুম্পা-বিদ্রোহ (১৮৭৮-৭৯)—মাদ্রাজ

মাদ্রাজের মহাদুর্ভিক্ষ

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে সমগ্র মাদ্রাজ প্রদেশ জুড়িয়া যে দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব চলিয়াছিল, তাহাতে প্রাণ হারাইয়াছিল প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ। এই ৫০ লক্ষ মানুষের অধিকাংশই ছিল কৃষক, কারিগর ও তাঁতী। এই দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব হইতেই ইহার পদধ্বনি শুনা যাইতেছিল, এমনকি বিভিন্ন সরকারী বিবরণেও পূর্বেই সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী তখন লুণ্ঠনের কার্যে এতই ব্যস্ত যে, কোন প্রকার সতর্কবাণী শুনিবার এবং ভারতবাসীদের আসন্ন বিপদের সংকেত উপলব্ধি করিবার সময় তাহাদের ছিল না।

বৃটিশ শাসনের নৃশংসতার জন্য এই দুর্ভিক্ষের পরিণতি সহস্র গুণ অধিক মর্মান্তিক হইয়া উঠে। যে সময় প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় আর্তনাদ করিতেছিল, ক্ষুধার্ত মানুষ মুমূর্ষু ও মৃত মানুষের দেহ হইতে মাংস ছিঁড়িয়া খাইয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছিল, সমগ্র মাদ্রাজ প্রদেশ মানুষের মৃতদেহে ছাইয়া গিয়াছিল, সেই সময়ই তৎকালের গভর্নর-জেনারেল লর্ড লিটন অজ্ঞ ভারতবাসীদিগকে বৃটিশ-রাজের জাঁকজমক ও দম্ভ দেখাইয়া ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য অজস্র অর্থব্যয়ে দিল্লীতে এক 'দরবার' বসাইয়াছিলেন।[১]

এই দুর্ভিক্ষ কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য ঘটে নাই, ইহা ঘটিয়াছিল বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর অমানুষিক শোষণের ফল হিসাবে। অত্যধিক ভূমি-রাজস্ব আদায় এবং তাহার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ কৃষক জনসাধারণের চরম দারিদ্র্যই এই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ। কৃষক জনসাধারণ সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই তাহারা টাকা দিয়া খাদ্য ক্রয় করিতে পারিত না। ইহাই ছিল দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ।[২] ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বরের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় এই দুর্ভিক্ষের কারণ ব্যাখ্যা

১। A. Y. Ayapyan : Report on the Aboriginal Tribes of Madras, p. 162.
২। Ibid, p. 164.

করিয়া এবং বৃটিশ যুগের পূর্বকালের দুর্ভিক্ষের সহিত ইহার তুলনা করিয়া লিখিত হইয়াছিল :

"শস্যের অভাব নহে, অর্থাভাবই বর্তমান কালের দুর্ভিক্ষের কারণ। বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর আগমনের পূর্বে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে। কিন্তু বর্তমান কালের দুর্ভিক্ষের একমাত্র কারণ দারিদ্র।"[১]

অত্যধিক কর আদায়ই যে এই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়া ঐ পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল :

"ক্রোধ অপেক্ষা অধিক দুঃখের সঙ্গেই আমরা লিখিতেছি যে, ভারতবাসীদের জীবন রক্ষার পবিত্র কর্তব্য সাধন করিতে সরকার ব্যর্থ হইয়াছে।" "আমরা একটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, অত্যধিক কর আদায় করিয়া সুফল ফলে না। ইহার পরিণামে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।"[২]

মাদ্রাজ প্রদেশের কৃষ্ণা হইতে কমোরিণ প্রণালী পর্যন্ত বিশাল অঞ্চলের ১৪ কোটি মানুষের বাসভূমি ৬টি জেলায় এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বঙ্গদেশের 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' ও অন্যান্য মহাদুর্ভিক্ষের মতই এই দুর্ভিক্ষেও সর্বাপেক্ষা অধিক মৃত্যু ঘটিয়াছিল কারিগর ও তাঁতী সম্প্রদায়ের। এই দুর্ভিক্ষের সময় বঙ্গদেশের 'আদি ব্রাহ্মসমাজ'-এর সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতাবাসীদের এক সভার আয়োজন করিয়া মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যের জন্য অর্থদানের আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময় বঙ্গদেশেও এক দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হওয়ায় অতি সামান্য অর্থই আদায় হইয়াছিল।

রুম্পা আদিবাসীদের অভ্যুত্থান

মাদ্রাজের এই মহাদুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় আরম্ভ হইয়াছিল গোদাবরী জেলার রুম্পা আদিবাসীদের সশস্ত্র বিদ্রোহ। এই পর্বত অরণ্যচারী আদিবাসীরাও এই মহাদুর্ভিক্ষের কবল হইতে অব্যাহতি পায় নাই। দুর্ভিক্ষের ফলে তাহারাও বহু সংখ্যায় মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তথাপি সেই সময় অরণ্যের ফলমূল খাইয়া তাহাদের অধিকাংশ জীবনরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হ্রাস পাইবার পর বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী তাহাদের উপর নূতন এক আক্রমণের পরিকল্পনা করে। সেই আক্রমণের ফলে তাহাদের জীবনে নূতন বিপর্যয় দেখা দেয়। আদিবাসীদের উপর নূতন করের বোঝা চাপাইয়া দিয়াই শাসকগোষ্ঠী সেই আক্রমণ আরম্ভ করে।

এই সময় শাসকগোষ্ঠী তাহাদের 'আফগান অভিযান'-এর ব্যয় সঙ্কুলানের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ হইতে যেভাবে হউক অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য নূতন নূতন পরিকল্পনা করে। এই পরিকল্পনাগুলির একটি ছিল ভারতবর্ষের সকল পর্বত-অরণ্যচারী আদিবাসীদের জীবিকার উপর নূতন কর ধার্যকরণ। শাসকগোষ্ঠী রুম্পাদের উপর বর্ধিত হারে

১। Amrita Bazar Patrika, Nov. 23, 1876.

২। Amrita Bazar Patrika, 26th July, 1877.

ভূমি-রাজস্ব ধার্য করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা রুম্পাদের বন হইতে কাঠ প্রভৃতি সংগ্রহের উপরেও নানা প্রকারের বাধা-নিষেধ আরোপ করে। বর্ধিত হারে ভূমি-রাজস্ব আদায় এবং বন-সংক্রান্ত বাধা-নিষেধের ফলেই রুম্পা-বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। এই বিদ্রোহ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[১]

এই ভূমি-রাজস্ব এবং বন-সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ রুম্পাদের পক্ষে ছিল সম্পূর্ণ নূতন ঘটনা। ইহার পূর্বে কোন কালে কোন রাজা বা শাসক অতি দরিদ্র রুম্পা আদিবাসীদের উপর এই প্রকারের কোন রাজস্ব আদায় অথবা বনভূমির উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করে নাই। এই নূতন আইন পাস হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীরা রুম্পা-অঞ্চলে উপস্থিত হইয়া রাজস্ব আদায় করিবার জন্য উৎপীড়ন আরম্ভ করে। বনের মধ্যে তাহাদের প্রবেশেও বাধা দেওয়া হয়। এই উৎপীড়নে ক্ষিপ্ত হইয়া রুম্পা আদিবাসীরা রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রায় সকলকেই হত্যা করে। এইভাবে রুম্পা-বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া যায়।

গোষ্ঠীপ্রথা মূলক রুম্পা সমাজে সকল কার্যই পরিচালিত হয় গোষ্ঠীবদ্ধভাবে। সুতরাং সকল রুম্পা আদিবাসী একত্রিত হইয়াই বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। চান্দ্রিয়া নামক একজন রুম্পা সর্দার বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য প্রধান নেতা রূপে নির্বাচিত হন। তাঁহার সহকারী রূপে থাকেন লিঙ্গম রেড্ডি, থুমন ধোরা এবং আরও কয়েকজন সর্দার।[২]

পূর্ণোদ্যমে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যে গোদাবরী জেলার ১০০ মাইলব্যাপী সমগ্র রুম্পা অঞ্চলে বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করে। রুম্পা-বিদ্রোহীরা তাহাদের বাসভূমি হইতে বৃটিশ শাসনের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে থাকে। বহু সরকারী কর্মচারী তাহাদের হস্তে নিহত হয় এবং বহু কর্মচারী পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করে।

বিদ্রোহ দমন করিবার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই রুম্পা অঞ্চলে এক বিশাল সশস্ত্র পুলিস বাহিনী আসিয়া উপস্থিত হয়। কিছুদিন ধরিয়া সশস্ত্র পুলিসের সহিত রুম্পাদের খণ্ডযুদ্ধ চলিতে থাকে। এই সকল খণ্ড যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু হতাহত হয়। রুম্পাদের প্রধান অস্ত্র তীর-ধনুক, আর কয়েকটি সেকেলে 'ম্যাচ্‌লক' বন্দুক (পলতে লাগান বন্দুক) এবং দু-একটি মাস্কেট বন্দুক। এই সকল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া উন্নত আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত, সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে অধিক দিন সম্মুখযুদ্ধ করা চলে না। সুতরাং রুম্পা-বিদ্রোহীরা পাহাড়ে-জঙ্গলে পলায়ন করিয়া সেই স্থান হইতে গেরিলা-কৌশলে যুদ্ধ চালাইতে থাকে। এই সময় রুম্পা বিদ্রোহীদের যুদ্ধ-ক্ষমতা, অস্ত্রশস্ত্র আর যুদ্ধ-কৌশল সম্বন্ধে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় নিম্নোক্ত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছিল:

১। Ayapyan, Ibid, p. 165 & Amrita Bazar Patrika, 20th Feb.. 1880.

২। Ayapyan: Ibid. p, 165: The Amrita Bazar Patrika Centenary Supplement, March 29, 1968 (The Famine & the Rumpa Rebellion).

"স্বভাবত শান্ত প্রকৃতির এই পার্বত্য অধিবাসীরা মরিয়া হইয়া জীবনমৃত্যু তুচ্ছ করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিল। শান্ত মানুষগুলি দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিল। ম্যাচ্‌লক ও মাস্কেট বন্দুক এবং তীর-ধনুক চালনায় তাহারা সুদক্ষ। মাস্কেট বন্দুক চালনায় তাহারা সশস্ত্র পুলিসদেরও হার মানায়। ...তাহারা যে কৌশলে যুদ্ধ করে তাহা গেরিলা-যুদ্ধের কৌশল। এই গেরিলা-যুদ্ধের কৌশলেই তাহারা পাহাড়ের ঘাঁটি হইতে যুদ্ধ চালাইতেছে। বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য গোদাবরী জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বিদ্রোহীদের গ্রামগুলি আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া দিবার নির্দেশ দিয়াছেন।"[১]

সশস্ত্র পুলিস বাহিনী বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হওয়ায় এবার এক বিপুল সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়। কয়েকজন বৃটিশ সেনাপতি তাহাদের পরিচালক হইয়া আসে। 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র মাদ্রাজী সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:

"য়ুরোপীয় সেনাপতিরা বিদ্রোহীদের গ্রেপ্তার করা অপেক্ষা বনের বাঘ আর অন্যান্য জীবজন্তু হত্যা করিতেই অধিক দক্ষতা দেখাইল। বিদ্রোহীদের গ্রেপ্তার করিতে না পারিয়া তাহারা বিদ্রোহীদের সাহায্য করিবার অভিযোগে নিরীহ গ্রামবাসীদের দলে দলে গ্রেপ্তার করিল। গ্রামবাসীরা য়ুরোপীয় সেনাপতিদের আদেশ অমান্য করিতে ভয় পাইল। কারণ, তাহা করিলে তাহাদের মৃত্যু নিশ্চিত। মাদ্রাজের গভর্নরের আজ্ঞাবহ এক বিচারক জুরির সাহায্যে তাহাদের বিচারকার্য চালাইলেন এবং ডাকাতির অভিযোগে তাহাদের শাস্তি দিলেন।"[২]

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিদ্রোহের প্রধান নায়ক চান্দ্রিয়ার মৃত্যু ঘটে। কিভাবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। সম্ভবত কোন খণ্ডযুদ্ধে শত্রুসৈন্যবাহিনীর গুলিতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।[৩] তাঁহার মৃত্যুর পর যোগ্য পরিচালকের অভাবে রুম্পারা নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে এবং পর পর কয়েকটি যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় ঘটে। ইহার পর ধীরে ধীরে বিদ্রোহের আগুন নিবিয়া আসে। বিদ্রোহের অবসান ও উহার নায়ক চান্দ্রিয়ার নেতৃত্ব সম্বন্ধে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র মাদ্রাজী সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন:

"রুম্পা-বিদ্রোহের অবসান হইয়াছে। কিন্তু তাহা আমাদের সাহসী সৈন্যবাহিনীর জন্য হয় নাই, হইয়াছে চান্দ্রিয়ার মৃত্যুর জন্য। তাঁহার ছিন্নমুণ্ড রাজমুন্দ্রীতে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে রাজমুন্দ্রী জেলের কর্মচারীরা এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজন সেই ছিন্নমুণ্ড চান্দ্রিয়ার বলিয়া সনাক্ত করে।"

ইহার পর সংবাদদাতা মন্তব্য করিয়াছেন:

"এই মানুষটির (চান্দ্রিয়ার—লেঃ) উদ্দেশ্য ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতিভাকে কাজে লাগাইলে জনসাধারণ এবং সরকার বিশেষভাবে উপকৃত হইত।"[৪]

১। Amrita Bazar Patrika, 21 Aug., 1879.
২। Amrita Bazar Patrika, 18th Sept., 1879.
৩। Ayapyan: Idid. p. 166.
৪। Amrita Bazar Patrika. 20th February, 1880.

৯. খোন্দ বিদ্রোহ (১৮৬২-৯৪)

উড়িষ্যার খোন্দ উপজাতি তাহাদের সামন্ত রাজাদের বিরুদ্ধে বারংবার বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। প্রথমে উড়িষ্যার বাউদ রাজ্যের রাজার বিরুদ্ধে ঐ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত খোন্দ উপজাতি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ করিয়াছিল। রাজা বৃটিশ শাসকদের সাহায্যে বহু কষ্টে এবং বহু প্রাণহানির পর এই বিদ্রোহ দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ইহার পর ১৮৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে কালাহাণ্ডি রাজ্যের খোন্দগণ বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। রাজা খোন্দদের বিতাড়িত করিয়া তাহাদের জমিজমা হিন্দু চাষীদের নিকট অধিক খাজনায় পত্তন দিলে এই বিদ্রোহ দেখা দেয়। খোন্দগণ দলবদ্ধ ও সশস্ত্র হইয়া হিন্দু চাষীদের উপর আক্রমণ করিতে থাকে। ইহার ফলে বহু হিন্দু চাষী নিহত হয়। কয়েক মাস যাবৎ এই বিদ্রোহ চলে। রাজা বহু কষ্টে এবং বৃটিশ সামরিক শক্তির সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করিতে সক্ষম হয়।

ইহার পর আবার ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নয়াগড় রাজ্যের খোন্দ উপজাতি রাজার শোষণ-উৎপীড়নে অস্থির হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহে রাজার পক্ষের জমিদারদের বহু সম্পত্তি বিনষ্ট এবং বহু লোক নিহত হয়। রাজ্যের রাজা এবং সকল জমিদার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া বিদ্রোহ দমন করিতে সক্ষম হয়।[১]

১০. দ্বিতীয় কেওঞ্ঝার-বিদ্রোহ (১৮৯১)

কেওঞ্ঝার রাজ্যের মহারাজের অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নে অস্থির হইয়া এই রাজ্যের ভূঁইয়া আদিবাসীরা ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। এইবার বিদ্রোহীরা পূর্বাপেক্ষা অধিক সংগঠিত হইয়াই বিদ্রোহ আরম্ভ করে। তাহারা রাজধানী আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন, অগ্নি-সংযোগ প্রভৃতি দ্বারা উহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। রাজা প্রাণের ভয়ে সপরিবারে পলায়ন করিয়া উড়িষ্যার রাজধানী কটকে উপস্থিত হন। রাজ্যের জমিদারগোষ্ঠী ও রাজকর্মচারীরা এবং রাজ্যের সমস্ত পুলিস ও পাইক-বরকন্দাজ একত্রিত করিয়া বিদ্রোহ দমনের প্রয়াস পায়। এবারেও বিদ্রোহীরা কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। এইভাবে দ্বিতীয় কেওঞ্ঝার বিদ্রোহের অবসান ঘটে।[২]

১১. মোপলা-বিদ্রোহ (১৮৭৩-৯৬)[৩]

মোপলাদের পরিচয়

মালাবারের মুসলমান ধর্মাবলম্বী মোপলা কৃষকের ধারাবাহিক বিদ্রোহ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের জনসাধারণের স্বাধীনতা-সংগ্রামেরই একটি গৌরবোজ্জ্বল

১। L. S. S. O'Malley: Bengal, Bihar & Orissa Under British Rule, p. 682.

২। L. S. S, O'Malley: Ibid, p. 450. ৩। যে সকল গ্রন্থ হইতে এই বিদ্রোহের তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে: C. Gopalan Nayer; The Mopla Rebellion; C. G. Nayar; The Moplas of Malabar; The Mopla Rebellion by the Malabar Reconstruction Committee; Major P. Holland: The Moplas; Malabar District Gazetteer.

অধ্যায়। বর্তমান কেরল রাজ্যের সমুদ্রতটবাসী এই মোপলা সম্প্রদায়ের উপর বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রথম আক্রমণ হইয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। সেই সময় হইতেই মোপলা সম্প্রদায় বৃটিশ শাসনের আর্থিক শোষণের শিকারে পরিণত হইয়াছিল। আর তখন হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল বৃটিশ শাসনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কবল হইতে মোপলাদের আত্মরক্ষার সংগ্রাম। সেই ধারাবাহিক সংগ্রাম সেই সময় হইতে আরম্ভ হইয়া বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক, অর্থাৎ ১৯২১-২২ সাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়া ভারতের সশস্ত্র গণ-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন, চির-উজ্জ্বল অধ্যায় যোজনা করিয়াছে এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অফুরন্ত প্রেরণা যোগাইতেছে।

বর্তমান মোপলাদের পূর্বপুরুষেরা বহুকাল পূর্বে এক সময় যুগযুগান্তকালের দুঃখ-দারিদ্র্যের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় ঘুরিতে ঘুরিতে আরবদেশ হইতে দক্ষিণ-ভারতের সমুদ্র-উপকূলস্থ মালাবার অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। কালক্রমে তাহারা ভারতবর্ষকেই নিজেদের দেশ বলিয়া গ্রহণ করে। তাহাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় হইল চাষবাস। তাহারা স্থানীয় জমিদারদের নিকট হইতে জমি বর্গা লইয়া চাষের কাজ আরম্ভ করে। প্রথম হইতে জমিদারগোষ্ঠী ফসলের অর্ধভাগ লইত, কিন্তু জমিচাষের সকল ব্যয়ই বহন করিতে হইত মোপলা চাষীকে। জমিদারগণ যখন ইচ্ছা জমি হইতে চাষীকে উৎখাত করিত। এই ব্যবস্থায় মোপলা চাষীদের দুঃখ-দুর্দশা দূর না হইয়া বরং তাহা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রকার জমিচাষের আয় হইতে মোপলারা জমিদারকে খাজনার অর্থ দিতে অপারগ হইত। সুতরাং ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও ঋণদাতা মহাজনগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। তাহারাই মোপলাদের ঋণ দিত, আর মোপলারা সেই ঋণের অর্থ দিয়া জমিদারকে খাজনা দিত। ঋণের দায়ে মোপলাদের জমি মহাজনগণ গ্রাস করিতে আরম্ভ করে। জমিদারদের সহিত মহাজনগোষ্ঠী একত্র হইয়া মোপলা চাষীদের সর্বস্বান্ত করিয়া ফেলে। ইহাদের সহিত বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়ন তো ছিলই। সুদূর আরবদেশ হইতে আসিয়া হতভাগ্য মোপলা চাষীরা তিন-তিনটা পর্বত-প্রমাণ শোষণের বোঝার চাপে পিষ্ট হইতে থাকে।

সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে মোপলাদের মত এরূপ দারিদ্র্য আর কাহারও ছিল না। মুসলিম ধর্ম নহে, অভাবনীয় দারিদ্র্যই মোপলা সম্প্রদায়কে দক্ষিণ-ভারতের একটা বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত করিয়াছিল। মোপলাদের চির-দারিদ্র্যই তাহাদিগকে করিয়া তুলিয়াছিল দুর্দান্ত, অসমসাহসী। বৃটিশ শাসক, জমিদার ও মহাজন—এই ত্রিশক্তির মিলিত শোষণই ইহাদিগকে করিয়া তুলিয়াছে মৃত্যুভয়হীন, দুর্ধর্ষ।

মোপলা চাষীর সংগ্রাম

মোপলা চাষীদের সংগ্রামের ইতিহাস অতি দীর্ঘকালের। এই অঞ্চলে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্বে দীর্ঘকাল হইতে তাহারা সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে। মোপলা চাষীরা যে মহীশূরের হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সংগ্রাম

করিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার নজির আছে। টিপুর পতনের পর যখন বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী এই অঞ্চলে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে, সেই সময় হইতেই মোপলা চাষীরা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম আরম্ভ করে। কর্নেল আর্থার ওয়েলেস্‌লিকে (পরবর্তীকালের ওয়াটার্লু-বিজয়ী 'ডিউক অফ ওয়েলিংটন'—সু. রা) দীর্ঘকাল পর্যন্ত মোপলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। S. J. Owen দ্বারা সম্পাদিত 'ডিউক অফ ওয়েলিংটন'-এর জীবন-কাহিনী হইতে গৃহীত নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি তাহার সাক্ষ্য বহন করে।

"উইনাদ ও মালাবারের উচ্চভূমির মোপলা ও অন্যান্য দুর্ধর্ষ অধিবাসীরা হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহ চালনা করিয়াছিল। তাহারা এখন বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালাইতেছে। তবে 'ডিউক'(ডিউক অফ ওয়েলিংটন—সু. রা.) তাহাদের বিদ্রোহ নির্মম হস্তে দমন করিয়াছেন।"[১]

* * * *

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। ভারতবর্ষের ইতিহাসের যুগান্তকারী ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হইয়া গেলেও উহার রণধ্বনি তখনও মিলাইয়া যায় নাই। সেই রণধ্বনি নূতন নূতন গণবিদ্রোহের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া ভারতের আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। দেশব্যাপী এই গণবিক্ষোভের মধ্যে অত্যাচার, শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মরিয়া হইয়া মালাবারের মোপলা চাষীরাও বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে।

মালাবারের ওয়ালুভানাদ ও এরনাদ তালুক জুড়িয়া দশলক্ষ মোপলা চাষী সামান্য কয়েকখানি তরবারি, লাঠি আর বল্লমের জোরে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। বৃটিশরাজ জমিদার আর মহাজনগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য দলে দলে পুলিস আর সৈন্য পাঠাইল। তাহাদের সহিত যোগ দিল জমিদার-মহাজনদের পাইক-বরকন্দাজ বাহিনী। মোপলারা পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর কামান-বন্দুকের সম্মুখে দাঁড়াইতে না পারিয়া নিকটবর্তী জঙ্গলে ও পাহাড়ে পলাইয়া গেল। পুলিশ ও সৈন্যরা মোপলাদের জীর্ণ কুটির ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিল।

বিদ্রোহী মোপলারা পাহাড়ে ঘাঁটি করিয়া গেরিলা যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। পাহাড়ের গোপন পথ দিয়া তাহারা হঠাৎ বাহির হইয়া পুলিস ও সৈন্যদলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং তাহাদের আঘাত দিয়া আবার উধাও হইয়া যায়। এইভাবে যুদ্ধ চলিল এক বৎসর। এই এক বৎসরে শত শত মোপলা চাষী প্রাণ দিল, পুলিস আর সৈন্যদেরও বহু হতাহত হইল। কিন্তু অবশেষে অগণিত পুলিস-সৈন্য-কামান-বন্দুকের নিকট প্রায় নিরস্ত্র মোপলারা পরাজিত হইল।

ইহার পর মোপলাদের উপর দিয়া বৃটিশ-জমিদার-মহাজনদের অত্যাচারের বন্যা বহিতে লাগিল। বৃটিশ শাসকগণ মোপলা অঞ্চলে স্থায়িভাবে একটি সৈন্যদল বসাইল।

১। Thomson & Garrat : Ibid, p. 210.

সেই সৈন্যদলের ব্যয়ভার বহন করিতে হইল মোপলাদেরই। এইভাবে শেষ হইল প্রথম মোপলা বিদ্রোহ। বিদ্রোহী মোপলারা ভবিষ্যতে আর একটা সুযোগের অপেক্ষায় সকল অত্যাচার মুখ বুজিয়া সহ্য করিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। সেই সময় সমগ্র দক্ষিণ-ভারত জুড়িয়া আর একটা বৃটিশ-জমিদার-মহাজন-বিরোধী কৃষক-সংগ্রামের ঢেউ উঠিতেছিল। মোপলা চাষীদের উপরেও জমিদার-মহাজন আর পুলিস ও সৈন্যদের শোষণ-উৎপীড়ন চরমে উঠিয়াছিল। এই শোষণ-উৎপীড়নে মোপলাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া যায়। তাহারা মরিয়া হইয়া স্থানীয় জমিদার, মহাজন ও সৈন্যদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দেয়। এবার মোপলারা পূর্বাপেক্ষা অধিক সংগঠিত, অনেক বেশী শক্তিশালী। এই দ্বিতীয় মোপলা-বিদ্রোহ চলিয়াছিল প্রায় দেড় বৎসর। এবার এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য প্রায় তিন হাজার সৈন্য, বহু সশস্ত্র পুলিস, অনেকগুলি কামান আর কয়েকখানি ছোট যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরিত হয়। বৃটিশ বাহিনী আর যুদ্ধ-জাহাজের নিষ্ঠুর আক্রমণে দ্বিতীয় মোপলা-বিদ্রোহও ব্যর্থ হইয়া যায়।

বিদ্রোহের পরাজয়ের পরেই আরম্ভ হয় অত্যাচারের পালা। প্রায় দেড় হাজার বিদ্রোহী মোপলা সৈন্য আর পুলিসের গুলিতে প্রাণ দেয়। কয়েকজন মোপলা নায়ককে পাঠানো হয় দ্বীপান্তরে। মোপলা অঞ্চলে স্থায়িভাবে সশস্ত্র পুলিসদল বসানো হয় এবং পিটুনী কর আদায়ের নাম করিয়া দরিদ্র মোপলাদের সর্বস্ব কাড়িয়া লওয়া হয়। চির-বিদ্রোহী মোপলা চাষী আবার একটা সুযোগের অপেক্ষায় দিন গণিতে থাকে।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। জমিদার-মহাজনগোষ্ঠী আর পুলিস-সৈন্যদলের শোষণ-উৎপীড়নে অস্থির হইয়া মোপলা চাষীরা বিভিন্ন স্থানে বাধা দিতে আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের উপর পুলিস আর সৈন্যদল আক্রমণ আরম্ভ করে। বহু মোপলাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সশস্ত্র পুলিস ও সৈন্যবাহিনী দিবারাত্র মোপলা অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা প্রকারে উৎপীড়ন করিতে থাকে। ইহার ফলে মোপলাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া যায়। আরম্ভ হইয়া যায় তৃতীয় মোপলা-বিদ্রোহ। কিন্তু কয়েকটা সংঘর্ষের পরই মোপলারা এবারও পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। এই বিদ্রোহের আয়োজন ছিল নিতান্ত অসম্পূর্ণ। কিন্তু ব্যর্থতার ফলে মোপলাদের মূল্য দিতে হইল অত্যধিক। প্রথমত, পূর্বের সশস্ত্র পুলিস আর সৈন্যদল ব্যতীত আরও সৈন্য আনিয়া স্থায়িভাবে মোপলা অঞ্চলে বসানো হইল এবং তাহাদের ব্যয়ভার চাপাইয়া দেওয়া হইল মোপলাদের উপরেই। দ্বিতীয়ত, তিনমাস পর্যন্ত দুইখানি যুদ্ধজাহাজ মালাবারের উপকূলে টহল দিয়া মধ্যে মধ্যে মোপলা অঞ্চলের উপর গোলা বর্ষণ

করিল। এ সকল সত্ত্বেও মোপলারা আর একটা সুযোগের অপেক্ষায় দিন গণিতে থাকে।

* * *

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। তৃতীয় মোপলা-বিদ্রোহের মাত্র দুই বৎসর পরের কথা। মোপলাদের অঞ্চল হইতে যুদ্ধ-জাহাজ চলিয়া গেলেও যায় নাই পুলিস, যায় নাই সৈন্যবাহিনী। তাহাদের উৎপীড়ন চলিতেছিল অবাধে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে চরমে উঠিয়াছিল জমিদার মহাজনগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়ন। এই সময় জমিদারগোষ্ঠী তাহাদের জমির খাজনা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করে, মহাজনদের সুদের হারও বিশেষভাবে বাড়িয়া যায়। জমিদারের খাজনা আর মহাজনদের ঋণের দায়ে শত শত মোপলা চাষী জমিজমা হারাইয়া পথের ভিখারী হয়, তাহাদের লাঙ্গল আর চাষের বলদ কাড়িয়া লওয়া হয়। জমিদারের পাইক-বরকন্দাজ চাষীদের ঘরবাড়ী ভাঙিয়া ফেলে, তাহাদের ঘটিবাটি কাড়িয়া লয়। এই বীভৎস অত্যাচারে মোপলাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া পড়ে, তাহারা ইহার প্রতিকারের জন্য পাগল হইয়া উঠে। চতুর্থ মোপলা-বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া যায়।

বিদ্রোহী মোপলারা প্রাণপণে শত্রুর উপর আঘাত দিতে আরম্ভ করিল। পূর্বের মত এবারেও তাহারা নিকটবর্তী পাহাড়ে পলাইয়া গেল। পাহাড়ই হইল বিদ্রোহের ঘাঁটি। এই ঘাঁটি হইতে চলিল তাহাদের গেরিলা যুদ্ধ। বিদ্রোহীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়া অতর্কিত আক্রমণে পুলিস ও সৈন্যদের ঘাঁটি জ্বালাইয়া ভাঙিয়া-চুরিয়া দিতে লাগিল। বিদ্রোহী মোপলাদের আক্রমণে জমিদার-মহাজনদের শস্যগোলা, ঘরবাড়ী সবকিছু ধূলিসাৎ হইয়া গেল। মোপলাদের আক্রমণে বহু জমিদার ও মহাজন এবং তাহাদের বহু কর্মচারী নিহত ও আহত হইল। ক্রমশ বিদ্রোহ ভীষণ আকার ধারণ করিল। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া বিদ্রোহ দমনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, বিদ্রোহ দমনের জন্য বিপুল আয়োজন করিল। কয়েক হাজার সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিস আসিয়া মালাবার ছাইয়া ফেলিল। দশলক্ষ সহায়-সম্বলহীন, প্রায় নিরস্ত্র মোপলা চাষীর আঘাতে দক্ষিণ-ভারতের বৃটিশ শাসন কাঁপিয়া উঠিল।

বিদ্রোহ চলিল এক বৎসর। তাহার পর বৃটিশরাজের পশু-শক্তির আঘাতে বিদ্রোহীরা ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া পড়িল। অবশেষে চতুর্থ মোপলা-বিদ্রোহও পরাজিত হইল। এই বিদ্রোহে উভয় পক্ষের বহুলোক হতাহত হইল। কিন্তু এবারের বিদ্রোহে কিছু সুফল ফলিল। এবারের বিদ্রোহে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী বিশেষ ভীত হইয়া পড়ে। বৃটিশ সরকার জমিদারদের বর্ধিত খাজনা ও মহাজনদের বর্ধিত সুদ আদায় বন্ধ করিয়া দেয়। খাজনা ও সুদের হার নির্দিষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা হয়। এই সকল ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল মোপলা চাষীদের ভুলাইয়া শান্ত করা। কারণ, প্রকৃতপক্ষে মোপলারা পাইল না কিছুই। জমিদার ও মহাজনগোষ্ঠী আরও বহু উপায়ে তাহাদের শোষণ অব্যাহত রাখে। চির-বিদ্রোহী মোপলারা আর একটা বিদ্রোহে শত্রুর উপর চূড়ান্ত আঘাত দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।[১]

১। পঞ্চম ও শেষ মোপলা-বিদ্রোহ ঘটে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইবে।

১২. কোল-বিদ্রোহ (ছোটনাগপুর)[১]

(১৮৫৭-১৯০০)

কোল উপজাতির পরিচয়

ভারতের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসী জাতিসমূহের অবদান অন্য কাহারও অপেক্ষা অল্প নহে। বৃটিশ শাসনের আরম্ভকাল হইতে বণিক শাসকগোষ্ঠীর মুদ্রা-অর্থনীতির আক্রমণ হইতে নিজস্ব প্রাচীন আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থা এবং জীবনযাত্রা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, বৃটিশ শাসন আর তাহাদের অনুচর জমিদার ও মহাজনগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহারা বারংবার বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়াছে, অজস্র ধারায় বুকের রক্ত ঢালিয়াছে, হাজারে হাজারে প্রাণ বলি দিয়াছে। ভারতের কৃষক-বিদ্রোহের ইতিহাসে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কোল উপজাতির ধারাবাহিক সংগ্রাম সাঁওতাল-বিদ্রোহের মতই সমান গৌরবময়। সাঁওতালদের মতই কোলরাও রক্তরঞ্জিত স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করিয়াছে। কোলজাতি হো, ওঁরাও, মুণ্ডা প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের সংগ্রামের ঐতিহ্যই সমান গৌরবময়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোন এক সময় কোল জাতি (অস্ট্রালয়েড) বাহির হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। তখন বিহার অঞ্চল ছিল এক গভীর বনভূমি। কোলজাতিই সেই বন কাটিয়া বর্তমান বিহারের ছোটনাগপুর ও রাঁচি অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপন করিয়াছিল। কোলজাতির সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা সর্দারগণের নাম 'মুণ্ডা'। এইজন্য কোলদিগকে 'মুণ্ডা' নামেও অভিহিত করা হয়।

কোলদের আগমনের পর ভারত-ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে পর পর প্রবেশ করিয়াছে 'দ্রাবিড়', 'আর্য', 'তুর্কি' প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীসমূহ। ইহাদের সকলেই প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ ও শস্য-শ্যামল বিহার অঞ্চল অধিকার করিয়া কোল ও অন্যান্য আদিবাসীদের উপর অল্প-বিস্তর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু কেহই তাহাদের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার উপর আক্রমণ করে নাই, অথবা এই অঞ্চলের প্রথম বসতি-স্থাপনকারী (খুন্ত কাট্টিদার) হিসাবে কোলগণ প্রাচীন কাল হইতে যে সকল বিশেষ অধিকার ভোগ করিতেছিল তাহার উপরেও কেহ কোনদিন হস্তক্ষেপ করে নাই। সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মতে এই কোলরাই সর্বপ্রথম ভারতে সমানাধিকারের ভিত্তিতে গ্রাম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সেই সমাজই বৃটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় অটুটভাবে একটানা চলিয়া আসিয়াছে। কালক্রমে কোলদের মধ্যেও রাজা

১। যে সকল গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী হইতে এই দীর্ঘ বিদ্রোহের তথ্যাবলী সংগৃহীত হইয়াছে: বীরেশ্বর চক্রবর্তী: কোল-কাহিনী; Chotanagpur D. G.; L. S. S. O'Malley; Bengal, Bihar & Orissa under British Rule; A. V. Thakkar; Tribes in India; John Hounton; Bihar, the Heart of India; Articles by Sarat Chandra Roy in Modern Review (1911); Ranchi D. G.; Hazaribag D. G.; Singbhum D. G.; Palamau D. G.

(যেমন ছোটনাগপুরের রাজা) ও জমিদারগোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু তাহারাও কোন সময় কোলদের সমাজ-ব্যবস্থা এবং বিশেষ অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে নাই।

বৃটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত কোলদের রাজা ও জমিদারগণ সকলেই ছিল কোল-জাতির লোক। ইহাদের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে, যে জমি কোলগণ সকলে মিলিয়া বন কাটিয়া পরিষ্কার করিয়াছে তাহার মালিক রাজাও নহে বা জমিদারও নহে। তাহার মালিক সকল "কাট্টিদার" কোল। জমিদারের কাজ ছিল খাজনা বাবদ সামান্য পরিমাণ শস্য গ্রাম-সমাজের নিকট হইতে আদায় করিয়া এবং তাহা হইতে কিছু শস্য নিজেদের জন্য রাখিয়া বাকী শস্য রাজার ভাণ্ডারে জমা দেওয়া। কাষ্ঠ, বেত প্রভৃতি বনজ দ্রব্য ব্যবহার করিবার অবাধ অধিকার ছিল কোলদের। আর প্রচলিত নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করিলে রাজা-জমিদার সকলকেই কোল-সমাজপতি মুণ্ডাদের দেওয়া শাস্তি মাথা পাতিয়া লইতে হইত।

বৃটিশ শাসকগণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে আরম্ভ হয় ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। ইহারা যেখানেই ইহাদের বিজাতীয় শাসন বিস্তার করিয়াছে সেই স্থানেই ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়াছে তাহাদের অচ্ছেদ্য সহচর মহাজনগোষ্ঠী আর নূতন এক শ্রেণীর জমিদার। বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের সকল স্থানের মত এই অঞ্চলেও বৃটিশ শাসক, নূতন জামিদার ও মহাজনগোষ্ঠী একত্রে মিলিয়া প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থাকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার পর শাসকগোষ্ঠী কোল চাষীদের সমস্ত অধিকার হরণ করিয়া এবং তাহাদের হস্ত হইতে জমি কাড়িয়া লইয়া তাহা নূতন জমিদারশ্রেণী ও মহাজনদের হস্তে তুলিয়া দিয়াছে। তাহার ফলে সর্বত্র চাষীরা অনিবার্য ধ্বংসের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃটিশ শাসনের আরম্ভকাল হইতেই বিহারের ছোটনাগপুর ও রাঁচি জেলার অধিবাসী কোলচাষীদের জীবনেও এইরূপ এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগ ঘনাইয়া আসে।

অন্যান্য উপজাতিদের মত কোলদের মধ্যেও মুদ্রার কোন ব্যবহার ছিল না, বিনিময়ের মাধ্যমেই ক্রয়-বিক্রয় চলিত। বৃটিশ শাসকগণ এই অঞ্চলেও মুদ্রা অর্থনীতির প্রবর্তন করিয়া কোলদের প্রাচীন অর্থনীতি ধ্বংস করে। অন্যান্য স্থানের মত এখানেও বৃটিশ শাসকগণ ফসলের দ্বারা খাজনা দিবার নিয়মের পরিবর্তে টাকা দ্বারা খাজনা দিবার নিয়ম প্রবর্তন করে। এইভাবে মুদ্রা-অর্থনীতির প্রবর্তনের ফলে কোলদের সমাজ-ব্যবস্থা ও জীবনযাত্রা-প্রণালীতে বিপর্যয় দেখা দেয়। ফসল বিক্রয় করিয়া খাজনার টাকা সংগ্রহ করিবার ফলে কোলদের জীবনে এক তীব্র সংকট ঘনাইয়া আসে। এই সংকটের ফলে কোলচাষীদের নিকট হইতে ফসলের পরিবর্তে টাকায় খাজনা আদায় করা অসম্ভব হইয়া উঠে। এই অবস্থায় জমিদারগণ হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি মহাজনদের ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের হাতে খাজনা আদায়ের ভার দেয় এবং ইহার পরিবর্তে মহাজনদের নিকট হইতে তাহারা বিপুল পরিমাণ অর্থ লাভ করে। এইভাবে বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি মহাজনগণই হইল নূতন জমিদার—কোলদের ভাষায় "ডিকু"। এই নূতন জমিদারগণ ক্রমশ

কোলচাষীদের সমস্ত অধিকার হরণ করিয়া তাহাদের উপর ইচ্ছামত খাজনা ধার্য করে এবং বিনামজুরিতে বেগার খাটাইয়া তাহাদিগকে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করিতে বাধ্য করে।

অরণ্যচারী ও প্রকৃতির অবিকৃত সন্তান কোলচাষীরা বর্তমান সভ্যজগতের এই প্রকার প্রতারণা ও শোষণ-উৎপীড়নে প্রথমে হতভম্ব হইয়া গেল। তাহারা বৃটিশ-প্রতিষ্ঠিত নূতন আদালতে অভিযোগ করিল। কিন্তু বৃটিশ আদালত জমিদার-মহাজনদের হাতধরা, তাহাদের কুকার্যের সহচর। সুতরাং সেখানে তাহাদের অভিযোগের কোন প্রতিকার হইল না। তাহার পর চিরশান্ত কোলচাষীরা অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নের জ্বালায় অস্থির হইয়া ইহার প্রতিকারের জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে পদক্ষেপ করিল। তাহাদের এই সশস্ত্র সংগ্রাম দীর্ঘকাল ধরিয়া চলে। বৃটিশ শাসনের যুগে কোল উপজাতির ইতিহাস "ডিকু" অর্থাৎ বহিরাগত জমিদার-মহাজনগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সশস্ত্র সংগ্রামেরই ইতিহাস।

১৮৯৯-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের শাসনকার্যের বিবরণেও শাসকগণ কোলজাতির ধারাবাহিক বিদ্রোহের মূল কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন :

"ছোটনাগপুরের আদিবাসীরা জমির উপর এতকাল ধরিয়া যে সকল অধিকার ভোগ করিতেছিল তাহা হইতে বঞ্চিত হইবার ফলেই তাহাদের মধ্যে দীর্ঘকাল হইতে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ধূমায়িত হইয়া উঠে। তাহারা স্মরণাতীত কাল হইতে জমির উপর কতকগুলি বিশেষ অধিকার ভোগ করিতেছিল এবং তাহাদের জমিদারগণও তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু বহু বৎসর হইল এই জমিদারদের জমিদারি বহিরাগতদের, বিশেষত মহাজনদের কবলে পতিত হইয়াছে। মহাজনগণ জমিদারি গ্রাস করিয়াই আদিবাসিগণকে তাহাদের বিশেষ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং যথেচ্ছভাবে খাজনা বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহার ফলেই এই নূতন জমিদারগোষ্ঠী ও আদিবাসীদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংঘর্ষ চলিতেছে।"[১]

কোল-বিদ্রোহের পূর্ব-ইতিহাস
১৮২০-২১ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ

ছোটনাগপুর বিভাগের আদিবাসী কোলগণ হো, মুণ্ডা, ওঁড়াও প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ছোটনাগপুরের দুই হাজার বর্গমাইল ব্যাপী কোল্‌হান অঞ্চলই কোলদের প্রধান বাসস্থান। এই কোল্‌হান অঞ্চলে তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বাধীনভাবে বসবাস করিতেছিল। বৃটিশ যুগের পূর্বে অন্য কোন শাসকই এই অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া কোলদিগকে পদানত করিবার চেষ্টা করে নাই। কিন্তু বৃটিশ শাসনকালের প্রথম হইতেই শাসকগণের প্ররোচনায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রাজা ও জমিদারগণ কোলজাতিকে তাহাদের শোষণ ও শাসনের শিকারে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল।

১। Administrative Report, Bihar, 1899-1900.

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পোড়াহাটের রাজা বৃটিশ শাসকদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। রাজার উপর বিপুল পরিমাণ বাৎসরিক কর ধার্য হইলে রাজা এই সুযোগে হো-কোলদের অঞ্চলটিও তাঁহার রাজ্যের অংশ বলিয়া দাবি করেন। বৃটিশ শাসকগণও রাজার এই দাবি মানিয়া লয়। রাজার কর্মচারীরা হো-কোলদের নিকট হইতে বলপূর্বক খাজনা আদায়ের চেষ্টা করিলে এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহা শুনিবা মাত্র হো-সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি নরনারী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠে। সমগ্র অঞ্চলের কোলচাষীরা রাজার কর্মচারীদের হত্যা করিতে আরম্ভ করে, বহু কর্মচারী প্রাণের ভয়ে কোল-অঞ্চল হইতে পলায়ন করে। রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া বৃটিশ শাসকদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। করদ রাজ্যের সহিত চুক্তির শর্ত অনুসারে প্রজা-বিদ্রোহের সময় করদ রাজা ও তাহার রাজত্ব রক্ষার দায়িত্ব ছিল বৃটিশ শাসকগণের। এই চুক্তি অনুসারে রোগসেস্ নামক এক বৃটিশ সেনাপতি একটি পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদল লইয়া হো-চাষীদের এই বিদ্রোহ দমন করিতে আসেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের শক্তি ও দৃঢ়তা দেখিয়া সেনাপতি মহাশয় বিদ্রোহীদের বুঝাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার আহ্বানে হো-সর্দারগণ আসিয়া স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেয়, তাহারা পোড়াহাটের রাজার অধীনতা স্বীকার করিতে আর প্রস্তুত নহে।

আপসের চেষ্টা ব্যর্থ হইলে বৃটিশ সেনাপতি তাঁহার পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী লইয়া হো-অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইলে চাঁইবাসার নিকটবর্তী এক বিশাল প্রান্তরে বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। তীর-ধনুকে ও বল্লমে সজ্জিত বিদ্রোহীদের সহিত বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত ও সুশিক্ষিত বৃটিশ সৈন্যদলের ঘোরতর যুদ্ধ চলে। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হো-চাষীরা মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া শত্রু সংহার করিতে করিতে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দেয়। অবশেষে আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে অধিকক্ষণ সম্মুখ-যুদ্ধ অসম্ভব বুঝিয়া তাহারা পশ্চাৎ অপসরণ করিয়া গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে। সেখান হইতে তাহারা বহু দিন পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া যায়। বিদ্রোহীরা তাহাদের বনের আশ্রয় হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া বৃটিশ সৈন্যদলের উপর আঘাত করিয়া আবার অদৃশ্য হইয়া যাইত। এইভাবে সমগ্র ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ এক বৎসরকাল যুদ্ধ চালাইবার পর বৃটিশ সেনাপতি বুঝিলেন, আরও কয়েকটি বড় সৈন্যদল আনিয়া নূতনভাবে আক্রমণ না করিলে এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং বৃটিশ সেনাপতি তাঁহার সৈন্যদল লইয়া ফিরিয়া গেলেন, অর্থাৎ হো-চাষীদের প্রচণ্ড আঘাতে সাময়িক পরাজয় বরণ করিয়া পলায়ন করিলেন।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই উক্ত সেনাপতি পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া গঠিত প্রায় এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী ও কয়েকটি কামান লইয়া পুনরায় হো-অঞ্চলে ফিরিয়া আসিলেন। বিদ্রোহীরাও প্রস্তুত হইয়াই ছিল। তাহারাও আঘাতের পর আঘাত দিয়া এই বিশাল বৃটিশ বাহিনীটিকে অস্থির করিয়া তুলিল। এবার বৃটিশ পক্ষ এক নূতন কৌশল অবলম্বন করিল। বিদ্রোহীদিগকে বন হইতে অকস্মাৎ বাহির

হইয়া এবং পশ্চাৎ ভাগ হইতে আঘাত দিয়া আবার বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতে দেখিয়া তাহারা কামানের সাহায্যে বনের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। কামানের গোলায় বনের বৃক্ষ-লতাগুল্ম ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, গভীর বন সাফ হইয়া গেল, তাহার পর আরম্ভ হইল অশ্বারোহী বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ। এইবার বিদ্রোহীদের বনের আশ্রয় স্থল ও ঘাঁটি অনাবৃত হইয়া পড়িলে তাহাদের আর যুদ্ধ চালাইবার ক্ষমতা রহিল না। এই আক্রমণে তাহাদের যথেষ্ট লোকক্ষয় হওয়ায় তাহারা বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিল।

আপাতত হো-বিদ্রোহের অবসান হইলেও হো-চাষীরা পোড়াহাটের রাজাকে কর দিতে অস্বীকার করিল। তাহারা রাজাকে তাহাদের পরম শত্রু বলিয়া গণ্য করিল এবং তাঁহাকে কিছুতেই কর দিতে সম্মত হইল না। কারণ, তাহারা মনে করিল যে, এই রাজার জন্যই বৃটিশ শাসকগণ তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। হো-সর্দারগণ ঘোষণা করিল, তাহারা বরং বৃটিশ শাসকদিগকে কর দিবে, তথাপি পোড়াহাটের রাজাকে নহে। কিন্তু বৃটিশ শাসকগণ হো-চাষীদের দাবি মানিতে অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে উক্ত রাজার হস্তেই সমর্পণ করিল এবং রাজাকে 'লাঙল-কর'[১] বসাইবার নির্দেশ দান করিল। রাজাও বৃটিশ প্রভুদের নির্দেশে অবিলম্বে চাষীদের প্রত্যেকটি লাঙলের উপর উচ্চহারে কর ধার্য করিলেন। অসহায় চাষীরা এই অপমানের জ্বালায় অন্তরে জ্বলিতে লাগিল।

যতদিন বৃটিশ সৈন্য এই অঞ্চলে ঘাঁটি করিয়াছিল, ততদিন আদিবাসীরা চুপ করিয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ বাহিনী এই অঞ্চল ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে হো অঞ্চলে আবার আগুন জ্বলিয়া উঠে। তাহারা 'লাঙল কর' দেওয়া বন্ধ করে এবং রাজার কর্মচারীদের দেখিবামাত্র হত্যা করিতে থাকে। হো-চাষীরা আবার তাহাদের অঞ্চলে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় পনের বৎসর যাবৎ হো-চাষীদের সহিত রাজার পাইক-বরকন্দাজদের সহিত যুদ্ধ চলে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে কোলজাতির অন্তর্ভুক্ত মুণ্ডা ও ওঁড়াও সম্প্রদায় রাঁচি অঞ্চলে বিদ্রোহ আরম্ভ করিলে হো-চাষীরাও তাহাদের জ্ঞাতি-ভাইদের এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। ইহার পর ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ শাসকগণ পোড়াহাটের রাজার হস্ত হইতে হো-উপজাতির বাসস্থান কোল্হান অঞ্চলের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে এবং এই অঞ্চলে স্থায়িভাবে একটি সৈন্যদল বসাইয়া শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করে।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ

সমগ্র ছোটনাগপুর বিভাগের কোলজাতির হো, মুণ্ডা এবং ওঁড়াও সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকাল হইতে বিদ্রোহ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল। হিন্দু, মুসলমান ও শিখ মহাজনগণ চাষীদের খাজনা আদায়ের ইজারা লইয়া কোলদের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিতেছিল, খাজনার হার দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং খাজনার দায়ে নূতন জমিদারগণ চাষীর সর্বস্ব কাড়িয়া লইতেছিল। এই শোষণ-উৎপীড়ন কোল-

১। চাষাদের প্রত্যেকখানি লাঙলের উপর ধার্য কর।

চাষীদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিলে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র রাঁচি জেলার মুণ্ডা ও ওঁড়াও সম্প্রদায়ের সকল চাষী একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহের সংবাদ দ্রুত সমগ্র বিভাগে ছড়াইয়া পড়ে। সমগ্র কোলজাতি যেন পূর্ব হইতেই বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। রাঁচি জেলায় বিদ্রোহের সংবাদ পাইবামাত্র সিংভূম জেলার হো-চাষীরা হিন্দু ও মুসলমান মহাজনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার জন্য উন্মাদ হইয়া উঠে। দেখিতে না দেখিতে বিদ্রোহ মানভূম, হাজারিবাগ এমনকি পালামৌ জেলায়ও বিস্তার লাভ করে। এই সকল জেলার অধিবাসীরা চেরো ও খারোয়ার (সাঁওতাল) সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহারাও একত্রে নূতন জমিদারগোষ্ঠী (ডিকু) আর তাহাদের কর্মচারীদের নির্মূল করিবার জন্য চারিদিকে আক্রমণ আরম্ভ করে। সমগ্র ছোটনাগপুর বিভাগ জুড়িয়া আদিবাসী চাষীরা দীর্ঘকালের অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নের অবসান করিতে উন্মাদ হইয়া উঠে।

আদিবাসীদের অস্ত্রশস্ত্র হইল তীর-ধনুক, টাঙ্গি আর বল্লম। তাহা লইয়াই তাহারা সমগ্র বিভাগে বহিরাগত সকল হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের হত্যা করিতে থাকে। তাহারা "ডিকু" দস্যুদিগকে এবং তাহাদের গৃহ ও সমস্ত সম্পত্তি আগুনে পোড়াইয়া ধ্বংস করে। এমনকি মহাজন "ডিকু"দের শস্যপূর্ণ ক্ষেত-খামারও বাদ গেল না। তাহারা ক্ষেত-খামারে আগুন দিয়া, ক্ষেতের পাকা ফসল মাটিতে ছড়াইয়া ফেলিয়া দীর্ঘকালের শোষণ-উৎপীড়নের প্রতিশোধ লয়। এক সহস্রাধিক "ডিকু" আর তাহাদের লুণ্ঠনের সহচর কর্মচারীরা আদিবাসী চাষীদের ক্রোধের আগুনে জীবন আহুতি দেয়।

এই বিদ্রোহ দুই বৎসর কাল প্রচণ্ড বেগে চলিয়াছিল। বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য পাটনা ও দানাপুর হইতে তিনটি পদাতিক বাহিনী ও একটি প্রকাণ্ড অশ্বারোহী বাহিনী ছোটনাগপুরে ছুটিয়া আসে। এই সকল বাহিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া সমগ্র বিভাগে ছড়াইয়া পড়ে। এই সকল সৈন্যদলের সহিত বিদ্রোহীদের সর্বত্র খণ্ডযুদ্ধ চলিতে থাকে। একদিকে বন্দুক ও অন্যান্য উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সরকারী সৈন্যবাহিনী, আর অপরদিকে তীর-ধনুক-বল্লমধারী আদিবাসী কৃষক। প্রায় একমাস কাল বিভিন্ন স্থানে খণ্ডযুদ্ধ চলে। এই সকল যুদ্ধে শত শত চাষী বন্দুকের গুলির আঘাতে নিহত হয়, আদিবাসী চাষীর রক্তে ছোটনাগপুরের মাঠঘাট রঞ্জিত হইয়া যায়। অবশেষে বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

বৃটিশ শাসকগণ এই বিদ্রোহের ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া এতই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা ছোটনাগপুর বিভাগটিকে বিহার প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহাকে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এক সীমান্ত প্রদেশ বলিয়া ঘোষণা করে এবং ইহার পরিচালনাভার সামরিক কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই নূতন সীমান্ত প্রদেশটিকে বিহার প্রদেশের একটি বিভাগে পরিণত করিয়া ইহাকে কমিশনারের অধীনে রাখা হয়।

বিদ্রোহের অবসানের পর হইতে আদিবাসী চাষীদের উপর সৈন্যবাহিনী ও পুলিসের বর্বর তাণ্ডব চলিতে থাকে। তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণে বাহির হইতে নূতন

"ডিকু"র দল আসিয়া আদিবাসী চাষীদের মাথার উপর আবার চাপিয়া বসে। তাহাদের উপর পূর্বাপেক্ষাও শতগুণ নিষ্ঠুর শোষণ-উৎপীড়ন চলিতে থাকে। ছোটনাগপুরের আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহের আগুন বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া ভবিষ্যতের আশায় দিন গণিতে থাকে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধে বা মহাবিদ্রোহে বিহারের আদিবাসীদের, বিশেষত কোলজাতির অবদান কিছুমাত্র অল্প নহে। প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত জুড়িয়া যখন মহাবিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে, তখন বিহারের ছোটনাগপুর বিভাগের বিভিন্ন আদিবাসী জাতিও সাহাবাদের বিদ্রোহী নায়ক কুমার সিংহ ও বিভিন্ন স্থানের বিদ্রোহী সৈন্যদলের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া নিজ নিজ অঞ্চলের বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর সহচর জমিদার-মহাজনগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়।

সিংভূম ও পালামৌ অঞ্চলে আদিবাসীদের জমিদার-মহাজন-বিরোধী অভ্যুত্থানের ফলে শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়ে। জমিদার-মহাজনগোষ্ঠী শাসকদের নিকট বার বার সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করিয়াও কোন সাহায্য না পাইয়া প্রাণের ভয়ে এই অঞ্চল হইতে পলায়ন করে।

সিংভূমের হোগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া পোড়াহাটের রাজাকে বন্দী করে। মুক্তি পাইলে রাজাও তাঁহার হো-প্রজাদের সহিত বিদ্রোহে যোগদান করিবে—এই প্রতিশ্রুতি দিলে হোগণ তাঁহাকে মুক্তি দেয় এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজা বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সরল বিশ্বাসে হো-বিদ্রোহীরা রাজার নেতৃত্ব মানিয়া লয়। এই বিদ্রোহের সংবাদ পাইবা মাত্র শাসকগণ এই অঞ্চলে একদল শিখসৈন্য প্রেরণ করে। কিন্তু দুর্ধর্ষ হো-বিদ্রোহীদের দমন করা শিখসৈন্যদের সাধ্যাতীত। হোগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া বনাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে এবং শিখসৈন্য দেখিবামাত্র বন হইতে বাহির হইয়া শিখসৈন্যদের হত্যা করিয়া আবার পলাইয়া যায়। এইভাবে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলিবার পর কয়েকটি বৃটিশ সৈন্যদল আসিয়া শিখদের সহিত মিলিত হয়। তাহারা বিদ্রোহীদের আশ্রয়-স্থল বনভূমি বেষ্টন করে। ইহার ফলে বিদ্রোহীদের পক্ষে বাহির হইতে খাদ্য সংগ্রহ করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই সময়, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ভয়ঙ্কর বিপদ আসন্ন দেখিয়া পোড়াহাটের রাজা গোপনে বৃটিশ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। ইহার পরেও কয়েকমাস বিদ্রোহ চলে। অবশেষে বহু সংগ্রামের পর বিদ্রোহীরা ক্রমশ অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহার ফলে ধীরে ধীরে এই বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

সিংভূমের এই হো-বিদ্রোহ ব্যতীত এই সময়ের পালামৌ জেলার আদিবাসীদের বিদ্রোহও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আদিবাসীরা হইল কোলদেরই জাতি সম্পর্কীয় খারোয়ার ও চেরোসম্প্রদায়। সাহাবাদ জেলার বিদ্রোহী নায়ক কুমার সিংহের

আহ্বানে ইহারা দুইজন খারোয়ার সর্দারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ আরম্ভ করে। ঐতিহাসিক এল. এস্. এস্. ও'ম্যালি লিখিয়াছেন :

"বহিরাগত রাজপুত জমিদারদের বিরুদ্ধে এই উভয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ দীর্ঘকাল হইতে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল এবং দীর্ঘকাল হইতে এই জমিদারদের বিরুদ্ধে তাহাদের সংগ্রাম চলিতেছিল। এইবার (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) তাহারা মনে করিল যে, বৃটিশ শাসনের অবসান হইয়াছে এবং এখন তাহারা আবার অতীতের সেই সুখশান্তিময় ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে,—যে ব্যবস্থায় তাহারা নিজেদের সর্দারদের অধীনে এই সমগ্র অঞ্চলের উপর এক সময় একচ্ছত্র প্রভুত্ব করিত। বহিরাগত জমিদারগোষ্ঠীকে তখন তাহাদের খাজনা দিতে হইত না।"[১]

বহু খণ্ডযুদ্ধের পর বিদ্রোহের পরিচালক খারোয়ার নেতৃদ্বয় বৃটিশ সৈন্যদের দ্বারা ধৃত হইয়া ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দেন। তাহার পর, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে এই বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আবার সমগ্র রাঁচিজেলা জুড়িয়া আদিবাসী কোলচাষীদের বিদ্রোহ দেখা দেয়। রাঁচি জেলায় কোলজাতির মুণ্ডা সম্প্রদায়ের বাস। ১৮৩১ ও ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময় এই অঞ্চলের বহিরাগত হিন্দু-মুসলমান-রাজপুত জমিদারগণ সাময়িকভাবে পলায়ন করিয়াছিল। বিদ্রোহ শেষ হইলে আবার তাহারা ফিরিয়া আসিয়া পূর্ণোদ্যমে শোষণ-উৎপীড়ন আরম্ভ করে। চাষীদের উপর বিদ্রোহের সময় সৈন্যবাহিনীর এবং বিদ্রোহের পর জমিদারশ্রেণীর এরূপ ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন চলে যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহাদের আর মাথা তুলিবার উপায় ছিল না। কিন্তু কিছুদিন পর আবার তাহারা শক্তি সঞ্চয় করিয়া বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়।

১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর কিছু দিন পর্যন্ত একটা অবসাদের ভাব দেখা দিলেও আবার ধীরে ধীরে আদিবাসী চাষীদের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিতে থাকে। এই চাঞ্চল্য ক্রমশ গভীর হইতে গভীরতর হইয়া ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে। ইহার কিছুদিন পূর্ব হইতে চাষীদের খাজনার হার বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। খাজনা এত বৃদ্ধি পায় যে, চাষীরা তাহাদের সমস্ত ফসল বিক্রয় করিয়াও খাজনার টাকা সংগ্রহ করিতে পারিত না। ইহার উপর বিভিন্ন প্রকারের কর ও বে-আইনী আদায় তো চলিতই। চিরকাল আদিবাসীরা বন হইতে বাঁশ, বেত, কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিত। এবার সেই সুযোগ হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়। ইহা ব্যতীত বন কাটিয়া চাষের জমি বাড়াইবার জন্য জমিদারগণ চাষীদের বিনা পারিশ্রমিকে খাটাইয়া লইতে থাকে, চাষীরা দলবদ্ধভাবে ইহার প্রতিকার দাবি করিয়াও কোন ফল পায় নাই। আদালত হইতেও ইহার কোন প্রতিকার হয় নাই। সুতরাং আদিবাসী চাষীদের সম্মুখে মাত্র একটি পথই খোলা রহিল, তাহা হইল বিদ্রোহের পথ।

১। L. S. S. O'Malley : Ibid, p. 414.

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে সমগ্র রাঁচি জেলায় আবার কোল-বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। দলবদ্ধ বিদ্রোহীরা নিজ নিজ অঞ্চলের জমিদারদের কাছারি অগ্নি-সংযোগে ভস্মীভূত করে এবং তাহাদের হাতে বহু কর্মচারী নিহত হয়। অল্পকালের মধ্যে গ্রামাঞ্চল হইতে জমিদারী শোষণ-ব্যবস্থার শেষ চিহ্নটি পর্যন্ত মুছিয়া যায়। পূর্বের মত এবারও জমিদারগোষ্ঠীর আহ্বানে বৃটিশ সরকারের কয়েকটি বৃহৎ সৈন্যদল ছুটিয়া আসে বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য। এই সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে আসে জমিদারগোষ্ঠী।

এবার বৃটিশ সরকার বিদ্রোহ দমনের জন্য ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, কেবল কামান, বন্দুক আর সৈন্যবাহিনী দ্বারা আদিবাসীদের হাজারে হাজারে হত্যা করিয়া বিদ্রোহ আপাতত দমন করা সম্ভব হইলেও কোন স্থায়ী ফল লাভ করা যাইবে না, উপরন্তু আর একটি বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিগণ বিভিন্ন অঞ্চলে আলাপ-আলোচনা মারফত আপসের ইচ্ছা এবং আদিবাসীদের অভিযোগের প্রতিকার করিবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিলেন। আদিবাসী সর্দারগণ ও সেনাপতিদের মধ্যে আলোচনা চলিল। সেই আলোচনায় স্থির হইল, আর খাজনা বৃদ্ধি করিতে দেওয়া হইবে না, পূর্বের খাজনাই বহাল থাকিবে এবং আদিবাসীরা তাহাদের প্রয়োজনমত বনজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবে। সরলমতি সর্দারগণ এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিয়া ফিরিয়া গেল। এইভাবে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের অবসান হইল।

বিরশা "ভগবানের" নেতৃত্বে মুণ্ডা-বিদ্রোহ
(১৮৯৫-১৯০০)

১

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকারের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিয়া মুণ্ডা সর্দারগণ শান্ত হইয়া ফিরিয়া গেলেও অবস্থার কোনই পরিবর্তন হইল না। জমিদার-মহাজনগোষ্ঠী, অর্থাৎ 'ডিকু'র দল কোন প্রতিশ্রুতি মানিয়া চলিবার পাত্র নয়। সুতরাং মুণ্ডা অঞ্চলে আবার ধীরে ধীরে বিদ্রোহের ঝড় উঠিবার লক্ষণ দেখা দিল। ক্রমশ মুণ্ডা অঞ্চলটি হইয়া উঠিল অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বক্ষণের একটি আগ্নেয়গিরির মত—বাহিরে নির্জীব, শান্তভাব, আর ভিতরে চলিয়াছে এক ভয়ঙ্কর অগ্নি-প্রবাহ।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে মুণ্ডা অঞ্চলে এক নূতন নায়কের আবির্ভাব হয়। বয়স মাত্র ২১ বৎসর, সদাহাস্যময় মুখ, বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল মুখমণ্ডল। রাঁচি জেলার তামার থানার অন্তর্গত চালকাদ গ্রামের এক মুণ্ডা-সর্দারের পুত্র, নাম বিরশা মুণ্ডা। বিরশা বাল্যে চাইবাসার 'জার্মান মিশন' স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়া পরে এক ক্যাথলিক গীর্জার স্কুলে গেলেন উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে। স্কুলে খ্রীষ্টান ধর্মের পাঠ গ্রহণ করিতে করিতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরশা অনেক উন্নত শিক্ষা আর জ্ঞান লাভ করিলেন। খ্রীষ্টানদের স্বরূপ তাঁহার চক্ষে উদ্ঘাটিত হইল। চিন্তাশীল

বিরশার মনে নানা প্রকারের প্রশ্ন দেখা দিল, তিনি বহুদিন চিন্তা করিলেন। তাঁহার মনে হইল, কোলজাতির মধ্য হইতে কুসংস্কার দূর করিয়া জাতিকে উন্নত করিয়া তুলিতে না পারিলে দীর্ঘকালের শোষণ-উৎপীড়নের অবসান হইবে না। এই স্থলে বলিয়াই বিরশা কোলজাতির প্রাচীন ধর্ম ও প্রচলিত হিন্দুধর্মের সহিত খ্রীষ্টান ধর্মের মিশ্রণ করিয়া এক নূতন ধর্মমত গড়িয়া তোলেন। মুণ্ডা সমাজের উপর হইতে রোমান পুরোহিত ও খ্রীষ্টান পাদ্রী এই উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকদের প্রভাব অর্থাৎ ধর্মের নামে শোষণকারীদের দুষ্ট প্রভাব নষ্ট করাই ছিল বিরশার এই নূতন ধর্মমতের মূল উদ্দেশ্য। বিরশা যতটুকু শিক্ষা পাইয়াছেন তাহাতেই বুঝিয়াছেন যে, এই উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকগণই মুণ্ডা সমাজের সমান শত্রু। তাহাদের প্রচারে ও অনুশাসনে মুণ্ডারা বিভ্রান্ত। সুতরাং তাহাদের প্রভাব দূর করিতে না পারিলে মুণ্ডাদের জাগরণের কোন আশা নাই। মুণ্ডা সমাজে বহু দেবতার পূজার প্রচলন ব্রাহ্মণরাই করিয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণরাও মুণ্ডাদের শত্রু। কারণ, দেবতাদের নামে ভয় দেখাইয়া তাহারা মুণ্ডাদের ভুলাইয়া রাখে, মুণ্ডাদের সংগ্রামের পথ হইতে দূরে রাখিবার প্রয়াস পায়।

বিরশা কতিপয় সমবয়স্ক মুণ্ডা যুবককে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন গ্রামে গ্রা নিজের এই নূতন ধর্মমত প্রচার করিতে। বিরশা তাঁহার এই ধর্মমত প্রচারের এক নূতন কৌশল গ্রহণ করিলেন—১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহের পূর্বক্ষণে সাঁওতাল নায়ক সিঁদুর মত। বিরশা জানিতেন, কোলজাতি অত্যন্ত পশ্চাৎপদ এবং দীর্ঘকালের হিন্দু-ব্রাহ্মণ ও খ্রীষ্টান-পাদ্রীদের ধর্মীয় প্রচারের ফলে নানাপ্রকারের ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। সুতরাং সেই সকল দুষ্ট ধর্মীয় প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া কোলজাতিকে বিদ্রোহের পথে টানিয়া আনিতে হইলে ধর্মের প্রশ্নটিকে বাদ দিলে চলিবে না। হিন্দুধর্ম ও খ্রীষ্টান ধর্মের দুষ্ট প্রভাব কাটাইবার জন্য বরং কোলদের নিকট তাঁহাদের ঈশ্বরের নামেই তাঁহার নূতন ধর্মমত প্রচার করিতে হইবে, নূতন নিয়ম-কানুনের প্রবর্তন করিতে হইবে। এইজন্য প্রয়োজন হইলে জাতির স্বার্থে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

বিরশা প্রচার করিলেন, তিনি তাঁহার এই নূতন ধর্ম মুণ্ডাদের প্রধান দেবতা 'শিং বোঙা'র নিকট হইতেই লাভ করিয়াছেন। 'শিং বোঙা' স্বয়ং তাঁহার মারফত বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, এখন হইতে বহু দেবতার (বোঙার) পরিবর্তে কেবলমাত্র একটি দেবতাকেই মুণ্ডাদের মানিয়া চলিতে হইবে এবং পূজা করিতে হইবে। 'শিং বোঙা' আরও নির্দেশ দিয়াছেন যে, মুণ্ডাদের জীবজন্তুর মাংস ভক্ষণ ত্যাগ করিতে হইবে, সৎভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে, সকল প্রকার কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া সুন্দর, নির্মল ও পবিত্র চরিত্র গঠন করিতে হইবে, আর হিন্দুদের ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের মত গলায় 'জানে' অর্থাৎ পবিত্র সূত্র ধারণ করিতে হইবে। 'শিং বোঙা'র পূজা মুণ্ডারা নিজেরাই করিবে, তাহার জন্য ব্রাহ্মণ ডাকিবার প্রয়োজন নাই।[১]

১। Sarat Roy : The Curious History of a Munda Fanatic (article, Modern Review, 1911, p 547)

বিরশার মুখ হইতে "শিং বোঙা'র এই নির্দেশ অর্থাৎ নব-জাগরণের মন্ত্র লাভ করিয়া মুণ্ডা জনসাধারণের মধ্যে এক নূতন প্রাণচাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে এক ব্যাপক ও গভীর সামাজিক আলোড়ন দেখা দিল। পৈতাধারী ব্রাহ্মণের দল এতকাল তাহাদের মধ্যে বহু দেবতা ও পৈতার মহিমা প্রচার করিয়া তাহাদিগকে বোকা বানাইয়া রাখিয়াছে, আর ধর্মের ভয় দেখাইয়া জমিদার-মহাজনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে বাধা দিয়াছে। সুতরাং খ্রীষ্টধর্মে প্রভাবান্বিত বিরশা এইবার মুণ্ডাদের মধ্য হইতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতশ্রেণীর দুষ্ট প্রভাব দূর করিবার আয়োজন করিলেন।

শত শত মুণ্ডা যুবক বিরশার নবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া এক নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। তাহারা দলে দলে বিরশার গ্রামে আসিয়া সমবেত হয়। তাহারা তাহাদের তরুণ নায়ক বিরশাকে ভগবানের আসনে বসাইয়া জাতির ত্রাণকর্তারূপে পূজা করিতে থাকে। তাহাদের নিকট বিরশা হইলেন "বিরশা ভগবান", মুণ্ডাভাষায় "ধাতৃ আবা" অর্থাৎ বিশ্বের পিতা।[১]

বিরশা তাঁহার অনুচরদের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করিয়া গ্রামে গ্রামে তাঁহার বাণী প্রচার করিতে পাঠাইলেন। প্রচারক দল ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবিলম্বে জমিদারের খাজনা দেওয়া, বেগার খাটা প্রভৃতি বন্ধ করিবার নির্দেশ দিল। বিরশার নির্দেশ অনুযায়ী তাহারা মুণ্ডাদের নিকট বিদ্রোহের তারিখটিও জানাইয়া দিল। এই দিনটিকে বলা হইল "প্রলয়ের দিন"। এই প্রলয়ের দিনে সকল মুণ্ডাকে নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া নবসাজে সজ্জিত হইয়া এবং অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বিরশার গ্রাম চালকাদে সমবেত হইতে হইবে। শরৎ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন:

"শুনা যায়, কয়েকদিন ধরিয়া স্থানীয় মুরুহ ও পার্শ্ববর্তী বাজারগুলিতে কাপড়ের চাহিদা এত বৃদ্ধি পায় যে, সমস্ত চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় নাই।"[২]

অবশেষ প্রলয়ের দিন উপস্থিত হইল। উহার পূর্বদিন হইতে হাজার হাজার মুণ্ডা চালকাদ গ্রামে সমবেত হইতে লাগিল। এমনকি মুণ্ডা নারী আর শিশুরাও আসিল। চালকাদ জনসমুদ্রে পরিণত হইল। কিন্তু যে পরিকল্পনা করিয়া বিরশা তাহাদের আহ্বান করিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হওয়ায় বিরশা তাহাদের ফিরাইয়া দিলেন।

মুণ্ডাদের মধ্যে আবার চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ পুরোহিত আর জমিদার-মহাজনগণ ভয়ে মুণ্ডা-অঞ্চল হইতে পলায়ন করে। তাহারা আসন্ন বিদ্রোহের সংবাদ বিভিন্ন থানায় জানাইয়া দেয়। বিদ্রোহের পূর্বে কয়েকশত সশস্ত্র পুলিস আসিয়া চালকাদ গ্রামের নিকটে ঘাঁটি করিয়া থাকে। বিরশার ঘোষিত প্রলয়ের দিনে মুণ্ডা অঞ্চলের সকল 'ডিকু' শয়তান অর্থাৎ জমিদার-মহাজনদের হত্যা করাই ছিল বিরশার পরিকল্পনা। কিন্তু 'ডিকু'রা পূর্বেই এই অঞ্চল হইতে পলায়ন করায় বিরশার অনুচরগণ অতর্কিতভাবে পুলিস বাহিনীর উপর আক্রমণ করে। পুলিসেরা প্রস্তুত হইবার পূর্বেই বিদ্রোহীরা আকস্মিক আক্রমণে তাহাদের কয়েকজনকে নিহত ও

১। Sarat Roy: Ibid, p. 547. ২। Ibid.

আহত করিয়া এবং তাহাদের সমস্ত জিনিসপত্র তচ্‌নচ্‌ করিয়া বিছানাগুলি নদীতে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করে।[১]

ইহার পর সশস্ত্র পুলিসের দল গ্রামে গ্রামে হানা দিয়া মুণ্ডাদের গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করে। বিরশা তাঁহার কয়েকজন অনুচরসহ এক দল পুলিসকে বাধা দেন। কিন্তু সংঘর্ষে বিরশা পরাজিত হন এবং পলায়ন করিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকেন। পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সংবাদ পাইয়া একদল সৈন্য ও কয়েকটি হস্তী লইয়া মুণ্ডা অঞ্চলে উপস্থিত হন। ইহার পর কয়েকশত পুলিস ও সৈন্য একত্রে মিলিয়া বিরশা ও তাঁহার প্রধান অনুচরদের গ্রেপ্তারের জন্য মুণ্ডা অঞ্চল চষিয়া ফেলিতে থাকে। হস্তীর সাহায্যে মুণ্ডাদের ঘরবাড়ী ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেওয়া হয়, গ্রামের পর গ্রাম অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করিয়া মুণ্ডাদের নিরাশ্রয় করা হয়। অবশেষে পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বিরশার এক বিশ্বাসঘাতক অনুচরের নিকট সংবাদ পাইয়া সৈন্য ও পুলিসদলসহ বিরশাকে তাঁহার গোপন আশ্রয় স্থান হইতে নিদ্রিতাবস্থায় গ্রেপ্তার করে। বিরশা গোপনে দূরবর্তী রাঁচি জেলে প্রেরিত হন। বিরশার গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সাত হাজার সশস্ত্র মুণ্ডা তাঁহাকে জেল ভাঙিয়া মুক্ত করিবার জন্য চালকাদ গ্রামে সমবেত হয়। শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় নিম্নোক্ত ভাষায় বিরশার গ্রেপ্তারের বিবরণ দিয়াছেন :

"পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গভীর রাত্রিতে সৈন্যদল লইয়া গ্রামের মধ্যে উপস্থিত হয় এবং বিরশার আশ্রয়স্থলে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত বিরশাকে চাপিয়া ধরে। তাহার পর রুমাল দিয়া তাঁহার মুখ বাঁধিয়া ফেলে এবং চালকাদ গ্রামে সমবেত বিরশার বিপুল সংখ্যক অনুচর নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিবার পূর্বেই তাঁহাকে হাতীর পিঠে চাপাইয়া দূরবর্তী রাঁচি জেলে প্রেরণ করে। বিরশার এই অন্তর্ধানের সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গ্রাম হইতে জনসাধারণ বিরশার গ্রাম চালকাদের দিকে ধাবিত হয়। বহু পূর্বেই বিরশা তাঁহার অনুচরদের বলিয়াছিলেন যে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইতে পারে। সেই কথা সত্যে পরিণত হইয়াছে শুনিয়া জনস্রোত "ভগবানের" গ্রামের দিকে ধাবিত হয়। অল্পকালের মধ্যে সমবেত মানুষের সংখ্যা হয় প্রায় সাত হাজার।"[২]

বিরশার অনুচরগণ তাহাদিগকে বুঝাইয়া ফিরাইয়া দেয়। তাহার পর তাঁহার আটজন অনুচর রাঁচি জেলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া বিরশার সহিত একত্রে দূরবর্তী খুন্তিয়া জেলে প্রেরণ করা হয়। বিরশা ও তাঁহার অনুচরগণকে শাস্তি দিলে মুণ্ডারা ভয় পাইয়া বিদ্রোহের মনোভাব ত্যাগ করিবে—এই ধারণা লইয়া খুন্তিয়া জেলের মধ্যেই তাহাদের বিচার আরম্ভ হয়। এই সংবাদ পাইবা মাত্র এক বিপুল মুণ্ডা জনতা দুইদিন পর্যন্ত খুন্তিয়া জেল ঘিরিয়া রাখে। অবশেষে কর্তৃপক্ষ ভয় পাইয়া অতি গোপনে আবার তাহাদের রাঁচি জেলে স্থানান্তরিত করে। রাঁচি জেলের মধ্যেই তাহাদের বিচার চলে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর,

১। Ibid. p. 547. ২। Sarat Roy: Ibid. p. 547.

মাসে বিরশাকে আড়াই বৎসর এবং তাঁহার অনুচরদের বিভিন্ন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

২

বিরশার কারাদণ্ডের পরেও মুণ্ডা জনসাধারণ শান্ত না হইয়া বরং আরও উগ্রমূর্তি ধারণ করে। বিরশার কারাদণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আর একটা বিদ্রোহ আসন্ন হইয়া উঠে। এই অবস্থা দেখিয়া শাসকগণ ভীত হইয়া গ্রামে গ্রামে পুলিস ও সৈন্য বসাইয়া রাখে। পুলিস ও সৈন্যদল বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বন্দুকের সঙ্গিন উঁচাইয়া সকলকে ভয় দেখাইতে থাকে। আপাতত বিদ্রোহ আরম্ভ করা অসম্ভব বুঝিয়া মুণ্ডারা উপরে শান্তভাব ধারণ করিয়া থাকে।

পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর পিছনে পিছনে আসে পুরোহিত শ্রেণী, জমিদার আর মহাজনগোষ্ঠী। তাহারা আসিয়া আবার শোষণ-উৎপীড়নের তাণ্ডব আরম্ভ করে। সরকারী বিবরণেও এই শোষণ-উৎপীড়নের কথা স্বীকার করিয়া বলা হইয়াছে :

"লোহারডগা জেলায় (মুণ্ডা অঞ্চলে—সু. রা) শুনা যায় যে, জমিদারের খাজনা আর বেগার শ্রমের নামে চাষীদের যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। জমিদার আদিবাসী চাষীদের জমি হইতে উচ্ছেদের ভয় দেখাইয়া সর্বদা তাহাদিগকে শঙ্কিত অবস্থায় রাখিতেছে। এই অবস্থায় চাষীরা তাহাদের ন্যায্য খাজনাও দিতে অস্বীকার করিতেছে।"[১]

পর বৎসরের বিবরণে দেখা যায়,

"লোহারডগা জেলার জমিদার ও রায়তের সম্পর্ক অত্যন্ত উদ্বেগজনক। জমিদারগণ আইনের সাহায্যে অথবা বে-আইনীভাবেই রায়তদের যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। রায়তেরা তাহাদিগকে যথাশক্তি বাধা দিতেছে। জঙ্গলের অধিকার লইয়া সংঘর্ষ লাগিয়াই আছে। এই সম্বন্ধে অবিলম্বে কিছু করা না হইলে জেলার এক বৃহৎ অংশের জঙ্গলে আদিবাসীদের সমস্ত অধিকার, এমনকি জেলার সমগ্র জঙ্গলের এক বৃহৎ অংশই বিলুপ্ত হইবে।"[২]

জমিদার-মহাজনদের এই উৎপীড়ন ও শোষণ ব্যতীত দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর আক্রমণেও আদিবাসীরা অনিবার্য ধ্বংসের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জমিদারগোষ্ঠির ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন ও অনাবৃষ্টির ফলে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র মুণ্ডা অঞ্চলে এক অভূতপূর্ব দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অনাহারে বহু লোকের মৃত্যু ঘটে। ইহার উপর ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে সমগ্র মুণ্ডা অঞ্চলে কলেরা মহামারী দেখা দেয়। শত শত আদিবাসী বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আদিবাসী চাষীদের মধ্যে হাহাকার উঠে।

এই অবস্থার মধ্যেই বিরশা ও তাঁহার অনুচরগণ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জেল হইতে মুক্তি পাইয়া মুণ্ডা অঞ্চলে ফিরিয়া আসেন। বাহিরে আসিয়া মুণ্ডাদের

১। The Report of the Land Revenue Administrations of the Lower Provinces for th

২। Ibid for the year 1898-99

এই চরম দুর্দশা দেখিয়া বিরশা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার স্বজাতির এই চরম দুর্দশার জন্ম যাহারা দায়ী তাহাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ম বিরশা অস্থির হইয়া উঠিলেন। অবিলম্বে গ্রামে গ্রামে বিরশার অভয়বাণী ও সংগ্রামের কথা প্রচারিত হইল। সেই বাণী শুনিয়া মুমূর্ষু মুণ্ডাজাতির প্রাণে আবার চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিল। হাজার হাজার মুণ্ডা যুবক আবার তাহাদের প্রিয়তম নায়ক বিরশা 'ভগবানের' নির্দেশ গ্রহণ করিতে চালকাদ গ্রামে উপস্থিত হইল। বিরশা ঘোষণা করিলেন, মুণ্ডারাই মুণ্ডা অঞ্চলের সমগ্র জমির একমাত্র মালিক, তাহারা বৃটিশ সরকারকে ভূমিকর দিতে প্রস্তুত, কিন্তু 'ডিকু' অর্থাৎ জমিদারদের কোন খাজনা দিবে না, 'ডিকু'দের কোন্ অধিকারই স্বীকার করিবে না।

জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়াই বিরশা শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, অদূরবর্তী চুতিয়া নামক স্থানের প্রাচীন হিন্দু মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সহায়তায় জমিদার-মহাজনগোষ্ঠী এতদিন আদিবাসী চাষীদের উপর উৎপীড়ন চালাইয়াছে, তাহাদের যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে। বিরশা তাঁহার অনুচরদের সহিত পরামর্শের পর স্থির করিলেন, এই "শয়তানের ঘাঁটি" হিন্দু মন্দিরটার উপরেই প্রথম আক্রমণ করিতে হইবে।

অনুচরদের লইয়া বিরশা একদিন মন্দিরটার উপর আক্রমণ করিলেন এবং উহা দখল করিয়া মন্দিরের সমস্ত দেবমূর্তিগুলি ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিলেন। বিরশা মন্দির দখল করিয়া রহিলেন। স্থানীয় জমিদার, মহাজন ও পুরোহিতগণ ছোটনাগপুরের মহারাজের সাহায্যে বিরশার কবল হইতে মন্দির উদ্ধারের জন্ম সচেষ্ট হইল। জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন গভীর রাত্রিতে যখন বিরশা তাঁহার অনুচরদের লইয়া পরামর্শ করিতেছিলেন, এমন সময় মহারাজের পাইক-বরকন্দাজগণ আকস্মিকভাবে মন্দির আক্রমণ করে। এই আকস্মিক আক্রমণে বিরশার দল পরাজিত হইয়া পলায়ন করে।

এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে রাঁচি হইতে একদল সৈন্ম ও পুলিস আসিয়া মুণ্ডা অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘাঁটি করিয়া বসে। তাহারা গ্রামে গ্রামে হানা দিয়া বিরশা ও তাঁহার অনুচরগণকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ম খুঁজিতে থাকে। বিরশা দেখিলেন এই অবস্থায় এবং উপযুক্ত আয়োজন না করিয়া বিদ্রোহ আরম্ভ করা অসম্ভব। সুতরাং তিনি আত্মগোপন করিয়া গ্রামে গ্রামে মুণ্ডা চাষীদের মধ্যে নূতন সংগ্রামের কথা প্রচার করিতে থাকেন।

৩

একদিকে গ্রামে গ্রামে পুলিস ও সৈন্ম বসাইয়া মুণ্ডাদের ভীতি প্রদর্শন এবং গ্রেপ্তারের জন্ম বিরশার অনুসন্ধান চলিতে থাকে, অপরদিকে চিরবিদ্রোহী মুণ্ডাদের শান্ত করিবার চেষ্টাও চলে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন[১] পাশ করিয়া সরকার জমি ও বনভূমির উপর মুণ্ডাদের প্রাচীন অধিকার নামেমাত্র স্বীকার করিয়া লয়

১। Act IV of 1897.

অবশ্য জমিদারগণ সেই আইন কোনদিন মানিয়া চলে নাই। ঐ বৎসরই লেঃ গভর্নর উড্‌বার্ন সাহেব আসিয়া ঘোষণা করেন যে মুণ্ডাদের সকল প্রাচীন অধিকার রক্ষা করা হইবে।[১] কিন্তু ঘোষণা অনুযায়ী কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। আদিবাসীদের আর্থিক দুর্দশা আরও বাড়িয়া যায়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের আঘাত কাটাইয়া উঠিতে না উঠিতেই আর একটা দুর্ভিক্ষের কৃষ্ণমেঘ মুণ্ডা অঞ্চলের উপর ঘনাইয়া আসে। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে শীতের ফসল নষ্ট হইয়া যায়, সমগ্র মুণ্ডা অঞ্চলে হাহাকার উঠে। অথচ জমিদারগণ তাহাদের খাজনার একটি পয়সাও ছাড়িল না। তাহারা খাজনার দায়ে চাষীদের যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইতে লাগিল, খাজনার দায়ে চাষীদের জমিজমা আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করিল।

আদিবাসী চাষীদের এই দুর্দশা দেখিয়া বিরশা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি এবার অজ্ঞাত বাস ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যে মুণ্ডা অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলকে অভয় দিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে গ্রামাঞ্চল হইতে পুলিস ও সৈন্যবাহিনী সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল। সুতরাং বিরশা নির্ভয়ে সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুচরগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন, মুণ্ডারাই জমির প্রকৃত মালিক, কেহ যেন জমিদার 'ডিকু'দের এক পয়সাও খাজনা না দেয়।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ তিনমাসে মুণ্ডা-অঞ্চলের সর্বত্র বড় বড় সভা হইল। এই সকল সভায় বিরশা স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন প্রধান অনুচর জ্বালাময়ী ভাষায় মুণ্ডা জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা এবং তাহাদের উপর জমিদার ও মহাজনগোষ্ঠীর উৎপীড়নের কথা বলিয়া মুণ্ডাদের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন। তাঁহারা বুঝাইলেন, অস্ত্র হাতে লইয়া যুদ্ধ করিয়া 'ডিকু' দস্যুদের তাড়াইতে না পারিলে মুণ্ডাদের বাঁচিবার কোন আশা নাই, শোষণ-উৎপীড়নের অবসানের কোন সম্ভাবনা নাই। মুণ্ডা চাষীরা বিরশার আহ্বানে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

মুণ্ডা সর্দারগণ পরামর্শ করিয়া বিদ্রোহের দিন স্থির করে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের খ্রীষ্টমাস পর্বের পূর্বদিন।[২] স্থির হয় ঐ দিন মুণ্ডাগণ তাহাদের নিজ নিজ তীর-ধনুক, বালুয়ার (বল্লম) প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া মুণ্ডা-অঞ্চলের সকল রাজা, হাকিম, জমিদার, জায়গীরদার, ঠিকাদার, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, খ্রীষ্টান-পাদ্রী প্রভৃতি সকল শোষক-উৎপীড়কদের আক্রমণ করিবে। বিরশা বলিলেন, "এই শয়তানগুলিকে হত্যা করিলেই এই দেশ হইবে আমাদের। জমির মালিক হইব আমরা"।[৩]

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের খ্রীষ্টমাস পর্বের কয়েকদিন পূর্ব হইতেই বিরশার বিশ্বস্ত অনুচরগণের এক এক জনকে এক এক অঞ্চলে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল। খ্রীষ্টমাসের পূর্বদিন তাহাদের নেতৃত্বে তানা, কুঁটি, তামা, বাসিয়া, রাঁচি প্রভৃতি অঞ্চলে জমিদারদের কুঠি-কাছারি, মন্দির, গীর্জা, খামার, থানা, আদালত প্রভৃতির উপর আক্রমণ আরম্ভ হইল। এই আক্রমণে কয়েকজন জমিদার, তাহাদের বহু কর্মচারী, পুরোহিত, পাদ্রী, পুলিস ও চৌকিদার নিহত

১। Sarat Roy: Ibid. p. 547. ২। Ibid, p. 548. ৩। Sarat Roy: Ibid. p. 548.

হইল। সমগ্র অঞ্চলে এই বিদ্রোহের ফলে খ্রীষ্টানদের বড়দিনের উৎসব ও আনন্দ পণ্ড হইল, সমস্ত জমিদার-মহাজন, পুরোহিত-পাদ্রী পলায়ন করিয়া রাঁচি শহরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এমনকি সৈন্য ও পুলিস দ্বারা বেষ্টিত রাঁচি শহরের উপরেও বিদ্রোহীদের আক্রমণের আশঙ্কা লইয়া রাঁচির অধিবাসীরা দিন কাটাইতে লাগিল।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী তিনশত মুণ্ডা যুবক তীর-ধনুক, বল্লম, টাঙ্গি, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া খুন্তির বিরাট থানাটির উপর আক্রমণ করে। থানার কনেস্টবলগণ বহুক্ষণ প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া কয়েকজন নিহত ও বহু আহত হয়। বিদ্রোহীরা থানায় আগুন লাগাইয়া দেয়। এই সংবাদ পাইবামাত্র পুলিশ কমিশনার ও ডেপুটি পুলিস কমিশনার দারেন্দার সামরিক ঘাঁটি হইতে ১৫০ জন সৈন্য ও ১০০ জন সশস্ত্র পুলিস সঙ্গে লইয়া খুন্তি আসিয়া উপস্থিত হন।

এই সংবাদ শুনিবা মাত্র খুন্তির নিকটবর্তী ডুমারী পাহাড়, জানুমপিড়ি, খুটুহাটু, কুরাপুর্তি প্রভৃতি অঞ্চল হইতে শত শত সশস্ত্র মুণ্ডা খুন্তির নিকটবর্তী অরণ্য অঞ্চলে সমবেত হয়। তাহারা আত্মরক্ষার জন্য গাছ ও বাঁশ কাটিয়া বেড়া দেয় এবং বেড়ার পিছনে থাকিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্বয়ং বিরশা হইলেন বিদ্রোহী-বাহিনীর সেনাপতি।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে পুলিস কমিশনার সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিসের এক বিশাল বাহিনী লইয়া বিদ্রোহীদের নিকটবর্তী হইলেন। তিনি বিদ্রোহীদিগকে আত্মসমর্পণ করিবার আদেশ দিবামাত্র বেড়ার ফাঁক দিয়া শত শত বিষাক্ত তীর সৈন্যবাহিনীর উপর বর্ষিত হইল। বহু সৈন্য ও পুলিস তীরের আঘাতে ধরাশায়ী হইল। কমিশনার তাঁহার বাহিনীকে গুলিবর্ষণের হুকুম দিলেন। সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর রাইফেল হইতে বৃষ্টি ধারার মত গুলিবর্ষণ চলিল। তাহার সহিত পাল্লা দিয়া চলিল মুণ্ডাদের তীরবর্ষণ। ইতিমধ্যে গুলিবর্ষণের ফলে কয়েকজন মুণ্ডা যুবক নিহত ও আহত হওয়ায় বিরশা বুঝিলেন মুখোমুখি দাঁড়াইয়া তীর-ধনুক দিয়া রাইফেলের সহিত বেশীক্ষণ যুদ্ধ করা সম্ভব নহে। সুতরাং তাঁহার নির্দেশে বিদ্রোহীরা বেড়ার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী অরণ্যে আশ্রয় লইল। সৈন্য ও পুলিস বাহিনী বেড়া ভাঙিয়া চারিজন মুণ্ডা যুবককে নিহত ও তিনজনকে আহত অবস্থায় দেখিতে পাইল। চারিটি মৃতদেহের মধ্যে তিনটি ছিল বীরবেশে সজ্জিত মুণ্ডাযুবতীর মৃতদেহ।[১]

সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিসের মোট সংখ্যা মাত্র তিনশত। এই শক্তি লইয়া তাহারা অরণ্যে প্রবেশ করিতে সাহসী হইল না। সংবাদ পাইয়া বিভিন্ন ঘাঁটি হইতে আরও তিনশত সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিস আসিয়া পৌছিবার পর তাহারা বিদ্রোহীদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিল। বিদ্রোহীরা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া সমগ্র রাঁচি জেলা ও সিংভূম অঞ্চলে প্রায় দুইমাস যাবৎ যুদ্ধ চালাইল। এদিকে

১। Administration Report of the Lower Provinces for the year 1899-1900, p. 4.

পঙ্গপালের মত পুলিস ও সৈন্যদল আসিয়া মুণ্ডা-অঞ্চলে ভয়ঙ্কর ধ্বংসকার্য আরম্ভ করিল। তাহার ফলে বহু মুণ্ডাযুবক নিহত ও আহত হইল, মুণ্ডাদের হাজার হাজার কুটির ধূলিসাৎ ও ভস্মীভূত হইল।

এই অসমান যুদ্ধ বেশীদিন চলিতে পারে না। বিদ্রোহের আগুন ধীরে ধীরে নিবিয়া আসে। বিদ্রোহের নায়ক বিরশা আর তাঁহার শতাধিক অনুচর কিছুদিন আত্মগোপন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা পুলিসের হাতে বন্দী হন। ইহার পর আরম্ভ হয় বিচারের পালা। বিচার শেষ হইবার পূর্বেই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে এই ঐতিহাসিক মুণ্ডা-বিদ্রোহের প্রধান নায়ক বিরশা 'ভগবান' মাত্র আটাশ বৎসর বয়সে রাঁচিজেলের মধ্যে কলেরা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনেকে বিরশার ধর্ম-সংস্কার, রাজনীতিক মত ও আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে "ধর্মোন্মাদ", "উগ্র ও বিকৃতমস্তিষ্ক", "হঠকারী" প্রভৃতি আখ্যা দান করিয়াছেন। কিন্তু মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত এই মুণ্ডা-যুবক স্বজাতির শতাব্দীকালের দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটাইবার জন্য, মুণ্ডাজাতির উপর হিন্দু-খ্রীষ্টান পুরোহিত সম্প্রদায় ও জমিদার-মহাজনগণের অবর্ণনীয় শোষণ-উৎপীড়নের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য, এবং মুণ্ডাজাতিকে উহার প্রাচীন মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যেভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে কোন জাতির যে কোন মানুষের অনুকরণীয়। স্বজাতির মুক্তি সাধনে নিবেদিত প্রাণ এই যুবক মুণ্ডানায়ক তাঁহার ধর্মীয় ও রাজনীতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়া মুণ্ডা আদিবাসীদের মধ্যে যে নূতন চেতনার সঞ্চার করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মানুষ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া গিয়াছেন তাহার জন্যই তাঁহাকে মুণ্ডাজাতি ভগবানের আসনে বসাইয়াছেন। আজও সেই উচ্চতম আসনে বিরশা সুপ্রতিষ্ঠিত।

দীর্ঘকাল পরে বিদ্রোহের অন্যান্য নায়কগণের বিচারের পালা শেষ হয়। বিচারে দুইজনের ফাঁসি হয় এবং বারোজন দ্বীপান্তর ও তিয়াত্তরজন পাঁচ হইতে দশ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করে।

* * * *

বৃটিশ সরকার এতদিন পর্যন্ত মুণ্ডা আদিবাসীদের কোন দাবির প্রতিই কর্ণপাত করে নাই, তাহারা এই আদিবাসী চাষিগণকে জমিদার-মহাজনগোষ্ঠীর হাতে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। এবার এই বিদ্রোহের ফলে তাহাদের টনক নড়িয়া উঠে। সরকার ব্যস্ত সমস্ত হইয়া মুণ্ডা অঞ্চলের সমস্ত জমি জরীপ করিবার ব্যবস্থা করে এবং জমি ও বনভূমির উপর মুণ্ডাদের অধিকার আংশিকভাবে স্বীকার করিয়া লয়। ইহা ব্যতীত, জমিদারদের জমিতে আদিবাসীদের বলপ্রয়োগে বেগার খাটানো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর সংগ্রামী ঐতিহ্য

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের উন্মেষ আরম্ভ হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতেই বুর্জোয়াশ্রেণীর মুখপাত্ররূপে মধ্যশ্রেণীর ইংরেজী শিক্ষিত অংশ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরম্ভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়া উহার বিকাশের জন্য বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর নিকট হইতে কিছু সুবিধা-সুযোগ আদায়ের উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইতেছিল এবং ইহার জন্য তাহারা ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীকে দলে টানিয়া তাহাদের উপর সেই সংগ্রাম চালনার ভার অর্পণ করিয়াছিল। বৈপ্লবিক কৃষক-সংগ্রামে বাধা দানের উদ্দেশ্যে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর উদ্যোগে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইলেও সেই কংগ্রেসকেই বুর্জোয়াশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণী তাহাদের স্বার্থরক্ষার সংগ্রামের সংগঠনরূপে গ্রহণ করে। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর মত তাহাদেরও সম্মুখে সমস্যা ছিল বৈপ্লবিক কৃষক-সংগ্রামে বাধা দেওয়া। কৃষক জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের বিরুদ্ধেই তাহারা কংগ্রেসকেই তাহাদের নিজস্ব জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সংগঠনরূপে গড়িয়া তোলে।

ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর কৃষক-সংগ্রামের বিরোধিতা কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তির উপর, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোর মধ্যেই ভারতীয় ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটিতেছিল। ভারতীয় ধনতন্ত্রের শিকড় সামন্ততন্ত্রের গর্ভেই নিহিত। বৃটিশ শাসন উহার অন্যতম স্তম্ভ রূপে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল, আর বৃটিশ শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় এবং উহার সমর্থক রূপেই ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীরও জন্ম ও বৃদ্ধি হইয়াছিল। প্রথম হইতেই বুর্জোয়াশ্রেণী ভূস্বামী জমিদারগোষ্ঠীর হাত ধরিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠনের সহযোগীরূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে। তাই তাহারা উভয়ে বৃটিশসৃষ্ট কংগ্রেসকেই গণ-সংগ্রামের বিরোধী সংগঠন হিসাবে ব্যবহার করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, বুর্জোয়াশ্রেণী ও ভূস্বামী জমিদারগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার প্রয়াস পাইয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত বুর্জোয়া-জমিদারগোষ্ঠীর সংঘাত উপস্থিত হইলে ভারতের সমগ্র জনসাধারণের সমর্থন লাভের আশায় এই কংগ্রেসেরই মারফত তাহারা তাহাদের জাতীয় সংগ্রাম চালনা করিয়াছে এবং সেই সংগ্রামকে তাহাদের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাইতে দেখিবামাত্র তাহারা প্রতিবার সংগ্রাম বন্ধ করিয়া বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর সহিত আপস করিয়া আসিয়াছে। একটি মাত্র উদ্দেশ্য লইয়াই চলিয়াছে কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলন। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর অনিচ্ছুক হস্ত হইতে আর্থনীতিক সুবিধা আদায়ই সেই উদ্দেশ্য। সুতরাং কংগ্রেস শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদ-বুর্জোয়া-জমিদার-বিরোধী সংগ্রামে সর্বশক্তি দিয়া বাধা দানের চেষ্টাই করিয়াছে। ইহাই ভারতবর্ষের কংগ্রেস অর্থাৎ বুর্জোয়া-জমিদারগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদের মূল বিষয়বস্তু। এই আপসপন্থী ও

সুবিধাবাদী জাতীয়তাবাদ লইয়াই ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী ও জমিদারগোষ্ঠীর কংগ্রেসের বিকাশ এবং এই আপসপন্থী ও সুবিধাবাদী রাজনীতিই কংগ্রেস প্রথম হইতে অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে।

বৃটিশ প্রভুত্বকে ভারত-ভূমিতে অক্ষত রাখিয়া শাসকদের নিকট হইতে কিছু সুবিধা আদায়ের জন্য যে আন্দোলন কংগ্রেস চালনা করিয়াছে তাহা ছিল সংস্কারের আন্দোলন, তাহা স্বাধীনতা-সংগ্রাম নহে। অন্যদিকে ভূস্বামী ও মহাজনগোষ্ঠী প্রভৃতি কৃষক-শোষণের অংশীদারগণসহ বৃটিশ শক্তির প্রভুত্ব ভারতভূমি হইতে নির্মূল করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশ ও ভারতের অন্যান্য স্থানের কৃষক-সম্প্রদায় সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালনা করিয়াছিল তাহাই ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা-সংগ্রামের এবং বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করিয়াছে।

ভারতবর্ষের কৃষক ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সময় হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও উহার সহচর জমিদার-মহাজনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছে এক মহান বৈপ্লবিক সংগ্রামের ঐতিহ্য। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে এই সংগ্রামের কোন পরিণতি না ঘটিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে বৈদেশিক ও জাতীয় শত্রুর সহিত কোন আপসের স্থান নাই।

উনবিংশ শতাব্দীতে যথেষ্ট সংখ্যায় শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে নাই। তখন কৃষকই ছিল একমাত্র সংগ্রামী শক্তি এবং তখন কেবল কৃষক একাকী সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রাম চালনা করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-বিদ্রোহের এই সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহকরূপে বিংশ শতাব্দীতে শ্রমিকশ্রেণী এই বৈপ্লবিক ঐতিহ্যকে আরও অগ্রসর, ইহার আরও বিকাশসাধন করিয়া ইহাকে উন্নত স্তরে লইয়া গিয়াছে। ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কৃষক জনসাধারণের আপসহীন সংগ্রামই ইহার এবং ভারতের বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করিয়াছিল।

১৭৬৩-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ' নামে খ্যাত কৃষক-বিদ্রোহই বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের প্রথম বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রাম। তাহার পর ১৮৩০-৭০ খ্রীষ্টাব্দের ওয়াহাবী বিদ্রোহ, ১৮২০-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মুণ্ডা-কোল বিদ্রোহ, ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের নীল বিদ্রোহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক কৃষক-বিদ্রোহগুলি বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ ও বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের চিরউজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে।

চৌত্রিশ বৎসরের দীর্ঘ সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের মধ্য দিয়াই উনবিংশ শতাব্দী অষ্টাদশ শতকের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিল বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ও জাতি গঠনের গুরু দায়িত্ব। তাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বৈদেশিক শাসন ও সেই শাসনের দ্বারা সৃষ্ট সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতা ও জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী কৃষক-অভ্যুত্থান।

শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন নেতৃত্বের অভাবে সংগঠন, শ্রেণীচেতনা, ঐক্য ও জাতীয় সংস্কৃতিবিহীন কৃষক-সম্প্রদায় সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া কেবল খণ্ড-বিক্ষিপ্ত অভ্যুত্থানের মারফত সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করিয়াছিল। সচেতন নেতৃত্বের অভাবে সেই সকল খণ্ড-বিক্ষিপ্ত অভ্যুত্থানগুলিকে এক অখণ্ড সংগ্রামে পরিণত করিতে না পারায় কৃষক-সম্প্রদায় সেই বিপুল ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইয়াছে। তথাপি এই আপসহীন সংগ্রামের আদর্শই ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের, বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করিয়াছে এবং পরাধীন ভারতবর্ষের মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে।

কৃষক-সম্প্রদায়ের এই আপসহীন বৈপ্লবিক সংগ্রাম এমনকি মধ্যশ্রেণীর নায়কগণকেও জাতীয়তাবাদের শিক্ষা দান করিয়াছিল এবং তাহাদিগকেও জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দের নীল-বিদ্রোহের সময় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় বিদ্রোহী কৃষকগণের সংস্পর্শে আসিয়া যে অমূল্য শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহা স্বীকার করিয়া তিনি লিখিয়াছেন:

"এই নীল-বিদ্রোহই সর্বপ্রথম দেশের মানুষকে রাজনীতিক আন্দোলন ও সঙ্ঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা শিখাইয়াছিল। বস্তুত বঙ্গদেশে বৃটিশ রাজত্বকালে নীল-বিদ্রোহই প্রথম বিপ্লব।"[১]

মধ্যশ্রেণীর নায়কগণকে ১৮৩০-৭০ খ্রীষ্টাব্দের ওয়াহাবী বিদ্রোহ যে প্রেরণা যোগাইয়াছিল তাহা স্বীকার করিয়াছেন বুর্জোয়া ও মধ্যশ্রেণীর জাতীয়তাবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াহাবী বিদ্রোহের নায়কগণের মামলার বিচারকালে বিদ্রোহীপক্ষের ব্যারিস্টার এ্যানেস্টি সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় চূড়ান্তরূপে প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে, ওয়াহাবী বিদ্রোহ কৃষকের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। পরে এ্যানেস্টি সাহেবের এই বক্তৃতা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইলে তাহা মধ্যশ্রেণীর নায়কগণকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় লিখিয়াছেন:

"এ্যানেস্টির এই বক্তৃতা সমেত মোকদ্দমার বিবরণ ওয়াহাবীরা পুস্তিককারে ছেপে চারিদিকে বিলি করলে তা পাঠ করে বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, যৌবনে এই পুস্তিকাখানি পাঠ করে তারা যেন মেতে উঠেছিলেন।"[২]

উপজাতীয় আদিবাসী কৃষকের সংগ্রাম উনবিংশ শতাব্দীর এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই শতাব্দীতে আদিবাসী কৃষকদের দীর্ঘ সংগ্রাম একটি প্রধান জাতীয় সমস্যাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে এবং সেই সংগ্রামের মারফত এক মহান বৈপ্লবিক ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিয়াছে। বর্তমান কালের উপজাতীয় আদিবাসীরা সেই ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকারী হইয়া দীর্ঘ ও আপসহীন সংগ্রামের মারফত উহাকে চূড়ান্ত রূপ দান করিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের পূর্ব প্রান্তের উপজাতীয় আদিবাসীদের

১। Amrita Bazar Patrika, 22nd. May, 1874.
২। যোগেশচন্দ্র বাগল: মুক্তি-সন্ধানে ভারত; পৃ. ৯৯।

দীর্ঘ সংগ্রাম, দক্ষিণ-ভারতের মোপলা উপজাতীয়দের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলের মুণ্ডা-কোল আদিবাসীদের প্রায় শত বৎসরের সংগ্রাম একদিকে যেমন ইহাদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জাতীয় দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং ইহাদের বিশেষ সমস্যাবলী ভারতের অন্যান্য জাতিগুলির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে, তেমনি অপর দিকে এই সকল আদিবাসী কৃষক ভারতবর্ষের সকল কৃষকের সাধারণ শত্রু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভূস্বামী জমিদারগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইহাদের দীর্ঘস্থায়ী, রক্তক্ষয়ী ও আপসহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়া সমগ্র ভারতের সকল জাতির কৃষক জনসাধারণের সহিত এক অচ্ছেদ্য ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইবার পথ প্রস্তুত করিয়াছে। এই পথই ভবিষ্যতের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের এবং ঐক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক ভারত গঠনের পথ।

সংগ্রামের ক্ষেত্রে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব[1]

শিল্পীয় শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম এবং সংগ্রামের ক্ষেত্রে উহার আবির্ভাব এক বিপুল তাৎপর্যপূর্ণ বৈপ্লবিক ঘটনা। "ধনতন্ত্রের কবর খননকারী" শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ক্ষেত্রে আবির্ভাব ভারতের প্রকৃত বৈপ্লবিক সংগ্রামের সূচনা করিয়াছে। গোড়ার দিকের শ্রমিক-সংগ্রাম আর্থনীতিক দাবিদাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও, সেই আর্থনীতিক গণ্ডি পার হইয়া রাজনীতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে শ্রমিকশ্রেণীর অধিক দিন বিলম্ব হয় নাই। ১৯০৮ সালে বোম্বাইয়ে "চরমপন্থী" জাতীয়তাবাদী নায়ক বাল-গঙ্গাধর তিলকের কারাদণ্ড উপলক্ষে বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকশ্রেণীর অভূতপূর্ব সংগ্রামের পর লেনিন ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী এবার রাজনীতিক সংগ্রামের স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। এই রাজনীতিক সংগ্রামের স্তরের প্রস্তুতি হিসাবেই ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শিল্পীয় শ্রমিকশ্রেণী তাহার আর্থনীতিক দাবি লইয়া শ্রেণীসংগ্রাম আরম্ভ করে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের এই শ্রমিক-সংগ্রাম ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাসের প্রথম সংগ্রাম এবং ইহা চিরস্মরণীয়।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে হাওড়ায় ১২০০ রেলশ্রমিক ধর্মঘট করে। তাহাদের দাবি ছিল, দিনে ৮ ঘণ্টার অধিক সময় খাটানো চলিবে না। সেই সময় শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় নির্দিষ্ট ছিল না। ৮ ঘণ্টার কাজের দাবি লইয়া ইহাই ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম ধর্মঘট।[2]

ঐ বৎসর জুন মাসে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে'র 'অডিট' বিভাগের কেরানীরা কর্তৃপক্ষের উৎপীড়নের প্রতিবাদে একদিনের জন্য ধর্মঘট করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দেই পুলিসের উৎপীড়নের প্রতিবাদে কলিকাতার গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানগণ ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘট একাধিক দিন স্থায়ী হইয়াছিল।

১। এই অংশের তথ্যসমূহের উৎস: A. S. Mathur and J. S. Mathur: Trade Union Movement in India; গোপাল ঘোষ: ভারতের প্রথম ধর্মঘট ও শ্রমিক-ধর্মঘটের দিনলিপি; R. K. Das: Labour Movement in India. ২। গোপাল ঘোষ: পূর্বোক্ত পুস্তিকা, পৃ. ১৩।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানগণ ধর্মঘট করে। কয়েকজন গাড়োয়ান অতি দ্রুত গাড়ী চালাইলে পুলিশ তাহাদের নির্যাতন করে এবং শাস্তি দেয়। গাড়োয়ানদের দাড়ি কামাইয়া দেওয়া হয়। ইহার প্রতিবাদে গাড়োয়ানগণ ধর্মঘট করিয়া গাড়ী চালানো বন্ধ করে এবং চৌরঙ্গীর মাঠে সমবেত হইয়া ইহার প্রতিবাদ করে।[১]

ঐ বৎসর বোম্বাইয়ের সরকারী ছাপাখানার শ্রমিকগণ দৈনিক ৮ ঘণ্টার কাজ ও মজুরি বৃদ্ধির দাবি লইয়া ধর্মঘট করে। দীর্ঘকাল এই ধর্মঘট চলে। বোম্বাই সরকার মাদ্রাজ হইতে কম্পোজিটর আনাইয়া ধর্মঘট ভাঙিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে মজুরি বৃদ্ধি হইলে ধর্মঘটের অবসান ঘটে।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরের শিল্পকেন্দ্রে দীর্ঘকাল যাবৎ ধর্মঘট চলে।

ঐ বৎসর মাদ্রাজের এম্প্রেস মিলের শ্রমিকগণ মজুরি বৃদ্ধির দাবি লইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ ধর্মঘট চালায়। ধর্মঘট সাফল্যমণ্ডিত হয়।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া' রেলপথের পয়েণ্টস্‌ম্যানগণ বৃটিশ সাহেবদের উৎপীড়নমূলক আচরণের প্রতিবাদে এবং ঐ সাহেবদের অপসারণের দাবি লইয়া দীর্ঘকাল ধর্মঘট চালনা করে। সাহেবদের আচরণ ভবিষ্যতে সংযত হইবে—এই প্রতিশ্রুতি আদায়ের পর ধর্মঘটের অবসান হয়।

১৮৮২ হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বঙ্গদেশে কয়েকটি বৃহৎ ধর্মঘট হয়। ধর্মঘটীদের প্রধান দাবি ছিল ৮ ঘণ্টার কাজের দিন এবং মজুরি বৃদ্ধি।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকগণ ধর্মঘট করে। মজুরি বৃদ্ধি এবং ৮ ঘণ্টার কাজের দিনই ছিল এই ধর্মঘটের প্রধান দাবি। এই ধর্মঘটের ফলে অধিকাংশ মিল দীর্ঘকাল যাবৎ বন্ধ থাকে।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেদাবাদের সকল মিলের তাঁতীরা ধর্মঘট করে এবং ইহার ফলে কয়েকদিন সকল মিল বন্ধ থাকে। মিলমালিক-সঙ্ঘ শ্রমিকদের সাপ্তাহিক মজুরির পরিবর্তে পাক্ষিক মজুরি দিবার সিদ্ধান্ত করিলে সকল মিলের তাঁতীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই ধর্মঘট করে। কিন্তু ধর্মঘট শেষপর্যন্ত দাবি আদায় করিতে ব্যর্থ হয়।[২]

এই বৎসর কলিকাতার নিকটবর্তী বজবজ চটকলের শ্রমিকগণ ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘট দুই সপ্তাহ যাবৎ চলিয়াছিল এবং ইহার জন্য মালিকদের ক্ষতি হইয়াছিল প্রায় ৮০ হাজার টাকা।[৩]

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বজবজ চটকলের শ্রমিকগণ পুনরায় ধর্মঘট করে। দুই সপ্তাহ যাবৎ এই ধর্মঘট চলিয়াছিল।

এই বৎসর অক্টোবর মাসে কলিকাতার নিকটবর্তী শিবপুর চটকলের শ্রমিকগণ কাজের সময় বৃদ্ধির প্রতিবাদে ধর্মঘট করে।[৪]

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বিনা মজুরিতে অতিরিক্ত সময় কাজ করাইবার প্রতিবাদে মাদ্রাজ

১। গোপাল ঘোষ: পৃ. ১১। ২। A. . Mathur & J. S. Mathur: Ibid. p. 14.
৩। গোপাল ঘোষ: পূর্বোক্ত পুস্তিকা, পৃ. ১৩। ৪। ঐ, পৃ. ১৪।

সরকারের প্রেস-শ্রমিকগণ দুই সপ্তাহকাল ধর্মঘট করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রমিকগণ অতিরিক্ত কাজের মজুরি আদায় করিতে ব্যর্থ হয়।

এই বৎসর জানুয়ারী মাসে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য বেতনবৃদ্ধি ও ছুটির দাবি লইয়া 'জি. আই. পি.' রেলপথের গার্ডগণ ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘট চারদিন চলিবার পর রেলবোর্ড গার্ডদের দাবি মানিয়া লয়।

এই বৎসর বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকগণ মাসিক মজুরির পরিবর্তে দৈনিক মজুরির দাবি লইয়া ধর্মঘট করে। কিন্তু শ্রমিকগণ দাবি আদায় করিতে ব্যর্থ হয়।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 'জি. আই. পি.' রেলপথের শ্রমিকগণ কতকগুলি দাবি লইয়া ধর্মঘট করে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই ধর্মঘটের প্রস্তুতি চলিয়াছিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এই রেলপথের 'সিগ্‌নাল'-এর শ্রমিকগণ তাহাদের সঙ্ঘের মাধ্যমে রেল-কর্তৃপক্ষের নিকট এক দাবিপত্র পেশ করে। এই দাবিপত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় ৪ শত শ্রমিক স্বাক্ষর দান করিয়াছিল। পুনরায় শ্রমিকদের পক্ষ হইতে একজন উকিল ঐ দাবিপত্র কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করে। তাহাতেও ফল না হওয়ায় আবার ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে শ্রমিকদের পক্ষ হইতে 'দীক্ষিত, এণ্ড ধুনজা সাউ সলিসিটর কোম্পানি' অনুরূপ একখানি দাবিপত্র 'জি. আই. পি.' রেল কোম্পানীর এজেণ্টের নিকট পেশ করে। দাবিপত্র পেশ করিবার পর এজেণ্টকে ৪৮ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। ৪৮ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইলে শ্রমিকগণ ধর্মঘট আরম্ভ করে। ধর্মঘট ভাঙিবার জন্য সরকার সামরিক বাহিনী হইতে বহু 'সিগনালার' প্রেরণ করে এবং রেল কর্তৃপক্ষ ধর্মঘট ভাঙিবার জন্য চারগুণ অধিক মজুরি দিয়া নূতন শ্রমিক নিযুক্ত করে। দেশীয় সংবাদপত্রগুলি এই ধর্মঘট সমর্থন করে এবং স্থানীয় জনসাধারণ ধর্মঘটী শ্রমিকদিগকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া ও ধর্মঘটীদের সমর্থনে কর্তৃপক্ষের নিকট গণ-ডেপুটেশন পাঠাইয়া শ্রমিকদের ধর্মঘট সমর্থন করে। কর্তৃপক্ষ ও য়ুরোপীয় সংবাদপত্রগুলি এই ধর্মঘট ভাঙিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে। তাহারা শ্রমিকদের মধ্যে জাতিভেদের সুযোগ লইয়া শ্রমিকদের ঐক্য ভাঙিবার চেষ্টা করে। শ্রমিকগণ দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকিয়া এই সকল বিভেদ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়।[১]

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে কয়েকটি ধর্মঘট হয়। এই সকল ধর্মঘটের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মাদ্রাজ সরকারের প্রেসের শ্রমিকদের ধর্মঘট। অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরির দাবি লইয়া এই ধর্মঘট আরম্ভ হয় এবং ৬ মাস পর্যন্ত এই ধর্মঘট চলে। ধর্মঘটী শ্রমিকগণ তাহাদের আংশিক দাবি আদায় করিতে সক্ষম হয়।

জাতীয়তাবাদী যুবশক্তির আবির্ভাব

শাসকগোষ্ঠী ও নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসকে যতই আপস-আলোচনার ক্ষেত্র হিসাবে একটা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করুন না কেন, এই প্রতিষ্ঠানে

১। গোপাল ঘোষ: পূর্বোক্ত পুস্তিকা, পৃ. ১৫; R. K. Das: Labour Movement in India, p. 81-82.

জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ বুদ্ধিজীবীরা ক্রমশ অধিক সংখ্যায় যোগদান করিতে থাকে। ইতিমধ্যে মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত অংশ অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান আর্থিক দুর্দশা দেখা দিতেছিল এবং ভারতবাসীদের প্রতি বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর অবজ্ঞা ও বৈষম্য-মূলক আচরণ সর্বক্ষেত্রে প্রকট হইয়া উঠিতেছিল তাহার ফলেই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এক প্রবল বৃটিশ-বিরোধী বিক্ষোভ ও জাতীয় চেতনা স্পষ্টরূপ গ্রহণ করিতেছিল। নবগঠিত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে ক্রমশ অধিক সংখ্যায় তাহাদের যোগদানের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ করে। ইহারা কংগ্রেসের মধ্যে লইয়া আসে একটা দৃঢ় সংগ্রামী মনোভাব, বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের এক দুর্জয় দাবি। ইহাদের দাবির ফলেই কংগ্রেসের এক সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

কংগ্রেসের প্রথম দিকের আপসমূলক মনোভাবের মধ্যে তৎকালের ভারতীয় মূলধনি-শ্রেণীর আপসমূলক মনোভাবই প্রতিফলিত হয়। ভারতের নূতন মূলধনিশ্রেণী তাহাদের তৎকালীন আর্থনীতিক দুর্বলতার জন্য আপস-আলোচনার মাধ্যমেই শিল্পবিকাশের পথ বাধামুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। সেই সময় পর্যন্ত বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর সহৃদয়তায় তাহাদের বিশ্বাস ছিল অগাধ। তাই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরিবর্তে আপস-আলোচনাই ছিল তাঁহাদের দাবি আদায়ের একমাত্র পথ। শিল্পপতিদের এই মনোভাবই কংগ্রেসের প্রথম দিকের গৃহীত প্রস্তাব ও মূল দাবি গঠনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

কিন্তু তৎকালীন অবস্থায় এই মনোভাবের জন্য শিল্পপতিদিগকে ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া অভিহিত করিলে ভুল হইবে। ভারতের তৎকালীন অবস্থায় তাঁহাদের নেতৃত্বে ও উদ্যোগে কংগ্রেস সৃষ্টির তাৎপর্য অসাধারণ। তাঁহাদের রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রয়াস যতই সামান্য হউক না কেন, সেই প্রয়াসের প্রগতিশীল তাৎপর্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহারাই ছিলেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের স্রষ্টা এবং তাঁহাদের উদ্যোগেই ভারতে প্রথম জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। এই দিক হইতে সেই সময়ে তাঁহাদের ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল। তাঁহাদের সেই প্রচেষ্টাই পরবর্তীকালে জাতীয় চেতনার উন্মেষ, জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

"ইহা ধারণা করিলে ভুল হইবে যে,... গোড়ার দিকের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ছিলেন বিদেশী শাসনের প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয়তা-বিরোধী আজ্ঞাবহ মাত্র। বরং তাঁহারা ছিলেন সেই সময়ের ভারতীয় সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল শক্তি। সেই সময় পর্যন্ত নবজাত শ্রমিকশ্রেণী নিজেকে জাহির করিতে অথবা সংঘবদ্ধ হইতে পারে নাই এবং কোটি কোটি কৃষক ছিল মূক দর্শক মাত্র, তখন ধনিকশ্রেণীই ছিল ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল ও কার্যত বিপ্লবী শক্তি। সমাজ-সংস্কার, জ্ঞানের বিকাশ ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং ভারতীয় সমাজের পশ্চাৎপদ অবস্থা ও যাহা কিছু অগ্রগতি-বিরোধী তাঁহার বিরুদ্ধেই তাঁহারা সংগ্রাম করিয়াছিলেন। শিল্প ও যন্ত্রের বিকাশের জন্যও তাঁহারা দাবি তুলিয়াছিলেন।"[১]

১। R. P. Dutt: 'India To-day,' p. 257.

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের মোহ ও শাসকদের সহৃদয়তায় তাঁহাদের বিশ্বাস কাটিয়া যাইতে বেশী বিলম্ব হয় নাই। কংগ্রেসকে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হইতে এবং ইহার মধ্য হইতে সংগ্রামের ধ্বনি উঠিতে দেখিয়া শাসকগোষ্ঠীর মনোভাবও দ্রুত বদলাইয়া যায়। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের ধনিকশ্রেণী ও ভারতের শিল্পপতিদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত তীব্রতর হইয়া উঠিতে থাকে এবং "সেই সংঘাত ভারত সরকার ও জাতীয় কংগ্রেসের সম্পর্কের মধ্যেও প্রতিফলিত হইতে আরম্ভ করে।"[১] বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্পষ্টভাবেই কংগ্রেসের প্রগতিশীল ভূমিকা এবং ইহার সহিত সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থার অনিবার্য সংঘর্ষের তাৎপর্য বুঝিতে পারে। সুতরাং কংগ্রেসের প্রতি প্রথম দিকের সরকারী সমর্থন সন্দেহ ও বিরোধে রূপান্তরিত হয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মধ্যেই বড়লাট লর্ড ডাফরিন কংগ্রেসকে "অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুর প্রতিনিধি" বলিয়া তাচ্ছিল্যসূচক উক্তি করিতে আরম্ভ করেন।"[২] সরকারী কর্মচারীদের এমনকি দর্শক হিসাবেও কংগ্রেস-অধিবেশনে যোগদান দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন করিয়া আলোড়ন আরম্ভ হয়। বেকারী, স্বল্প বেতন ও সাধারণ আর্থিক দুর্দশার চাপে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর জীবনে নূতন সংকট ঘনাইয়া আসে। এই আর্থিক সংকট হইতে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে তাহারা নূতন করিয়া বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের ধ্বনি তুলিতে থাকে। তাহাদের সেই সংগ্রামের ধ্বনি কংগ্রেসের মধ্যেও প্রতিধ্বনিত হয়। কিন্তু কংগ্রেসের প্রধান নেতৃত্ব তখনও সংগ্রামের পথে পা বাড়াইতে প্রস্তুত ছিলেন না, আপসের পথকেই তাঁহারা দাবি আদায়ের একমাত্র পথ বলিয়া আঁকড়াইয়া থাকেন। সেই সময় ভারতের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া আইনসভা গঠনই ছিল তাঁহাদের প্রধান দাবি।

এই দাবি লইয়া একদিকে ভারতবর্ষের আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের কংগ্রেস-কমিটিও এই দাবির সমর্থনে প্রচার চালাইতে থাকে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্টের জনৈক সদস্যের মারফত এই দাবির উপর পার্লামেন্টে একটা বিল পেশ করা হয়। ইংলণ্ডের সরকারী দল সেই বিলের পরিবর্তে তাহাদের নিজস্ব একটি বিল পাশ করিয়া লয়। সেই বিলটিই '১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্ট্' নামে ভারতবর্ষে প্রয়োগ করা হয়। এই নূতন আইনে প্রকৃতপক্ষে শাসন-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হইল না, বরং এতদিন শাসন-কার্যে ভারতবাসীর অংশ গ্রহণের দাবি লইয়া কংগ্রেস যে আন্দোলন চালাইতেছিল, তাহার প্রতি এই নূতন আইনের দ্বারা অবজ্ঞাই প্রদর্শন করা হয়। ভারতের জাতীয় জাগরণকে বিভ্রান্ত করাই ছিল এই নূতন আইনের উদ্দেশ্য।

এই নূতন আইন কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাঁহারা এবার বুঝিতে পারেন যে, ইংরেজ-শাসকগণ ভারতের জাতীয় আশা-

১। Hutchinson : "Empire of the Nabobs." p. 186.
২। R. P. Dutt : 'India To-day,' p. 267.

আকাঙ্ক্ষার প্রতি মোটেই সহানুভূতিশীল নহে, বরং তাহার বিরোধী। কিন্তু শাসকগণের নিকট হইতে কিছু পাওয়া যাইবে না বুঝিয়াও তাঁহারা কোন সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণের কথা চিন্তা করিতে পারেন নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিবর্তে এই আইনে বড়লাটের কাউন্সিলে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার না দিবার জন্য মামুলীভাবে দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহারা "সম্প্রতি গৃহীত 'ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্‌ট'কে অনুগত মনোভাব দ্বারা" মানিয়া লইয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে একটি প্রস্তাব পাশ করেন।

এই নূতন আইন কংগ্রেসের পক্ষে এক শোচনীয় পরাজয় এবং উহার আপসপন্থী নেতৃবৃন্দের মর্যাদার উপর এক ভীষণ আঘাত বহন করিয়া আনে। তাঁহাদের আপসপন্থার উপর শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ আস্থা হারাইয়া ফেলে। এই আইনের ফলে তাহাদের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ আহত ও তাহাদের আর্থনৈতিক জীবন অন্ধকারময় হইয়া উঠে। কিন্তু যুবসম্প্রদায় এত সহজে পরাজয় স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না, তাহারা এবার কংগ্রেসের আপসপন্থী নেতৃবৃন্দকে অগ্রাহ্য করিয়া সাম্রাজ্যবাদের এই ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে এক কঠিন প্রতিজ্ঞা লইয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। এই পথে অগ্রসর হইবার জন্য এরূপ পরিচালকের প্রয়োজন যাঁহার সাম্রাজ্যবাদের সহৃদয়তায় কোন বিশ্বাস নাই, সংগ্রাম যতই কঠোর হউক তাহা পরিচালনা করিতে কোন ভয় নাই। পুনার বাল গঙ্গাধর তিলক এই যুবসম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে এবং তাহাদের এক নূতন সংগ্রামের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিতে আগাইয়া আসেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী যুবসম্প্রদায় মহারাষ্ট্রীয় নেতা তিলকের আহ্বানে নূতন সংগ্রামের প্রেরণায় চঞ্চল হইয়া উঠে। তিলক তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন বিদেশী ইংরেজ-শাসনের প্রতি তীব্র ঘৃণা এবং সেই ঘৃণিত শাসনের উচ্ছেদের জন্য এক কঠোর সংগ্রামের আদর্শ।

"তাঁহার নিকট ইংরেজরা ছিল চিরশত্রু এবং প্রথম হইতেই তিনি তাঁহার অনুচরগণের মধ্যে যুদ্ধের মনোভাব জাগাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।"[১]

তিলকের এই আদর্শই সমগ্র ভারতের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের আদর্শ হইয়া উঠে। তিলকের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বাংলার যুবসম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল এবং পাঞ্জাবের যুবসম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন লালা লাজপৎ রায়। এইভাবে এক আপস-বিরোধী চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ভারতে এক বিশেষ ধরনের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে থাকে।

১। Thomson and Garrat: 'Rise & Fulfilment of British Rule in India', p. 546.

ষষ্ঠ অধ্যায়

"নরমপন্থা" ও "চরমপন্থার" স্বরূপ

ভারতবর্ষে মধ্যশ্রেণীর সন্ত্রাসপন্থী বিপ্লববাদের অভ্যুদয় কতকগুলি বিশেষ সামাজিক-রাজনীতিক কারণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। শোষণ-উৎপীড়ন মূলক বৈদেশিক শাসন, উন্নত ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর চরম আর্থনীতিক দুর্দশা, তাহাদের মধ্যে জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ, গোড়ার দিকের ক্রমবর্ধমান জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের আপসপন্থী মনোভাব—এইগুলি সেই সামাজিক-রাজনীতিক কারণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল কারণই জাতীয় আন্দোলনের আপসপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আপসবিরোধী চরমপন্থী ভাবধারার সৃষ্টি করে। জাতীয় আন্দোলনের আপসবিরোধী চরমপন্থী ভাবধারা হইতেই ভারতের মধ্যশ্রেণীর তথাকথিত বিপ্লববাদের সৃষ্টি। তাই জাতীয় আন্দোলনের চরমপন্থী ভাবধারার মতই ভারতের মধ্যশ্রেণীর বিপ্লববাদও সামাজিক-রাজনীতিক কারণসমূহের অনিবার্য পরিণতি। এই জন্যই, ভারতের সামাজিক-রাজনীতিক অবস্থার মধ্যে পরস্পর বিরোধী কারণসমূহের যে দ্বন্দ্ব প্রথম হইতেই দেখা দেয়, সেই দ্বন্দ্ব চরমপন্থী রাজনীতিক ভাবধারা এবং বিপ্লববাদের মধ্যেও প্রথম হইতেই প্রতিফলিত হইয়াছিল।

গোড়ার দিকের জাতীয় আন্দোলনের আপসপন্থী পুরাতন নেতৃত্ব কোন সময়েই শোষণ ও উৎপীড়ন মূলক বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা চিন্তাও করিতে পারেন নাই। অথচ তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের প্রধান শক্তি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী চরম আর্থিক দুর্দশার চাপে পরাধীনতার জ্বালায় অস্থির হইয়া আপস-বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে পদক্ষেপ করিতে বাধ্য হয়। এই দ্বন্দ্বই জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে চরমপন্থার সৃষ্টি করে। নিঃসন্দেহে এই আপসহীন চরমপন্থী সংগ্রামের মনোভাব জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বিপুল অগ্রগতির সূচনা করে। কিন্তু অনিবার্য সামাজিক-আর্থনীতিক কারণেই এই অগ্রগতির মূলে যথেষ্ট দুর্বলতাও থাকিয়া যায় এবং সেই দুর্বলতা লইয়াই ইহা বাড়িয়া উঠে। এই চরমপন্থী সংগ্রামের মনোভাব তখনও পর্যন্ত কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তখনও পর্যন্ত জনসাধারণের অপর কোন অংশই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের পরিকল্পিত এই চূড়ান্ত সংগ্রামে যোগদান করিতে এবং ইহাকে কার্যকরী ও সফল করিয়া তুলিতে প্রস্তুত ছিল না। যে উন্নত জাতীয় চেতনা থাকিলে তাহা সম্ভব হইতে পারে তাহা তখনও জনসাধারণের মধ্যে দেখা দেয় নাই। তখনকার সামাজিক-রাজনীতিক অবস্থায় জনগণের মধ্যে চেতনার উন্মেষের কোন সম্ভাবনাও ছিল না। কাজেই জনগণের মধ্যে সেই চেতনা না থাকাতে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দও জনগণের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে এবং তাহাদের জাতীয় সংগ্রামের প্রধান শক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহাদের পক্ষে জনগণকে সংগঠিত করিয়া গণ-সংগ্রাম গড়িয়া তুলিবার কথা কল্পনা করাও সম্ভব

হয় নাই। এই জন্যই জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে গান্ধীর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত চরমপন্থী ও নরমপন্থী কোন নেতৃত্বই বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণকে জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে টানিয়া আনিবার কথা ভাবিতে পারেন নাই। সুতরাং চরমপন্থীরা তাঁহাদের আপস-বিরোধী সংগ্রামের মনোভাবের দ্বারা জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক আপস-বিরোধী আদর্শ স্থাপন করিলেও গণ-দৃষ্টিভঙ্গি ও গণ-সংযোগহীন হইবার ফলে সেই আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করিতে ব্যর্থ হন। গণ-সংগ্রামের পথ তখনও স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই বলিয়াই বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে চরমপন্থীদের অবরুদ্ধ ক্রোধ ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের রূপে ফাটিয়া পড়ে। দেশব্যাপী সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সুপ্ত পরিকল্পনা সত্ত্বের ভারতের বিপ্লববাদ গণসংযোগ-বিহীন হইয়া মূলত এই সন্ত্রাসবাদকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিতে থাকে।

ভারতের সন্ত্রাসপন্থী বিপ্লববাদ গণ-সংগ্রামের সহিত সংযুক্ত না হইবার ফলে উহা গোড়ার দিকে আর একটি দুর্বলতা আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠে। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী যখন বহু ব্যয়সাধ্য ও কষ্টার্জিত ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করা সত্ত্বেও আর্থনীতিক দুর্দশার কবল হইতে মুক্তি পায় নাই, তখন তাহাদের মধ্যে দেখা দেয় দারুণ হতাশা। এই হতাশার মনোভাব তাহাদের আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতি বিরূপ করিয়া তোলে। এই বিরূপ মনোভাবই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীকে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার দিকে মুখ ফিরাইতে বাধ্য করে। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী বিদেশী শাসকদের সর্বগ্রাসী ধনিক সভ্যতার কবল হইতে ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে রক্ষা করিবার ব্রত গ্রহণ করে। বিবেকানন্দের বাণী হইতে তাহারা লাভ করে অফুরন্ত প্রেরণা। এই দুইটি কারণে শিক্ষিত সম্প্রদায় একদিকে য়ুরোপীয় সভ্যতার ঘোরতর বিরোধী হইয়া উঠে, য়ুরোপীয় সভ্যতার গ্রহণযোগ্য প্রগতিশীল বিষয়গুলিও "শাসকদের সভ্যতা" বলিয়া ঘৃণাভরে বর্জন করিতে থাকে এবং অপর দিকে তাহারা অন্ধ হইয়া সনাতন হিন্দুধর্মের ভালমন্দ সবকিছুকে "একমাত্র খাঁটি ও পবিত্র" বলিয়া গ্রহণ করে। তাহারা আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার পরিবর্তে সমাজ-প্রগতির আধুনিক স্তরের সহিত সামঞ্জস্যহীন প্রাচীন হিন্দুধর্মের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং প্রাচীন হিন্দুধর্মের উপরই তাহারা তাহাদের চরমপন্থী [illegible] বনিয়াদ গড়িয়া তোলে। এইভাবে চরমপন্থীরা তাহাদের আধুনিক ও প্রগতিশীল রাজনীতিক ভাবধারার সহিত প্রগতি-বিরোধী প্রাচীন হিন্দুধর্মের সংযোগ সাধন করিয়া জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নূতন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। চরমপন্থীদের সৃষ্ট এই পরস্পর-বিরোধী আদর্শের সংমিশ্রণ সেই সময় হইতেই বরাবর ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে নানাভাবে ও নানাক্ষেত্রে প্রভাবান্বিত করিতে থাকে।

জাতীয় [illegible] ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী চরমপন্থা ও প্রাচীন হিন্দু ধর্মের সংমিশ্রণের [illegible] গণ-[illegible] হইবেক তৎকালীন চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের [illegible] নায়ক বাল গঙ্গাধর তিলক। চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের এই শ্রেষ্ঠ নায়ক তাঁহার এই পরস্পর-বিরোধী মনোভাবের ফলে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন [illegible]

[illegible]

প্রগতিশীল 'এজ অব কনসেন্ট বিল' নামক একটি আইনের [illegible] কর্তেন। এই আইনে হিন্দু বালিকাদের বিবাহের বয়স [illegible] [illegible] [illegible] হাজীয়তাবাদী নেতৃত্ব এই সমাজ-সংস্কার মূলক আইনের কলকে [illegible] বিরুদ্ধে প্রতিবাদ [illegible] বিজেন, কিন্তু [illegible] প্রগতিশীল [illegible] ঘায়ায় [illegible] তাঁহার বিপুল প্রভাব লইয়া [illegible] হন এবং এইভাবে [illegible] হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিবার [illegible] [illegible] সমর্থন করিয়া প্রগতি-বিরোধীদের শক্তিশালী করিয়া তোলেন। ইহাকে [illegible] করেই তিনি 'গো-রক্ষা সমিতি' স্থাপন করিয়া হিন্দুদের [illegible] "গো-[illegible]" রক্ষা করিবার জন্য [illegible] বিরুদ্ধে এক প্রবল আন্দোলনের [illegible] করেন। এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে আর্থনীতিক [illegible] প্রধানত ভারতের মুসলমানদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হওয়ায় ইহা জাতীয় আন্দোলনের ঐক্য ও অগ্রগতি ব্যাহত করিবার পক্ষে সহায়ক হয়। কারণ, ইহা জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধনের সহায়ক না হইয়া এই দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের একটি প্রধান কারণ হইয়া থাকে।

জাতীয় আন্দোলনের নরমপন্থী নেতৃত্ব রাজনীতি-ক্ষেত্রে যে মতই পোষণ করুন না কেন, তাঁহারা ধর্মের প্রশ্নটিকে রাজনীতি হইতে দূরেই রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তিলক ও অন্যান্য চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ রাজনীতিকে ধর্মের পোশাকে আবৃত করিয়া এবং [illegible] হিন্দু জনশ্রেণীর সহজাত ধর্ম-সংস্কারে আঘাত দিয়া তাহাদের মধ্যে [illegible] [illegible] প্রেরণা জাগাইবার চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে মহারাষ্ট্রে তিলক [illegible] [illegible], আর বাঙলাদেশের চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ শক্তির দেবতা কালীকে, বৈপ্লবিক সংগ্রামের [illegible] ব্যবহার করেন। বাঙলাদেশের চরমপন্থী [illegible] ও বৈপ্লবিক আদর্শের [illegible] পথ প্রদর্শক অরবিন্দ ঘোষ ঈশ্বর ও [illegible] এক ও অভিন্ন বলিয়া ঘোষণা করেন। [illegible]

[illegible] মুসলমানগণ যে বিপ্লব-প্রচেষ্টায় যোগদান করে নাই, [illegible] সহিত হিন্দুধর্মের সংমিশ্রণই তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। তাহার ফলে ভারতের [illegible] বিপ্লব-প্রচেষ্টা প্রথম হইতেই কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে এবং এইভাবে প্রগতিশীল [illegible] জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে ভারতের [illegible] [illegible] [illegible] বিচ্ছেদের [illegible] রচিত হয়। [illegible]

[illegible] দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, [illegible] [illegible] [illegible] নেতৃত্ব রাজনীতির দিক হইতে কোন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিক হইতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, অন্য দিকে চরমপন্থী নেতৃত্ব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] জাতীয় আন্দোলনের [illegible] ক্ষেত্রে প্রগতি[illegible] ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রগতি-বিরোধী [illegible] পরিচিতি [illegible] সমাজ-প্রগতি-বিরোধী [illegible] জাতীয় আন্দোলনের [illegible] জাতীয় আন্দোলনের [illegible] বিকাশের পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়ায় [illegible] চরমপন্থী [illegible] অনেকেই শেষ পর্যন্ত [illegible] রাজনীতির সহিত [illegible] রাজনীতির পথ [illegible] তাহাই একই প্রমাণ। [illegible] আন্দোলনে [illegible] রাজনৈতিক পথ গ্রহণ করিয়া ক্রমশ প্রতিক্রিয়ার [illegible]।

চরমপন্থীদের সমাজ-প্রগতি-বিরোধী আদর্শ ও ক্রিয়াকলাপের জন্য জাতীয় আন্দোলনের [illegible] নেতৃবৃন্দের একটি অংশ চরমপন্থী রাজনীতির প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি হারাইয়া ফেলেন এবং উহার প্রতি বিরূপ হইয়া এমনকি শেষ পর্যন্ত চরমপন্থীদের বিরুদ্ধেও আন্দোলন আরম্ভ করেন। এইভাবে জাতীয় আন্দোলনের প্রগতিশীল অংশের মধ্যেও বিভেদ দেখা দেয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁহার 'আত্মজীবনী'তে তাঁহার পিতা ও তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রগতিশীল নায়ক পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর রাজনৈতিক মনোভাব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই বিভেদের কথা ও তৎকালীন চরমপন্থীদের সমাজ-প্রগতি-বিরোধী অন্ধতার তীব্র সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন :

"এই দৃঢ়চেতা, গভীরভাবে ভাব-প্রবণ, [illegible] মানুষটি (পণ্ডিত মতিলাল) ছিলেন চরমপন্থীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু ১৯০৭ ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ এবং তাহার পরেও অনেক বৎসর পর্যন্ত [illegible] তিনি ছিলেন নরমপন্থীদের [illegible]

প্রাচীনকালের সমাজ-প্রথা, জাতি-বিভাগ বা ঐ ধরনের বিষয়গুলিকে তিনি ঘৃণা করিতেন। কারণ ঐগুলিকে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল পশ্চিমের দিকে, পশ্চিমী প্রগতির প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে, ইংলণ্ডের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলেই এই প্রগতি (ভারতবর্ষেও) আসিতে পারে।

"সামাজিক দিক হইতে বিচার করিলে, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে যে ভারতীয় জাতীয়তা-বাদের অভ্যুদয় হয় তাহা ছিল নিশ্চিত রূপে প্রতিক্রিয়াশীল।"[১]

কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, চরমপন্থীরা গভীর দেশভক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতা লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়াই জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে ধর্মের আমদানি করিয়াছিলেন এবং বৈদেশিক শাসকদের প্রতি তীব্র ঘৃণাই তাঁহাদিগকে প্রাচীন হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয়ের সমর্থক করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহারা ধর্মানুষ্ঠান ও বাৎসরিক ধর্মোৎসব উপলক্ষে যে সকল বড় বড় সভা-সমিতি ও গণ-সমাবেশ করিতেন তাহাতে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক প্রচার ও বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সৃষ্টি করা হইত। তাঁহারা এই সকল উৎসব সম্মুখে রাখিয়া ব্যাপকভাবে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া তুলিতেন এবং ধর্মের আবরণে বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য লইয়া ব্যায়ামের আখড়া ও যুবসমিতি গড়িয়া তুলিতেন। ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, সেই যুগে সরকারী দমননীতির প্রচণ্ড প্রকোপে প্রকাশ্যে কোন চরমপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন গড়িয়া তোলা ও চরমপন্থী রাজনৈতিক প্রচারকার্য চালানো সম্ভব ছিল না। সেই সময় শাসকগোষ্ঠী এমনকি সাধারণ শরীর চর্চার আখড়াগুলিকেও ভয়ের চক্ষে দেখিত। সুতরাং সামাজিক দিক হইতে প্রতিক্রিয়াশীল এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পক্ষে ইহার ফল মারাত্মক হইলেও তাহা উপেক্ষা করিয়াই তাঁহারা ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মোৎসবগুলিকে তাঁহাদের বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতেন।

পরবর্তীকালের বিপ্লবীরা গোড়ার দিকের এই সকল দুর্বলতা বহুলাংশে কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার সময় বৈপ্লবিক সংগ্রামের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইবার ফলে এবং বিপ্লববাদ মধ্যশ্রেণীর ভিতর আরও বিস্তার লাভ করায় মধ্যশ্রেণীর এই বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল। তাহার ফলে এই দুই যুগের অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী বিপ্লবীদের মধ্য হইতে ধর্মের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। গোড়ার দিকে দীক্ষার সময় যে সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হইত তাহা এই দুই যুগে তুলিয়া দেওয়া হয়, এমনকি আনুষ্ঠানিক দীক্ষা-ব্যবস্থাও পরে লোপ করা হয়। ইহা নিঃসন্দেহে [illegible] [illegible] এক [illegible] অগ্রগতির সূচনা করিয়াছিল।

৬। Jawaharlal Nehru: "Autobiography", p. 23-24.

● দ্বিতীয় ভাগ ●

মধ্যশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের আদর্শগত ভিত্তি, কর্মপদ্ধতি ও সংগঠন

[illegible]

[illegible] চরমপন্থী [illegible]

[illegible]

মহারাষ্ট্রের আদর্শ

১। শিবাজী-উৎসব ও গণপতি-উৎসব

স্বেচ্ছাচারী বিদেশী শাসন, আর্থনৈতিক শোষণ, জাতীয় চেতনার উন্মেষ এবং কংগ্রেস-নেতৃত্বের আপসনীতি—এই চারিটি কারণের একত্র সমাবেশের ফলেই ভারতে শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়। [illegible] শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের আর্থনৈতিক বিক্ষোভ চরমপন্থী [illegible] রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করে। তাহারা বিদেশী শাসনকেই [illegible] দুঃখদৈন্যের একমাত্র কারণ বলিয়া মনে করে। বিদেশী শাসনের প্রতি [illegible] তীব্র ঘৃণা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের দ্বারা [illegible] (যেমন) [illegible] হইয়া তাহারা হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের সমর্থক হইয়া উঠেন এবং [illegible] ও আত্মত্যাগের প্রেরণা [illegible] করিতে [illegible]। তাহারা মনে করিত যে, পাশ্চাত্য শিক্ষাকে অস্বীকার করিয়া হিন্দু [illegible] দুঃখদৈন্যের কারণস্বরূপ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাহারা [illegible] বর্তমান অবস্থা হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় তাহারা হিন্দু অতীত গৌরবের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের [illegible] হিসাবে হিন্দু প্রত্যেকটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য লইয়া গর্ব করিতে থাকে।[1]

অন্যদিকে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের দুর্বল ও আপসমূলক নীতি-পদ্ধতির [illegible] [illegible] গভীর প্রেরণায় [illegible] যুব-সম্প্রদায়কে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল [illegible] ইংরেজ শাসকদের নূতন 'ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্ট'-এর নিকট কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের [illegible] ফলে তাঁহারা বিক্ষুব্ধ যুব-সম্প্রদায়ের [illegible] [illegible] [illegible] এই অবস্থায় [illegible] চরমপন্থী [illegible] [illegible] বিদেশী জাতীয়তাবাদ তাহাদের [illegible] করিতে থাকে।

[illegible] মহারাষ্ট্রদেশে এক [illegible] [illegible] উৎপীড়নের বিরুদ্ধে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায় সেই কথা [illegible] [illegible] সেই বিদ্রোহের প্রভাব তাহাদের মধ্যেও [illegible] বিদ্রোহের [illegible]

[1] L. Hutchinson, 'Empire of the Nabobs', p. [illegible]

জাগাইয়া তোলে। সেই বিদ্রোহী মনোভাবের প্রতীকরূপে তিলক মহারাষ্ট্রের বিক্ষুব্ধ যুব-সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

মহারাষ্ট্রের এই চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের পুরোভাগে স্থান গ্রহণ করেন মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়। তিলক ও তাঁহার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত নেতৃবৃন্দ সকলেই ছিলেন এই চিৎপাবন ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় তাঁহাদের পুরাতন ঐতিহ্য হইতেও ইংরেজ-বিরোধিতা ও বিদ্রোহের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের খ্যাতনামা মনীষী ও রাজনীতিক দীক্ষাগুরু রাণাডে এবং গোখেলও ছিলেন এই চিৎপাবন ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ভুক্ত। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এই তেজস্বী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের অবদান চিরস্মরণীয়।

চিৎপাবন ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় ছিলেন মারাঠী মধ্যশ্রেণীর জীবনাদর্শ ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাঁহাদের পূর্ব-পুরুষ নানা ফরনবীশ ও পেশোয়াদের নিকট হইতেই ইংরেজ-আক্রমণকারীরা মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা কাড়িয়া লইয়াছিল। চিৎপাবন-ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের পূর্ব-পুরুষের রাষ্ট্রীয় গৌরব ও বিদেশী ইংরেজদের হস্তে তাঁহাদের লাঞ্ছনা কোনদিন ভুলিয়া যান নাই। মহারাষ্ট্রের পরাধীনতার গ্লানি তাঁহাদের মনে চিরদিন সজাগ থাকিয়া এই বিদেশীদের কবল হইতে মহারাষ্ট্র ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণা যোগাইয়াছিল। এই প্রেরণাই শিবাজীর কর্মাদর্শের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ইংরেজ শাসকগণের সংস্কৃতি, ধর্ম ও সভ্যতার বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন হিসাবে হিন্দুধর্মের রক্ষাকারী দেবতা গণপতির আদর্শের মধ্য দিয়া সক্রিয় রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। তিলকের নেতৃত্বে চরমপন্থী চিৎপাবন ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে তাঁহাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ করেন।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর হইতেই তিলক কংগ্রেস-আন্দোলনে যোগদান করেন এবং কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী বিরোধী দল গড়িয়া তোলেন। তাঁহার মতের প্রচার ও মহারাষ্ট্র যুব-সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের জাতীয় সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বোম্বাইপ্রদেশের পুণা শহরে 'কেশরী নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তিলকের পত্রিকার প্রধান কাজ ছিল ইংরেজ-শাসন, আপসপন্থী কংগ্রেস-নেতৃত্ব ও বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনা করা। এই সময়ে বৃটিশ-সমর্থক স্যার সৈয়দ আহম্মদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া শিক্ষিত মুসলমানগণ কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হইতে দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। ইহার ফলে মুসলমানগণও 'কেশরী' পত্রিকার আক্রমণের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহা ব্যতীত ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দুর সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের পুনরুজ্জীবনের উপায় হিসাবে বেদ ও ভগবদ্গীতার ধর্মীয় মতবাদ ও আদর্শ জোরের সহিত প্রচার করা হইতে থাকে। অল্পকালের মধ্যেই 'কেশরী' পত্রিকা বোম্বাই প্রদেশের শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং তাহারা তিলককেই যোগ্যতম নেতা বলিয়া গ্রহণ করে।

মারাঠী যুবকদের মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারাঠীদের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দেবতা গণপতির (গণেশের) উৎসব ও মহারাষ্ট্রের জাতীয় বীর শিবাজীর রাজ্যাভিষেক-উৎসবের প্রচলন করেন। প্রতি বৎসর এই দুই উৎসব উপলক্ষ করিয়া ইংরেজ-বিরোধী প্রচার-কার্য চলিতে থাকে। এই দুই উৎসবের শোভাযাত্রা ক্রমশ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কুচকাওয়াজে পরিণত হয়। হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তা হইলেন গণপতি দেবতা। সুতরাং গণপতি-উৎসব উপলক্ষে বিদেশী ইংরেজ শাসনের খ্রীষ্ট ধর্ম ও "ম্লেচ্ছ" মুসলমান ধর্মের আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য প্রচার চলিতে থাকে। "বিদেশী" মুসলমানদের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াই শিবাজী মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাই শিবাজী-উৎসবে শিবাজীর মত বীরত্বের সহিত বর্তমান বিদেশী ইংরেজ শাসনের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য মারাঠী যুব সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করা হইত।

হিন্দুর শ্রেষ্ঠ দুইখানি ধর্মগ্রন্থ, মহাভারত ও গীতা এবং তিলকের সৃষ্ট এই দুই উৎসব বোম্বাইপ্রদেশের তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের আদর্শগত ভিত্তি রচনা করে। ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মনোভাব সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে কিভাবে এই দুই উৎসবকে কাজে লাগানো হইত তাহা এই বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত 'শিবাজী-শ্লোক' ও 'গণপতি-শ্লোক' হইতে বুঝিতে পারা যায়।

২. *শিবাজী-শ্লোক*

"শিবাজীকে দেবতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার বীরত্ব-কাহিনী আবৃত্তি করিলেই স্বাধীনতা আসিবে না। শিবাজী ও বাজীর (বাজীরাও-এর) অনুকরণে সত্বর দুঃসাহসিক কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। তাঁহাদেরই যোগ্য সন্তান তোমরা, সকল বুঝিয়া শুনিয়া এখন তোমাদের তরবারী ও বর্ম ধারণ করিতে হইবে; আমাদের অসংখ্য শত্রুর শিরশ্ছেদন করিতে হইবে। তোমরা শ্রবণ কর, জাতীয় যুদ্ধের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে আমরা আমাদের জীবন বিসর্জন দিব; আমাদের ধর্মনাশকারী শত্রুর রক্তে ধরণীর মৃত্তিকা রঞ্জিত করিব; আমরা শত্রু সংহার করিয়া তবে প্রাণ দিব, আর তোমরা কি স্ত্রীলোকের মত নিশ্চেষ্ট হইয়া আমাদের বীরত্ব-গাথা শুনিবে?"

৩. *গণপতি-শ্লোক*

"হায়! তোমাদের দাসত্বে লজ্জা নাই? তাহা হইলে আত্মহত্যা করাই উচিত। হায়! এই কসাইরা দানবীয় নিষ্ঠুরতার সহিত গো-মাতা ও গো-বৎসদের হত্যা করে, তোমরা এই যন্ত্রণা হইতে গো-মাতাকে রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হও; মৃত্যু বরণ কর, কিন্তু তাহার পূর্বে ইংরেজদের হত্যা কর; অলস হইয়া বসিয়া থাকিয়া বৃথা ধরণীর ভার বৃদ্ধি করিও না। আমাদের দেশের নাম যদি হয় হিন্দুস্থান, তবে ইংরেজরা এখানে রাজত্ব করে কোন্ অধিকারে?"[১]

১। Sedition Commitee Report; p. 2.

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক-উৎসব উপলক্ষে জনৈক বক্তার ভাষণরূপে 'কেশরী' পত্রিকা নিম্নোক্ত আদর্শ প্রচার করে :

"প্রত্যেকটি হিন্দু, প্রত্যেকটি মারাঠী—সে যে-দলেরই লোক হউক না কেন—এই শিবাজী-উৎসবে আনন্দিত হইবে। আমরা সকলেই আমাদের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছি, আমাদের সকলকে একত্র হইয়াই এই ভয়ংকর বোঝা (ইংরেজ-শাসন) উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। যে ব্যক্তি নিজ পথ বাছিয়া লইয়া সেই পথেই শুদ্ধ মনে এই বোঝা উপড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে তাহার পথে বাধা দেওয়া কখনই উচিত নয়। আমাদের অন্তর্বিরোধের ফলে আমাদের অগ্রগতি বিশেষ ব্যাহত হয়। যদি কেহ উপর হইতে চাপিয়া বসিয়া আমাদের দেশকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে থাকে তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেল। এই উৎসবের মত যে সকল ঘটনা আমাদের সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করিবার পক্ষে সহায়ক সেই সকল ঘটনাকে স্বাগত জানাও।"

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের যুগান্তকারী ফরাসী-বিপ্লবকেও সন্ত্রাসবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় :

"যাঁহারা ফরাসী-বিপ্লবে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা নরহত্যা করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা বিশেষ জোরের সহিত একথাই বলিতেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের পথ হইতে কাঁটা তুলিয়া ফেলিতেছেন। মহারাষ্ট্রেও এই যুক্তি কেন কাজে লাগানো হইবে না ?"[১]

স্বয়ং তিলক মহারাষ্ট্র-বীর শিবাজীর দৃষ্টান্ত দ্বারা এইভাবে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের আদর্শ তুলিয়া ধরেন :

"আফজল খাঁকে (মুসলমান-সেনাপতিকে) হত্যা করিয়া শিবাজী কি অন্যায় করিয়াছিলেন ? এই প্রশ্নের উত্তর মহাভারতের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এমন কি আমাদের গুরু এবং আত্মীয়-স্বজনকেও হত্যা করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। যদি কোন ব্যক্তি কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করিয়া যায়, তবে তাহার কোন পাপ হয় না। শিবাজী তাঁহার নিজের উদর পূর্তির জন্য কিছু করেন নাই, অতি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া অন্য সকলের মঙ্গলের জন্যই তিনি আফজল খাঁকে হত্যা করিয়াছিলেন। যদি একদল চোর আমাদের গৃহে প্রবেশ করে আর তাহাদের তাড়াইবার মত শক্তি যদি আমাদের না থাকে, তবে আমাদের কর্তব্য হইবে কিছুমাত্র ইতস্তত না করিয়া সেই চোরদের গৃহের মধ্যে আটক করিয়া তাহাদের জীবন্ত দগ্ধ করিয়া হত্যা করা। ভগবান হিন্দুস্থানের উপর রাজত্ব করিবার অধিকার তাম্রপত্রে খোদিত করিয়া বিদেশীদের দান করেন নাই। মহারাজ (শিবাজী) তাঁহার জন্মভূমি হইতে বিদেশীদের (মুসলমানদের) বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাদ্বারা তিনি অপরের দ্রব্য হরণের অপরাধ করেন নাই। কূপের মধ্যে আবদ্ধ মণ্ডূকের মত নিজের দৃষ্টিশক্তিকে সীমাবদ্ধ রাখিও না ; 'পিনাল

১। Sedition Committee Report, p. 10.

কোড'-এর বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রীমৎভগবদ্গীতার অনন্ত বিস্তারের মধ্যে প্রবেশ কর এবং মহৎ ব্যক্তিদের সাধনা হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর।"[১]

বৈপ্লবিক প্রচারের উদ্দেশ্যে শিবাজীর সংগ্রাম ও গীতার এই সকল ব্যাখ্যা 'শিবাজীর উক্তি' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছিল।

মহারাষ্ট্রের অন্যতম চরমপন্থী নেতা বিনায়ক সাভারকরের ভ্রাতা গণেশ দামোদর সাভারকর গান ও কবিতার মারফত স্বাধীনতা লাভের উপায়স্বরূপ বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রচারের জন্য 'লঘু অভিনব ভারত-মেলা' নামে একখানি গান ও কবিতার পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহাতেও মারাঠী যুবকদের সন্ত্রাসবাদে উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি শিবাজী ও ভগবদ্গীতার আদর্শ তুলিয়া ধরেন। এই পুস্তকের প্রকাশনা ও অন্যান্য অভিযোগে তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহার বিচার-কালে বোম্বাই হাইকোর্টের একজন মারাঠী বিচারপতি এই পুস্তক সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তাহা হইতে এই পুস্তকের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য জানা যায়: "হিন্দুদের কয়েকজন দেবতা ও শিবাজীর মত কয়েকজন যোদ্ধার নাম করিয়া বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উন্মাদনা জাগাইয়া তোলাই লেখকের উদ্দেশ্য।" পুস্তকের এই নামগুলি ছদ্ম আবরণ মাত্র, আসল কথা হইল এই: 'তরবারি উঠাও, এই সরকারকে ধ্বংস কর, কারণ এই সরকার বিদেশী ও অত্যাচারী।' লেখকের আসল উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য কবিতায় ভগবদ্গীতা হইতে গৃহীত ভাবধারাগুলির উল্লেখ না থাকিলেও চলিত। পুস্তকের কবিতাগুলির নিজস্ব তাৎপর্য খুবই স্পষ্ট। যাহারা মারাঠী ভাষা জানে না তাহারা এইগুলির অর্থ কেবল ইহাই বুঝিবে যে, ইহা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে উন্মাদনা সৃষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু নহে।[২]

৪. ম্যাৎসিনির শিক্ষা

শিবাজী ও গীতার আদর্শ ব্যতীত ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ও ইতালীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম নায়ক ম্যাৎসিনির[৩] কর্মাদর্শ হইতেও সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টি করা হয়। মহাবিদ্রোহ ও ইতালীর জাতীয় বীর ম্যাৎসিনির দৃষ্টান্তের ব্যবহার তৎকালের বিপ্লবীদের চিন্তাধারায় এক ধাপ অগ্রগতি সূচনা করে। মহাবিদ্রোহ ও ম্যাৎসিনির দৃষ্টান্ত হইতে ভারতের স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টির প্রথম চেষ্টা করেন তিলকের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত অনুচরগণের অন্যতম বিনায়ক দামোদর সাভারকর। তিনি ইংলণ্ডে থাকিয়া "জনৈক ভারতীয় জাতীয়তাবাদী"—এই ছদ্মনামে '১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের মারফত তিনি মহারাষ্ট্রীয় যুবকদের মধ্যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে থাকাকালেই

১। Tilak's Speech Reported by 'Kesari'—Sedition Committee Report, p. 10.

২। Sedition Committee Report'. p, 9, ৩। ইতালীর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য ম্যাৎসিনি ইতালীর শিক্ষিত যুবকদের লইয়া গোপন-সমিতি গঠন ও সন্ত্রাসবাদী সংগ্রাম পরিচালনা করেন। তিনি রাজনীতিক উদ্দেশ্যে হত্যার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

তিনি ম্যাৎসিনির আত্মজীবনী মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেশে প্রেরণ করেন। ইহার ভূমিকায় তিনি রাজনীতিকে একটি ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করিতে এবং সেই ধর্মের জন্য যুবকদের জীবন উৎসর্গ করিতে আহ্বান করেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীকে 'ভারতের ম্যাৎসিনি' আখ্যাদান করেন। ইহাতে তিনি ম্যাৎসিনির কর্ম-পদ্ধতি আলোচনা করিয়া লিখেন যে, ম্যাৎসিনি তাঁহার স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য যুব-শক্তির উপরেই প্রধানত নির্ভর করিয়াছিলেন। সাভারকর তাঁহার এই ভূমিকায় স্ব-উদ্ভাবিত দুইটি কর্মসূচী ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, ম্যাৎসিনির মত, পার্শ্ববর্তী দেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিয়া লুকাইয়া রাখিতে হইবে এবং সুযোগমত তাহা ব্যবহার করিতে হইবে; দেশের মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট গোপন কারখানা স্থাপন করিয়া তাহাতে অস্ত্র তৈরি করিতে হইবে; যে সকল গুপ্ত সমিতি গঠিত হইবে সেইগুলি অন্য দেশে অস্ত্র ক্রয় করিয়া পণ্যবাহী জাহাজে লুকাইয়া দেশে লইয়া আসিবার ব্যবস্থা করিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্গীয় আদর্শ

১. *প্রথম যুগের বঙ্গীয় আদর্শ*

বলা হইয়া থাকে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসখানি বঙ্গদেশের প্রথম যুগের বিপ্লবীদের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। তাহা হইলে বলিতে হয়, বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগের 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ' নামক কৃষক-বিদ্রোহই (১৭৬৭-১৮০০) মধ্যশ্রেণীর বিপ্লবীদের সেই প্রেরণার উৎস। কারণ, 'আনন্দমঠ' উপন্যাসখানি (এবং 'দেবী চৌধুরাণী'ও) উক্ত 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ' নামক কৃষক-বিদ্রোহের পট-ভূমিকায় রচিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে নিজ আদর্শ ও প্রয়োজন অনুযায়ী ঐ বিদ্রোহ-এর পরিণতি দেখাইয়াছেন।

আমাদের দেশের যামিনীমোহন ঘোষ[১], ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত[২] প্রভৃতি কয়েক-জন লেখক প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, তথাকথিত 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ'-এর বিদ্রোহীরা ছিল বহিরাগত যাযাবর সন্ন্যাসী। কিন্তু বৃটিশ শাসনের সরকারী ইতিহাস-প্রণেতা ও প্রধান তথ্য সংগ্রহকারী উইলিয়াম হাণ্টার লিখিয়াছেন, তথাকথিত 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ'-এর সন্ন্যাসীরা ছিল মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত সৈন্য-বাহিনীর বেকার ও বুভুক্ষু সৈন্যগণ এবং বঙ্গদেশের জমিহারা, গৃহ-হারা বুভুক্ষু কৃষক।

১। Jamini Mohan Ghose: Sanyasi and Fakir Raiders of Bengal,

২। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃ ৯০।

এই অন্নবস্ত্রহীন বেকার সৈন্য ও কৃষক উভয়েই "জীবিকানির্বাহের শেষ উপায় হিসাবে বিদ্রোহের পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহারাই তথাকথিত গৃহত্যাগী (গৃহহারা) ও সর্বত্যাগী (সর্বহারা) সন্ন্যাসী রূপে দলবদ্ধ হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশ ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাদের সংখ্যা এক সময় পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত উঠিয়াছিল।"[১]

হাণ্টারের এই মত যদি প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয়, তবে তথাকথিত 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের' ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বারা প্রচারিত "সন্ন্যাসী" বা "যাযাবরগণ" বাঙলাদেশ ও বিহারের বাহির হইতে আগত কোন পেশাদার দস্যু-ডাকাত নহে, ইহারা ছিল বৃটিশ শাসন ও শোষণের ফলে উচ্ছন্নে যাওয়া জমি-গৃহ-জীবিকাহীন কৃষকের দল। হাণ্টার ধ্বংসপ্রাপ্ত মোগল সৈন্যবাহিনীর যে বেকার ও বুভুক্ষু সৈন্যবাহিনীর কথা বলিয়াছেন সেই সৈন্যগণও কৃষকেরই সন্তান। অন্নবস্ত্রের জন্য তাহারাও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বাংলা ও বিহারের এই কৃষক-বিদ্রোহে যোগদান করিয়া ইহাকে সামরিক দিক হইতে শক্তিশালী করিয়াছিল।

এই দুই শক্তি একত্রে মিলিত হইয়া বৃটিশ বণিকরাজের শোষণের কবল হইতে বাঁচিবার সংগ্রামের সহিত তাহাদের চেতনানুযায়ী দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকেও যুক্ত করিয়াছিল এবং এই সংগ্রামকে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদের অনেকেই গৃহত্যাগী ও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সাজিয়াছিল। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের নায়কগণ স্বাধীনতার মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই ঢাকার রমনার কালীবাড়ীর পুরোহিত মহারাষ্ট্রীয় স্বামীজী সন্ন্যাসী যোদ্ধাদের মুখে "ওঁ বন্দেমাতরম্" এই রণধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন।[২]

'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা'য় অভিযুক্ত ও প্রগতিশীল লেখক লেস্টার হাচিন্‌সন্ বাঙলা ও বিহারের এই ঐতিহাসিক বিদ্রোহ এবং তাহার সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন:

'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, রাজস্ব আদায়ের যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল তাহার ফলেই কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক বিদ্রোহ ধূমায়িত হইয়া উঠে। সন্ন্যাসীরা কৃষকের আর্থনীতিক বিদ্রোহের সহিত ধর্মীয় প্রেরণা যুক্ত করে। তাহাদের সশস্ত্র দল কোম্পানির শাসকদের বিরুদ্ধে মরিয়া হইয়া গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহারা কোম্পানির সৈন্যদের ছোট ছোট দলের উপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ করিয়া বড় বাহিনী আসিবার পূর্বেই গভীর জঙ্গলে পলায়ন করিত। হেস্টিংস্‌কে এক বিদ্রোহ দমনে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। এই বিদ্রোহের এক শত বৎসর পরে বাঙলাদেশে যে সন্ত্রাসবাদী সংগ্রাম দেখা দিয়াছিল, এই সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ তাহারই অগ্রদূত।[৩]

১। W. W. Hunter : Annals of Rural Bengal, p. 70; সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের পূর্ণ বিবরণ সুপ্রকাশ রায়ের 'ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম: প্রথম খণ্ড' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

২। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃ ৯১।

৩। Lester Hutchinson : The Empire of the Nabobs p. 114.

লেস্টার হাচিন্‌সন্‌ সাহেবের মতে, 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ'-এর সন্ন্যাসী ও ফকিরগণ সংগ্রামী কৃষক ও কারিগরদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন বিদেশীদের কবল হইতে স্বদেশের মুক্তিসাধন ও ধর্মরক্ষার আদর্শ; তাঁহারা শিখাইয়াছিলেন যে, দেশের মুক্তি-সাধন পরম ধর্ম, আর পরাধীন জাতির মুক্তির জন্য "সর্বস্বত্যাগ", দেশ মাতৃকার প্রতি অচলা "ভক্তি", অন্যায়ের বিনাশ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য "সন্ন্যাস গ্রহণ" এবং প্রবল বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে দেশবাসীর "ঐক্য গঠন"—এই সকলই সেই পরম ধর্ম পালনের শ্রেষ্ঠ পন্থা।[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' প্রভৃতি উপন্যাস ও 'বন্দেমাতরম্‌' সঙ্গীত হইতে প্রথম যুগের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবিগণ অসাধারণ প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের 'নবহিন্দুবাদ' অর্থাৎ হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ও হিন্দু-সম্প্রদায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতির ধ্বনি তাঁহাদের মনে যথেষ্ট সাড়া জাগাইয়াছিল। বৃটিশ শাসনের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন সত্ত্বেও ইংরেজ সভ্যতার প্রতি বিরূপ মনোভাব সম্পন্ন শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধ্বনির মধ্যেই জাতীয় মুক্তির পথ দেখিতে পাইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্‌' সঙ্গীতটিতে বাঙালীদের আরাধ্যা দেবী দুর্গার সহিত বাঙলাদেশকে এক করিয়া দেখিবার ফলে এই সঙ্গীতের মারফতই হিন্দু মধ্যশ্রেণীর যুব-সম্প্রদায়ের দেশাত্মবোধ হ্রাস না পাইয়া বরং বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সঙ্গীতের মধ্যে তাহাদের স্বাধীন বঙ্গে[২] হিন্দুধর্ম ও হিন্দু-সম্প্রদায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সার্থক রূপ লাভ করিয়াছিল বলিয়াই এই সঙ্গীতই তাহাদের রণধ্বনি হইয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে বঙ্কিমের নিকট হইতে তাহারা লাভ করিয়াছিল উগ্র হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার শিক্ষা। এই শিক্ষাই তাহারা গ্রহণ করিল তাহাদের জাতীয়তাবাদ রূপে।

এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস ও উহার অন্তর্ভুক্ত 'বন্দেমাতরম্‌' সঙ্গীতটি হইল মধ্যশ্রেণীর বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণার অন্যতম উৎস। 'আনন্দমঠ'-এর মাধ্যমেই 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' নামক ঐতিহাসিক কৃষক বিদ্রোহের পরিচালক "সন্ন্যাসী" ও "ফকির-সম্প্রদায়"-এর ত্যাগ, বৈরাগ্য ও দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব পণের আদর্শ এই বিপ্লবীদের সংগ্রামের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র জন্মভূমিকে কালীদেবতা রূপে অঙ্কিত করিয়া বাঙলাদেশের চরম দুর্দশার চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি তাঁহার বর্ণনায় সর্বাভরণ-ভূষিতা দুর্গা এবং সর্ব সম্পদহৃতা, দুর্দশার মসিলিপ্ত ও নগ্ন কালীদেবতার বিকট রূপের মধ্য দিয়া জন্মভূমির সমৃদ্ধিশালী অবস্থা হইতে চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার রূপান্তরের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,

১। Ibid, p. 122.

২। প্রথম যুগের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মনে সমগ্র ভারতবর্ষের কথা বিশেষ স্থান পায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মত তাঁহারাও স্বদেশ বলিতে বঙ্গদেশকেই বুঝিতেন।

তাহা বাঙলাদেশের স্বাধীনতাকামী যুব-সম্প্রদায়ের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণার উৎসে পরিণত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'আনন্দমঠ'-এ লিখিয়াছেন :

পূর্বে মা (জন্মভূমি বঙ্গমতা – সু. রা.) ছিলেন :

"এক অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্তি।" "ইনি কুঞ্জর, কেশরী প্রভৃতি বন্য পশু সকল পদতলে দলিত করিয়া বন্য পশুর আবাসস্থলে আপনার পদ্মাসন স্থাপন করিয়াছেন। ইনি সর্বালঙ্কার-পরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি ছিলেন বালার্ক স্বর্ণাভ, সকল ঐশ্বর্যশালিনী।[১]

আর এখন[২] মা (জন্মভূমি বঙ্গমাতা) হইয়াছেন :

"কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্ন কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজ দেশের সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন।"[৩]

স্বাধীন ও শোষণমুক্ত মায়ের (জন্মভূমি বঙ্গমাতার) ভবিষ্যত রূপ :

"দশভুজা প্রতিমা নবারুণ-কিরণে জ্যোতির্ময়ী হইয়া হাসিতেছেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত ; পদতলে শত্রু বিমর্দিত ; পদাশ্রিত বীর কেশরী শত্রু-নিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণ-ধারিণী শত্রু বিমর্দিনী—বীরেন্দ্রশ্রেষ্ঠ বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিনী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।"[৪]

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা

বঙ্গদেশের চরম বেকার-সমস্যা হইতে সৃষ্ট সংকটের ফলে বিক্ষুব্ধ শহুরে মধ্যশ্রেণী গ্রামাঞ্চলের কৃষক আর শহরের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া নিজ সমস্যা সমাধানের জন্য নিজস্ব বিশেষ পন্থায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার আয়োজন করে। ইহাদের আত্মত্যাগ আর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামই বাহ্যত তথাকথিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন রূপে দেখা দেয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বঙ্গদেশের শহুরে মধ্যশ্রেণীর ভিতর য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি যে প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়াছিল, তাহা তাহাদের গভীর আর্থিক সংকটের ফলে ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আরম্ভকালেই কাটিয়া যাইতে থাকে। তাহার পরিবর্তে দেখা দেয় বৈদেশিক সভ্যতার প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব এবং ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও প্রাচীন ধর্মের প্রতি নূতন আকর্ষণ। সেই সময় হইতে শিক্ষিত হিন্দুগণ হিন্দু-সভ্যতার প্রতি নূতন করিয়া আকৃষ্ট হইতে থাকে। তাহাদের মধ্যে ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির জন্য একটা গর্বের ভাব জাগিয়া উঠে। তাহাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, এতকাল পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিয়া ভারতবর্ষ উহার আত্মা বিদেশীদের পায়ে বিকাইয়া দিতে বসিয়াছিল। ইহার

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : আনন্দমঠ (গ্রন্থাবলী সংস্করণ) ২। এখন অর্থাৎ মুসলমান শাসনের পর এবং এই শাসনের ফলে। ৩। আনন্দমঠ। ৪। আনন্দমঠ (গ্রন্থাবলী সংস্করণ)।

সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রাচীন ধর্মীয় আদর্শ অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে নূতন নূতন সংগঠন স্থাপিত হয় এবং সেই সকল সংগঠন পাশ্চাত্ত্য আদর্শ অপেক্ষা ভারতের ঐতিহ্য ও আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতে থাকে। সেই সঙ্গে হিন্দু সমাজ ও হিন্দু-ধর্মের যুগোপযোগী সংস্কার সাধনের উপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এই সামাজিক পারবেশে হিন্দু 'রিনাসান্স' বা হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের অন্যতম প্রধান নায়করূপে স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভূত হন এবং মধ্যশ্রেণীর নিকট হিন্দু-ভারতের ধর্মীয় আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'নবাহিন্দুবাদ' প্রচারের দ্বারা সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের কার্য আরম্ভ করিয়া যান, আর বিবেকানন্দ সেই কার্য বহুদূর অগ্রসর করিয়া দেন।

স্বামী বিবেকানন্দের অভয় বাণী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতি বিরূপ মনোভাব-সম্পন্ন শহুরে মধ্যশ্রেণীর মনে নূতন আশা ও উদ্দীপনা সঞ্চার করে। তাহারা বিবেকানন্দের শিক্ষাকেই তাহাদের জাতীয়তাবাদের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। তাহাদের এই জাতীয়তাবাদের মূল বিষয়বস্তু ছিল স্বদেশ সম্বন্ধে নূতন গৌরববোধ, হিন্দু-সম্প্রদায়ের পুনরুত্থান এবং ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ সাধন।

বিবেকানন্দ ছিলেন এই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের অন্যতম মুখপাত্র। মধ্যশ্রেণীর জাতীয়তাবাদীরাও তাঁহাকেই "জাতীয় বীর" রূপে গ্রহণ করে। কারণ, তিনিই একদিকে যুরোপীয় সভ্যতার মোহ হইতে সদ্যমুক্ত শহুরে মধ্যশ্রেণীকে দেশের প্রতি মুখ ফিরাইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন, এবং অপর দিকে আমেরিকার চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ধর্ম-মহাসম্মেলনে ভারতের আহত জাতিসত্তার জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন; তিনিই শোষক শ্বেতজাতির সভ্যতাকে যাহা হউক একটা উত্তর দিতে পারিয়াছিলেন এবং পরাধীন ভারতবর্ষও যে বিশ্বসভায় উচ্চমর্যাদার আসন লাভ করিতে পারে তাঁহা দেখাইয়াছিলেন। এই সকল কারণেই বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি পরবর্তীকালের চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নায়কগণও স্বামী বিবেকানন্দকেই রাজ-নীতিক গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর ব্যাপক গণ-সংগ্রাম এবং বৃটিশ সভ্যতার মোহ হইতে শহুরে মধ্যশ্রেণীর আংশিক মুক্তি বিবেকানন্দের মনে গভীর ছায়াপাত করিয়াছিল। দুইবার য়ুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের ফলে পাশ্চাত্ত্যের ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিকট রূপ ও উহার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর প্রবল সংগ্রাম তাঁহাকে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বৃটিশ-সৃষ্ট সামন্তপ্রথার প্রতি মধ্যশ্রেণীর সহজাত অন্ধতা তাঁহার সামাজিক দৃষ্টিকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছিল। এই দুই পরস্পর-বিরোধী প্রভাবের দ্বন্দ্ব তৎকালের মধ্যশ্রেণীর অধিকাংশ চিন্তানায়কের ন্যায় বিবেকানন্দেরও চিন্তাশক্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই বৃটিশ শাসন ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সম্ভবত ইহাই একমাত্র কারণ যাহার জন্য তাঁহার অসংখ্য বক্তৃতা, চিঠিপত্র, প্রবন্ধ

প্রভৃতির মধ্যে বঙ্গদেশের জমিদারগোষ্ঠীর অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়ন এবং কৃষক-সম্প্রদায়ের শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম সম্বন্ধে তিনি একটি কথাও বলিতে পারেন নাই। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর অন্যতম প্রধান নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ্যেই বৃটিশ শাসনের প্রতি সমর্থন জানাইয়াছিলেন এবং কৃষক-সংগ্রামের বিরোধিতা করিয়াছিলেন।[১] আর শহুরে মধ্যশ্রেণীর অন্যতম প্রধান নায়ক স্বামী বিবেকানন্দ 'বেদান্ত', 'মায়া', "মুচি, মেথর, চণ্ডাল আমার ভাই" প্রভৃতি কতকগুলি অর্থহীন কথার ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়া কৃষিপ্রধান ও পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতিক ও আর্থনীতিক মুক্তির প্রকৃত সমস্যাটিকে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন।

উপরি-উক্ত দুই পরস্পর-বিরোধী চিন্তাধারার দ্বন্দ্বের অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ মধ্যশ্রেণীর অন্যান্য নায়কগণের ন্যায় স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায়ও স্ববিরোধিতা প্রকট হইয়াছিল। একদিকে তিনি অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী : "জগৎকে যদি আমাদের কিছু জীবনপ্রদ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হয় তবে তাহা এই অদ্বৈতবাদ।" অন্যদিকে তিনি মূর্তিপূজারী রামকৃষ্ণের পরম ভক্তশিষ্য। তিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, আবার তিনিই স্বদেশপ্রীতির উদ্গাতা : "ভারতের মাটি আমার পরম স্বর্গ।...এই একমাত্র দেবতা যে জীবন্ত—আমার স্বজাতি... ।" কিন্তু এই "স্বর্গ" অর্থাৎ মাতৃভূমির উদ্ধার কেবল অদ্বৈতবাদের দ্বারাই সম্ভব :

"এই অদ্বৈতবাদ[২] কার্যে পরিণত না হইলে আমাদের এই মাতৃভূমির আর উদ্ধারের আশা নাই।" আবার "জড়বাদ এক অর্থে ভারতবর্ষকে মুক্ত করেছে......।" বিবেকানন্দ য়ুরোপীয় সভ্যতাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করিতেন, কিন্তু তিনিই আবার য়ুরোপীয় সভ্যতার নিকট হইতে চাহিয়াছেন রজোগুণের অনুশীলন, শক্তির সাধনা, চাহিয়াছেন বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব। অবশেষে তিনি সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগের ধর্মমত ও ধনতান্ত্রিক য়ুরোপ—এই দুই বিপরীত শক্তির সমন্বয় সাধন করিয়া নূতন ভারতবর্ষ গঠনের জন্য আহ্বান জানাইয়া বলিয়াছেন :

"সাম্যের দিক দিয়ে, স্বাধীনতার দিক দিয়ে কর্ম ও শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যকে হার মানাও, কিন্তু ধর্মসাধনায় ও ধর্মবিশ্বাসে হিন্দুত্ব যেন তোমার অস্থিমজ্জার মধ্যে মিশে থাকে।"

এই প্রকার পরস্পর-বিরোধী চিন্তাধারা লইয়া শিক্ষিত শহুরে মধ্যশ্রেণীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয়তাবাদের পথ নির্দেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকারের বহু নিবন্ধ ও বক্তৃতার মারফত ভারতবাসীকে সে পথের সন্ধান দিয়াছেন। বিবেকানন্দের পথ নির্দেশ :

১. "ভারতের মুক্তির পথনির্দেশ : শক্তিনাশক অতীন্দ্রিয়তাবাদ পরিহার করিয়া শক্তিমান হও। উপনিষদের মহাসত্যগুলি তোমার সম্মুখে রহিয়াছে। সেই সকল

১। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ও 'বঙ্গদেশের কৃষক' পুস্তিকায় সরাসরি এবং বিভিন্ন প্রবন্ধে ও পুস্তকে নানাভাবে বৃটিশ শাসনের প্রতি সমর্থন জানাইয়াছিলেন এবং কৃষক-সংগ্রামের বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

২। অদ্বৈতবাদ—ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, আর সকলই মায়া—এই রূপ দার্শনিক মত।

সত্য গ্রহণ কর, তাহা অনুসরণ কর—তাহা হইলেই ভারতের মুক্তি নিকটবর্তী হইবে।"[১]

২. "ভবিষ্যৎ ভারত গঠনের উপায় নির্দেশ: যে-কোন দেশ হইতে ভারতের সমস্যা অধিকতর জটিল ও গুরুতর। মানবগোষ্ঠী (Race), ধর্ম, ভাষা ও শাসন-ব্যবস্থা—এই সকল লইয়াই একটি জাতির সৃষ্টি। সুতরাং ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ গঠনের পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ধর্মের ঐক্যসাধন। ইহা বলিতেছি না যে, রাজনীতিক বা সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমার মতে ধর্মই সবাগ্রে প্রয়োজন।"[২]

৩. "বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা ও উপায় নির্দেশ: এখন এরূপভাবে কাজ করিতে হইবে যাহাতে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবধারা পাশ্চাত্যে গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারে। আমাদের ভারতের বাহিরে যাইতে হইবে, আমাদের আধ্যাত্মিকতা ও দর্শনের মারফত সমগ্র বিশ্ব জয় করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের—জাগ্রত ও বেগবান জাতীয় জীবনের একটি মাত্র শর্ত আছে, তাহা হইল ভারতীয় চিন্তার সাহায্যে বিশ্ব জয় করা।"[৩] কিন্তু তাহার উপায় হইল, উপনিষদের শিক্ষা গ্রহণ—"য়ুরোপকে কেবল উপনিষদই রক্ষা করিতে পারে।"[৪]

* * * *

ভারতের জাতীয়তাবাদিগণ, বিশেষত চরমপন্থী, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবিগণ স্বামী বিবেকানন্দকে "জাতীয় বীর" বলিয়া গ্রহণ করিলেও তিনি কোন সুগঠিত রাজনীতিক মত প্রকাশ অথবা স্বাধীনতা লাভের জন্য কোন রাজনীতিক পথ নির্দেশ করেন নাই। তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু-ভারতের ঐক্যসাধনের ও হিন্দুধর্মের প্রচারক। তথাপি পরবর্তীকালে মধ্যশ্রেণীর রাজনীতিক কর্মিবৃন্দ, বিশেষত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা তাঁহার ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের বাণী হইতে যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। চিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে বিবেকানন্দের সাফল্যের জন্যই হতাশাচ্ছন্ন মধ্যশ্রেণী তাঁহাকে তাহাদের "জাতীয় বীর" রূপে গ্রহণ করিয়াছিল—কোন রাজনীতিক জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্য নহে।

১৯০১ সনে স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারের উদ্দেশ্যে ঢাকা শহরে উপস্থিত হইলে পরবর্তীকালের বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ও তাঁহার সহকর্মিগণ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করেন। স্বামীজী তাঁহাদিগকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা হইতে তাঁহার সামাজিক-রাজনীতিক কর্তব্য সম্বন্ধীয় মত সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা করা চলে। ঘোষ মহাশয়ের কথায়:

"তিনি (স্বামীজী) একটি মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একটি কর্মিদল গঠন করিতে বলেন। সমসাময়িক কালের ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ক্রিয়াকলাপে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না।"[৫]

১। Swami Vivekananda: Works, Vol. III, p. 223-24. ২। Ibid, p. 286-87 ৩। Ibid, p. 277. ৪। Bhupendra Nath Datta: Swami Vivekananda—Patriot and Prophet, p. 320. ৫। B. N. Datta: Ibid, p. 332.

স্বামীজীর কথায় :

"কোথাও দেশভক্তি জাগ্রত করিবার পথ ইহা নহে। যন্ত্র, অর্থ ও পণ্যসম্ভার লইয়া গঠিত যে বণিকের জগৎ, তাহাতে ভিক্ষাপাত্রের কোন স্থান নাই।... ...প্রথম কাজ প্রথম করিতে হইবে। শরীর গঠন ও দুঃসাহসিক কার্যে ঝাঁপাইয়া পড়াই তরুণ বাঙলার প্রাথমিক কর্তব্য। শরীর সাধনা এমনকি 'ভগবদ্গীতা' পাঠ করা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ। এই দুঃসাহসিকতার নেশা—পৌরুষ, তেজস্বিতা অর্থাৎ বীরনীতি দুর্বলের রক্ষা ও উদ্ধারের জন্য নিযুক্ত করা কর্তব্য।......আমি তোমাদের সকলকে সমাজ-সেবার নির্দেশ দিতেছি।" "বঙ্গদেশের হে তরুণদল! তোমরা ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর আদর্শ অনুসরণ কর।"[১]

স্বামীজী তাঁহাদিগকে চতুর্বিধ কর্তব্যের নির্দেশ দান করিয়া বলেন :

"জনগনের মধ্যে যাও, অস্পৃশ্যতা দূর কর, ব্যায়ামাগার ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা কর। বঙ্কিমের রচনা বারংবার পাঠ কর, আর তাঁহার দেশভক্তি ও সনাতনধর্মের অনুসরণ কর। মাতৃভূমির সেবাই তোমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। ভারতবর্ষের রাজনীতিক স্বাধীনতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।"[২]

এই সকল উক্তি হইতে ধারণা করা চলে যে, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র-প্রবর্তিত 'নবহিন্দুবাদ' ও 'হিন্দু-জাতীয়তাবাদ'-এরই সমর্থক। তাই দেখা যায়, স্বামীজী স্পষ্ট ভাষায় তৎকালের জাতীয়তাবাদিগণকে সামন্ততন্ত্র ও বৃটিশ শাসনের প্রশস্তিগানে মুখর বঙ্কিম-সাহিত্য বারংবার পাঠ করিবার এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সনাতন-ধর্ম অনুসরণ করিয়া চলিবার নির্দেশ দিয়াছেন। অবশ্য বিবেকানন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় স্পষ্টভাবে কৃষক-সংগ্রামের প্রতি বিরোধিতা ও বৃটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু সমগ্র ভারতে উনবিংশ শতাব্দীব্যাপী কৃষকের সামন্ততন্ত্র ও বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করিয়াও তিনি সেই সম্বন্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নাই ; শূদ্র-মুচি-মেথর প্রভৃতি কতকগুলি শ্রেণীসত্তাবর্জিত অর্থহীন শব্দের দ্বারা কৃষকের সেই সংগ্রামকে এড়াইয়া গিয়াছেন। সম্ভবত স্বামী বিবেকানন্দ এক সময়ে সশস্ত্র বিপ্লবের কথাও চিন্তা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁহার কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তিনি তাঁহার মার্কিন শিষ্যা ভগ্নী গ্রিন্‌স্টিড্‌ল (Sister Grinstidle)-এর নিকট ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের নিমিত্ত তাঁহার যে নিজস্ব পরিকল্পনা ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা নিম্নরূপ :

"বিপ্লবোদ্দেশ্যে আমি সমগ্র ভারত ঘুরিয়াছি। আমি কামান প্রস্তুত করিব। আমি স্যার হিরাম ম্যাক্সিমের[৩] সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছি—কিন্তু ভারত গলিত হইয়াছে। এই জন্যই আমি একদল কর্মী চাই, যাঁহারা ব্রহ্মচারী হইয়া দেশের লোককে শিক্ষাদান করিয়া এই দেশকে পুনঃসঞ্জীবিত করিতে পারিবেন।"[৪]

১। B. N. Datta, Ibid, p. 332-33, ২। Ibid, p. 334.

৩। হিরাম ম্যাক্সিম—ইংলণ্ডের বিখ্যাত 'ম্যাক্সিম' কামানের উদ্ভাবক।

৪। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম, পৃঃ ৯৯।

স্বামীজী সঠিকভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, রাজনীতিক স্বাধীনতা ব্যতীত সমাজ-সংস্কার, জনগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রভৃতি কিছুই সম্ভব নহে। সম্ভবত ইহা উপলব্ধি করিয়াই স্বামীজী "বিপ্লবের" উদ্দেশ্যে দলগঠন ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দলগঠন করিতে চাহিয়াছেন মধ্যশ্রেণী হইতে আগত একদল ব্রহ্মচারী লইয়া। এই ব্রহ্মচারিদলের কর্তব্যও তিনি নির্দেশ করিয়াছেন: "দেশের লোককে শিক্ষাদান করিয়া দেশকে পুনঃসঞ্জীবিত করা।" এই বুদ্ধিজীবী সুলভ মনোভাব লইয়াই স্বামীজী ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবি-সংগঠন 'ফেবিয়ান সোস্থালিস্ট পার্টির'[১] ন্যায় কেবল শিক্ষার প্রসারের দ্বারাই সামাজিক বিপ্লব আনয়নের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। অথচ 'বিপ্লবী' স্বামীজী দেশের অগণিত কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করিয়াও বিপ্লবের জন্য তাহাদের সহিত হাত মিলাইতে, এমনকি তাহাদের দিকে ফিরিয়া তাকাইতেও পারেন নাই। তিনি নাকি "বিপ্লবের" উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে 'ম্যাক্সিম' কামান তৈয়ার করাইবার জন্য এক সময় ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ও বৃটিশ শাসনের স্তম্ভ স্বরূপ দেশীয় রাজা-মহারাজগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছেন, কিন্তু বিপ্লবের জন্য ভারতের সংগ্রামশীল বৈপ্লবিক শক্তি শ্রমিক-কৃষকের নিকটবর্তী হইতে পারেন নাই।

হতাশাচ্ছন্ন শহুরে মধ্যশ্রেণীর নায়কগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া কোন কোন সময় বিপ্লবের কথা ভাবিলেও এবং নূতন নূতন তত্ত্বকথা ঘোষণা ও ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত বাক্যবাণ বর্ষণ করিলেও তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে বৈপ্লবিক শক্তি ও বিপ্লবের পন্থা বর্জন করিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামন্ততন্ত্রের পক্ষপুটেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এবং মধ্যযুগীয় রহস্যবাদ ও 'নাইট' সুলভ মনোবৃত্তির দ্বারা প্রকৃত সমস্যাকে ধোঁয়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদ সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা তাহারই সাক্ষ্য বহন করে।

যে সমাজবাদী ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতি প্রাচীন ও মধ্যযুগে উদ্ভূত ধর্মীয় ভাবধারা ও অধ্যাত্মবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত, স্বামীজীর মতে সেই ধর্মীয় ভাবধারার প্লাবনই ভারতে সাম্যবাদ ও রাজনীতিক জাগরণের পক্ষে অপরিহার্য। অবশ্য এই ধর্মীয় প্লাবন যে পুনর্গঠিত হিন্দুধর্মের অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র-প্রবর্তিত ও রামকৃষ্ণ পরমহংস কর্তৃক পরিবর্ধিত 'নবহিন্দুবাদ'-এরই প্লাবন তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং বিবেকানন্দ নিজেকে 'সমাজবাদী' বলিয়া ঘোষণা করিলেও বৈদান্তিক মায়াবাদী বিবেকানন্দের 'সোস্থাল-ইজম্' ও জাতীয়তাবাদ যে ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদ-বিরোধী জনসাধারণকে অর্থাৎ সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষককে এবং তাহাদের বৃটিশ-জমিদার-বিরোধী সংগ্রামকে এড়াইয়া চলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি!

* * * *

ইহা সত্য, স্বামী বিবেকানন্দ বাঙলার শিক্ষিত হিন্দু যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিবেকানন্দ বাঙলাদেশের

১। ইংলণ্ডের 'ফেবিয়ান সোস্থালিস্টগণ' কেবল শিক্ষা প্রচারের দ্বারাই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে।

হতাশাচ্ছন্ন যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে আশার সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে শক্তি-সাধনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন। ধর্মের আবরণে আবৃত থাকিলেও তাঁহার সেই শক্তি-সাধনার বাণী সেই সময় বাঙলার মধ্যশ্রেণীর যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় জাগরণের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল, জাতীয় সত্তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের মধ্যে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সাহস আনিয়া দিয়াছিল। তাঁহার শিক্ষার মূলকথা ছিল :

"পরমাত্মার সহিত আত্মার মিলন নিষ্ক্রিয় কল্পনাদ্বারা সম্ভব নহে, কেবলমাত্র নিঃস্বার্থ কর্মের দ্বারাই সম্ভব।"

তৎকালে তাঁহার এই ঘোষণা যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে এক দুর্বার প্রাণ-চাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

"আমাদের অধ্যাত্মবাদ ও দর্শনের দ্বারা আমাদের বিশ্বজয় করিতে হইবে। ইহা না করিতে পারিলে আমাদের মৃত্যু। ভারতীয় চিন্তাধারা দ্বারা বিশ্বজয়ই হইবে ভারতের জাতীয় জীবনের—গর্বোন্নত ও প্রাণ-চঞ্চল জাতীয় জীবনের—একমাত্র ভিত্তি।"

ইহার পর তিনি ভারতের জাতীয় জীবনের অভিশাপস্বরূপ পরাধীনতা সম্বন্ধে বলেন,—যে দেশের কোটি কোটি মানুষের অনাহারে মৃত্যু হয়, যে দেশ অস্পৃশ্যতা ও নারী-উৎপীড়নের কলঙ্কে কলঙ্কিত, সে দেশ কখনই আধ্যাত্মিক শক্তির গর্ব করিতে পারে না। তিনি ভারতবাসীর ভীরুতা এবং জাতীয় জীবনের বহুবিধ অনাচার ও কলঙ্কের প্রতি তীক্ষ্ণ কষাঘাত করিয়া স্বাধীনতা আয়ত্ত করিবার জন্য ভারতবাসীকে শক্তি-সাধনায় উদ্বুদ্ধ হইবার আহ্বান জানাইয়া বলেন :

"হায় ভারত! তুমি কি কেবল এই পাথেয় সম্বল করিয়া সভ্যতা ও মহত্বের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে চাও? যে স্বাধীনতা কেবল সাহসী ও বীরেরাই আয়ত্ত করিতে পারে, সেই স্বাধীনতা কি তুমি তোমার লজ্জাকর ভীরুতা দ্বারা লাভ করিতে পারিবে?......হে মা শক্তিদায়িনী! আমার দুর্বলতা দূর কর, আমার অপৌরুষ দূর কর, আমাকে পৌরুষ দান কর।" "সর্বোপরি, শক্তিমান হও! পৌরুষ লাভ কর! দুষ্ট লোক যদি পৌরুষের অধিকারী ও শক্তিমান হয় তবে আমি সেই দুষ্টকেও শ্রদ্ধা করি, কারণ তাহার শক্তিই একদিন তাহার দুষ্ট স্বভাব দূর করিবে এবং তাহাকে সত্যের পথে লইয়া আসিবে।"[১]

বিবেকানন্দ কেবল অতীত ভারতের গৌরবোজ্জ্বল যুগেরই প্রচারক ছিলেন না, তিনি ছিলেন নূতন আশা, হিন্দু ভারতের জাগরণের অগ্রদূত। তিনি জ্ঞান-শক্তি-আশার আলোক-বর্তিকা হস্তে ভারতের মধ্যশ্রেণীর যুবসম্প্রদায়কে স্বাধীনতা লাভের আশায় সঞ্জীবিত করিয়াছেন। ইহা লক্ষ্য করিয়াই সরকারী 'সিডিসন কমিটি' উহার রিপোর্টে বাঙলার বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের মূলে স্বামী বিবেকানন্দের নূতন শক্তিমন্ত্রের বিপুল প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছে।

১। J. N. Farquhar: Modern Religious Movements in India, p. 213-14, & Vivekananda's Works—Part IV, Mayavati Memorial Ed. p. 970-71.

স্বামী বিবেকানন্দের শক্তি-সাধনার শিক্ষা বাঙলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণার উৎসরূপে দেখা দেয়। শক্তির দেবতা কালী তাহাদের প্রেরণার প্রধান উৎস হইয়া উঠে। কালী কেবল শক্তির দেবতাই নহে, ধ্বংসেরও দেবতা, আর ইংরেজ-শাসনের ধ্বংসই তাহাদের লক্ষ্য। তাই মহারাষ্ট্রে যেমন ইংরেজ ও "ম্লেচ্ছ"দের আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য গণেশ দেবতা বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি শক্তি ও ধ্বংসের দেবতা কালী হইল বাঙলার বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস। তাহাদের সংগ্রামের ধ্বনি হইল বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট "বন্দেমাতরম"—জন্মভূমি হইতে অভিন্ন শক্তি ও ধ্বংসের দেবতা কালী বা দুর্গার বন্দনা।

অরবিন্দ-বিপিনচন্দ্র-আর্যসমাজের ভূমিকা

বাঙলাদেশে মধ্যশ্রেণীর সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শ নূতন-ভাবে প্রভাব বিস্তার করে অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পালের মারফত। অরবিন্দ বরোদারাজ্যে চাকরি করিবার সময়ই পুনার বিপ্লবী নায়ক ঠাকুরসাহেবের প্রতিষ্ঠিত গুপ্তসমিতিতে দীক্ষিত হন। ঐ সময় অরবিন্দ 'গণতন্ত্রী ভারতের' গুজরাট শাখার সভাপতি ছিলেন এবং মনে প্রাণে বাল গঙ্গাধর তিলকের বৈপ্লবিক আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন তিলকেরই মন্ত্রশিষ্য। তাঁহার নিজের ও তাঁহার সহ-কর্মীদের কর্মপ্রচেষ্টাই এযুগে সর্বপ্রথম বাঙলার বিক্ষুব্ধ যুবসমাজকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

কিন্তু অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র ও তাঁহাদের সহকর্মীদের কর্মপ্রচেষ্টা, এমনকি জাতীয় আন্দোলন এবং কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠারও বহু পূর্ব হইতে কতিপয় নূতন ভাবধারার প্রভাবে বাঙলার যুবসমাজের মধ্যে নূতন জাগরণ আরম্ভ হইয়াছিল, চিরাচরিত ধর্ম, সমাজ ও ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের মনোভাব গড়িয়া উঠিতেছিল। সেই সকল বিদ্রোহী ভাবধারার প্রভাব ও আর্থনীতিক বিক্ষোভ একত্রে মিলিয়া বাঙলার মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়কে বৈপ্লবিক সংগ্রামের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলে। সুতরাং অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র ও তাঁহাদের সহকর্মীদের পক্ষে বাঙলার শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়কে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে বিশেষ অসুবিধা হয় নাই।

১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে নীলচাষীদের ঐতিহাসিক বিদ্রোহ তৎকালীন বাঙলার শিক্ষিত সম্প্রদায়কে যে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহা বিদ্রোহী কৃষকদের পক্ষে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সক্রিয় অংশ গ্রহণ হইতেই অনুমান করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ দিকে বাঙলাদেশের মধ্যশ্রেণীর ভিতর য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি যে প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়াছিল তাহা দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম ভাগেই কাটিয়া যায় এবং তাহার পরিবর্তে দেখা দেয় ঐ বিদেশী সভ্যতার প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব। এই বিরূপ মনোভাব হইতেই শিক্ষিত সম্প্রদায় হিন্দু-সভ্যতার প্রতি নূতন করিয়া আকৃষ্ট হইতে থাকে। তাহাদের মধ্যে ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির জন্য একটা গর্বের ভাব

জাগিয়া উঠে। তাহাদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া উঠে যে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া ভারতবর্ষ তাহার আত্মা বিদেশীদের পায়ে বিকাইয়া দিতে বসিয়াছিল। তৎকালীন বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছিলেন:

"আমরা বিদেশীদের দেবমূর্তিও বর্জন করিব, কিন্তু এমনকি আমাদের গৃহপালিত কুকুরকেও পূজা করিব।"

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে য়ুরোপের সভ্যতা, সমাজ ও ধর্মের প্রতি যে ঝোঁক দেখা দিয়াছিল তাহা দ্রুত পরিবর্তিত হয় এবং তাহার পরিবর্তে দেখা দেয় ভারতীয় প্রাচীন সমাজ ও ধর্মের প্রতি নূতন আকর্ষণ। পুরাতন ধর্ম-বিশ্বাস অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে নূতন নূতন সমিতি গড়িয়া উঠে। সেই সকল সমিতি ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য প্রচার করিতে থাকে। ভারতীয় সমাজ ও ধর্মের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের উপরেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি তাহাদের প্রতিক্রিয়া বাড়িয়াই চলে। এই সময় উত্তর-ভারতে প্রধানত দুইটি ধ্বনি লইয়া আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়: (১) বেদের যুগে ফিরিয়া চল; (২) আর্যস্থান আর্যদের। হিন্দুধর্ম ও হিন্দু-সমাজের সংস্কার এবং ইংরেজ-শাসন হইতে হিন্দুস্থানের মুক্তির আন্দোলন গড়িয়া তোলার দিক হইতে আর্যসমাজ সেই সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

ভবানী-মন্দির

কালী, দুর্গা, ভবানী—এই কয়টি শক্তি ও ধ্বংসের দেবতার বিভিন্ন নাম। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষের রচিত 'ভবানী-মন্দির' নামে যে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় তাহাতেও দেশের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে শক্তিরূপিনী ভবানী দেবীর পূজার আদর্শ প্রচারিত হয়। ষোল পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাখানির গোড়ার দিকে সন্নিবিষ্ট ভবানী-স্তবে ভবানীর নিকট স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয় লাভের জন্য শক্তি প্রার্থনা করা হইয়াছে। শিবাজী যেমন উচ্চ শৈল-শিখরে ভবানী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই প্রকারের একটি ভবানী-মন্দির স্থাপনের পরিকল্পনা এই পুস্তিকাটিতে দেওয়া হয়। এই মন্দির নির্মাণের স্থান হইবে "আধুনিক শহরের দূষিত প্রভাব হইতে বহু দূরে, শান্তি ও শক্তি-সমন্বিত উচ্চ ও পবিত্র বায়ু-প্রবাহিত নির্জন পার্বত্য অঞ্চলে।"[১] এই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিবে একটি দেশ-হিতার্থে নিবেদিত-প্রাণ কর্মিদল। পূর্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ হইবে তাহাদের ইচ্ছাধীন, কিন্তু তাহাদের ব্রহ্মচর্য পালন হইবে বাধ্যতামূলক। ব্রহ্মচর্য পালনের সময় দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রত্যেকের উপর ন্যস্ত কর্তব্য প্রত্যেককে অবশ্যই পালন করিতে হইবে। এই কর্তব্য পালনের পরেই তাহারা গার্হস্থ্য-জীবনে ফিরিয়া যাইতে পারিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর সন্ন্যাসীদলের আদর্শে একটি সুগঠিত রাজনৈতিক সন্ন্যাসীদল গড়িয়া তোলাই ছিল এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

১। অরবিন্দ ঘোষ: ভবানী মন্দির।

ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ

মহারাষ্ট্রে যেমন গণপতি, সেইরূপ বঙ্গদেশে শক্তির দেবতা জাতীয়তাবাদের উৎস ছিল। শক্তি ও ধ্বংসের দেবতা কালী, দুর্গা বা ভবানীর নিকট আত্মনিবেদন করিয়া বিপ্লবীরা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেন। এই ধ্বংসের দেবতাদের সন্তুষ্টির জন্য বলির প্রয়োজন, অত্যাচারী ইংরেজ-কর্মচারীরাই হইবে সেই বলি। এইভাবে হিন্দুধর্মের সহিত নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ মিশিয়া এক হইয়া যায়। ধর্মের সহিত জাতীয়তাবাদের এই মিলন বাঙলার বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের গুরু অরবিন্দের ভাষায় আরও স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"জাতীয়তাবাদ একটি ধর্ম, ভগবানই ইহার উৎস। জাতীয়তাবাদের মৃত্যু নাই, কারণ স্বয়ং ভগবানই বাঙলাদেশে ইহা পরিচালনা করিতেছেন। ভগবানকে হত্যা করা যায় না, তাঁহাকে বন্দীশালায় আবদ্ধ করাও চলে না।"[১]

বৈদেশিক ঘটনাবলীর প্রভাব

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধে ক্ষুদ্র ও অখ্যাত জাপানের নিকট প্রবল-প্রতাপান্বিত জারের রুশিয়ার অভাবনীয় পরাজয় সমগ্র এশিয়ার জাগরণশীল জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করিয়া তোলে। জাপানের জয়লাভ ভারতের, বিশেষ করিয়া বাঙলার বিপ্লবীদের গভীর প্রেরণা যোগাইয়াছিল। তাঁহারা জাপানের এই জয়কে য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তির উপর "এশিয়ার আধ্যাত্মিক শক্তির জয়" বলিয়া গ্রহণ করেন। য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের প্রবল সামরিক শক্তি অপরাজেয় নহে এবং এই সামরিক শক্তিকেও শক্তি-সাধনার দ্বারা পরাজিত করা সম্ভব—এই ধারণা বিপ্লবীদের ইংরেজ-বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে। কেবল তাহাই নহে, ইতালীর জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাফল্য এবং আয়ার্লণ্ডের "হোমরুল"-এর সংগ্রাম হইতেও তাহারা যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।

এই সময় "ভারতের বাহিরের ঘটনাবলী শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। সমগ্র পৃথিবীতে য়ুরোপের প্রভুত্ব খর্ব হইবার লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠে। দীর্ঘ 'বুয়র যুদ্ধ'-এর অনিশ্চিত অবস্থা, তুর্কিদের হস্তে গ্রীকদের পরাজয়, নিকট-প্রাচ্যে খ্রীষ্টানদের হত্যা এবং সর্বোপরি রুশিয়ার সহিত যুদ্ধে জাপানের বিরাট জয়—এই সকল ঘটনার তাৎপর্য তাঁহারা বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেন।"[২]

এই সকল ঘটনা ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে এবং বিশেষ করিয়া চরমপন্থীদের মনে সাফল্য সম্পর্কে ভরসা ও নিশ্চয়তা জাগাইয়া তোলে।

১। Speech of Aurobindo Ghosh—Quoted from H. F. Zacheria's "Renascent India," p. 149. ২। Thomson and Garrat: "British Rule in India", p. 548.

"তৎকালীন ঘটনাবলী হইতে এশিয়ার জাতীয়তাবাদ গভীর প্রেরণা লাভ করে। য়ুরোপ অপরাজেয়—এই ধারণা সেই সকল ঘটনাদ্বারা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়ার একটি ক্ষুদ্রশক্তি রুশিয়ার বিরাট স্থল-বাহিনীকে মাঞ্চুরিয়ায় পরাজিত করে এবং রুশিয়ার সমগ্র নৌ-বহর শুশিমার যুদ্ধে ধ্বংস করিয়া ফেলে। ......চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা ইহা হইতে ধারণা করে যে, যে বিরাট শক্তি (রুশিয়া) এতদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকেও সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই শক্তিটাকে যদি জাপানীরা এত সহজে পরাজিত করিতে পারে, তাহা হইলে যেহেতু ভারতবাসীরা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে জাপানীদের তুলনায় বহুগুণে উন্নত, সেই হেতু তাহারাও ইংরেজদের পরাজিত করিতে পারিবে—অবশ্য যদি তাহারা সত্যই তাহাদের দেশ হইতে ইংরেজদের বিতাড়িত করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়। এদিকে 'বুয়র-যুদ্ধ'-এও বৃটিশ সামরিক শক্তি সম্পর্কে পূর্বের উচ্চ ধারণা যথেষ্ট ক্ষুণ্ন হইয়াছিল। এই অবস্থায় বাঙলার যুব-সম্প্রদায় অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল ও অন্যান্য বিপ্লবীদের আহ্বানে সাড়া দিতে বিলম্ব করিল না। অরবিন্দ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ইতালী ও আয়ার্লণ্ডের জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়া ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন।"[১]

• বৈপ্লবিক সংগ্রামের কর্মপদ্ধতি •

তৃতীয় অধ্যায়

মহারাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদ ও বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণার উৎস ছিল 'গণপতি-উৎসব' ও 'শিবাজী-উৎসব'। এই দুই উৎসব উপলক্ষ করিয়াই বাল গঙ্গাধর তিলকের চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ সাংগঠনিক রূপ গ্রহণ করে। এই দুই উৎসব উপলক্ষ করিয়াই মহারাষ্ট্রে প্রথমে বিভিন্ন সমিতি ও গুপ্তদল গড়িয়া উঠে। 'সার্বজনিক গণপতি উৎসব' প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথমে এই উৎসব কোন সাম্প্রদায়িক ঘটনা উপলক্ষ করিয়া আরম্ভ হইলেও ইহা অবিলম্বে প্রধানত বৃটিশ-বিরোধী উৎসবে পরিণত হয়। আর প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশ-বিরোধী ধ্বনি লইয়াই ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় 'শিবাজী-উৎসব'। সেই সময় হইতে এই দুইটি উৎসব মহারাষ্ট্রীয় যুব-সম্প্রদায়ের জাতীয় জাগরণ এবং বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শ ও প্রেরণার উৎসে পরিণত হয়।

১। L. Hutchinson : "Empire of the Nabobs". p. 194

এই উৎসব উপলক্ষে প্রকাশ্যে মহারাষ্ট্রীয় যুবকগণের ছোরা-তরবারি খেলা, ব্যায়াম, শোভাযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইত। যুবকদের এক-একটি দল এক-একটি গণপতি দেবতার মূর্তি লইয়া শোভাযাত্রা বাহির করিত, শোভাযাত্রা হইতে পথে পথে জ্বালাময়ী ভাষায় বৃটিশ-বিরোধী বক্তৃতা হইত, ধ্বনি দেওয়া হইত এবং স্কুলের বালকগণ বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবার শপথ গ্রহণ করিত। অবশেষে নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্য-জনসভায় বৃটিশ-বিরোধী বক্তৃতা করিতেন।

চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রয়াস

তিলক মহারাষ্ট্রের এই জাতীয় জাগরণের প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রেরণাদাতা হইলেও তাঁহার প্রধান অনুচরগণই সাংগঠনিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার নামক দুই ভ্রাতা এবং গণেশ সাভারকর ও বিনায়ক দামোদর সাভারকর নামক অপর দুই ভ্রাতার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিলকের দ্বারা সম্পাদিত দৈনিক 'কেশরী' পত্রিকা, পুনার শিবরাম মহাদেব পরাঞ্জপের দ্বারা সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কাল' ও কৃষ্ণ বর্মার দ্বারা সম্পাদিত এবং লণ্ডন হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলোজিস্ট' উক্ত সংগঠনগুলিকে আদর্শ ও প্রেরণা যোগাইত।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুব-সংগঠন একত্র করিয়া পুনরায় 'হিন্দুধর্মের অন্তরায় বিনাশী সংঘ' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। ইহাই মহারাষ্ট্রে প্রথম সুগঠিত ও কেন্দ্রবদ্ধ সংগঠন। এই সংঘে যুবকদিগকে শারীরিক ব্যায়াম, সামরিক শিক্ষা, লাঠিখেলা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। পুলিসের দৃষ্টি এড়াইবার জন্যই এই সংঘ ধর্মীয় নাম গ্রহণ করিয়াছিল।

বৃটিশ-বিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রস্তুতিই ছিল ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সংঘ ইংরেজদের উপর প্রথম আঘাত আরম্ভ করে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন উক্ত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয় একত্রে পুনার দুই অত্যাচারী ইংরেজ কর্মচারীকে হত্যা করিয়া ভারতের মধ্যশ্রেণীর বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের উদ্বোধন করেন। তাঁহাদের আগ্নেয়াস্ত্র হইতে নিক্ষিপ্ত অগ্নি-গোলকই সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের "অগ্নি-যুগ"-এর আরম্ভ ঘোষণা করে।

শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার প্রয়াস

ভারতবর্ষের বাহিরে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের স্বপক্ষে প্রচার-আন্দোলন চালনার দিক হইতে শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার দান প্রথম স্মরণীয়। কেবল প্রচার-কার্যই নহে, ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া দাক্ষিণাত্যের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামে আদর্শ ও প্রেরণা দান করিয়া তিনি এই সংগ্রামকে শক্তিশালী করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত আদর্শ হইতেও দাক্ষিণাত্যের বিপ্লবীরা যথেষ্ট

সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া হোম-রুল-সোসাইটি' নামে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি নিজে ইহার সভাপতি হন। ভারতীয় যুবকগণ যাহাতে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া ভারতের জনগণের মধ্যে ঐক্য ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিতে সক্ষম হয় তাহার জন্য তিনি ছয়টি বৃত্তি ঘোষণা করেন। এই বৃত্তির পরিমাণ ছিল জনপ্রতি এক হাজার টাকা। কৃষ্ণ বর্মার বৃত্তি লইয়া সেই সময়ে যাঁহারা ইংলণ্ডে গমন করেন, নাসিকের বিনায়ক দামোদর সাভারকর তাঁহাদের অন্যতম।

এই সময় পারী নগরীতে এস. আর. রাণা নামে এক ভারতীয় ভদ্রলোকও কৃষ্ণ বর্মার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া রাণা প্রতাপ, শিবাজী ও একজন মুসলমান-শাসকের নামে তিনটি বৃত্তি দান করেন। প্রত্যেকটি বৃত্তির পরিমাণ ছিল দুই হাজার টাকা।

ইংলণ্ডে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের স্বপক্ষে প্রচার-কার্য চালনার জন্য কৃষ্ণ বর্মা 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলোজিস্ট' নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশিত করেন। তিনি নিজেই ছিলেন ইহার সম্পাদক। এই মাসিক পত্রিকাখানিতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সংগঠন ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কেও আলোচনা করা হইত। এই সকল আলোচনা মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবীদের সংগঠনের আদর্শগত ভিত্তি রচনা করিয়াছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলোজিস্ট' পত্রিকায় ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কর্মপদ্ধতি, উদ্দেশ্য ও সংগঠন সম্পর্কে নিম্নোক্ত মত প্রকাশিত হইয়াছিল:

"সম্ভবত ভারতবর্ষের আন্দোলন গোপনভাবে চালাইতে হইবে, এবং কেবলমাত্র রুশীয় (নিহিলিস্ট) কর্ম-পদ্ধতিতেই ইংরেজ-সরকারকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইবে। যে পর্যন্ত না ইংরেজরা তাহাদের অত্যাচার বন্ধ করিতে বাধ্য হয় এবং এই দেশ হইতে বিতাড়িত হয়, সেই পর্যন্ত এই রুশীয় পদ্ধতি পূর্ণোদ্যমে অব্যাহত-ভাবে চালাইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু কোন একটা বিশেষ কর্ম-পদ্ধতির নিয়ম-কানুন ও ক্রিয়া-কলাপ কি হইবে তাহা (এতদূর হইতে) কেহই নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে পারে না। তাহা সম্ভবত স্থানীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনার উপরেই নির্ভর করিবে। কিন্তু ইহা খুবই সম্ভব যে, সাধারণ নীতি হিসাবে রুশীয় পদ্ধতি অনুসারে য়ুরোপীয় কর্মচারীদের দিয়া কাজ আরম্ভ না করিয়া ভারতীয় কর্ম-চারীদের দিয়াই কাজ আরম্ভ করা উচিত।"[১]

কৃষ্ণ বর্মার এই কর্মনীতি সাভারকর-ভ্রাতৃদ্বয়কে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। তাঁহারা তাঁহাদের সংগঠনের ভিত্তি হিসাবে রুশিয়ার যে সন্ত্রাসবাদী 'নিহিলিস্ট' আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা কৃষ্ণ বর্মার নিকট হইতেই শিক্ষা করেন।

১। Quoted from the Sedition Committee Report, p. 6.

সাভারকর-ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রয়াস

সাভারকর-ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল বোম্বাই প্রদেশের নাসিক শহর। পুণার পরেই নাসিক শহর মহারাষ্ট্রের বিপ্লব-প্রচেষ্টার অন্যতম কেন্দ্র হইয়া উঠে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অগম্যগুরু পরমহংস নামে এক সন্ন্যাসী এক বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই সন্ন্যাসী সারা ভারতবর্ষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নির্ভীকভাবে বৃটিশ-সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য চালাইতেন। তিনি তাঁহার প্রচারে বলিতেন :

বৃটিশ শাসনকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই, ভারতবাসীদিগকে আত্মত্যাগের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের দ্বারা এই সরকারের উচ্ছেদ করিতে হইবে।

সন্ন্যাসী অগম্যগুরুর প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া একদল ছাত্র ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে পুণ্য শহরে একটি সংঘ গঠন করে। বিনায়ক সাভারকর এই সংঘের নায়ক নির্বাচিত হইলে তিনি সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাতের জন্য পুণায় আমন্ত্রিত হন। পুণায় উপস্থিত হইয়া সাভারকর সন্ন্যাসীর এই আন্দোলন সফল করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে নয়জন ছাত্র লইয়া একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। পুণার ফার্গুসন কলেজের নয়জন ছাত্র লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি পুণার সকল অধিবাসীর নিকট হইতে এক আনা করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করে। এই চাঁদা আদায়ের উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ-বিরোধী প্রচার ও সংগ্রামের জন্য তহবিল গঠন। কিন্তু ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে সাভারকর ইংলণ্ডে চলিয়া আসিলে এই সংঘটি উঠিয়া যায় এবং ইহার অধিকাংশ সভ্য 'অভিনব ভারত সংঘ' নামক আর একটি সংগঠনে যোগদান করে। বিনায়ক সাভারকরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশ সাভারকর ছিলেন এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। বিনায়কের ইংলণ্ড-যাত্রার পূর্বেই, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নাসিক শহরে তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশ সাভারকর একত্রে 'মিত্র মেলা' নামে একটি সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। 'গণপতি-উৎসব' উপলক্ষ করিয়া 'মিত্র মেলা' গঠিত হইলেও কেবল মাত্র 'গণপতি-উৎসব' পালন করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল না, বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের আয়োজন করাই ছিল ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। গণেশ সাভারকর এই সংঘের সভ্যদের শারীরিক ব্যায়াম, ছোরা-খেলা, সামরিক কুচকাওয়াজ শিক্ষা দিতেন। এই সংঘটিই অল্প কিছুদিন পরে ইতালীর সন্ত্রাসবাদী সংগ্রামের নায়ক ম্যাৎসিনির 'নব্য ইতালী' নামক সংঘের আদর্শে 'অভিনব নব্য ভারত সংঘ' নামে পুনর্গঠিত হয়। বিনায়ক ইংলণ্ড-যাত্রার পূর্বেই এই নূতন সংঘটি প্রতিষ্ঠা করেন। নাসিক শহরই ছিল এই সংঘের প্রধান কর্মকেন্দ্র।

'অভিনব নব্য ভারত সংঘ'-এর আদর্শগত ভিত্তি ছিল চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয়ের 'হিন্দুধর্মের অন্তরায় বিনাশী সংঘ' হইতে আরও গভীর ও ব্যাপক। 'অভিনব নব্য ভারত সংঘ'-এর প্রত্যেকটি সভ্যকে গণপতি ও শিবাজীর নামে কঠিন শপথ গ্রহণ করিতে হইত। পরবর্তীকালে এই সংঘের বিভিন্ন দলিল-পত্র হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইহার প্রতিষ্ঠাতাগণ (সাভারকর-ভ্রাতৃদ্বয়) রুশিয়ার বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংঘের আদর্শেই ইহাকে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা

ফ্রস্টসাহেবের রচিত '১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত য়ুরোপীয় বিপ্লবের গোপন সংঘ'[১] নামক গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। এই গ্রন্থে সমগ্র রুশিয়াব্যাপী 'নিহিলিস্ট'দের[২] সংগঠন-পদ্ধতির যে বিবরণ দেওয়া আছে তাহা 'অভিনব নব্য ভারত-সংঘ'-এর সংগঠন গড়িয়া তুলিবার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করা হইয়াছিল। 'নিহিলিস্ট'রা এক-একটি ক্ষুদ্র এলাকায় এক-একটি ক্ষুদ্র 'চক্র' বা ক্ষুদ্র দল গঠন করিত, সেই 'চক্র' বা দল একটি বৃহত্তর অঞ্চলের পরিচালক-কমিটির অধীনে পরিচালিত হইত। প্রত্যেক চক্র বা দলের সভ্যগণ পরস্পরকে চিনিত, কিন্তু অপর কোন চক্রের সভ্যদের তাহারা জানিতে পারিত না। 'অভিনব নব্য ভারত-সংঘটি'কেও ঠিক এই সাংগঠনিক পদ্ধতিতে গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। বিনায়ক সাভারকর ইংলণ্ডে চলিয়া গেলে ইহার পরিচালনার ভার পড়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশ সাভারকরের উপর। গণেশের সুযোগ্য পরিচালনায় শীঘ্রই সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ইহার শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করে। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন 'নাসিক-ষড়যন্ত্র মামলা' আরম্ভ হয়, তখন এই সংঘের শাখা-প্রশাখা দাক্ষিণাত্যের বোম্বাই, নাসিক (প্রধান কেন্দ্র), পুণা, ঔরঙ্গাবাদ, হায়দরাবাদ, সাতারা প্রভৃতি স্থানে বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং এই সকল কেন্দ্রের কর্মীরা এই ষড়যন্ত্র-মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।[৩]

বিনায়ক সাভারকর বিদেশ হইতে নির্দেশ ও প্রবন্ধ পাঠাইয়া এই সংঘের আদর্শ ও প্রেরণা যোগাইতেন। এই সংঘের সাংগঠনিক ভিত্তি আরও দৃঢ় এবং ব্যাপকতর করিয়া তুলিবার জন্য তিনি য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের বৈপ্লবিক সংগঠন হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহা ভারতবর্ষে প্রেরণ করিতেন। ইংলণ্ডে থাকা কালেই তিনি ইতালীর বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী নায়ক ম্যাৎসিনির 'আত্মজীবনী' মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করিয়া উহা তাঁহার ভ্রাতা গণেশের নিকট প্রেরণ করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে গণেশ এই গ্রন্থখানি ছাপাইয়া সংঘের সভ্যদের মধ্যে বিতরণ করেন। এই অনুবাদের ভূমিকায় বিনায়ক উক্ত সংঘের আদর্শ ও সংগঠন সম্পর্কে তাঁহার মত ব্যক্ত করেন। তিনি তাঁহার এই ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন যে, রাজনীতিকে একটি ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইহার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। তিনি শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীকে "ভারতবর্ষের ম্যাৎসিনি" আখ্যা দান করেন। তিনি তাঁহার ভূমিকায় আরও লিখিয়াছিলেন যে, ম্যাৎসিনি যেমন ইতালীর স্বাধীনতার জন্য যুব-সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষেও সেইরূপ করিতে হইবে। অতঃপর তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের দ্বিবিধ কার্যসূচী ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য পার্শ্ববর্তী দেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিয়া মজুদ করিতে হইবে এবং যখনই সময় আসিবে তখনই তাহা ব্যবহার করিতে হইবে; ক্ষুদ্র ও গোপন কারখানায় অস্ত্র তৈরির ব্যবস্থা করিতে হইবে, কারখানাগুলি দূরে দূরে স্থাপন করিতে হইবে, ইত্যাদি।

১। L. Frost : 'Secret Societies of Europian Revolution, 1776 to 1876.'

২। রুশিয়ার সন্ত্রাসবাদী দল

৩। Sedition Committee Report, p. 10-11.

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ভারতীয় শহীদ মদনলাল ধিংরার ফাঁসী উপলক্ষে রচিত 'বন্দেমাতরম্' নামক একখানি পুস্তিকায় বিনায়ক দামোদর সাভারকর স্পষ্ট ভাষায় ভারতীয় সন্ত্রাসবাদের কর্মপন্থা এবং বৈপ্লবিক কার্যসূচী ও বিপ্লবের ভবিষ্যৎ-চিত্র ব্যাখ্যা করেন। এই পুস্তিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ

"ইংরেজ ও ভারতীয় সরকারী কর্মচারীদের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি কর, সরকারের উৎপীড়ন-যন্ত্রের ধ্বংস আর বেশি দূরে নয়। ক্ষুদিরাম বসু, কানাইলাল দত্ত ও অন্যান্য শহীদগণ অব্যাহতভাবে যে নীতি কার্যকরী করিয়া আসিয়াছে, সেই নীতি অব্যাহতভাবে কার্যে পরিণত করিতে থাকিলেই অচিরে ভারতের বৃটিশ সরকার পঙ্গু হইয়া পড়িবে। এই বিচ্ছিন্ন হত্যার আন্দোলনই আমলাতন্ত্রকে নির্জীব ও জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুচিন্তিত উপায়। বিপ্লবের প্রথম স্তরের নীতি হইবে বিচ্ছিন্ন হত্যার নীতি।"[১]

'গোয়ালিয়র নব ভারত-সংঘ'

সাভারকর-ভ্রাতৃদ্বয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নাসিকের 'অভিনব ভারত-সংঘ'-এর সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় গোয়ালিয়র দেশীয় রাজ্যে 'গোয়ালিয়র নব ভারত-সংঘ' নামে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। এই প্রতিষ্ঠানটির সংগঠন-পদ্ধতিও কৃষ্ণ বর্মা ও বিনায়ক সাভারকরের আদর্শের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। 'গোয়ালিয়র নব ভারত-সংঘ'-এর নিয়মাবলীর চতুর্থ দফায় ইহার কার্য ও সংগঠন-পদ্ধতি নিম্নোক্ত রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ঃ

"প্রকৃত শিক্ষালাভ ও স্বাধীনতা-আন্দোলন পরিচালনার দুইটি উপায় আছে। শিক্ষার মধ্যে থাকিবে স্বদেশী গ্রহণ, বিদেশী-বর্জন, জাতীয় শিক্ষা, মাদক-দ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জন, বিভিন্ন ধর্মোৎসব, বক্তৃতার ব্যবস্থা, পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি, আর আন্দোলনের মধ্যে থাকিবে আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা লক্ষ্যভেদের অভ্যাস, তরবারি-শিক্ষা, বোমা ও ডিনামাইট তৈরি শিক্ষা, রিভলভার সংগ্রহের ব্যবস্থা, বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করা এবং অপরকে শিক্ষা দেওয়া। যখন কোন প্রদেশে সশস্ত্র অভ্যুত্থান আরম্ভ হইবে তখন সেই অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ ও তাহার মারফত স্বাধীনতা লাভ করাই হইবে সকলের কর্তব্য। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের এই আর্যভূমি ইহার নিজের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।··· আত্মবিশ্বাস দাসত্ব দূর করিবার একটি প্রধান উপায় ; আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, যদি ভারতের ত্রিশ কোটি মানুষ এক হইয়া সংগ্রাম করে তাহা হইলে কেহই তাহাদের লক্ষ্য-সিদ্ধির পথে বাধা দিতে সক্ষম হইবে না। সর্বপ্রথম মানসিক প্রস্তুতির জন্য শিক্ষা দিতে হইবে ; তাহার পর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করিতে হইবে ; ধূর্ততা ও কৌশলের দ্বারাই ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ চালাইতে হইবে।"[২]

১। Quoted from "Sedition Committee Report", p. 11.

২। Quoted from "Sedition Committee Report", p. 12.

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্গদেশে মধ্যশ্রেণীর বৈপ্লবিক ভাবধারার বিকাশ

বাঙলাদেশে সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগঠন ১৯০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও পূর্ব হইতেই বাঙলার শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও বৈপ্লবিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস আরম্ভ হইয়াছিল। সেই সকল প্রয়াস কালের অমোঘ নিয়মে ব্যর্থ হইয়া গেলেও তাহার গভীর প্রভাব শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে চলিয়া আসিয়াছে। ইহা পরবর্তীকালের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত হইয়া বাঙলার বিপ্লববাদের পূর্ণ ইতিহাস গড়িয়া তুলিয়াছে। বাঙলার বিপ্লববাদের ঐতিহাসিক মূল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে নিহিত।

"বিপ্লববাদের ইতিহাসের উৎপত্তির কথা জানিতে হইলে বাঙলার বিগত ৮০ বৎসরের ইতিহাসের চর্চা করিতে হইবে। বাঙলার বিপ্লববাদের ইতিহাস বর্তমান বাঙলার ইতিহাস হইতে বাদ দেওয়া যায় না; কারণ ইহা বিদেশ হইতে আমদানি-করা নহে। ইহা বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ক্রমবিকাশের একটি স্তর মাত্র। রামগোপাল ঘোষের সময় হইতে 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর (নব্য বঙ্গের) অভ্যুদয়। তৎপরে ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব ও বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের চিন্তার উপর তাহার প্রভাব; রাজনারায়ণ বসুর বৈপ্লবিক মত ও নবগোপাল মিত্রের জাতীয় বা হিন্দু-মহামেলা, 'ন্যাশনাল পেপার'-এর সংস্থাপনা; 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের স্বদেশপ্রেম মূলক নাটকসমূহের অভিনয়; তৎপরে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানকারীদের অভ্যুদয়; বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির বৈপ্লবিক চেষ্টা ও তদনুসারে হুগলীর চারিদিকে লাঠিখেলার আখড়া স্থাপনা; শিবনাথ শাস্ত্রীর দেশ-সেবার উদ্যম, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর বৈপ্লবিক চেষ্টা ও 'স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন' স্থাপনা এবং শেষে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ও কংগ্রেসের কার্য; শিশিরকুমার ঘোষের বৈপ্লবিক জল্পনা-কল্পনা, তৎপরে স্বামী বিবেকানন্দের আক্রমণশীল হিন্দুধর্মের মতবাদ এবং শেষে বিপ্লববাদীদের দলস্থাপনা ও কর্ম—এইগুলি বাঙলার জাতীর জীবনের ক্রমবিকাশের পর পর স্তর, একটাকে বাদ দিয়া অন্যটাকে ধরা যায় না।"[১]

১. রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজের চিন্তা

বাঙলার মধ্যশ্রেণীর বৈপ্লবিক ভাবধারার মূল উৎস দুইটি: ভারতের পরাধীন অবস্থা ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাব। পরাধীন অবস্থার পটভূমিকায় ভারতীয় শিক্ষা ও উন্নত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংঘর্ষ হইতে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সমাজে একটা নূতন চিন্তাধারা দেখা দেয়। এই চিন্তাধারার প্রথম বাহন ছিলেন রামমোহন রায়। তিনিই প্রথম য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া মানব-ইতিহাসের যুগান্তকারী

১। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম', পৃঃ ৩।

'ফরাসী-বিপ্লব'-এর ভাবধারায় দীক্ষিত হন। কিন্তু তিনি তাঁহার বৈপ্লবিক চিন্তাধারা প্রয়োগের জন্য রাজনীতি অপেক্ষা দেশের সমাজকেই বিশেষ ক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লন। তিনি প্রধানত সমাজ-সংস্কারক বলিয়া পরিচিত হইলেও রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তাঁহার প্রচেষ্টার সাক্ষ্য মিলে। পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত তাঁহার কয়েকখানি পার্শী ভাষায় লিখিত পত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে, রামমোহন তাঁহার সময় দিল্লীর নামমাত্র বাদশাহকে কেন্দ্র করিয়া বিদেশী ইংরেজ-শাসনের উচ্ছেদের জন্য একটি সর্ব-ভারতীয় বৈপ্লবিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।[১] তিনি 'ফরাসী-বিপ্লব'-এর প্রতীক ফরাসীদেশের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকার প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাইতেন এবং কলিকাতায় 'ফরাসী-বিপ্লব'-এর অন্যতম প্রধান ঘটনা বাস্তিল-দুর্গের পতন-উৎসবের প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

রামমোহনের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা সমগ্রভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা না হইলেও তাঁহার চিন্তাধারা সামাজিক ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক আলোড়ন আনিয়া দিয়াছিল তাহা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তাহাদিগকে সামাজিক ও রাজনীতিক বিপ্লবের দিকে টানিয়া আনে। রামমোহনের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা তৎকালীন ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া বাঙলার সমাজে এক নূতন বৈপ্লবিক ভাবধারায় প্রবর্তন করে। এই জন্যই গোড়ার দিকে বিপ্লবীরা প্রায় সকলেই ছিলেন ব্রাহ্ম-সমাজের অন্তর্ভুক্ত। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন :

"আজ ইহা শুনিলে অনেকে আশ্চর্যান্বিত হইবেন যে, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সমিতির প্রথম সভ্যদের অনেকের উপর বিশেষভাবে ছিল। তৎকালে একবার আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, বাছা বাছা বৈপ্লবিক কর্মীদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত বা ব্রাহ্ম-সমাজের ছায়াশ্রিত ছিলেন এবং বর্তমান ভারতের রাজনীতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করিলে ইহা দেখা যায় যে, যে-প্রদেশে ব্রাহ্ম-সমাজ, প্রার্থনাসমাজ বা আর্য-সমাজ···একটা নূতন চিন্তাস্রোত আনিয়াছে, সেই সব জায়গায় আজ জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতা-স্পৃহা বিশেষ প্রবলভাব ধারণ করিয়াছে।"[২]

২. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তা

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈপ্লবিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া একটি বৈপ্লবিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি 'সঞ্জীবনী সভা' নামে একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। এই গুপ্ত সমিতির সভাপতি ছিলেন পরবর্তীকালের "ফাঁসীর সত্যেন"-এর খুল্লতাত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়। 'হিন্দু মেলা'র উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ছিলেন সেই গুপ্ত সমিতির

১। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।
২। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম", পৃঃ ৭।

সত্য। রবীন্দ্রনাথের 'আত্মপরিচয়' নামক পুস্তিকায় এই গুপ্ত সমিতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত চিত্রটি পাওয়া যায় :

"জ্যোতি দাদা এক পোড়ো বাড়ীতে এক গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন। একটা পোড়ো বাড়ীতে তার অধিবেশন, ঋগ্‌বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত। সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম।"[১]

৩. 'হিন্দুমেলা'

রাজনারায়ণ বসু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সঞ্জীবনী সভা'র সভাপতি থাকিলেও তিনি নিজেও একটি গুপ্তসমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সমিতি 'সঞ্জীবনী সভা'র সহিত মিলিতভাবেই পরিচালিত হইত। নবগোপাল মিত্র, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ বসুমহাশয়ের দলের সদস্য হইয়াছিলেন।

নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির উদ্যোগে 'হিন্দু মেলা' নামে একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। নবগোপাল মিত্র ছিলেন 'হিন্দু মেলা'র প্রধান উদ্যোক্তা। শিক্ষিত হিন্দু-যুবকদের মনে বৈপ্লবিক ভাবধারা জাগাইয়া তোলাই ছিল ইহার মূল উদ্দেশ্য। 'হিন্দু মেলা'র অপর নাম ছিল 'চৈত্র মেলা'। এই মেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছিলেন :

"আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম-কর্মের জন্য নহে, কোন বিষয়-সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের জন্যও নহে, ইহা স্বদেশের জন্য,—ইহা ভারত-ভূমির জন্য।"

৪. শিবনাথ শাস্ত্রীর চিন্তা

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি ব্রাহ্ম-সমাজের তরুণ কর্মীদের লইয়া শিবনাথ শাস্ত্রী একটি বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির সভ্যপদে দীক্ষা গ্রহণের সময় একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া তাহা যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হইত। প্রতিজ্ঞা-পত্রে লিখিত থাকিত :

"স্বায়ত্তশাসনই আমরা বিধাতৃনির্দিষ্ট শাসন বলিয়া গ্রহণ করি। তবে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্তমানে সরকারের নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিব, কিন্তু দুঃখ-দারিদ্র-দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনই এই সরকারের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না।"

তৎকালের হিন্দু-মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদের সরকারী চাকরিলাভই ছিল জীবনের প্রধান লক্ষ্য। এই প্রলোভন হইতে যুবকদের নিবৃত্ত করিয়া তাহাদের মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব জাগাইয়া তাহাদের দেশ-সেবায় নিযুক্ত করাই ছিল শিবনাথ শাস্ত্রীর দলের উদ্দেশ্য। এই দলের কার্যসূচীতে নারীর মুক্তি, উন্নত ও

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : "আত্মপরিচয়", পৃঃ ৮।

জাতীয়তামূলক শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতির সহিত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা (স্বায়ত্ত-শাসন) লাভের এক পরিকল্পনা স্থান পায়। এই দলের আদর্শ ছিল:

"অন্যায়ের উপর ন্যায়ের, অসাম্যের উপর সাম্যের, রাজ-শক্তির উপর প্রজা-শক্তির প্রতিষ্ঠা দ্বারা পৃথিবীব্যাপী এক মহাসাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।[১]

আনন্দমোহন বসু, মনোমোহন ঘোষ ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই দলে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রথমে আনন্দমোহন বিশ্বাস করিতেন যে, বিপ্লব দ্বারাই ভারতের-স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। পরে তাঁহার এই ধারণা বদলাইয়া যায় এবং নূতন ধারণা জন্মে যে, ভারতের পক্ষে সমাজ-সংস্কারই সর্বোত্তম পন্থা।

৫. সুরেন্দ্রনাথের চিন্তা ও প্রচেষ্টা

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু একসঙ্গেই ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া স্বাধীনতা-আন্দোলন সৃষ্টির প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন এবং তাঁহারা উভয়েই শিবনাথ শাস্ত্রীর বৈপ্লবিক দলে যোগদান করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর সহযোগিতায় সুরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম একটি 'ছাত্র-সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাত্র-সমিতির সভাতেই তিনি ভারতবর্ষে প্রথম ইতালীর বিপ্লববাদী নায়ক ম্যাৎসিনিকে পরিচিত করাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি এই সমিতির অধিবেশনে 'ম্যাৎসিনি ও নব্য ইতালী', 'শিখ-শক্তির অভ্যুদয়', 'চৈতন্য ও সমাজ-বিপ্লব' প্রভৃতি বিষয়ের উপর যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহা শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের উপর বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। এই সকল বক্তৃতার জন্য কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি নরমপন্থী নেতারা তাঁহাকে "ম্যাৎসিনির মাথা-গরম শিষ্য" বলিয়া গালি দিতেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে যখন বাঙলাদেশে 'অনুশীলন সমিতি' নামে প্রথম গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও সুরেন্দ্রনাথ সেই উদ্যোগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। অনুশীলন সমিতির বিখ্যাত সভাপতি, ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় (পি. মিত্র) ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পরবর্তীকালে যখন বাঙলায় বৈপ্লবিক সংগ্রাম পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে, তখন আর তিনি সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী না থাকিলেও গুপ্ত সমিতিকে অর্থসাহায্য করিতেন এবং তাহার সংবাদ রাখিতেন।

৬. বঙ্কিম-হেম-ভূদেব-বিদ্যাভূষণের চিন্তা

"বঙ্কিমবাবু (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) যখন হুগলীতে কাজকর্মে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় ভূদেববাবু (ভূদেব মুখোপাধ্যায়) তথায় চাকরি করিতেন। তাঁহারা দেশকে জাগাইবার জন্য নানা পরামর্শ করিতেন।"[২] তাঁহাদের মনে বিপ্লবের কোন স্পষ্ট ধারণা না থাকিলেও তাঁহারা দেশকে জাগাইয়া তুলিবার উপায় হিসাবে বিপ্লবের পথকেই একমাত্র পথ বলিয়া মনে করিতেন এবং বৈপ্লবিক প্রেরণা-উদ্দীপক সাহিত্য সৃষ্টির উপর জোর দিতেন। তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া এই কার্যে আত্মনিয়োগ

১। যোগেশচন্দ্র বাগল: "মুক্তির সন্ধানে ভারত", পৃঃ ২৪।

২। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম', পৃঃ ৭৮।

করেন। তাঁহাদের সেই প্রচেষ্টার ফলে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়, তাহাই বাঙলার (মধ্যশ্রেণীর) 'বিপ্লববাদ'-এর আদর্শগত ভিত্তি রচনা করিয়াছিল। এই উদ্দেশ্য লইয়াই সৃষ্টি হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী', হেমচন্দ্রের 'ভারত-সঙ্গীত', ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস', যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের গ্রন্থাবলী, সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' প্রভৃতি নূতন ধরনের সাহিত্য। এই দলভুক্ত ভূদেববাবুর ভাগিনেয় চন্দননগর-নিবাসী তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের পরামর্শেই ভারতের সংবাদসমূহ চন্দননগরের ফরাসী কাগজে প্রকাশ করিতেন।"

এই মনীষিগণ কেবল বৈপ্লবিক সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা তাঁহাদের বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে কালোপযোগী সংগঠনে রূপদান করিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়কে চন্দননগরে ও হুগলীর আশে-পাশে শরীর-চর্চার জন্য আখড়া স্থাপন করিবার নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ অনুসারে তিনকড়িবাবু ঐ সকল অঞ্চলে কয়েকটি আখড়া স্থাপন করেন। সেই সকল আখড়ায় শরীর-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত "বৈপ্লবিক" সাহিত্য পাঠ ও আলোচনা চলিত। বর্তমান কালে ইহা হাস্যকর বলিয়া মনে হইলেও সেই সময় শরীর-চর্চার আখড়া স্থাপনের একটা বৈপ্লবিক তাৎপর্য ছিল, তৎকালে কেবল ইহার জন্যই অনেকে সরকারের রোষ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন। এই সকল আখড়া স্থাপন ও ফরাসী কাগজে ভারতীয় সংবাদ প্রকাশ করিবার জন্য তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় ইংরেজ-সরকারের কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়া সাত বৎসর পণ্ডিচেরীতে পলাইয়া থাকিতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে স্থায়িভাবে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অতি বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার পুত্রসহ সেই গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন।[১]

৭. স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ও প্রচেষ্টা

স্বামী বিবেকানন্দ কেবল সমাজ-সংস্কার ও শক্তির বাণী প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি যে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাও আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। একথা তিনি অনেক পূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, রাজনীতিক স্বাধীনতা ব্যতীত সমাজ-সংস্কার, জনগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রভৃতি কিছুই সম্ভব নহে।[২] সম্ভবত ইহা উপলব্ধি করিয়াই তিনি বিপ্লবের উদ্দেশ্যে দলগঠন ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার মার্কিন-শিষ্যা ভগ্নী গ্রিনস্টিডল্-এর (Miss Grinstidle) নিকট তাঁহার বৈপ্লবিক পরিকল্পনা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন :

"......বিপ্লবোদ্দেশ্যে আমি সমগ্র ভারত ঘুরিয়াছি। আমি কামান প্রস্তুত করিব। আমি স্যার হিরাম ম্যাক্সিম্-এর (Sir Hiram Maxim)[৩] সহিত বন্ধুত্ব

১। 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম', পৃঃ ৮৭

২। Vivakananda : 'From Colombo to Almora.'

৩। "ম্যাকসিম" নামক বিখ্যাত কামানের উদ্ভাবক। তাঁহার নিজের নামানুসারেই তাঁহার উদ্ভাবিত কামানের নাম 'ম্যাকসিম' কামান রাখা হয়।

করিয়াছি—কিন্তু ভারত গলিত হইয়াছে (India is in Putrefication)। এই জন্যই আমি একদল কর্মী চাই, যাঁহারা ব্রহ্মচারী হইয়া দেশের লোককে শিক্ষা দান করিয়া এই দেশকে পুনঃসঞ্জীবিত করিতে পারিবেন।"

স্বামীজী সখারাম গণেশ দেউস্করের নিকটেও "ঠিক এই কথা বলিয়াছিলেন যে, তিনি (স্বামীজী) দেখিয়া যাইবেন, ভারত একটি বারুদের স্তূপ হইয়া আছে। তিনি তাঁহার জীবদ্দশাতেই বিপ্লব দেখিয়া যাইবেন বলিয়া আশা রাখিতেন। এই ভারত আর ভুল করিয়া বিদেশীদের ডাকিয়া আনিবে না বলিয়া তিনি দেউস্করকে প্রত্যুত্তর দেন।"[১]

৮. ভগ্নী নিবেদিতা ও ওকাকুরার প্রচেষ্টা

বাঙলার বিপ্লব-প্রচেষ্টার মূলে ভগ্নী নিবেদিতা ও ওকাকুরা নামক দুই জন বিদেশীর দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভগ্নী নিবেদিতার পূর্ব-নাম ছিল 'মিস মার্গারেট নোবল'। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী আইরিশ। তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতেই জাতীয়তাবাদে দীক্ষালাভ করেন, এবং সেইজন্যই তিনি ভারতের জাতীয়তাবাদকে অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। বাঙলার প্রথম যুগের বিপ্লববাদের মূলে এই মহীয়সী নারীর দান অসামান্য। ওকাকুরা ছিলেন জাপানের চিত্রকলার একজন অধ্যাপক। ইনিও বাঙলার সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় যথেষ্ট প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মার্কিন-শিষ্যা ম্যাকলিয়ড তাঁহাকে জাপান হইতে ভারতে আনয়ন করেন।

ভগ্নী নিবেদিতা ভারতবর্ষে আসিবার কিছুদিন পরেই বাঙলার সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সহিত নিজেকে জড়িত করিয়াছিলেন। ১৯০০-০১ খ্রীষ্টাব্দে যখন বাঙলায় বৈপ্লবিক কর্ম পরিচালনার জন্য একটি জাতীয় পরিষদ (National Council) গঠিত হয়, তখন পরিষদের পাঁচজন-নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ভগ্নী নিবেদিতা ছিলেন অন্যতম।[২] স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বেলুড়ের 'রামকৃষ্ণ মিশনে' থাকিয়াই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ও 'রামকৃষ্ণ মিশনের' পক্ষ হইয়া প্রচার-কার্য একসঙ্গে চালাইতেন। স্বামীজীর মৃত্যুর পর তিনি মিশনের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বক্তৃতাদ্বারা ভারতীয় যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা জাগাইয়া তুলিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তিনি স্বামীজীর মার্কিন-শিষ্যাদের মারফত রুশিয়ার 'এনার্কিস্ট' বিপ্লববাদী নেতা পিটার ক্রোপোট্‌কিন-এর সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার মতবাদে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন। এই জন্য তাঁহার বক্তৃতায় ক্রোপোট্‌কিনের 'এনার্কিজম্'-এর প্রভাব ফুটিয়া উঠিত। শুনা যায়, কলিকাতার টাউন হলে ভগ্নী নিবেদিতার 'ডিনামিক্ রিলিজিয়ন' শীর্ষক একটি বক্তৃতা শুনিয়া চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল নাকি এই বক্তৃতাটিকে "ডিনামাইট" আখ্যা দান করিয়াছিলেন।

১। স্বামী বিবেকানন্দের এই উভয় উক্তিই ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-রচিত 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম' নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ৯১।

২। মাদাম হার্বাট নামক জনৈক ফরাসী মহিলা ভগ্নী নিবেদিতার জীবনী রচনা করিবার উদ্দেশ্যে পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলে অরবিন্দ তাঁহাকে এই ঘটনাটি বলেন।

ভগ্নী নিবেদিতা বক্তৃতা উপলক্ষে বরোদা গমন করিয়া অরবিন্দের সহিত পরিচিত হন এবং অরবিন্দ ঘোষকে কলিকাতার গুপ্ত সমিতির সংবাদজ্ঞাপন করেন। নিবেদিতার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াই অরবিন্দ কলিকাতায় আসিয়া গুপ্ত-সমিতিটিকে দৃঢ়ভাবে গড়িয়া তুলিবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বৈপ্লবিক প্রচার-কার্যের জন্য ভগ্নী নিবেদিতা কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে ছয় খণ্ডে সমাপ্ত 'ম্যাৎসিনির আত্মজীবনী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ও বাঙলার প্রথম যুগের বিপ্লব-প্রচেষ্টার উদ্যোক্তাদের অন্যতম ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ভগ্নী নিবেদিতার প্রচার-কার্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

'ম্যাৎসিনির আত্মজীবনী'র ছয়খণ্ডের "প্রথম খণ্ডটি তিনি বৈপ্লবিক সমিতিকে প্রদান করেন। ইহা সমগ্র বাঙলায় ঘুরিত এবং পঠিত হইত। এই পুস্তকের শেষে 'গেরিলাযুদ্ধ' কি প্রকারে করিতে হয় তৎবিষয়ে একটি অধ্যায় আছে। ইহা টাইপ করিয়া চারিদিকে প্রেরিত হইত; উদ্দেশ্য 'গেরিলাযুদ্ধ'-প্রণালী শিক্ষা করা। এই যুদ্ধ-পদ্ধতিই আমাদের লক্ষ্য ছিল।"[১]

জাপানী অধ্যাপক ওকাকুরা ভারতে আসিয়া বেলুড়মঠে থাকিয়া 'আইডিয়াল অফ দি ইস্ট' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পদানত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্তির কথা লিখিত হইয়াছিল। ভগ্নী নিবেদিতা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া প্রকাশিত করেন। ওকাকুরা অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনী প্রচারের দ্বারা বাঙলাদেশের যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা জাগাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতে স্বাধীনতার বাণী প্রচারের জন্য কলিকাতার কতিপয় বিখ্যাত ব্যক্তি একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির মধ্যে ছিলেন 'রাজা' সুবোধ মল্লিকের খুল্লতাত হেমচন্দ্র মল্লিক, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগ্নী নিবেদিতা এবং আরও অনেকে।

৯. প্রমথনাথ মিত্রের প্রথম প্রচেষ্টা

ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি. মিত্র নামে খ্যাত) ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইনি পর পর চারিবার গুপ্ত সমিতি স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এই কার্যে তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, মিত্র মহাশয়ের এই সকল প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। কিন্তু বারংবার ব্যর্থতা সত্ত্বেও তিনি বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করেন নাই। একবার বরিশালে এক মানহানির মামলায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ জেলে আটক হইলে পি. মিত্র ও তাঁহার সহকর্মীরা পরামর্শ করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে জেল ভাঙ্গিয়া উদ্ধার করিবার জন্য এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে লোক সংগ্রহের জন্য তিনি বরিশাল গমন করেন। পরে তিনি এই ঘটনা

১। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম', পৃঃ ৯৬।

বিবৃত করিয়া বলেন যে, এই জন্য বরিশালে লোকও প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কলিকাতার নেতৃবৃন্দ সম্মতি না দেওয়ায় পরিকল্পনাটি কার্যকরী হয় নাই। পরে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন :

"তাঁহার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা পূর্বে বহুবারই বিনষ্ট হইয়াছে। এইবার (১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে) তাহা স্থায়ী ও ফলবতী হইল। যখন তাঁহার সমসাময়িকেরা সকলে কংগ্রেসে গিয়া গলাবাজি করিতে লাগিলেন, তখন একমাত্র তিনিই এ বঙ্গে 'শ্মশান জাগাইয়া' রাখিয়াছিলেন।"[১] কিছুদিন পরেই বাঙলার শূন্য শ্মশানে আবার প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়, বাঙলাব্যাপী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠে।

মিত্র মহাশয়ের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ক্ষান্ত না হইয়া পূর্ণোদ্যমেই চলিতে থাকে। ১৯০১-০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অরবিন্দ ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাস, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র মল্লিক, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতির সহযোগে বাঙলাদেশে প্রথম স্থায়ী বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতি সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে 'অনুশীলন সমিতি' নামে বিখ্যাত। মিত্র মহাশয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁহাকেই এই বৈপ্লবিক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। যে সভায় এই বৈপ্লবিক সমিতি গঠিত হয় সেই সভার অধিবেশন শেষ হইবামাত্র তিনি নাকি আনন্দে আত্মহারা হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "এইবার আমার সারা জীবনের উদ্যম সফল ও স্থায়ী হইল।" মিত্র মহাশয়ের এই আশা ও ভবিষ্যৎ-বাণী ব্যর্থ হয় নাই।

* * * *

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোক বঙ্গদেশে মধ্যশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার কার্যে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি. মিত্র) সর্বাগ্রগণ্য এবং একটি স্মরণীয় নাম। অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন বাঙলার মধ্যশ্রেণীর বিপ্লববাদের আচার্য, আর সেই বিপ্লববাদের সাংগঠনিক আয়োজনের ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, প্রমথনাথ মিত্র, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সরলা দেবী চৌধুরাণী। বিখ্যাত 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'-এর প্রতিষ্ঠা ব্যারিস্টার পি. মিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'র বিখ্যাত নায়ক পুলীন দাস পি. মিত্রের দ্বারাই বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পি. মিত্রই বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন' প্রবন্ধ হইতে 'অনুশীলন সমিতি' নামকরণ করিয়াছিলেন।

প্রমথনাথ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগনা জেলার নৈহাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে ব্যারিস্টারী পড়িবার সময়ই তিনি আয়ার্লণ্ড ও রুশিয়ার বিপ্লবীদের কথা শুনিয়া বিপ্লববাদের দিকে আকৃষ্ট হন এবং দেশে ফিরিয়া আয়ার্লণ্ড ও রুশিয়ার বিপ্লবীদের অনুরূপ সংগঠন স্থাপনের সংকল্প গ্রহণ করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি আরম্ভ করেন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে রিপন কলেজের অধ্যাপকের পদও গ্রহণ করেন।

১। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম', পৃঃ ২২

অরবিন্দ ও বারীন্দ্রনাথ মহারাষ্ট্র হইতে বঙ্গদেশে আসিবার পূর্বেই (১৯০০-০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) প্রমথনাথ কলিকাতায় 'অনুশীলন সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমদিকে সভ্যদের শরীর গঠনের মধ্যেই সমিতির কার্য সীমাবদ্ধ ছিল। পরে কলিকাতার সমিতির কার্যভার তাঁহার সহকর্মী সতীশচন্দ্র বসুর উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি সমিতির শাখা বিস্তারের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। অরবিন্দের আদেশে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলাদেশে আসিয়া প্রথমে প্রমথনাথ মিত্র ও সরলা দেবী চৌধুরাণীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। 'বঙ্গভঙ্গ' উপলক্ষে যে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় প্রমথনাথও তাহাতে প্রকাশ্যে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রমথনাথ বিপিন পালের সহিত ঢাকায় যাইয়া 'অনুশীলন সমিতি'র একটি শাখা স্থাপন করেন এবং পুলীনবিহারী দাসের উপর 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'র পরিচালনা-ভার ন্যস্ত করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। প্রথমদিকে তিনি ও তাঁহার সংগঠন বারীন্দ্র প্রভৃতির সহিত একযোগে কার্য করিতেন। কিন্তু পরে তাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯১১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

বঙ্গদেশে গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা

গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা

পূর্ব-অধ্যায়ে বর্ণিত দলগুলির পিছনে একটা বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য থাকিলেও এই দলগুলিকে প্রকৃত বৈপ্লবিক সমিতি বলা চলে না। প্রথমত, উহাদের পিছনের বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য ছিল খুবই অস্পষ্ট; দ্বিতীয়ত, উহাদের কোন কর্মপন্থা ছিল না; তৃতীয়ত, এই দলগুলি এতই গোপন ও সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যে, সামাজিক জীবনের সহিত উহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না বলিলেই চলে। এই দলগুলি ছিল তৎকালীন সমাজের কতিপয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তৎকালের সামাজিক ও রাজনীতিক অবস্থায় ইহার বেশী কিছু তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। কিন্তু এই দলগঠন-প্রচেষ্টার প্রভাব যে পরবর্তী কালের শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়কে বৈপ্লবিক প্রেরণা যোগাইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ঐতিহ্য লইয়াই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৯০১-০২ খ্রীষ্টাব্দে) বাঙলাদেশে নূতন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা দেখা দেয় এবং তাহার পরিণতি স্বরূপ বাঙলাদেশব্যাপী গুপ্ত সমিতি স্থায়িভাবে গড়িয়া উঠে।

বাঙলাদেশে সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক আদর্শের বীজ বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নূতন করিয়া আমদানি হয় মহারাষ্ট্র হইতে, আর অরবিন্দ ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেই বীজের প্রধান বাহক। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ ছিলেন বরোদা রাজ্যের

রাজ-কলেজের সহকারী সভাপতি, আর যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বরোদার মহারাজের দেহরক্ষী। তৎকালে অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার অরবিন্দের সঙ্গেই থাকিতেন, তিনি সেই সময় দাদার সাহায্যে ইতিহাস ও রাজনীতিক সাহিত্য অধ্যয়নে নিমগ্ন ছিলেন।

ইহার পূর্বেই যতীন্দ্রনাথ মহারাষ্ট্র-নেতা তিলকের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং অরবিন্দও তিলকের শিষ্য, পুনার বিপ্লবীনেতা ঠাকুরসাহেবের নিকট হইতে বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামে দীক্ষা লাভ করেন। তিনি একদিকে ছিলেন উক্ত ঠাকুরসাহেবের গুপ্ত সমিতির সভ্য এবং অপর দিকে ছিলেন 'গণতন্ত্রী ভারত' নামক এক বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের গুজরাট-শাখার সভাপতি।

বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত অরবিন্দ ও যতীন্দ্রনাথ বাঙলাদেশের যুব-সম্প্রদায়কেও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া বাঙলাদেশের এই নূতন স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠেন। বহু আলোচনার পর তাঁহারা স্থির করেন, প্রথমে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যাপাধ্যায় মহারাজের দেহরক্ষীর চাকরি ছাড়িয়া বাঙলাদেশে গিয়া বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি গঠনের কাজ আরম্ভ করিবেন এবং শীঘ্রই অরবিন্দও বাঙলায় গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে যতীন্দ্রনাথ চাকরি ত্যাগ করিয়া এবং অরবিন্দের নিকট হইতে একখানি পরিচয়-পত্র সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন।

বাঙলাদেশেও একদল নেতা কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের আপস-নীতিতে বিরক্ত হইয়া এবং মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ইতিমধ্যেই বিপ্লবের পথ অবলম্বন করিবার জন্য আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র, চিত্তরঞ্জন দাস, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই প্রকার একটি আলোচনা-সভায় সর্ব-সম্মতিক্রমে পি. মিত্রের উপর একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার ভার অর্পণ করা হয়। এই সময় যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বরোদা হইতে কলিকাতায় আসিয়া পি. মিত্রের সহিত যোগদান করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে পি. মিত্র ও যতীন্দ্রনাথের যুক্ত প্রচেষ্টায় বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতির প্রথম সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই বাঙলাদেশে বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রথম স্থায়ী সংগঠন। সর্ব-সম্মতিক্রমে পি. মিত্রই হন এই সংগঠনের সভাপতি। অরবিন্দ ঘোষ ও চিত্তরঞ্জন দাস হন ইহার দুইজন সহকারী সভাপতি। এই সংগঠনের অধীনে সভ্যদের শারীরিক ব্যায়াম, লাঠি-খেলা, ছোরা ও তরবারি-খেলা, ঘোড়ায় চড়া ও সামরিক শিক্ষার জন্য একটি ক্লাব (আখড়া) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যতীন্দ্রনাথের উপর ইহার পরিচালনার ভার পড়ে।

পি. মিত্রের সহকর্মীদের ও বাঙলার বৈপ্লবিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় পি. মিত্র সম্পর্কে লিখিয়াছেন:

"মিত্রমহাশয় ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল্যবন্ধু। তিনি ইংরেজীতে উত্তমরূপে লিখিতে ও বলিতে পারিতেন, তত্রাচ কংগ্রেসে গিয়া গলাবাজি করিয়া নামার্জন

করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার কখনও ছিল না। কংগ্রেসে চেঁচাইয়া দেশ-বিখ্যাত 'নেতা' হইবার সুবিধা তাঁহার বিশেষই ছিল, কিন্তু তিনি বক্তৃতা দেওয়া বিশেষভাবে ঘৃণা করিতেন এবং কখনও আবেদন-নিবেদনকারীদের (কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের) রাজনীতির সহিত মিশেন নাই। তিনি প্রথম অবস্থায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও অন্যান্যের সহিত বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন।"[১]

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলাদেশে পৌঁছিবার ছয়মাস পরেই অরবিন্দ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারকেও বাঙলায় পাঠাইয়া দেন। বারীন্দ্র কলিকাতায় পৌঁছিয়া সদ্য-প্রতিষ্ঠিত সমিতির অন্যতম কর্ণধাররূপে ইহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন জেলায় ঘুরিয়া বেড়ান, কিন্তু সর্বত্র যুব-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে আশানুরূপ সাড়া না পাইয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। তিনি যে রঙিন স্বপ্ন লইয়া বাঙলায় আসিয়াছিলেন শীঘ্রই সেই স্বপ্ন মিলাইয়া যায়, তিনি হতাশ হইয়া ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বরোদায় ফিরিয়া যান। তথায় তিনি একবৎসর থাকিয়া ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে আবার বাঙলায় ফিরিয়া আসেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁহার এই সময়ের প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন:

"বরোদায় একবৎসর থাকিবার পর আমি বাঙলাদেশে উপস্থিত হই। রাজনীতিক প্রচারকরূপে বাঙলাদেশে স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আমি জেলায় জেলায় ঘুরিয়া বহু শরীর-চর্চার আখড়া স্থাপন করি। সেই সকল আখড়ার শরীর-চর্চা ও রাজনীতি অধ্যয়নের জন্য যুবকদের ভর্তি করা হইত। আমি প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া স্বাধীনতার বাণী প্রচার করি। কিন্তু ক্রমশ এই কার্যে অবসাদ দেখা দেয় এবং আমি বরোদায় ফিরিয়া যাইয়া এক বৎসর ধরিয়া নানা বিষয় অধ্যয়ন করি। তাহার পর (১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে) আমি আবার বাঙলাদেশে এই ধারণা লইয়া ফিরিয়া আসি যে, এই দেশে কেবলমাত্র রাজনীতিক প্রচারের দ্বারা কোন কাজ হইবে না, জনসাধারণকে এমনভাবে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে তাহারা নির্ভয়ে বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে।"[২]

ইতিমধ্যে অরবিন্দও বরোদা রাজ-কলেজের চাকরি ত্যাগ করিয়া বাঙলায় আগমন করেন এবং কলিকাতার প্রতিষ্ঠানটিকে আদর্শ ও সংগঠনের দিক হইতে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সভাপতি পি. মিত্র উহার নাম দেন 'অনুশীলন-সমিতি'। বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধ হইতেই নাকি এই নামটি গ্রহণ করা হয়। 'অনুশীলন' শব্দের অর্থ—চর্চা। চর্চাদ্বারা উন্নতিলাভ ও অভিষ্ট সিদ্ধ করিতে হইবে—ইহাই ছিল এই নাম গ্রহণের গূঢ়

১। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃঃ ২১-২২।
২। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিচারাধীন অবস্থায় জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তি।

তাৎপর্য।[১] পি. মিত্র মহাশয় এইভাবে বাঙলায় সর্বপ্রথম বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল, এই সংগঠনের মধ্য দিয়া এমন একটি তরুণ সৈনিকদল সৃষ্টি করা যাহারা দৈহিক ও আত্মশক্তিতে উন্নত হইয়া বিদেশীদের কবল হইতে দেশমাতৃকার মুক্তিসাধনে সক্ষম হইবে।

সমিতির সভ্যদের দেহ-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তাহাদের লইয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকদল গঠনের পরিকল্পনাও সমিতির কর্মপন্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই উদ্দেশ্যে সামরিক শিক্ষালাভের জন্য যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরোদা রাজ্যে প্রেরণ করা হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাঙলাদেশে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে নেতৃবৃন্দের সহিত মতান্তর হওয়ায় তিনি সমিতির সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'নিরালম্ব স্বামী' নাম গ্রহণ করেন।

অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সকল শাখার সভ্য-সংখ্যা প্রতিদিন বাড়িয়া চলে এবং বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত বহু আখড়ায় সমিতির সভ্যেরা নিয়মিতভাবে শরীর-চর্চা, লাঠি, ছোরা ও তরবারি খেলা শিক্ষা করিতে থাকে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম-পদ্ধতি লইয়া সমিতির মধ্যে মতভেদ ক্রমশ তীব্র আকারে দেখা দেয়। বৈপ্লবিক সমিতির পরিচালকরূপে পি. মিত্র মহাশয়ের দক্ষতায় কাহারও সন্দেহ ছিল না। তিনি ছিলেন তৎকালের বিপ্লবী কর্মীদের বরেণ্য। কিন্তু তিনি ছিলেন কিছুটা "সেকলে" ভাবাপন্ন। দৃঢ় নিয়ম-শৃঙ্খলাযুক্ত একটি গুপ্ত সমিতি, সুগঠিত শরীরসম্পন্ন এমন একদল নিষ্ঠাবান তরুণ কর্মীদল যাহারা নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও আদর্শ মনের অন্তঃস্থলে সংগোপন রাখিয়া মুখ বুজিয়া নেতার হুকুম শিরোধার্য করিবে এবং নেতার অঙ্গুলি হেলনে হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিতেও ইতস্তত করিবে না—এই চিন্তাধারার গণ্ডির বাহিরে তিনি আর কিছু ভাবিতেই পারিতেন না। আখড়ার শরীর-চর্চা ও লাঠি-ছুরি তরবারি খেলা—ইহাই ছিল মিত্র মহাশয়ের মতে, প্রাথমিক ও মৌলিক কর্তব্য। কিন্তু সমিতির তরুণ নেতৃবৃন্দের একটি অংশ এই "নীরব শরীর-চর্চার নীতি" নীরবে মানিয়া লইতে পারিলেন না। পি. মিত্র মহাশয়ের মতে, সর্বাগ্রে শরীর গঠন; আর তরুণ নেতাদের এই অংশের মতে, বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রচারই হইল প্রথম ও মূল কর্তব্য। এই তরুণ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি। এই দুই কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে একই গুপ্ত সমিতির মধ্যে দুইটি দল গড়িয়া উঠিতে থাকে। উক্ত তরুণ দলের অন্যতম ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন:

পি. মিত্র মহাশয়ের "মত ছিল যে, লাঠি ও ফুটবল খেলা, মুষ্টিযুদ্ধ ও কুস্তি বাঙালী যুবকদের অবশ্য-কর্তব্য এবং ইহা আমরাও জানিতাম, কিন্তু তাহা লইয়াই কেন যে আমাদের চিরকাল পড়িয়া থাকিতে হইবে, ইহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম

১। পুলীন দাসের প্রবন্ধ।

না। আমাদের মধ্যে জনকতক প্রচার-কর্মের উপর বিশেষ জোর দিতেন। ফলে কলিকাতায় দুইটি দল হইল, যদিচ মিত্র মহাশয় সকলকার উপর সভাপতি ছিলেন।"[১]

ইতিপূর্বে ভূপেন্দ্রনাথ, বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতির উদ্যোগে 'আত্মোন্নতি সমিতি' নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শরীর-চর্চা প্রভৃতি এই ক্লাবের বাহিরের কাজ হইলেও প্রধান কাজ ছিল রাজনীতিক আলোচনা ও রাজনীতি অধ্যয়ন। গুপ্ত সমিতির মধ্যে দুইটি দল হইবার পর যে তরুণ নেতৃবৃন্দ রাজনীতিক প্রচারকেই প্রাথমিক কাজ বলিয়া মনে করিতেন তাঁহারা এই 'আত্মোন্নতি সমিতি'কে কেন্দ্র করিয়া নিজেদের শক্তি ও দল সংহত করিয়া তুলিতে থাকেন। এইভাবে সকলে পি. মিত্রের পরিচালিত একই গুপ্ত-সমিতির (অনুশীলন-সমিতির) মধ্যে থাকিয়া দুইটি পৃথক দলে বিভক্ত হইয়া পড়িতে থাকেন। অর্থ-বণ্টন প্রভৃতি বিষয় লইয়া ক্রমশ এই দুই দলের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয় এবং দুইটি দল কার্যত পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে থাকে।

গুপ্ত সমিতির বিস্তার

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া সমগ্র দেশে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার বহিতেছিল। বাঙলাদেশে বিশেষত মধ্যশ্রেণীর বিক্ষোভ চারিদিকে ফাটিয়া পড়িতেছিল। বাঙলার বিপ্লবীরাও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন না, তাঁহারা মধ্যশ্রেণীর এই বিরাট বিক্ষোভকে কাজে লাগাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা আরম্ভ করেন। গুপ্ত সমিতির দুইটি দলই নিজ নিজ সংগঠন ও প্রভাব বিস্তারের জন্য পূর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ করে।

এই সময় পাবনার অবিনাশ চক্রবর্তী[২], অন্নদা কবিরাজ প্রভৃতির উদ্যোগে 'পাবনা-সম্মিলনী' নামে পাবনা জেলায় একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহাদের দ্বারা রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় এই গুপ্ত সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। এই সকল সংগঠনও প্রথমে পি. মিত্রের পরিচালনাধীন অনুশীলন-সমিতির অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সভাপতি হিসাবে পি. মিত্রকেই আনুগত্য দেখাইত। কিন্তু পরে এই সকল সংগঠনও 'আত্মোন্নতি-সমিতি'র প্রচারবাদী দলের সহিত, অর্থাৎ অরবিন্দ, বারীন্দ্র, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতিদের সহিত সহযোগিতা করিত। এই সময় প্রচারবাদীরা বাঙলার বাহিরে উড়িষ্যাতেও নিজেদের সংগঠন বিস্তার করিয়াছিলেন।

অপর দিকে পি মিত্রের চেষ্টায় অনুশীলন-সমিতিও সারা বাঙলায় শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে থাকে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে পি. মিত্র মহাশয় বিপিনচন্দ্র পালকে সঙ্গে লইয়া পূর্ববঙ্গ সফরে বাহির হন। তাঁহারা ঢাকায় আসিয়া আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী ও

১। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃঃ২২।

২। ইনি প্রথমে পাটনায় একজন মুনসেফ ছিলেন, পরে রাজনীতিক-অপরাধে তাঁহার চাকরি চলিয়া যায়। ইনি ছিলেন পাবনা ও উত্তর-বঙ্গে যুগান্তর সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। ইনি পরে বাঙলার বিপ্লব প্রচেষ্টার অন্যতম কর্ণধার হইয়াছিলেন।

পুলিনবিহারী দাস নামক একজন তরুণ শিক্ষকের সহিত পরিচিত হন। মিত্র মহাশয় আনুষ্ঠানিকভাবে পুলিন দাসকে গুপ্ত সমিতিতে দীক্ষিত করিয়া তাঁহারই হস্তে ঢাকার সমিতি গঠন ও পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। পুলিন দাসের চেষ্টায় ঢাকাতেও দ্রুত একটি গুপ্ত সমিতি গড়িয়া উঠে এবং পি. মিত্র এই সমিতিরও নাম দেন 'অনুশীলন-সমিতি'। ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ জেলায়ও পরেশ লাহিড়ীর উদ্যোগে 'সুহৃদ-সমিতি' নামে একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতিও কলিকাতার অনুশীলন-সমিতির প্রধান দপ্তরের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া পি. মিত্রের নেতৃত্বে কাজ করিতে থাকে। পরে কলিকাতার সমিতির মধ্যে দুই দলের বিবাদ স্পষ্ট আকার ধারণ করিলে সুহৃদ-সমিতির মধ্যেও দুইটি দল দেখা দেয়। সুহৃদ-সমিতির মূল অংশটি পি. মিত্রের নেতৃত্ব স্বীকার করে, আর ইহার অন্য অংশটি 'সাধনা-সমিতি' নামে অরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতির সহিত যোগাযোগ রাখিয়া কাজ করিতে থাকে। ইতিমধ্যে বিশেষ করিয়া ঢাকার অনুশীলন-সমিতির পরিচালকগণের চেষ্টায় বরিশাল, ফরিদপুর (ব্রতী-সমিতি), কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলাতেও গুপ্ত সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সকল স্থানেও কলিকাতার বিচ্ছেদের প্রভাবে প্রত্যেকটি সমিতির মধ্যে দুইটি করিয়া দল দেখা দেয়। এই সময়ে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রচারবাদী দলের বারীন্দ্র, ভূপেন্দ্র, অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতির চেষ্টায় বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রকাশ ও ইহার জ্বালাময়ী প্রচারের ফলে বাঙলার যুব-সম্প্রদায়ের একটি বৃহৎ অংশ প্রচারধর্মী বিপ্লববাদের দিকে, বিশেষ করিয়া 'যুগান্তর' দলের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে।

'যুগান্তর'

'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশের পর বারীন্দ্র, ভূপেন্দ্র, অবিনাশ প্রভৃতি আত্মোন্নতি-সমিতির কর্মিগণ প্রধানত 'যুগান্তর' পত্রিকার কাজেই ব্যস্ত থাকিতেন এবং পত্রিকার পরিচালনার ব্যাপারে প্রায়ই সমবেত হইতেন। ইহার ফলে আত্মোন্নতি-সমিতির কাজ ও নাম প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং 'যুগান্তর' নামটিই বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। এই সময় হইতে সাধারণ লোকেরা 'যুগান্তর' পত্রিকার পরিচালক ও কর্মীদের 'যুগান্তর-দল' নামেই অভিহিত করিতে থাকে এবং ধীরে ধীরে 'আত্মোন্নতি' নামটি সকলের স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায়। এইভাবেই হয় 'যুগান্তর-সমিতি'র সৃষ্টি।[১]

এইভাবে সারা বাঙলাদেশব্যাপী কার্যত দুইটি দল গড়িয়া উঠে, কিন্তু বাহ্যিক আকারের দিক হইতে তখনও যুগান্তর দল পি. মিত্রের পরিচালনাধীন মূল অনুশীলন-সমিতিরই অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং সকলেই প্রকাশ্যে পি. মিত্র মহাশয়কে সভাপতি বলিয়া স্বীকার করে। 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পরেও দুই বৎসর পর্যন্ত এই দুই সমিতির মধ্যে এইভাবে কিছুটা সাংগঠনিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা চলিয়াছিল, কিন্তু ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের 'আলিপুর-ষড়যন্ত্র মামলা'র সময় হইতে দুইটি সমিতি সকল

১। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে, এই কর্মীদলকে পুলিসই নাকি সর্বপ্রথম 'যুগান্তর-দল' নামে অভিহিত করিয়াছিল।

সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই ইতিহাসের একটি প্রামাণ্য দলিল হিসাবে সেই যুগের অন্যতম নায়ক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থ হইতে সংশ্লিষ্ট বহু তথ্যপূর্ণ নিম্নোক্ত অংশটি উদ্ধৃত করা হইল :

"গুপ্ত-সমিতির মধ্যে যাঁহারা প্রচারে বিশ্বাস করিতেন তাঁহারা একত্রিত হইলেন এবং ইহাদের সঙ্গে আত্মোন্নতি-সমিতি রাজনৈতিক কার্যের সহকারিতা করিত। 'যুগান্তর' কাগজ ইহাদের দ্বারা পরিচালিত হইত। বাহিরে রহিল পি. মিত্রের পরিচালিত অনুশীলন-সমিতি। এই সমিতি প্রচারকর্ম না করিয়া কেবল লাঠি-খেলা ও কুস্তির দিকে নজর রাখিত। এই সমিতি সভাপতি মহাশয়ের (পি. মিত্রের) প্রিয় ও পৃষ্ঠপোষিত ছিল। তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গকে এই সমিতিকে সাহায্য করিতে বলিতেন।......"

"তৎপরে বঙ্গভঙ্গের হাঙ্গামা এবং স্বদেশী বন্যা আসিল। সেই সঙ্গে আমরাও গাঝাড়া দিয়া উঠিলাম। সেই সময় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় তাঁহার ভ্রাতা বারীন্দ্রকে 'ভবানী মন্দির' স্থাপনা উপলক্ষে আবার বঙ্গে পাঠাইয়া দেন।......এই সময় পাবনার দল, যাঁহাদের অনেকে আমাদের দলের লোক ছিলেন,......আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যোগদান করিলেন। ইহারাই উত্তর-বঙ্গে কার্যক্ষেত্রের প্রসার করিয়াছিলেন। তাহার ফলে দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি ও পাবনা আমাদের হাতে আসে। ইহার অগ্রে কটকে যে কর্ম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল আমি গিয়া তাহা আবার জাগাইয়া একটি আখড়া স্থাপন করিয়া আসিয়াছিলাম। এই সমস্ত যোগাযোগ একসঙ্গে সংগঠিত হইবার ফলে 'যুগান্তর' কাগজ প্রকাশিত হয়।"

"বহুদিন ধরিয়া আমরা কাগজ বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম।......এই সময়ে ৺উপাধ্যায় (ব্রহ্মবান্ধব) 'সন্ধ্যা' কাগজ বাহির করিলেন। কিন্তু এই কাগজে ক্রমাগত ধ্বংসমূলক আলোচনা বাহির হওয়ায় উহা শিক্ষিত-সাধারণের প্রিয় হয় নাই এবং উহা বৈপ্লবিক মতাবলম্বী না হওয়ায় আমরাও একটি বৈপ্লবিক কাগজ (যাহা দলাদলির বাহিরে থাকিবে) বাহির করিবার জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলাম।......"

" 'যুগান্তর' নাম আমারই মনোনীত।...এই নামটি ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' নামক সামাজিক উপন্যাস হইতে ধার লওয়া হয়। আমরা অনেকেই ব্রাহ্ম-সমাজের ছায়ায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হই ; সেইজন্য এই নামটি আমার বিশেষ পছন্দ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় যেমন সামাজিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইয়াছেন, আমরাও সেইরূপ রাজনীতিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইব এবং বৈপ্লবিক মনোভাব দেশে আনিব—ইহাই আমাদের ইচ্ছা ছিল। 'যুগান্তর' দলের কাগজ ছিল। টাকা সংগ্রহ, মতামত ও প্রবন্ধ লেখা সমস্ত কর্মই পার্টির অভিপ্রায় অনুসারে হইত। কাগজ সম্বন্ধে আমাদের মাথার উপরে ছিলেন—অরবিন্দ ঘোষ, দেউস্কর (সখারাম গণেশ দেউস্কর) এবং অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী।"

" 'যুগান্তর'-এর পশ্চাতে সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী বৈপ্লবিক সমিতিই ছিল। ইহা তাহাদেরই কাগজ। এই সময় যাঁহারা পি. মিত্রের তাঁবেদার ছিলেন (অর্থাৎ

তাঁহার নির্দেশ মানিয়া চলিতেন) ও যাঁহারা লাঠি ঘুরাইতেন তাঁহারা একদল হইলেন ; তাহা ছাড়া সমস্ত কেন্দ্র আমাদের সঙ্গে ছিল এবং আমরা অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে কার্য করিতাম। এই প্রকারে বঙ্গে বৈপ্লবিক দলের মধ্যে সর্বপ্রথম দলাদলির ছায়া প্রকাশ পায়। কলিকাতার অনুশীলন-সমিতি, ঢাকার অনুশীলন-সমিতি এবং ময়মনসিংহের সুহৃদ-সমিতি ও তাহাদের শাখাসমূহ পি. মিত্রের সরাসরি অধীনে ছিল ; তাহা ছাড়া বঙ্গে যে সব বৈপ্লবিক কেন্দ্র ছিল তাহাদের সকলেই আমাদের সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বাধীনে কর্ম করিতেন এবং সংখ্যাতেও আমাদের দিকের লোক বেশী ছিল। অথচ বাৎসরিক কনফারেন্সে-এ সকলেই পি. মিত্রের নেতৃত্বাধীনেই মিলিতাম।...আমার মনে হয় ভবিষ্যতে এই দলাদলির ছায়ায় শেষে তিনটি দল[১] বঙ্গে ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হয়।”[২]

১. অনুশীলন-সমিতি—সংগঠনের বিস্তার ও পদ্ধতি

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বাঙলাদেশের প্রথম ও মূল গুপ্ত সমিতি, অর্থাৎ কলিকাতার অনুশীলন-সমিতি হইতে নিম্নোক্ত তিনটি বিরাট সংগঠন সৃষ্টি হয়: অনুশীলন-সমিতি, যুগান্তর-সমিতি ও উত্তরবঙ্গ-সমিতি। এই তিনটি সমিতিই ক্রমশ বিস্তার লাভ করিয়া বিরাট আকার ধারণ করে। ইহাদের প্রত্যেকটি সংগঠন নিজ নিজ স্থানীয় গণ্ডি অতিক্রম করিয়া এবং সারা বাঙলাদেশে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সমগ্র বাঙলাদেশকে বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিস্তৃত ক্ষেত্রে পরিণত করে। সম্ভবত ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ‘আলিপুর-বোমার মামলা’ পর্যন্ত যুগান্তর-সমিতিই ছিল বৃহত্তম সংগঠন। এই মামলার সময় হইতে পুলিশের আক্রমণে ও শত শত কর্মী ধৃত হইবার ফলে এই বিরাট সংগঠন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ইহার সংগঠন সাময়িকভাবে সংকুচিত হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রথমেই এই প্রকারের কোন প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিতে হয় নাই বলিয়াই এবং প্রথম হইতে অনুসৃত “শক্তি-সঞ্চয়”-এর নীতির জন্য অনুশীলন-সমিতির সাংগঠনিক বিস্তার বরাবর অব্যাহত ছিল। এই জন্য অনুশীলন-সমিতিই একটি অখণ্ড ও একক সংগঠন হিসাবে বৃহত্তম সংগঠন হইয়া উঠে। ‘সিডিশন-কমিটি’র মতেও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে অনুশীলন-সমিতিই বৃহত্তম বৈপ্লবিক সংগঠন হইয়া দাঁড়ায়।

এই সমিতির প্রধান পরিচালন কেন্দ্র সেই সময় পর্যন্ত কলিকাতায় থাকিলেও ঢাকাই অনুশীলন-সমিতির প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়া উঠে। বিভিন্ন জেলায় প্রতিষ্ঠিত শাখা-প্রশাখাসহ ঢাকার অনুশীলন-সমিতিই ছিল সমগ্র পূর্ব-বঙ্গের বৃহত্তম সংগঠন। ঢাকার অনুশীলন-সমিতির প্রথম পরিচালক ছিলেন পুলিনবিহারী দাস। তাঁহার যোগ্য পরিচালনায় বিভিন্ন গ্রামে, স্কুল-কলেজে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সমিতির শাখা-

১। তিনটি দল :—পশ্চিম-বঙ্গে প্রধানত যুগান্তর-সমিতি, পূর্ববঙ্গে প্রধানত অনুশীলন-সমিতি এবং উত্তর-বঙ্গে প্রধানত যুগান্তর-সমিতি। উত্তর-বঙ্গের সংগঠন পশ্চিম-বঙ্গের যুগান্তর-সমিতির সহিত সম্পর্কযুক্ত থাকিলেও ইহা অনেকটা স্বাধীনভাবে কাজ করিত।

২। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম, পৃঃ ২২-২৩।

প্রশাখা গড়িয়া উঠে। সমিতিদ্বারা পরিচালিত অসংখ্য আখড়ায় শরীর-চর্চা, লাঠি-তরবারি-ছোরাখেলা প্রভৃতিদ্বারা সমিতির বিরাট সভ্যসংখ্যাকে একটি সৈন্য-বাহিনী রূপে গড়িয়া তোলা হইতে থাকে। এই বাহিনীর নাম রাখা হয় "জাতীয় স্বেচ্ছাসৈন্য বাহিনী"। এই বাহিনীকে সকল সময় এমনভাবে প্রস্তুত রাখা হইত যাহাতে কোন স্থানে আগুন, বন্যা, মহামারী প্রভৃতি দেখা দিবামাত্র অবিলম্বে উপস্থিত হইয়া ইহারা জনসাধারণকে সাহায্য করিতে পারে। এই সকল সমাজ-সেবামূলক কার্যাবলীর দ্বারা সমিতি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

সংগঠন-বিস্তারের উপায় হিসাবে "এই সমিতি সকল স্কুলের মধ্যে প্রবেশ করে। ঢাকার 'ন্যাশনাল স্কুল' ছিল সমিতির সভ্য-সংগ্রহ ও তাহাদের শিক্ষা দানের প্রধান কেন্দ্র। এই স্কুলেরই শিক্ষক ছিলেন পুলিন দাস ও ভূপেশচন্দ্র রায়। সোনারং 'ন্যাশনাল স্কুল'টি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মাখনলাল সেন। পুলিন দাস মহাশয় গ্রেপ্তার হইবার পর মাখনলালই ঢাকার অনুশীলন-সমিতির পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন। ছাত্রদের উপর এই সোনারং-স্কুলটির প্রভাব ছিল অতি গভীর...

"ঢাকার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দুই বৎসর পর্যন্ত ইহা প্রকাশ্যেই কাজ চালাইতেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে যখন ইহা 'ক্রিমিনাল অ্যামেণ্ডমেণ্ট অ্যাকট' অনুসারে বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয় এবং পুলিনবিহারী দাস ও অন্যান্যেরা গ্রেপ্তার হন, তখন এই সমিতির পরিচালন-কেন্দ্র কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয় এবং ইহা মাখনলালের যোগ্য নেতৃত্ব লাভ করে। পরবর্তী কয়েক বৎসরে এই সমিতি সারা বাঙলায় ইহার সংগঠন বিস্তার করে এবং অন্যান্য প্রদেশেও ইহার সংগঠন বিস্তৃত হয়। ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলাতেই ইহার সংগঠন ছিল সর্বাপেক্ষা সুসংবদ্ধ, কিন্তু উত্তরে দিনাজপুর হইতে দক্ষিণ-পূর্বে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং উত্তর-পূর্বে কুচবিহার হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর পর্যন্ত ইহা বিশেষ সক্রিয় হইয়া উঠে। বাঙলাদেশের বাহিরে আসাম, বিহার, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং পুনা শহরেও ইহার সভ্যদের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা গিয়াছে।"[১]

অনুশীলন-সমিতির পরিচালকগণ একটি সুগঠিত সাংগঠনিক পদ্ধতিদ্বারা এই বিপুল সংগঠনকে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং তাহার জন্য তাঁহারা রুশিয়ার 'এনার্কিস্ট'দের সংগঠন-পদ্ধতি হইতেও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সমিতির সংগঠন-পদ্ধতির মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

'রুশ-বিপ্লবাদের সংগঠন-পদ্ধতি'

সমিতির সভ্যদের সাংগঠনিক আদর্শ শিক্ষা দিবার জন্য রুশিয়ার 'এনার্কিস্ট' নামক বিপ্লবীদলের সংগঠন-পদ্ধতি এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। 'এনার্কিস্ট'দের এই সংগঠন-পদ্ধতিই অনুশীলন-সমিতির 'সাধারণ সংগঠন-নীতি'র প্রধান ভিত্তিরূপে গৃহীত হয়। এই পুস্তিকায় সাধারণ সাংগঠনিক নীতি হিসাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ হয় :

১। Sedition Committee Report, p, 105.

'সাধারণ নীতি'

"রুশিয়ার বৈপ্লবিক আন্দোলন হইতে এই শিক্ষা পাই যে, যাহারা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের জন্য জনগণকে সংগঠিত করিতে চাহে তাহাদের এই সকল নীতি স্মরণ রাখা অবশ্য কর্তব্য :

"(১) দেশের সকল বিপ্লবীদের লইয়া একটা সুদৃঢ় সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে, যেখানেই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন হইবে, সেইখানেই পার্টির সকল শক্তি একত্র করিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

"(২) বিভিন্ন কর্ম-শাখা বা বিভাগগুলিকে পরস্পর হইতে কঠোরভাবে পৃথক করিতে হইবে, যথা—যে ব্যক্তি একটি বিভাগে কাজ করে, সে অন্য বিভাগের কাজকর্ম কিছুই জানিতে পারিবে না, এবং কোন ক্ষেত্রেই একব্যক্তিকে দুইটি বিভাগের পরিচালনা-ভার দেওয়া হইবে না।

"(৩) বিশেষ করিয়া কয়েকটি বিভাগে (যেমন, সামরিক ও সন্ত্রাসকার্যের বিভাগে) এমনকি যাহারা সম্পূর্ণ স্বার্থলেশহীন ও আত্মত্যাগী সভ্য, তাহাদেরও কঠোর শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে হইবে।

"(৪) সম্পূর্ণ গোপনতা অবলম্বন, অর্থাৎ একজন পার্টি-সভ্যের যতখানি জানা উচিত সে কেবলমাত্র ততখানিই জানিবে, তাহার সহকর্মীদের নিকট সে কেবল সেই কাজের কথাই বলিবে যে কাজ সহকর্মীদের জানা উচিত, যে কাজের কথা যাহাদের জানা উচিত নয় তাহাদের নিকট সে তাহা কিছুতেই বলিবে না।

"(৫) নির্দিষ্ট সাংকেতিক বাক্য, সাংকেতিক লিখন-পদ্ধতি প্রভৃতি ষড়যন্ত্রমূলক উপায়গুলির নিপুণ ব্যবহার করিতে হইবে।

"(৬) পার্টির কাজের ক্রমোন্নতি সাধন, পার্টির পক্ষে সকল প্রকারের কার্য একসঙ্গে আরম্ভ করা উচিত নয়, কার্যের ক্রমবিস্তার সাধন করা উচিত; যেমন—প্রথমত, শিক্ষিত ব্যক্তিদের ভিতর হইতে যোগ্য ব্যক্তিদের দলে টানিয়া সভ্য করা এবং তাহাদের লইয়া 'নিউক্লেয়াস' বা প্রাথমিক সংগঠন সৃষ্টি করা; দ্বিতীয়ত, সেই প্রাথমিক সংগঠনের মারফত জনগণের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার; তৃতীয়ত, সামরিক ও সন্ত্রাসকার্য প্রভৃতির আয়োজন; চতুর্থত, জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি; এবং পঞ্চমত, সশস্ত্র অভ্যুত্থান।"

উক্ত পুস্তিকায় শেষোক্ত পাঁচটি নিয়মের বিশেষ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় নিয়মে (কর্ম-বিভাগে) বলা হইয়াছে যে, একটি বিপ্লবী পার্টির কার্য দুইভাগে ভাগ করা চলে, যথা (ক) সাধারণ কার্য ও (খ) বিশেষ কার্য। সাধারণ কার্য হইবে সংগঠন, প্রচার ও বিক্ষোভ সৃষ্টি। বিশেষ কার্য হিসাবে সাতটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই সাতটি বিষয়ের দ্বিতীয়টির (সামরিক কার্যের) মধ্যে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রয়োজনে বিস্ফোরক জিনিসপত্র (বোমা প্রভৃতি) প্রস্তুত করিবার জন্য রসায়ন-বিজ্ঞানের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে; তৃতীয়টির (বিপ্লবের প্রয়োজনে অর্থ-সংগ্রহের) মধ্যে 'সন্ত্রাসকার্য-

বিভাগের' সাহায্যে ধনীদের উপর কর বসাইবার কথা বলা হইয়াছে। সর্বশেষ সপ্তম বিষয়টির (সন্ত্রাসকার্যের) বিভিন্ন কার্যের মধ্যে একটি হইল, "প্রধানত অর্থ-বিভাগকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ছোটখাট কাজের জন্য ভ্রাম্যমাণ সন্ত্রাসকার্যের সংগঠন।" তৃতীয় নিয়ম (শৃঙ্খলা) সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে "সন্ত্রাসকার্য অথবা সামরিক বিভাগের কোন সভ্যের দ্বারা পরিচালকের নির্দেশ পালনে অস্বীকার প্রভৃতি গুরুতর নিয়মভঙ্গের অপরাধের শাস্তি হইবে মৃত্যুদণ্ড।"

ইহার পর পার্টি-সংগঠনের রূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পার্টি-সংগঠনের বিভিন্ন স্থানীয় অংশ একটি সুগঠিত কেন্দ্রের দ্বারা পরিচালিত হইবে। স্থানীয় সংগঠনের মধ্যে থাকিবে "প্রাদেশিক কমিটি", "জেলা-কমিটি", "শহর-কমিটি", "গ্রাম্য-সংগঠন" এবং "পার্টি-সভ্য"।[১]

"জেলা-সংগঠন পরিকল্পনা" ও "পার্টি-সভ্যের নিয়মাবলী" সাধারণ নীতিরই অন্তর্ভুক্ত। জেলা-সংগঠন-পরিকল্পনার মধ্যে আছে পঁয়ত্রিশটি অনুচ্ছেদ, শেষ অনুচ্ছেদটি আবার ষোলটি ভাগে বিভক্ত। জেলা-সংগঠনের বিশেষ কয়েকটি নিয়ম নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

'জেলা-সংগঠন পরিকল্পনা'

"(১) একটি নিম্নবর্তী কেন্দ্রের সকল কার্য ইহার পরিচালকের আদেশে পরিচালিত হইবে। সে এই কার্যভার গ্রহণের পূর্বে অন্তত পাঁচবার সংগঠন-পরিকল্পনাটি পাঠ করিবে।"

"(২) নিম্নবর্তী কেন্দ্রের পরিচালক তাহার পরিচালনাধীন জেলাটিকে সরকারের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা অনুসারে (যেমন, মহকুমা, থানা, গ্রাম প্রভৃতি) বিভিন্ন অংশে ভাগ করিবে। প্রত্যেকটি অংশের পরিচালক-পদে একজন বুদ্ধিমান ও স্নেহশীল ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইবে।"

"(২৫) যদি কোন জেলায় অন্য কোন পার্টির হাতে অস্ত্র থাকে এবং সেই অস্ত্রের দ্বারা দেশের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে প্রধান পরিচালনা-কেন্দ্রের অনুমতি লইয়া যে-কোন প্রকারে সেই অস্ত্র হস্তগত করিতে হইবে। এই কার্য এত সাবধানে করিতে হইবে যেন তাহারা (অন্য পার্টি) কিছুই বুঝিতে না পারে।"

"(৩৪) যাহাদের নিকট অস্ত্র বা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গোপন দলিল-পত্র গচ্ছিত রাখা হইবে তাহারা কোন হাঙ্গামা, সন্ত্রাসকার্যের সংগঠন অথবা কোন সাধারণ গোলমালে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না, অর্থাৎ তাহারা এমন কোন কার্যে অংশ গ্রহণ করিবে না অথবা এমন কোন স্থানে যাইবে না যাহাতে তাহাদের কোন বিপদ ঘটিতে পারে।"

"(৩৫) প্রত্যেকটি জেলা-সংগঠক নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রধান পরিচালনা-কেন্দ্রের নিকট ত্রৈমাসিক কার্য-বিবরণী পেশ করিবে": জেলার সভ্য সংখ্যা ও সাধারণ

১। Sedition Committee Report, p. 96-97.

অধিবাসী, স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান, আঞ্চলিক নক্সা, যাতায়াত-ব্যবস্থা, আয়-ব্যয়ের হিসাব, স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের মনোভাব, সংগঠন, সন্ত্রাসকার্যের হিসাব [এই সম্পর্কিত বিষয় হইল চারিটি—(১) সন্ত্রাসমূলক ঘটনা, (২) মুদ্রাজাল, (৩) অস্ত্র মেরামত ও উহা চালনা শিক্ষা, এবং (৪) "খামার" অর্থাৎ সভ্যদের অস্ত্রচালনা ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দিবার স্থান। প্রত্যেক জেলায় সুদূর গ্রামাঞ্চলে এই প্রকারের কয়েকটি "খামার" থাকা চাই] প্রভৃতি ষোলটি বিষয়।

পার্টি-সভ্যদের জন্য নিয়মাবলী

"পার্টি-সভ্যদের নিয়মাবলী" একটি বৃহৎ দলিল। মোট বাইশটি নিয়মের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলিই এখানে উদ্ধৃত করা হইল :

"(১) প্রত্যেকটি পার্টি-সভ্যকে সকল প্রকার (চারি প্রকার) দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।" (পার্টি-সভ্যদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কয়েকটি নিয়ম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।)

"(৮) পার্টি-সভ্যগণ যখনই যে-অর্থ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিবে তখনই সেই অর্থ ও দ্রব্যাদি পার্টির সাধারণ তহবিলে জমা দিবে।"

"(১৪) পার্টি-সংগঠন সম্পর্কিত কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন পত্র কোথাও পাঠাইতে হইলে সভ্যগণ সেই পত্র পরিচালকের নিকট পেশ করিবে এবং পরিচালকই সেই পত্র যথাস্থানে পাঠাইবেন।" (এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সকল সময়েই একদল লোককে পরিচালকের 'পোস্ট-বক্স' বা 'ডাক-বাক্স্' হিসাবে ব্যবহার করা হইত। এই সকল 'পোস্ট-বক্স'-এর লোকেরা এমনভাবে পর পর চিঠি হস্তান্তর করিত যে প্রথম জন হইতে সর্বশেষ জনের মধ্যে অনেকগুলি 'পোস্ট-বক্স'-এর ব্যবধান থাকিত। এই ব্যবস্থাদ্বারা পুলিশের দৃষ্টি এড়ান ও সংগঠনের গোপনতা রক্ষা করা সহজ হইত।)

"(১৭) প্রত্যেকটি সভ্য পার্টি-সংগঠনকে একটা সামরিক সংগঠনের মত মনে করিবে এবং ইহার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি পাইবে।"

"(১৮) প্রত্যেকটি সভ্যের মনে এই কথা সকল সময়ে জাগরুক থাকা চাই যে, সে একটা বিপ্লব গড়িয়া তুলিতেছে। এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য আমোদ-প্রমোদ নয়, ইহার উদ্দেশ্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। তাহাকে সকল সময় সতর্ক থাকিতে হইবে যেন সে কখনই এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হয়।"

দীক্ষা—প্রতিজ্ঞা গ্রহণ

অনুশীলন-সমিতির সভ্যপদ গ্রহণের পূর্বে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইত। এই প্রতিজ্ঞা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। নূতন সভ্যদের "আদ্য প্রতিজ্ঞা" গ্রহণ করিয়া দলভুক্ত হইতে হইত। নূতন সভ্যদের মধ্যে যাঁহারা যোগ্যতার পরিচয় দিতেন, তাঁহাদের জন্য উচ্চতর পর্যায়ের প্রতিজ্ঞার ব্যবস্থা ছিল। এই সকল প্রতিজ্ঞা পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত চারি ভাগে ভাগ করা যায় :

(ক) আদ্য প্রতিজ্ঞা।
(খ) অন্ত্য প্রতিজ্ঞা।
(গ) প্রথম বিশেষ প্রতিজ্ঞা।
(ঘ) দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞা।

এই সকল প্রতিজ্ঞার প্রত্যেকটি আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত—প্রত্যেকটি এক-একটি মন্ত্রের মত। প্রত্যেকটি প্রতিজ্ঞার মধ্যে যে-সকল মন্ত্র সাংগঠনিক দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেবল সেইগুলিই নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

(ক) **আদ্য প্রতিজ্ঞা ঃ** ১। (ক) "আমি কখনই এবং কোন অবস্থাতেই এই সমিতি ত্যাগ করিব না।"

৫। (ক) "আমি সকল সময় সমিতির নিয়মাবলী মানিয়া চলিব।"

(খ) "আমি বিনাবাক্যব্যয়ে পরিচালকের সকল আদেশ পালন করিব।"

(গ) "আমি পরিচালকের নিকট কোন কথা গোপন করিব না এবং তাঁহার নিকট কখনই সত্য বিনা মিথ্যা বলিব না।"

(খ) **অন্ত্য প্রতিজ্ঞা ঃ**—১। "সমিতির ভিতরের কোন কথাই আমি কাহারও নিকট ব্যক্ত করিব না, অথবা আমি কখনই কোন কথা অনাবশ্যকভাবে আলোচনা করিব না।"

৩। "পার্টির পরিচালকের অনুমতি না লইয়া আমি কখনই একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইব না। আমি যখন যেখানে থাকিব তাহা পরিচালককে জানাইব। আমি যখনই সমিতির বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিব তখনই তাহা পরিচালককে জানাইব এবং তাঁহার নির্দেশে সেই ষড়যন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিব।"

৪। "আমি যখন যে-অবস্থাতেই থাকি না কেন, পরিচালকের নির্দেশ পাইবা মাত্র ফিরিয়া আসিব।"

৫। "আমি সমিতির মধ্যে আসিয়া শপথ গ্রহণ করিয়া যে সকল শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি তাহা এমন কোন ব্যক্তিকে শিখাইতে পারিব না, যে ব্যক্তি ঐ সকল শিক্ষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শপথ গ্রহণ করে নাই।"

(গ) **প্রথম বিশেষ প্রতিজ্ঞা ঃ** ওঁ বন্দেমাতরম্

"ভগবান, মাতা, পিতা, দীক্ষাগুরু, পরিচালক ও সর্বশক্তিমান জগদ্বীশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেছি যে ঃ

১। "এই সমিতির উদ্দেশ্য যতদিন পর্যন্ত পূর্ণ না হইবে, ততদিন আমি ইহার সম্পর্ক ত্যাগ করিব না। আমি পিতা, মাতা, ভাই-ভগ্নীর স্নেহ ও সংসারের মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হইব না, আমি বিনাবাক্যব্যয়ে পরিচালকের অধীনে সমিতির সকল নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব। আমি সকল প্রকারের মানসিক চঞ্চলতা ও দ্বিধা পরিহার করিয়া অবিচল দৃঢ়তার সহিত সকল কর্তব্য সম্পাদন করিব।"

৩। "যদি আমি এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অপারগ হই, তবে যেন ব্রাহ্মণ, পিতা-মাতা ও সকল দেশের শ্রেষ্ঠ দেশভক্তদের অভিশাপ আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলে।"

(ঘ) **দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞা :** ওঁ বন্দেমাতরম্

১। "ভগবান, অগ্নি, মাতা, দীক্ষাগুরু ও পরিচালককে সাক্ষী রাখিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, সমিতির উন্নতির জন্য আমি আমার জীবন ও সর্বস্ব পণ করিয়া আমার সংগঠনের সকল কর্তব্য সম্পাদন করিব। আমি সকল নির্দেশ পালন করিব এবং যাহারা আমার সংগঠনের ক্ষতিসাধন করিবে, আমি আমার সকল শক্তি দিয়া তাহাদের উপর আঘাত হানিব।"

২। "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি আমার সমিতির কোন গোপন বিষয় আমার আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবদের বলিব না, অথবা সেই সম্পর্কে অনাবশ্যকভাবে আমার সংগঠনের কোন সভ্যের নিকটেও জানিতে চাহিব না।"

"যদি আমি এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অপারগ হই, অথবা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করি, তবে যেন ব্রাহ্মণ, পিতা-মাতা ও সকল দেশের শ্রেষ্ঠ দেশভক্তদের অভিশাপ আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলে।"

(ঙ) **রাজনৈতিক ডাকাতি সম্পর্কে বিশেষ প্রতিজ্ঞা ঃ**

১। "স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, তাই অসৎ কর্ম জানিয়াও আমরা অর্থ সংগ্রহের উপায় হিসাবে ডাকাতির পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ডাকাতিলব্ধ অর্থের একটি কপর্দকও আমরা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় না করিয়া সমুদয় অর্থ আমাদেব পরিচালকের হস্তে অর্পণ করিব। আমাদের প্রত্যেকের পারিবারিক অভাব বুঝিয়া তিনি যাহা আমাদের দিবেন আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব।"

২। "যাহারা দেশদ্রোহী, স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিরোধী, সরকারের গুপ্তচর, প্রতারক, মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত, অসৎ, দরিদ্র ও দুর্বলের প্রতি উৎপীড়নকারী, জাতি বা দেশকে প্রতারণা করিয়া অর্থ আত্মসাৎকারী, অতিরিক্ত সুদখোর, কৃপণ-ধনবান কেবল তাহাদের বাড়ীতেই আমরা ডাকাতি করিব।"

৩। "প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ডাকাতি করিতে যাইয়া আমরা কোন রমণী, শিশু, দুর্বল, রুগ্ন, নিঃসহায় প্রভৃতিদের উপর কখনই কোন প্রকার অত্যাচার করিব না।"

দীক্ষাদান-পদ্ধতি

যে সভ্যকে দীক্ষা দান করা হইত, তাহাকে একবেলা হবিষ্যান্ন আহার করিয়া ও একবেলা উপবাসী থাকিয়া পরের দিন স্নান ও শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইত। দীক্ষাগুরু ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্প-চন্দনাদি সাজাইয়া বেদ ও উপনিষদের মন্ত্রপাঠ করিয়া যজ্ঞ করিতেন। যজ্ঞের পর শিষ্য "প্রত্যালীঢ়াসন"-এ[১] উপবিষ্ট হইত এবং দীক্ষাগুরু শিষ্যের মাথার উপর গীতা ও তাহার উপর তরবারি স্থাপন করিয়া দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইতেন। শিষ্য দুই হস্তে প্রতিজ্ঞা-পত্র ধারণ করিয়া

১। বাম হাঁটুর উপর বসা ; সিংহ তাহার শিকারের উপর লক্ষ প্রদান করিতে উদ্যত—'আলীঢ়' বা 'প্রত্যালীঢ়' আসনের দ্বারা তাহাই বুঝায়।

এবং যজ্ঞাগ্নি সম্মুখে তাহা পাঠ করিয়া শপথ গ্রহণ করিত। তাহার পর শিষ্য যজ্ঞাগ্নি ও দীক্ষাগুরুকে প্রণাম করিয়া অনুষ্ঠান শেষ করিত।

ঢাকার অনুশীলন-সমিতির প্রধান পরিচালক পুলিন দাস মহাশয় স্বয়ং নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে দীক্ষা দিতেন: "পি. মিত্র আমাকে যে পদ্ধতিতে দীক্ষা দিয়াছিলেন আমি সেই পদ্ধতিতে আমার নিজের বাসাতেই দীক্ষা দিতাম; একসঙ্গে বহু যুবককে দীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হইলে সাধারণত তৎকালীন ঢাকানগরীর উপকণ্ঠে ঈষৎ জঙ্গলাকীর্ণ পুরাতন ও নির্জন 'সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির'-এ যাইয়া একটু জাঁক-জমক করিয়াই দীক্ষা দিতাম। দীক্ষাপ্রার্থিগণ এবং আমি, সকলেই পূর্বদিন একবেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও যথাবিধি সংযম করিয়া, দীক্ষার দিনে উপবাসী থাকিয়া স্নানান্তে শুদ্ধ হইয়া পবিত্রভাবে কালীমূর্তির সম্মুখে যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া প্রত্যেককে 'প্রতিজ্ঞা-মন্ত্র' পাঠ করাইয়া লইতাম। তৎকালে যথাসম্ভব রুদ্রভাব অবলম্বন করিবার মানসে আমি উত্তরীয়সহ কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া মস্তকে, হস্তে, বাহুতে ও কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করিতাম। প্রত্যেকেই দীক্ষান্তে ৺কালীমূর্তিকে প্রণাম করিয়া আমাকে প্রণাম করিত। ...দীক্ষান্তে প্রত্যেক সভ্যকেই পর্যাপ্তরূপে বিশুদ্ধ ঘৃত ও চিনিযুক্ত টাট্‌কা (কাঁচা) দুগ্ধ সেবন করিতে দিতাম।"[১]

'সম্পাদকগণের কর্তব্য'

'সম্পাদকগণের কর্তব্য' নামক সংগঠন-সম্পর্কিত পুস্তিকায় সভ্যদের প্রতি সম্পাদকগণের কর্তব্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। স্কুলের অল্পবয়স্ক ছাত্ররাই প্রথমদিকে অধিক সংখ্যায় সমিতির সভ্য হইত বলিয়া এই সকল অল্পবয়স্ক সভ্যদের প্রতি সম্পাদকগণের বিশেষ দায়িত্ব ছিল। সেই বিশেষ দায়িত্বই নিয়মাবলীরূপে এই পুস্তিকায় বর্ণনা করা হইয়াছে। ষষ্ঠ নিয়মে বলা হইয়াছে যে, সম্পাদক সভ্যপদ-প্রার্থী বালকের নাম, তাহার অভিভাবকের নাম, তাহার স্কুলের নাম ও শ্রেণী লিখিয়া রাখিবেন। সপ্তম নিয়মে সভ্যদের বাসস্থান লিখিয়া রাখিবার কথা আছে। এক-বিংশতি ও দ্বাবিংশতিতম নিয়মে বলা হইয়াছে যে, সম্পাদক সকল সভ্যকে সকল প্রকার লাঠি-খেলা শিখাইবেন না। যে সভ্য সকল প্রকার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছে, সম্পাদক কেবল তাহাকেই সকল প্রকার লাঠি-লেখা শিখাইবেন, আর যে সভ্য কেবল 'আদ্য-প্রতিজ্ঞা' গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে লাঠি-খেলার প্রাথমিক নিয়ম শিক্ষা দিবেন। লাঠি-খেলা সম্পর্কে এই প্রকার বাধা-নিষেধের কারণ সম্ভবত এই যে, উচ্চস্তরের লাঠি-খেলা ছিল অসি-শিক্ষারই নামান্তর।

'পরিদর্শক'

সমিতির সাংগঠনিক কার্যে পরিদর্শকগণের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নবর্তী সংগঠন ও শাখা-প্রশাখাগুলির কার্য উত্তমরূপে চলিতেছে কিনা, না চলিলে তাহার কারণ কি এবং কোথায় নূতন শাখা-প্রশাখা স্থাপন করা যায়,

১। পুলিন দাসের প্রবন্ধ।

তাহা এই পরিদর্শকগণের মতামতের উপরই বহুলাংশে নির্ভর করিত। এই জন্যই পরিদর্শকগণের কর্তব্য ব্যাখ্যা করিয়া এই পুস্তিকাটি রচিত হয়। এই পুস্তিকাটির মুখবন্ধেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক পরিদর্শককে ইহা অন্তত পাঁচ বার অবশ্যই পাঠ করিতে হইবে। নিম্নোক্ত বিষয়গুলিই পুস্তিকাটিতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে :

কোথায় নূতন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে ; স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সমিতিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার উপায় কি ; জনসাধারণকে কিভাবে বুঝাইতে হইবে যে,"প্রতিজ্ঞা গ্রহণ ব্যতীত যে সংগঠন গড়িয়া উঠিবে, তাহা একটা শৃঙ্খলাহীন হট্টগোল ব্যতীত অন্য কিছুই হইবে না এবং কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা ব্যতীত কোথাও কোন সামরিক সংগঠন তৈরী হয় নাই, আর হইতেও পারে না" ; বিনাবাক্যব্যয়ে পরিচালকের নির্দেশ মানিয়া চলার নিয়মটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ; সমিতির শাখা-প্রশাখা অব্যাহতভাবে বাড়াইয়া যাইতে হইবে ; ইহার কেন্দ্র যতই বাড়িয়া যাইবে ততই লোকসংগ্রহের সুবিধা হইবে। মুসলমানদের কেন সমিতির সভ্য করা হইবে না, তাহাও ইহাতে ব্যাখ্যা করা হয়।

'অমূল্য সরকারের পুস্তিকা'

এই পুস্তিকাখানি সমিতির একটি স্বীকৃত দলিল না হইলেও ইহা বিভিন্ন দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তৎকালে বিপ্লবী নেতাদের কেহ কেহ গতানুগতিক সংগঠন-পদ্ধতি ও কর্মপন্থা হইতে ভিন্নভাবে চিন্তা করিতেন। এই পুস্তিকার রচয়িতা পাবনা জেলার অমূল্য সরকার উত্তরবঙ্গের অনুশীলন-সমিতির একজন প্রধান সংগঠক ছিলেন বলিয়া সমিতির উত্তরবঙ্গ শাখার সংগঠন ও কার্যপন্থার উপর এই পুস্তিকার প্রভাব অন্তত আংশিক ভাবেও যে পড়িয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই পুস্তিকাটি বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী চিন্তাধারার মধ্যে নূতনত্বের সন্ধান দেয়। মূল বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নরূপ :

স্বাধীনতার পথ :

"দেশ হইতে বিদেশীদের বিতাড়িত করিতে না পারিলে স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। জাতীয় অভ্যুত্থানের পক্ষে অপরিহার্য অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদের দ্বারা দেশের প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থার উচ্ছেদ করিতে না পারিলে বিদেশীদের বিতাড়িত করা সম্ভব নয়।

জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য লোকবল ও অর্থ বিশেষ গুরুত্বপূণ এবং অপরিহার্য। সংক্ষেপে, আমাদের এই স্বেচ্ছাসংঘকে (বাংলার অনুশীলন-সমিতিকে) নিরবচ্ছিন্ন উদ্যম সহকারে লোকবল, অর্থবল ও অস্ত্রবল সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য এই সকল লোক লইয়া পবিত্র উদ্দেশ্য-প্রণোদিত একটি সামরিক বাহিনী সংগঠিত করিতে হইবে। সুতরাং সংগঠনকে শক্তিশালী করিয়া তোলাই প্রধান কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইহার জন্য আমাদের স্বেচ্ছাসংঘকে সকল শক্তি নিযুক্ত করিতে হইবে।"

[ইহা লক্ষণীয় যে, এখানে গতানুগতিকভাবে ধর্মের সহিত স্বাধীনতা-সংগ্রামকে যুক্ত করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই এবং সশস্ত্র জাতীয় অভ্যুত্থানকেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের চরম রূপ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।]

পার্টি-সভ্য ঃ

পার্টি-সভ্যদিগকে ভবিষ্যতের সশস্ত্র জাতীয় অভ্যুত্থানের জাতীয় বাহিনীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে এবং সৈন্য-বাহিনীসুলভ শৃঙ্খলা ও যৌথ জীবনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

পরিচালক—তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্ব ঃ

"পরিচালককে তাঁহার অঞ্চলস্থিত ও অঞ্চল-বহির্ভূত অন্যান্য দলের সহিতও যোগাযোগ রক্ষা এবং আলোচনা করিতে হইবে। তাঁহাকে অন্যান্য দলের কর্মপদ্ধতি হইতেও শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।" [ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, পুস্তিকাটির রচয়িতা সন্ত্রাসবাদী দলসুলভ "দলীয় সংকীর্ণতা"র দোষ হইতে মুক্ত ছিলেন।]

অর্থসংগ্রহ ঃ

"১০নং ধারা—বলপ্রয়োগদ্বারা অর্থ সংগ্রহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।"

"১১নং ধারা—সমিতির (লীগের) আয়ের প্রধান উপায় হইবে জনসাধারণের দান ও সমিতির সভ্যদের চাঁদা।"

[এই দুইটি ধারা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, লেখক পার্টির অর্থ-সংগ্রহের জন্য ডাকাতি সমর্থন করেন নাই। তিনি পার্টিকে জনগণের সংগঠন হিসাবে গড়িয়া তুলিয়া অর্থের জন্য জনসাধারণের উপরেই নির্ভর করিতে বলিয়াছেন।]

শিক্ষা ঃ

পুস্তিকাটির একটি বড অংশে পার্টি-সভ্যদের বৈপ্লবিক শিক্ষা সম্পর্কে বলা হইয়াছে। তাহাদের অধ্যয়নের জন্য ইহাতে সেই সময়ের দেশীয় ও বিদেশী গ্রন্থের একটি তালিকাও সন্নিবেশ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে লেখকের মূল বক্তব্য বিষয় এই যে, সভ্যদিগকে প্রথমে রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন ও ইতিহাস সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষা দিয়া তাহার পরে অথবা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক শিক্ষা দিতে হইবে।

২. যুগান্তর সমিতি

যুগান্তর সমিতির উৎপত্তি ও গোড়ার ইতিহাস এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি ও সংগঠন-বিস্তারের ইতিহাসও এই সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বাঙলার বিপ্লব প্রচেষ্টার অন্যতম গুরু ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম' হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এবার এই সম্পর্কে বাঙলার বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম গুরু ও নায়ক বারীন্দ্রকুমার ঘোষের উক্তি উদ্ধৃত করা হইল :

বরোদায় "একবৎসর থাকিবার পর আমি বাঙলাদেশে উপস্থিত হই। রাজনীতিক প্রচারকরূপে বাঙলাদেশে স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আমি জেলায় জেলায় ঘুরিয়া বহু শরীর-চর্চার আখড়া স্থাপন করি। এই সকল আখড়ায় শরীর-চর্চা ও রাজনীতি অধ্যয়নের জন্য যুবকদের ভর্তি করা হইত। আমি প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া স্বাধীনতার বাণী প্রচার করি। কিন্তু ক্রমশ এই কার্যে আমার অবসাদ দেখা দেয় এবং আমি বরোদায় ফিরিয়া আসিয়া একবৎসর ধরিয়া নানা বিষয় অধ্যয়ন করি। তাহার পর (১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে) আমি আবার বাঙলাদেশে এই ধারণা লইয়া ফিরিয়া আসি যে, এই দেশে কেবলমাত্র রাজনীতিক প্রচারের দ্বারা কোন কাজ হইবে না, জনসাধারণকে এমনভাবে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে তাহারা নির্ভয়ে বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে। আমার একটা ধর্ম-প্রতিষ্ঠান (সম্ভবত ভবানী-মন্দির) গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা ছিল। এই সময় 'স্বদেশী' ও 'বয়কট-আন্দোলন' আরম্ভ হয়। যুবকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদের আমার নির্দেশে পরিচালনা করিবার কথা চিন্তা করি এবং তাহার ফলেই আমি একটি দল গঠন করি। তাহারাই আজ গ্রেপ্তার হইয়াছে (আলিপুর-মামলায়)। আমি আমার বন্ধু অবিনাশ ভট্টাচার্য ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সহযোগিতায় 'যুগান্তর' সংবাদপত্র বাহির করিয়া দেড়বৎসর পর্যন্ত উহা চালাইয়া যাই এবং তাহার পর উহার চালনার ভার বর্তমান ব্যবস্থাপকদের উপর ছাড়িয়া দিই। পত্রিকার ভার ছাড়িয়া দিবার পর আমি আবার সভ্য-সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করি। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভ কাল হইতে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের এই পর্যন্ত (আলিপুর-মামলা পর্যন্ত) চৌদ্দ কি পনের জন যুবক সংগ্রহ করি এবং তাঁহাদের ধর্ম ও রাজনীতিক পুস্তকাদি দ্বারা শিক্ষা দিই। আমরা সকল সময় একটা সুদূরপ্রসারী বিপ্লবের কথাই চিন্তা করি এবং তাহার জন্যই নিজেদের প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছি। এই উদ্দেশ্যে আমরা কিছু অস্ত্রও সংগ্রহ করিয়াছি। আমি সর্বসমেত এগারটা রিভলভার, চারিটি রাইফেল ও একটা 'গান' সংগ্রহ করিয়াছি। আমাদের দলে যে-সকল যুবক যোগদান করিয়াছিল, উল্লাসকর দত্ত তাহাদের একজন। সে আমাদের জানায় যে, সে আমাদের সহিত যোগ দিয়া কিছু কাজে লাগিবে বলিয়া বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরীর প্রণালী শিক্ষা করিয়াছে। সে তাহার পিতার অজ্ঞাতসারে তাহাদের বাড়ীতে একটি রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়াছিল। সেখানে সে অনেক পরীক্ষাকার্য চালাইয়াছিল। আমি নিজে ইহা কখনও দেখি নাই, সে-ই আমাকে ইহা জানাইয়াছিল। তাহার সাহায্যে আমরা ৩২নং মুরারী পুকুরের বাগানবাড়ীতে অল্পসংখ্যক বোমা তৈরী করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে আমাদের আর একজন বন্ধু হেমচন্দ্র দাস, মনে হয় তাহার সকল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যান্ত্রিকবিদ্যা, সম্ভব হইলে বোমা তৈরী শিক্ষা করিবার জন্য প্যারী নগরীতে গিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া উল্লাসকর দত্তের সহিত একত্রে বিস্ফোরক ও বোমা তৈরী করিতে থাকে। আমরা কখনই বিশ্বাস করিতাম না যে, কেবলমাত্র রাজনীতিক হত্যা দ্বারাই স্বাধীনতা

পাওয়া যাইবে। তাহা সত্ত্বেও যে আমরা এই কাজ (বোমা তৈরী) করি তাহার কারণ এই যে, আমরা বিশ্বাস করি, জনসাধারণ ইহা চায়।"

ইহা 'আলিপুর বোমার মামলা'য় বারীন্দ্রকুমারের স্বীকারোক্তির একটি অংশ। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেপ্তার হইবার পর তিনি জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এই স্বীকারোক্তি করেন। এই সম্পর্কে ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, দুইটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি এই স্বীকারোক্তি করিয়াছিলেন। প্রথমত, তিনি ইহার মারফত বাঙলাদেশে বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচার ও উহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, ইহা দ্বারা তিনি সমিতির বহু সভ্যকে পুলিশের কবল হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্য লইয়া স্বীকারোক্তিতে কেবল তাঁহাদেরই নাম করেন যাঁহারা পূর্বেই গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল, 'আলিপুর-ষড়যন্ত্র'-এর সকল দায়িত্ব নিজের উপর তুলিয়া লইয়া ধৃত সহকর্মীদের দায়িত্ব ও দণ্ড লাঘবের ব্যবস্থা করা। তাঁহার এই সকল উদ্দেশ্য যে বহুলাংশে পূর্ণ হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, উক্ত উদ্দেশ্যগুলি লইয়া এই স্বীকারোক্তি করা হইয়াছিল বলিয়া ইহা হইতে যুগান্তর সমিতির সংগঠন ও ক্রিয়া-কলাপের একটি পূর্ণ চিত্র না পাওয়া গেলেও ইহা হইতে যুগান্তর সমিতির গোড়া পত্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ইহার অন্যতম শ্রেষ্ঠনায়কের বিপ্লব-প্রচেষ্টা অন্তত আংশিকভাবে বুঝিতে পারা যায়।

প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টার অন্যতম নায়ক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবৃতি :

"আমার মনে হইল, ধর্মকে বাদ দিয়া ভারতবর্ষের লোকেদের দিয়া কিছুই করান যাইবে না, তাই আমি কয়েকজন সাধুর সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু সাধুরা কোন কাজে আসিল না বলিয়া স্কুলের ছাত্রদের দিকে দৃষ্টি দিলাম, তাহাদের কয়েকজনকে ধর্মীয় ও রাজনীতিক শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলাম। তখন হইতেই আমি ছেলেদের শিক্ষা দিবার কাজে আত্মনিয়োগ করি। আমি তাহাদের শিক্ষা দিতাম আমাদের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে ; ইহা ব্যতীত তাহাদের শিক্ষা দিতাম যে, আমাদের স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচারের জন্য দেশের বিভিন্ন অংশে গুপ্ত-সমিতি স্থাপন করিতে হইবে, আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া যখন সময় আসিবে তখন সশস্ত্র অভ্যুত্থান আরম্ভ করিতে হইবে।"[১]

বিভিন্ন তথ্য ও সাহিত্য আলোচনা করিয়া সরকারী 'সিডিসন কমিটি' এই মন্তব্য করে :

"তাহা হইলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি যে, বারীন্দ্র ও তাঁহার সহযোগীদের উদ্দেশ্য ছিল বাঙলাদেশের ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকদের এই বলিয়া অনুপ্রাণিত করা যে, প্রতারণা ও উৎপীড়নই ইংরেজ-সরকারের ভিত্তি, এবং এই প্রতারণা ও উৎপীড়নমূলক সরকারের উচ্ছেদ সাধনই ধর্ম ও ইতিহাসের নির্দেশ। শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের এদেশ হইতে তাড়াইতেই হইবে। তাহার জন্য অবিলম্বে

১। Sedition Commitee Report, p. 20-21.

ধর্মচর্চা ও শিক্ষামূলক শৃঙ্খলাযুক্ত একটি একনিষ্ঠ সংগঠন অবিলম্বে গড়িয়া তুলিতে হইবে।"[১]

এবার এক প্রকারের নূতন সাহিত্য স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য ধর্মীয় প্রেরণা লইয়া উক্ত সংগঠনের ভিত্তিরূপে দেখা দিতে থাকে।

'ভবানী-মন্দির'

অরবিন্দ ঘোষের রচিত 'ভবানী-মন্দির' নামক পুস্তিকাখানি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলাদেশে প্রকাশিত হয়। ইহাতে বিপ্লবীদের লক্ষ্য, কার্যাদর্শ ও সাংগঠনিক ভিত্তি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ও নব জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙলার যুব-সম্প্রদায়ের আরাধ্যা দেবী কালী বা শক্তিরই ভিন্ন নাম ভবানী। দেবী ভবানী শক্তিস্বরূপিনী, তাই এই পুস্তিকায় অরবিন্দ বাংলার যুব-সম্প্রদায়কে আহ্বান করিয়াছেন মানসিক, দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হইয়া উঠিবার জন্য। প্রবল-পরাক্রান্ত য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশ রুশিয়ার সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিয়া জাপান সেই শক্তিমত্তাই পৃথিবীর সম্মুখে প্রতিপন্ন করিয়াছে। অতএব নবশক্তিতে বলীয়ান জাপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাই ভারতবাসীর কর্তব্য। কিন্তু বাঙালীর সেই শক্তি-সাধনা কিভাবে সম্ভব, তাহার গূঢ় অর্থ কি, তাহার বাস্তব রূপ কি?

বাঙলার শক্তি-সাধনার ধর্মীয় আদর্শ রাজনীতিক স্বাধীনতার আদর্শের সহিত মিশিয়া গিয়া ভারতের নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের মধ্যে নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে, এবং তাহা বাঙালী মধ্যশ্রেণীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের বৈপ্লবিক আদর্শে পরিণত হইয়াছে। তাই শক্তি-স্বরূপিনী ভবানীর আরাধনা হইল মধ্যশ্রেণীর বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা ও শক্তির উৎস। সুতরাং স্বাধীনতা লাভের জন্য দেবী শক্তি (কালী) বা ভবানীর আরাধনা অপরিহার্য।

মহারাষ্ট্রীয় নায়ক শিবাজীর শক্তি-সাধনার অনুকরণে গড়িয়া তুলিতে হইবে শক্তি-সাধনার এক পীঠস্থান—ভবানী-মন্দির। এই মন্দির নির্মাণের স্থান হইবে "আধুনিক শহরের দূষিত প্রভাব হইতে বহু দূরে, শান্তি ও শক্তি-সমন্বিত, উচ্চ ও পবিত্র বায়ু-প্রবাহিত নির্জন পার্বত্য অঞ্চলে।" এই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিবে একটি দেশ-হিতার্থে নিবেদিত-প্রাণ কর্মিদল। পূর্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ হইবে তাহাদের ইচ্ছাধীন, কিন্তু তাহাদের ব্রহ্মচর্য পালন হইবে বাধ্যতামূলক। ব্রহ্মচর্য পালনের সময় স্বাধীনতার জন্য প্রত্যেকের উপর ন্যস্ত কর্তব্য প্রত্যেককে অবশ্যই পালন করিতে হইবে। এই কর্তব্য পালনের পরে তাহারা ইচ্ছা করিলে গার্হস্থ্য-জীবনে ফিরিয়া যাইতে পারিবে। এই কর্তব্য শেষ হইবে দেশের স্বাধীনতা লাভে। সংক্ষেপে, একটি সর্বত্যাগী ও দেশ-হিতার্থে নিবেদিত-প্রাণ রাজনীতিক "সন্ন্যাসী" বা কর্মিদল গঠন করাই 'ভবানী-মন্দির' প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য।

১। Ibid, p. 21.

'ভবানী-মন্দির"-এ স্বাধীনতা-সংগ্রামের ধর্মীয় আদর্শ তুলিয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক সংগ্রামের একটি সাংগঠনিক আদর্শও দেওয়া হইয়াছে। রুশীয় বিপ্লবীদের (এনার্কিস্টদের) সংগঠন ও নিয়ম-কানুনই বাঙলার বিপ্লবীদের সাংগঠনিক আদর্শ ও পন্থা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অরবিন্দ তাঁহার এই পুস্তিকায় স্বাধীনতার জন্য রাজনীতিক কর্মপন্থা হিসাবে নরহত্যা ও ডাকাতি সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত করেন নাই। পরবর্তীকালে সমিতির সংগঠনের মধ্যে এই পুস্তিকার ধর্মীয় ও সাংগঠনিক আদর্শ বহুলাংশে গৃহীত হয় এবং তাহার সহিত রাজনীতিক নরহত্যা ও ডাকাতির পন্থা সংযোজিত হয়। 'সিডিসন কমিটি'র মতে:

"'ভবানী-মন্দির'-এ ধর্ম সম্পর্কে বহু আলোচনার সহিত রুশীয় বৈপ্লবিক আদর্শ ও পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের পর সমিতি ও সঙ্ঘগুলি 'ভবানী-মন্দির' পুস্তিকায় আলোচিত 'শপথ' ও 'প্রতিজ্ঞা'সমূহ ব্যতীত অন্য সকল ধর্মীয় ভাবধারা ত্যাগ করে এবং ডাকাতি, নরহত্যা প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি যোগ করিয়া লয়।"[১]

[অরবিন্দের প্রস্তাবিত ভবানীর মন্দির কোনদিনই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শুনা যায়, এই মন্দির প্রতিষ্ঠার ভার দেওয়া হইয়াছিল বারীন্দ্রের উপর। বারীন্দ্র বহু অনুসন্ধান করিয়া বিহারপ্রদেশের কোন এক পাহাড়ের উপর একটি স্থান মনোনীত করেন। কিন্তু ইহার পর তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া সমিতির কার্যে এমনভাবে জড়িত হইয়া পড়েন যে, মন্দির-প্রতিষ্ঠার কার্য আরম্ভ করা আর সম্ভব হয় নাই।]

'যুগান্তর' পত্রিকা

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকাখানির প্রচার-সংখ্যা ছিল সাত হাজার, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'আলিপুর-ষড়যন্ত্র মামলা' আরম্ভ হইবার পর ইহা যখন বন্ধ হয় তখন ইহার প্রচার-সংখ্যা ছিল প্রায় পঁচিশ হাজার। 'যুগান্তর'-এর লেখক ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবব্রত বসু (প্রজ্ঞানন্দ স্বামী), সখারাম গণেশ দেউস্কর, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

এই পত্রিকাখানি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দেশব্যাপী, বিশেষ করিয়া বাঙলাব্যাপী নূতন জাতীয়তাবাদী জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার যুব-সম্প্রদায়ের চেতনার জড়তা কাটাইয়া তাহাদের মধ্যে শক্তি-সাধনার মনোভাব ও বৈপ্লবিক প্রেরণা জাগাইয়া তুলিবার কার্যে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ইহা ধর্মের সহিত স্বাধীনতার আদর্শ মিশ্রিত করিয়া বাঙলার যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নূতন বৈপ্লবিক প্রেরণা জাগাইয়া তোলে এবং বৈপ্লবিক সংগ্রামের সূচনা করে। এই উদ্দেশ্যে ইহাতে মহাভারতের ধর্মযুদ্ধে অর্জুনকে প্রেরণা দানের জন্য শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, চণ্ডীপুরাণের সুরাসুরের যুদ্ধ, রাজপুতদের ও শিবাজীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনী, ইতালীর

১। Sedition Committee Report, p. 101.

ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির বৈপ্লবিক সংগ্রামের কথা জ্বালাময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। এই সকল প্রবন্ধের মারফত লেখকগণ বাঙলার যুব-সম্প্রদায়কে বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করিয়া আত্মত্যাগের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেন। 'যুগান্তর' পত্রিকাখানি কেবল বাঙলার যুব-সম্প্রদায়কেই বৈপ্লবিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে নাই, ইহার বৈপ্লবিক প্রভাব ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এমন কি সুদূর আমেরিকা-প্রবাসী গদর-বিপ্লবীরাও ইহা হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। গদর-বিপ্লবীরা নাকি 'যুগান্তর' পত্রিকার নাম অনুসারে তাঁহাদের আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনীতিক মন্দিরের নাম রাখিয়াছিলেন 'যুগান্তর-মন্দির'।১

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'যুগান্তর' সমগ্র বঙ্গদেশের শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের বৈপ্লবিক দীক্ষাদাতা রূপে গৃহীত হয়, যুব-সমাজের মধ্যে ইহা এই বৈপ্লবিক মনোভাবের জোয়ার আনিয়া দেয়। সাহসী যুবকগণ ক্রমশ অধিক সংখ্যায় 'যুগান্তর' পত্রিকার সংস্পর্শে আসিতে থাকে। এই বৈপ্লবিক চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়াই ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তারিখের 'যুগান্তর'-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে সদম্ভে ঘোষণা করা হয়:

"অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া দিতেই হইবে। আমরা আহ্বান করি সেই অশান্তিকে যাহার নাম বিদ্রোহ।"

তৎকালে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া সারা বাঙলায় অশান্তির আগুন জ্বলিতেছিল। বিপ্লবীরা সেই আগুনকে দেশময় এক বিরাট দাবাগ্নিতে পরিণত করিয়া বিদেশী ইংরেজ-শাসনকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবার জন্য এই উন্মাদনাময় আহ্বান ধ্বনিত করেন।

বিপ্লবের জন্য অস্ত্র চাই, চারিদিক হইতে দাবি আসিতে থাকে,—'অস্ত্র চাই'। 'যুগান্তর' বাঙলার যুবকদের ভরসা দিল, অস্ত্র পাওয়া যাইবে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগস্টের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়:

"দেশের মধ্যেই অস্ত্র আছে, তাহা সহজেই পাওয়া যায়, আর বোমা তৈরীর ব্যবস্থা তো আছেই। কিন্তু এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ গোপনতা অবলম্বন করিতে হইবে।" "অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিবার আর একটি চমৎকার উপায় আছে। অনেকেই জানেন, রুশ-বিপ্লবে দেখা গিয়াছে যে 'জার'-এর (রুশিয়ার সম্রাটের) সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অনেক সৈন্য রুশ-বিপ্লবীদের সমর্থক। এই সৈন্যেরা বিপ্লবের সময় বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্রশস্ত্রসহ বিপ্লবীদের পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। এই উপায়টি যথেষ্ট কার্যকরী বলিয়া ফরাসী-বিপ্লবে প্রমাণিত হইয়াছে। যে দেশের শাসকগণ বিদেশী সে দেশে বিপ্লবীদের আরও অনেক সুযোগ আছে, কারণ শাসকদের বাধ্য হইয়া ঐ পরাধীন দেশের অধিবাসীদের মধ্য হইতেই প্রায় সকল সৈন্য সংগ্রহ করিতে হয়। এই সকল দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করিয়া বিপ্লবীরা যথেষ্ট সুবিধা করিয়া লইতে পারে। যখন শাসকশক্তির সহিত প্রকৃত সংঘর্ষ আরম্ভ হয়, তখন

১। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃঃ ১০৯।

বিপ্লবীরা কেবল এই সৈন্যদেরই তাহাদের দলে পায় না, শাসকগণ ঐ সৈন্যদের হাতে যে সকল অস্ত্র দেয় তাহাও বিপ্লবীদের হাতে আসে। ইহা ব্যতীত, শাসকদের মনে ভয়ংকর ত্রাস সৃষ্টি করিয়া তাহাদের এত উৎসাহ, এত সাহস সকলই চূর্ণ করিয়া দেওয়া যায়।"

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের ২৬ তারিখের 'যুগান্তর'-এ জনৈক 'যোগী'র নাম দিয়া একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্রখানি নিম্নরূপ :

"আমি শুনতে পাই, আপনাদের পত্রিকার হাজার হাজার সংখ্যা বাজারে বিক্রয় হয়। যদি দেশের মধ্যে পনের হাজার কাগজও বিক্রয় হয়, তবে তাহা পড়ে প্রায় ষাট হাজার লোক। আমি একটি কথা এই ষাট হাজার লোককে বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। তাই এই অসময়ে আমি কলম ধরিয়াছি।..... আমি উন্মাদ, বিকৃতমস্তিষ্ক ও হুজুগপ্রিয়। যখন শুনিতে পাই, চারিদিকে অশান্তি শুরু হইয়া গিয়াছে, তখন আমার আনন্দ আর ধরে না, আমি বধির ও বাকশক্তি-হীনের মত চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। আমার নিকট চারিদিক হইতে লুণ্ঠনের সংবাদ আসিতেছে, আমি স্বপ্ন দেখি, যেন ভবিষ্যৎ গেরিলা-দলগুলি চারিদিকে অর্থ লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেছে, যেন ছোট ছোট ডাকাতির আকারে ভবিষ্যৎ-যুদ্ধ শুরু হইয়া গিয়াছে।......লুণ্ঠন! আজ আমি তোমাকে পূজা করি, তুমি আমাদের সহায় হও! তুমি এতদিন ফুলের মধ্যে কীটের মত লুকাইয়া থাকিয়া দেশের প্রাণশক্তি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছ! এবার তুমি নিজ মূর্তিতে আবার আবির্ভূত হও, যততত্র অবাধে বিচরণ কর, জনসাধারণের মনে জাগাইয়া তোল সেই পুরাতন সামরিক চেতনা!...তোমার নিকট হইতে একদিন ভরসা পাইয়াছিলাম যে, যেদিন ভারতবাসীরা তোমাকে স্মরণ করিবে, তোমার পূজা করিবে, সেদিন তুমি অর্থ দিয়া তাহাদের হাত ভরিয়া দিবে, সেই অর্থ দিয়া তাহারা নিজেদের সশস্ত্র করিয়া তুলিবে, সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উঠিবে। তাই আজ আমি তোমাকে পূজা করি।"

এই বিপ্লবী যোগী যে 'যুগান্তর'-এর বিপ্লবী পরিচালকদেরই একজন এবং "উন্মত্ততা", "মস্তিষ্ক-বিকৃতি" ও "হুজুগপ্রিয়তা" প্রভৃতি কথাদ্বারা ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে যে একটা ব্যাপক বিদ্রোহের উন্মাদনা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

'সিডিসন-কমিটি'র রিপোর্টে তাই মন্তব্য করা হইয়াছে :

"বৃটিশ জাতির (শাসক জাতির) বিরুদ্ধে তাঁহারা ('যুগান্তর'-পরিচালকগণ) একটা জলন্ত ঘৃণা জাগাইয়া তুলিতেছেন। 'যুগান্তর'-এর প্রতি ছত্রে বিপ্লবের হুঙ্কার ধ্বনিত হয়, তাঁহারা বিপ্লব সফল করিয়া তুলিবার পথ দেখান। যুবকদের ভাবপ্রবণ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এমন কোন নিন্দাবাদ, কোন কৌশলই তাঁহারা তাঁহাদের ভাবধারা প্রচারের জন্য ব্যবহার করিতে ইতস্তত করেন না।"[১]

১। উপরোক্ত সকল উদ্ধৃতিই 'সিডিসন কমিটি'র রিপোর্ট হইতে গৃহীত এবং ইংরেজী হইতে অনূদিত।

'যুগান্তর' পত্রিকার তৎকালের ঐতিহাসিক ভূমিকা যে বহুলাংশে সফল হইয়াছিল তাহা পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন।

অন্যান্য পত্রিকা

বিপ্লবী ভাবধারা প্রচারের পক্ষে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' পত্রিকার অবদানও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ব্রহ্মবান্ধবও তাঁহার এই পত্রিকার মারফত ধর্মীয় ভাবধারার ভিত্তিতে বাঙলার যুবকদের বৈপ্লবিক চেতনা জাগাইয়া তুলিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বাঙালীর আত্মশক্তি জাগাইয়া তুলিয়া তাহা ইংরেজ-বিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রামের কর্মধারায় রূপান্তরিত করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় খোলাখুলিভাবে ইংরেজ-শাসনকে অগ্রাহ্য করিতেন। এই বিদেশী শাসনের উচ্ছেদের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের পথে বোমা-পিস্তলের সাহায্য গ্রহণের জন্যও তিনি প্রকাশ্যেই আবেদন জানাইতেন। তাঁহার জ্বালাময়ী ভাষা যুব-সম্প্রদায়ের এক অংশকে প্রেরণা যোগাইলেও ব্রহ্মবান্ধব কোন বৈপ্লবিক সংগঠনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন না এবং কোন গঠনমূলক কর্মপন্থার ধার ধারিতেন না বলিয়া কেবলমাত্র ধ্বংসমূলক রচনার জন্য এই পত্রিকাখানি অধিক সংখ্যক যুবককে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ব্রহ্মবান্ধবের বন্ধু ও সহযোগী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কথায়ঃ

"এই কাগজে ক্রমাগত ধ্বংসমূলক আলোচনা বাহির হওয়ায় ইহা শিক্ষিত সাধারণের প্রিয় হয় নাই এবং ইহা বৈপ্লবিক মতাবলম্বী না হওয়ায় আমরা একটি বৈপ্লবিক কাগজ (যাহা দলাদলির বাহিরে থাকিবে) বাহির করিবার জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলাম।"[১]

এই সকল সংবাদপত্রের সহিত ইংরেজী-ভাষায় প্রকাশিত 'বন্দেমাতরম'-এর নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার সম্পাদনায় ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। অরবিন্দ পরে ইহাদের সহিত যোগদান করেন। অরবিন্দ ইতিপূর্বে বোম্বাইয়ের 'ইন্দু প্রকাশ' নামক পত্রিকায় কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের আপস-নীতির মুখোস উন্মোচন করিয়া অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এবার 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় যোগদান করিয়া তিনি নূতন বৈপ্লবিক আদর্শ ও কর্মপন্থা দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য তাঁহার বিখ্যাত 'নিউ স্পিরিট' (নবভাব) ও 'নিউ পাথ' (নূতন পন্থা) শীর্ষক প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, অরবিন্দের এই সকল রচনাই বাঙলার বৈপ্লবিক সংগ্রামের আদর্শগত ভিত্তি রচনা করিয়াছিল।

'মুক্তি কোন পথে'

বাঙলাদেশে বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টি ও সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের দিক হইতে এই পুস্তকখানির দান অসামান্য। 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত

১। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তঃ "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃঃ ২৪

কয়েকটি বাছাই-করা প্রবন্ধ লইয়াই এই পুস্তকখানি তৈরী। অরবিন্দের 'ভবানী-মন্দির--এ বৈপ্লবিক সংগ্রামের যে সকল বিষয় স্থান লাভ করে নাই, এই পুস্তিকায় সেইগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 'ভবানী-মন্দির'-এ ডাকাতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহের কোন উল্লেখ ছিল না। কিন্তু ইহাতে "বিপ্লবের উদ্দেশ্যে ডাকাতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ" সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অত্যাচারী সরকারী কর্মচারীদের হত্যার কর্মপন্থাও ইহাতে বিশেষ স্থান লাভ করে এবং বৈপ্লবিক কর্মপন্থার আরও বিকাশ সাধন করা হয়।

পুস্তকখানির প্রথমাংশে কংগ্রেসী আদর্শের 'সংকীর্ণতা ও নীচতা' সম্পর্ক তীব্র ভাষায় সমালোচনা করা হয়, তাহার পর বিপ্লব গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে একদল "বিক্ষোভ ও অশান্তি সৃষ্টিকারী" লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার পন্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইহাতে লিখিত হইয়াছিল :

"দেশের যুবকদের অসংখ্য দল এই বিক্ষোভ ও অশান্তিমূলক কার্যে যোগদান করুক, দেশের বর্তমান নেতৃবৃন্দ যে সকল ঘটনায় আমাদের অংশ গ্রহণ করিতে বলে, সেই সকল ঘটনায়ও এই দলগুলি যোগদান করুক। কিন্তু তাহাদের ইহাতে যোগদানের উদ্দেশ্য হইবে ভিন্ন, তাহাদের যোগদানের উদ্দেশ্য হইবে সমগ্র দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। এই উদ্দেশ্য লইয়া ঐ দলগুলি এই সকল ঘটনায় সর্বশক্তি লইয়া অংশ গ্রহণ করিবে এবং আন্দোলনের সম্মুখভাগে স্থান গ্রহণের চেষ্টা করিবে।.........বর্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে বিক্ষোভ ও কর্মের অন্ত নাই ; আর ভগবানের কৃপায় বাঙালীরা সর্বত্র জ্বলন্ত দেশ-প্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এই রূপ প্রচেষ্টা দ্বারা দেশের স্বাধীনতা লাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সুতরাং এই দিকে অবহেলা দেখাইলে চলিবে না। কিন্তু সর্বদা অন্তরে স্বাধীনতার আদর্শ জাগরুক রাখিয়া এই সকল আন্দোলনে যোগদান না করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয় শক্তি ও শিক্ষা আয়ত্ত করা কোন দিনই সম্ভব হইবে না। সুতরাং উক্ত দলসমূহের সভ্যগণকে একদিকে যেমন নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও নিজ নিজ দলের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করিতে হইবে, তেমনি অন্যদিকে উক্ত কর্মপন্থা ও বিক্ষোভ সৃষ্টিদ্বারা দেশের মধ্যে উত্তেজনা জিয়াইয়া রাখিবার জন্য ধীর-স্থিরভাবে কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিতে হইবে।"

তাহার পর এই প্রকারের বৈপ্লবিক কর্মপন্থার কার্যকরী রূপ ব্যাখ্যা করিয়া কর্মীদের মনে সাহসের সঞ্চার করিবার জন্য বলা হইয়াছে ঃ য়ুরোপীয় কর্মচারীদের হত্যা করিবার জন্য খুব বেশী শক্তির প্রয়োজন হয় না, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া কাজে নামিলে অস্ত্র সংগ্রহ করাও সম্ভব, এবং কোন গোপন স্থানে নিঃশব্দে বসিয়া (বোমা প্রভৃতি) হাতিয়ার তৈরী করাও যায় ; বোমা প্রভৃতি তৈরী করিবার কৌশল শিক্ষা করিবার জন্য ভারতবাসীদের বিদেশে পাঠান চলে ; ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্য লাভের ব্যবস্থা করিতেই হইবে, দেশের দুঃখ-দুর্দশা তাহাদের উপলব্ধি করাইতে হইবে ; শিবাজীর বীরত্ব সকল সময় মনে রাখিতে হইবে ; বৈপ্লবিক কাজের গোড়ার দিকে চাঁদা

তুলিয়াই খরচ চালাইতে হইবে, কিন্তু শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বলপ্রয়োগের দ্বারা দেশের মধ্য হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে ; সমাজের মঙ্গল সাধনই যখন বিপ্লবের উদ্দেশ্য, তখন এই উদ্দেশ্যে সমাজের নিকট হইতে অর্থ আদায় করা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ; আমরা স্বীকার করি, চুরি বা ডাকাতি করা অপরাধ, কারণ ইহার ফলে সমাজের মঙ্গল বিপর্যস্ত হয়, কিন্তু রাজনীতিক ডাকাতির উদ্দেশ্য হইল সমাজের মঙ্গলসাধন। সুতরাং "বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য ক্ষুদ্র মঙ্গল বলি দিলে তাহাতে পাপ তো হইবেই না, বরং তাহাতে পুণ্য হইবে যথেষ্ট। কাজেই বিপ্লবীরা যদি সমাজের কৃপণ অথবা সৌখিন লোকদের নিকট হইতে বল প্রয়োগ করিয়া অর্থ আদায় করে, তবে তাহাদের সেই কাজ হইবে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।"

এই পুস্তকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়া বলা হইয়াছে :

"ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে।.........এই সৈন্যেরা পেটের দায়ে বিদেশী শাসকদের সরকারের অধীনে চাকরি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেও তাহারা রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। তাহারাও চিন্তা করিতে পারে ; সুতরাং বিপ্লবীরা যদি দেশের দুঃখ-দুর্দশার কথা তাহাদের বুঝাইয়া দেয়, তবে উপযুক্ত সময়ে তাহারা শাসকদের দেওয়া অস্ত্রশস্ত্রসহ বিপ্লবীদের দলে যোগদান করিয়া বিপ্লবের শক্তি বাড়াইয়া তুলিবে।.........সৈন্যদের এইভাবে বিপ্লবের পক্ষে টানা সম্ভব জানিয়াই ভারতের বর্তমান ইংরেজ শাসকগণ বুদ্ধিমান বাঙালীদের সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে দেয় না।.........ইহা ব্যতীত, বৈদেশিক শক্তিগুলির নিকট হইতেও গোপনে অস্ত্র-সাহায্য পাওয়া সম্ভব।"

'বর্তমান রণনীতি'

দেশের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম বা যুদ্ধ অনিবার্য। এই যুদ্ধের জন্য সর্বাঙ্গীণ আয়োজন আবশ্যক। 'বর্তমান রণনীতি' নামক পুস্তকে সেই সশস্ত্র সংগ্রামের আয়োজনের কথাই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানাইয়া বলা হইয়াছে :

"বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর উৎপীড়ন বন্ধ করিবার জন্য কোন উপায় নাই : বলিয়াই যুদ্ধ অনিবার্য। কর্মই (বৈপ্লবিক যুদ্ধ) দেশের মঙ্গল ও মুক্তির একমাত্র উপায়। এই কর্মের জন্যই হিন্দুরা শক্তির উপাসনা করে। কর্মই সবকিছুর মূল, অতএব কর্ম কর।.........ভারতীয় যুবকদের শক্তি-সামর্থ্য অনিয়মিত যুদ্ধে (গেরিলা-যুদ্ধে) নিয়োজিত করিতে হইবে, তাহা হইলেই তাহারা নির্ভীক ও অসিযুদ্ধে নিপুণ হইয়া উঠিবে। তাহাদের বিপদের সম্মুখে দাঁড়াইতে শিখিতে হইবে এবং বীরের গুণ আয়ত্ত করিতে হইবে। ভারতের জাতীয় সত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধের জন্য বিপ্লবীদের সামরিক শিক্ষা অপরিহার্য। ভারতবাসীদের চিরকাল পদানত করিয়া রাখিতে সুবিধা হইবে বলিয়াই শয়তান ইংরেজ তাহাদের নিরস্ত্র করিয়া রাখিয়াছে।"

ইহার পর এই পুস্তকে বিপ্লবীদের সামরিক শিক্ষা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা দেওয়া হইয়াছে। সামরিক শিক্ষার সহিত সম্পর্কযুক্ত বলিয়া ইহাতে বোমা তৈরীর

বিভিন্ন পদ্ধতি, এই সম্পর্কে বিপ্লবীদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা, বোমার কার্যকারিতা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।

সংগঠনের রূপ ও পদ্ধতি

যুগান্তর সমিতির সংগঠনের রূপ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে উক্ত দলের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের উক্তি উদ্ধৃত করা হইল :

"......শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতায় আসিয়া অগ্রে যে ভাসা ভাসা দলটি ছিল, তাহা দৃঢ়ভাবে সংগঠিত করেন। ইহারই ফলে মহারাষ্ট্রীয় এবং বঙ্গীয় বৈপ্লবিক দলের সংযোগ স্থাপিত হয় ও উপরোক্ত কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হয়।[১] কার্যের প্রণালী এই প্রকার ছিল :—সভাপতিকে সর্বপ্রকার কর্মের সংবাদ দিতে হইত। যিনি ক্লাবের অধিনায়ক হইয়া ছাত্রদের চালাইতেন তাঁহাকে কার্যের সংবাদ সভাপতিকে দিতে হইত এবং প্রত্যেক সভ্য স্বয়ং এককেন্দ্রস্বরূপ হইয়া ছাত্রদের মধ্যে কার্য করিত ও কার্যের ফল তাহার উপরিস্থিত নেতাকে জানাইত। এক কেন্দ্র অপর কেন্দ্রের কার্যের সংবাদ জানিত না। উদ্দেশ্য ছিল, একজন ধরা পড়িলে অন্য সকল কর্মীরা ও কেন্দ্রগুলি যেন ধরা না পড়ে এবং বিচ্ছিন্ন না হয়। কোন নূতন লোককে বৈপ্লবিক মতে আনয়ন করিতে পারিলে তাহাকে সমিতির মন্ত্র গ্রহণ করান হইত।[২] এই দীক্ষামন্ত্র নাকি মহারাষ্ট্র হইতে আনয়ন করা হইয়াছিল। দীক্ষায় সংস্কৃত ভাষা, হিন্দুশাস্ত্র, তরবারি ও প্রতিজ্ঞা বিশেষ উপকরণ ছিল। দীক্ষিত ব্যক্তি দীক্ষাদাতার নাম কাহারও কাছে ব্যক্ত করিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, এই প্রতিজ্ঞা তাহাকে করিতে হইত। দীক্ষায়, আমার যতদূর মনে হয়, 'ধর্মরাজ্য' স্থাপনের চেষ্টার কথা বলা হইত। ইহাতে মহারাষ্ট্রীয় প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হইত, কারণ ইহা স্বামী রামদাসের আদর্শ ছিল। জানি না, অহিন্দুর বেলায় কি ব্যবস্থা হইত। তবে আসল কথা এই যে, গুপ্ত-সমিতিতে অহিন্দু-সভ্য বেশী ছিল না।......আমি কেবল হিন্দুশাস্ত্রের নামে প্রতিজ্ঞা করিতে অস্বীকার করাতে আমার জন্য উদার ব্যবস্থা (বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের পুস্তক স্পর্শ করান) হইয়াছিল।

"সমিতির সভ্যদের জন্য সামরিক কড়া নিয়ম (discipline) প্রচলনের চেষ্টা সর্বদা করা হইত। একজন অপরের বিষয়ে কৌতুহলী হওয়া বা প্রকাশ্য স্থলে কাহারও সঙ্গে আলাপ করা নিষিদ্ধ ছিল। প্রত্যেক ছাত্রকে তাহার দীক্ষাদাতা এবং যিনি তাহার চালক হইতেন তাঁহার হুকুম মান্য করিতে হইত। ...প্রত্যেক সভ্যকে প্রচারের কার্য করিতে হইত। কেহ হেদুয়ায়, কেহ গোলদীঘিতে, কেহ কলেজে বা হোস্টেলে, কেহ বা বার-লাইব্রেরীতে—যিনি যেখানে পারিতেন অন্য লোককে স্বমতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেন।...

১। মহারাষ্ট্রীয় দলের সহিত বঙ্গীয় দলের সংযোগ সাধনের কারণ এই যে, অরবিন্দ ইতিপূর্বে মহারাষ্ট্রীয় দলের সভ্য হইয়াছিলেন—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে

২। 'ভবানী-মন্দির' পুস্তিকায় এই মন্ত্রের সারাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

"কর্মক্ষেত্রে বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ব্যায়াম-ভূমি স্থাপন করিয়া ছাত্রদের আহ্বান করা হইত। সেখানে ব্যায়াম শিক্ষার সঙ্গে স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক কথার চর্চা ও সঙ্গীত, ম্যাৎসিনির আত্মজীবনী, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের পুস্তকাবলী ও দেউস্করের (সখারাম দেউস্করের) 'দেশের কথা' পাঠ, স্বদেশী কাপড় ব্যবহার, শিবাজী, প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম-উৎসব, 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের প্রচলন ইত্যাদি অনুষ্ঠান হইত। এই সকল আখড়ায় স্থানীয় শিক্ষক বা যুবক উকিল বা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোক চালক হইতেন।"[১]

সভ্যসংগ্রহ-পদ্ধতি

গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সমিতির পরিচালকগণ সভ্যসংগ্রহের কার্যে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। বিভিন্ন গুপ্ত-সমিতির সভ্যসংগ্রহ-পদ্ধতি ছিল প্রায় অভিন্ন। মহারাষ্ট্র ও বাঙলা দেশের নেতৃবৃন্দ সকলেই এই উদ্দেশ্যে শিক্ষিত হিন্দু যুব-সম্প্রদায়কেই বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রধান ও একমাত্র শক্তি বলিয়া গ্রহণ করেন। এই যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের লইয়া বিপ্লবের সৈন্যদল গঠন করাই ছিল বিপ্লবী সমিতিগুলির প্রধান লক্ষ্য। এ বিষয়ে ম্যাৎসিনির আদর্শ মহারাষ্ট্র হইতে বাঙলাদেশ পর্যন্ত সকলেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন সমিতির কর্ম-পদ্ধতির পার্থক্যের জন্য উহাদের সভ্যসংগ্রহ-পদ্ধতিতেও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যে সকল সমিতি প্রচারধর্মী ছিল, অর্থাৎ যে সকল সমিতি সংবাদপত্র প্রভৃতির দ্বারা বিপ্লবের আদর্শ যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করিয়া তাহাদের বৈপ্লবিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা বিশেষ করিয়া প্রচার-কার্যের দ্বারাই ছাত্রদের প্রথমে সমিতির দিকে আকর্ষণ করিত। সাধারণত ইহার পরেই তাহারা আখড়া ও আলাপ-আলোচনার সাহায্য গ্রহণ করিত। মহারাষ্ট্রীয় সমিতি ও বাঙলার যুগান্তর-সমিতি এই পদ্ধতি অনুসরণ করিত। কিন্তু বাঙলাদেশের অনুশীলন-সমিতি সংবাদপত্রের মারফত প্রচারের বিরোধী ছিল বলিয়া উহা কেবলমাত্র গোপনে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা ও ব্যাখ্যা-কার্যের পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল। আখড়া ও স্কুল-কলেজগুলি ছিল তাহাদের সভ্য-সংগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র।

মহারাষ্ট্রদেশে পুণা হইতে প্রকাশিত 'কেশরী', 'কাল' ও 'বিহারী' পত্রিকা এবং বাঙলাদেশের যুগান্তর-সমিতির 'যুগান্তর' ও 'নবশক্তি' পত্রিকা যুব-সম্প্রদায়, বিশেষ করিয়া ছাত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচারের দ্বারা তাহাদের গুপ্ত-সমিতির দিকে আকর্ষণ করিত। এই সকল পত্রিকা, বিশেষত বাঙলাদেশের 'যুগান্তর' এই কার্যে সর্বাপেক্ষা বেশী সাফল্য লাভ করিয়াছিল। 'যুগান্তর' পত্রিকার অগ্নিবর্ষী রচনা ছাত্র, শিক্ষক প্রভৃতি যুব-সম্প্রদায়ের সকল অংশকেই সমানভাবে বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া গুপ্ত-সমিতির দিকে আকর্ষণ করিত। 'যুগান্তর'-এর বৈপ্লবিক রচনা কিভাবে শিক্ষিত যুবকদের বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া সংগ্রামের ক্ষেত্রে টানিয়া আনিত, তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত নীচে উদ্ধৃত করা হইল:

১। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: "দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃ ৪৪-৪৭।

"আমি একজন শিক্ষক।···চন্দননগরে থাকিতে উপেন (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) আমাকে কয়েক কপি 'যুগান্তর' পত্রিকা দেখাইয়াছিল এবং তাহা আমি খুব মন দিয়া পড়িয়াছিলাম। ঐগুলি পড়িয়া আমি প্রতিজ্ঞা করি যে, আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভ করিতেই হইবে, আমি উপেনকে 'যুগান্তর' অফিসে খোঁজ করিয়া দেখিতে বলি যে, কলিকাতায় এমন কোন সংগঠন আছে কিনা যাহা বিদেশীদের কবল হইতে দেশোদ্ধার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পরদিন আমি চাতরা (শ্রীরামপুর) চলিয়া যাই এবং শিক্ষা-বিভাগে একটি চাকরি সংগ্রহের সিদ্ধান্ত করি। শিক্ষকের কাজ লইলে আমি ছেলেদের নিকট এই প্রচার করিবার সুযোগ পাইব যে, ইংরেজেরা ভণ্ডামি ও প্রতারণা দ্বারা আমাদের দেশ জয় করিয়াছে। আমি ভদ্রেশ্বর উচ্চ ইংরেজী-স্কুলে একটি শিক্ষকের পদ লাভ করি।"[১]

অপর একজনের বিবৃতি: "যখন সরকার বঙ্গভঙ্গের সময় আমাদের আবেদন শুনিতে অস্বীকার করিল, তখনই আমরা 'স্বরাজ' লাভের চেষ্টা আরম্ভ করিলাম। 'যুগান্তর' পত্রিকা হইতেই আমি প্রেরণা লাভ করিয়াছিলাম।"[২]

সেই সময় 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রচারের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যান্য যুবকগণ দলে দলে 'যুগান্তর' পত্রিকার অফিসে আসিয়া বৈপ্লবিক কার্যে আত্মোৎসর্গ করিবার বাসনা জানাইত। নেতারা তাহাদের লইয়া ক্লাশ ও আলাপ-আলোচনা চালাইতেন, কাহাকেও বা আখড়ায় পাঠাইতেন দেহ-চর্চার জন্য। তাহার পর ইহাদের দীক্ষাদানের ব্যবস্থা হইত। ইহার সহিত আখড়ার কার্য, স্কুল-কলেজে প্রচার এবং ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার মারফত সভ্য-সংগ্রহও সমানভাবে চলিত। যুগান্তর-সমিতি উহার 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে সভ্য-সংগ্রহের কার্য চালাইত তাহার একটি প্রামাণ্য বিবরণ উক্ত সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইল:

সমিতির উর্ধ্বতন পরিচালকদের "নীচে ছাত্রদের লইয়া কার্য করিবার জন্য" একজন অধিনায়ক নিযুক্ত ছিলেন। "যুবকদের ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষার জন্য" অনেকগুলি আখড়া স্থাপন করা হইয়াছিল। "কার্যের প্রণালী এইরূপ ছিল: সভাপতিকে সকল প্রকার কর্মের সংবাদ দিতে হইত। যিনি ক্লাবের অধিনায়ক হইয়া ছাত্রদের চালাইতেন তাঁহাকে কার্যের সংবাদ সভাপতিকে দিতে হইত এবং প্রত্যেক সভ্য স্বয়ং এককেন্দ্রস্বরূপ হইয়া ছাত্রদের মধ্যে কার্য করিত ও কার্যের ফল তাহার উপরিস্থিত নেতাকে জানাইত। ···কোন নূতন লোককে বৈপ্লবিক মতে আনয়ন করিতে পারিলে তাহাকে সমিতির মন্ত্র (দীক্ষা) গ্রহণ করান হইত।"

"······প্রত্যেক সভ্যকে প্রচারের কার্য করিতে হইত। কেহ হেদুয়ায়, কেহ গোলদীঘিতে, কেহ কলেজে বা হোস্টেলে, কেহ বা বার-লাইব্রেরীতে—যিনি যেখানে পারিতেন অন্য লোককে স্বীয় মতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেন।"

১। যুগান্তর সমিতির অন্যতম নেতা হৃষিকেশ কাঞ্জিলালের বিবৃতি—'সিডিসন কমিটির রিপোর্ট' হইতে উদ্ধৃত, পৃ ২১। ২। উক্ত রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত, পৃ ২১।

"বৈপ্লবিক প্রচারকের দলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রী প্রাপ্ত লোকদের সঙ্গে ক্রমাগত তর্কযুদ্ধ করিতে হইত। সেই জন্য প্রচারকদের ভারতীয় রাজনীতিক ও অর্থনীতিক তত্ত্বের সংবাদ ভাল করিয়া রাখিতে হইত।"

"ইহা হইল চিন্তাক্ষেত্রের কথা। কর্মক্ষেত্রে বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ব্যায়াম-ভূমি স্থাপন করিয়া ছাত্রদের আহ্বান কড়া হইত, যে স্থানে ব্যায়াম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক কথার চর্চা ও সঙ্গীত, ম্যাৎসিনির আত্মজীবনী, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের পুস্তকাবলী ও দেউস্করের 'দেশের কথা' পাঠ, স্বদেশী কাপড় ব্যবহার, শিবাজী, প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম-উৎসব, 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের প্রচলন ইত্যাদি অনুষ্ঠান হইত। এই সব আখড়ায় স্থানীয় শিক্ষক বা যুবক উকিল বা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোক চালক হইতেন। এই সকল বৈপ্লবিক কেন্দ্রই বঙ্গভঙ্গের সময় স্বদেশী আন্দোলনকে অন্তরাল হইতে চালাইয়াছিল, কিন্তু তৎকালে এই সব কেন্দ্র স্থাপন করা বড় সহজ কাজ ছিল না। ....."

"কর্ম যতই শক্ত হউক, বিপ্লবপন্থীরাও নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং নিজেদের কর্মের প্রভাবে বঙ্গে ও তাহার বাহিরে কেন্দ্র স্থাপনা করিয়াছিলেন। বিপ্লবপন্থীদের চেষ্টা ছিল ছাত্রবৃন্দ ও বাবুর দলকে বিপ্লবপন্থীদের অনুগামী করা এবং সুবিধা হইলে রাজরাজড়ার দলকেও বিপ্লববাদী করা। সভ্যেরা মধ্যে মধ্যে প্রচার-কর্মের জন্য বাহির হইতেন। একবার জনকতক গেরুয়া পরিয়া বাহির হইয়াছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় যাইয়া প্রচার করা, লোককে স্বমতে আনয়ন করা, তথায় সাধারণের জন্য একটা ব্যায়ামাগার স্থাপন করা ও একটা গুপ্ত কার্যনির্বাহক কমিটি গঠন করা প্রচারকদের কর্ম ছিল।"[১]

স্কুল-কলেজ

বাঙলাদেশের অনুশীলন-সমিতি প্রচার-বিরোধী ছিল বলিয়া উহার পরিচালকগণ সভ্য সংগ্রহের জন্য কেবলমাত্র ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, অর্থাৎ স্কুল-কলেজ ও আখড়ার কার্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেন। তাই সভ্য-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনুশীলন-সমিতির স্কুল-কলেজ ও আখড়া-সংগঠন ছিল যুগান্তর-সমিতি অপেক্ষা অধিকতর সুসংগঠিত ও ব্যাপক। সমিতির সভ্য-সংগ্রহ এবং সভ্যদের শিক্ষার জন্য পরিচালকদের উদ্যোগে কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল স্কুলের মধ্যে ঢাকার 'ন্যাশনাল স্কুল' ও 'সোনারং ন্যাশনাল স্কুল' ঐতিহাসিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

ঢাকার অনুশীলন-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পরিচালক পুলিনবিহারী দাস এবং তাঁহার অন্যতম সহকর্মী ভূপেশচন্দ্র রায় 'ন্যাশনাল স্কুল'-এ শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহাদের চেষ্টায় এই স্কুলটি 'সমিতির সভ্য-সংগ্রহের ও সভ্যদের শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠে।' এই স্কুলের শিক্ষকগণ ও উচ্চশ্রেণীর অধিকাংশ ছাত্র সমিতির সভ্য-সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি করিয়াছিল। এই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ

১। এই সকল উক্তি ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম' নামক গ্রন্থের বিভিন্ন পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

সমিতির জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে বহু রাজনীতিক ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমিতির কর্ম-কেন্দ্ররূপে এই স্কুলটির বিশেষ গুরুত্ব 'সিডিসন কমিটি'র রিপোর্টেও উল্লেখ করা হইয়াছে। এই রিপোর্টেও দেখা যায় যে, এই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ বহু রাজনীতিক ডাকাতি ও হত্যায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'সিডিসন কমিটি'র মতে :

"এই কুখ্যাত স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে এবং 'ঢাকা-ষড়যন্ত্র-মামলা'র সময় (১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে) ইহার ছাত্র-সংখ্যা ছিল ষাট অথবা সত্তর জন। ইহার শিক্ষার মান ছিল সরকারী স্কুলের প্রবেশিকা অথবা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার মত। পাঠ্য-তালিকার সহিত ব্যায়াম এবং লাঠিখেলাও শিক্ষা দেওয়া হইত। স্কুলের অংশ হিসাবে একটা কামারশাল ও কাঠের মিস্ত্রিদের কর্মশালাকে কাঠের কাজ ও কামারের কাজ শিক্ষার জন্য ব্যবহার করা হইত। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের তালিকা ও শিক্ষার বিষয়সমূহ কখনই প্রকাশিত হইত না, ইহাতে কি কি বিষয় যে শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা জানা যায় নাই, তবে এই স্কুলে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে 'ঢাকা-ষড়যন্ত্র-মামলা' সম্পর্কে খানাতল্লাসির সময় স্কুলের লাইব্রেরীতে নিম্নোক্ত পুস্তকগুলি পাওয়া গিয়াছিল : ১। 'তিলকের মামলার ইতিহাস ও তাঁহার জীবনী' ২। সত্যচরণ শাস্ত্রী-প্রণীত 'ছত্রপতি শিবাজী ৩।,' সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস।"[১]

'বরিশাল-ষড়যন্ত্র-মামলা' সম্পর্কিত হাইকোর্টের রায়েও এই স্কুলটির গুরুত্ব উল্লেখ করা হইয়াছে। মামলার বিচারকদের মতে এই স্কুলে বসিয়া বহু রাজনীতিক ডাকাতির পরিকল্পনা করা হইয়াছিল।

"সোনারং ন্যাশনাল স্কুল'টি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন পুলিন দাসের প্রধান সহকারী মাখনলাল সেন। এই স্কুলটিও সমিতির সভ্যসংগ্রহ ও সভ্যদের শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। 'সিডিসন কমিটি'র মতে, এই স্কুলটি "ছাত্রদের উপর সাংঘাতিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং ইহা বহু ডাকাতির জন্য দায়ী…।"[৩]

স্কুল ও কলেজের, বিশেষত স্কুলের, ছাত্রদের উপর গুপ্ত-সমিতির প্রভাব দেখিয়া বাঙলা-সরকারের শিক্ষা-বিভাগের 'ডাইরেক্টর' তাঁহার রিপোর্টে সখেদে মন্তব্য করিয়াছিলেন :

"মাধ্যমিক স্কুলগুলির বর্তমান অবস্থা নিঃসন্দেহে প্রদেশের (বাঙলার) অগ্রগতি ব্যাহত করিতেছে। বর্তমানের এই সাধারণ অরাজক অবস্থার মধ্যে স্কুলগুলির এই দুর্দশার চিত্রটি কোন ক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে। সাধারণত কলিকাতা ও ঢাকার অন্ধকার অলিগলিগুলিকেই রাজদ্রোহ ও অপরাধমূলক ক্রিয়া-কলাপের উৎপত্তিস্থল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। কারণ, সেই সকল অলিগলিতে বসিয়াই অরাজকতামূলক ষড়যন্ত্রের পাণ্ডারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্য হইতে তাহাদের

১। Sedition Committee Report, p. 51. ২। Sedition Committee Report, p. 105, ৩। Sedition Committee Report, p. 105.

অনুচরদের সংগ্রহ করে। এই ধারণা আংশিকভাবে সত্য, কিন্তু উচ্চ ইংরেজী-স্কুলগুলিই আসল ক্ষেত্র যেগুলির শিক্ষকগণ সামান্য বেতনের জন্য বিক্ষুব্ধ, ঘরগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন ও আলো-বাতাসহীন এবং অসংখ্য ছাত্রের ভিড়ে কম্পিত ; আর শিক্ষা-পদ্ধতি হইল পরীক্ষা-পাশের উদ্দেশ্যে পড়া মুখস্থ করিবার জন্য ছাত্রদের উপর নিরবচ্ছিন্নভাবে চাপ দেওয়া, যাহার ফলে ছাত্রদের স্বাস্থ্যনাশ অবশ্যম্ভাবী। সেই স্কুলগুলিই আসল ক্ষেত্র যেখানে বিক্ষোভ ও উন্মত্ততার বীজ বপন করা হইয়া থাকে।"১

অনুশীলন-সমিতির সভ্যসংগ্রহের প্রধান দায়িত্ব ছিল উহার জেলা-সংগঠকদের উপর। এই সম্পর্কে জেলা-সংগঠকদের কর্তব্য ও কর্ম-পদ্ধতি ব্যাখ্যা করিয়া যে নির্দেশ-পত্র রচিত হইয়াছিল তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নির্দেশ-পত্রে জেলা-সংগঠকদের কর্তব্য ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে :

"জেলা-সংগঠক প্রথমে তাহার ভারপ্রাপ্ত জেলার কলেজ এবং উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী-স্কুলসমূহের সংখ্যা জানিয়া লইবে। প্রথমে সে প্রত্যেকটি ক্লাশের অন্তত একজন ছাত্রকে নিজের প্রভাবে আনিবে এবং তাহার মারফত সমগ্র ক্লাশের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার করিবে। জেলা-সংগঠনের সহিত এক-একটা স্কুলের একজন শিক্ষক বা অধ্যাপকের অধীনে একজন উচ্চশ্রেণীর ছাত্রের যোগাযোগ করিয়া দেওয়া হইবে। এই উচ্চশ্রেণীর ছাত্রটি অন্যান্য শ্রেণীর প্রধান ছাত্রদের (মনিটর) সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবে।...যদি জেলা-সংগঠক কোন স্কুলের কোন পদে লোক ঢুকাইতে চায় তবে জেলা-সংগঠককে সমিতির কেন্দ্রের নিকট ঐ লোক সম্বন্ধে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ জানাইতে হইবে : সে কোন্ সম্প্রদায়ের লোক, বয়স কত, কি পাশ, ঐ পদে সে কত বেতন পাইবে, সে ছাত্র হইলে তাহাকে কত বেতন দিতে হইবে, তাহার বাড়ী কোথায়, সে যাহার নিকট হইতে আসিয়াছে সে আমাদের লোক কিনা,—তাহাকে স্কুলে ঢুকাইলে আমাদের কাজের কোন বিশেষ সুবিধা হইবে কিনা। কেন্দ্রের প্রধান পরিচালকের (জেলা-সংগঠকের) কর্তব্য হইবে ইংরেজী প্রবেশিকা-স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বেশী করিয়া বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার করা, কারণ অল্পবয়স্ক যুবকগণই কর্ম, উৎসাহ ও আত্মত্যাগের উৎসস্বরূপ।"২

স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার করিয়া ও তাহাদের মধ্য হইতে ছাত্র বাছাই করিয়া আলোচনা এবং শিক্ষার মারফত তাহাদের সভ্যপদের উপযুক্ত করিয়া তোলা হইত। তাহার পর উপযুক্ত বিবেচিত হইলে তাহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সমিতির পূর্ণ সভ্যপদ লাভ করিতে পারিত।

উত্তর-বঙ্গের অনুশীলন-সমিতির একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও সমিতির অন্যতম প্রধান সংগঠক, পাবনাবাসী অমূল্য সরকার 'সভ্য-সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি ও স্থান"

১। Annual Report of the Director of Public Instruction, Bengal, for the year 1915-16, Quoted from V. Lovett's 'History of National Movements'. p. 26-27.

২। District Organisational Scheme of the Anusilan Samiti—Quoted from 'Sedition Committee Report', p. 113.

নামক একখানি সাংগঠনিক পুস্তিকা রচনা করেন। বলা বাহুল্য, অমূল্য সরকারের এই পদ্ধতি উত্তর-বঙ্গের অনুশীলন-সমিতি ব্যাপকভাবে অনুসরণ করিত। পুস্তিকাখানির কয়েকটি অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হইল :

১। "**প্রচার পদ্ধতি**—প্রকাশ্য বক্তৃতা দ্বারা, সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ দ্বারা এবং ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাদানের দ্বারা ;

২। "**স্থান**—স্কুল ও কলেজসমূহ, আমোদ-প্রমোদের স্থানসমূহ, ইত্যাদি ; যে সকল উৎসবাদিতে আত্মীয়-স্বজনদের সমাবেশ হয়, ইত্যাদি ; এবং জনসাধারণের হিতকর কার্যাদি ও জন-সেবা।"

৩। "**সভ্যদের শ্রেণীবিভাগ** (জীবনের কর্মক্ষেত্র অনুসারে) :

প্রথম শ্রেণী—অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালক।

দ্বিতীয় শ্রেণী—অবিবাহিত যুবকবৃন্দ।

তৃতীয় শ্রেণী—বিবাহিত যুবকবৃন্দ।

চতুর্থ শ্রেণী—বয়স্ক ও সাংসারিক লোক।

পরবর্তী শ্রেণীসমূহ (কর্ম ও উপযুক্ততা অনুসারে) :

প্রথম শ্রেণী—যে সকল বালক স্কুল-কলেজে পড়ে।

দ্বিতীয় শ্রেণী—যে সকল যুবক নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও কর্তব্য পালন করিবে।

তৃতীয় শ্রেণী—যাহারা কেবল অর্থ দিয়া সাহায্য করিবে।

চতুর্থ শ্রেণী—যাহাদের কেবল সহানুভূতি আছে।

এই শ্রেণীগুলিকে পৃথক পৃথক দল বা চক্রে সংঘবদ্ধ করিতে হইবে।"

৪। "**সভ্য-সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি** :

প্রথম পদ্ধতি—স্কুলের শিক্ষক ও কলেজের অধ্যাপকদের সাহায্যে ; ড্রিল ও ব্যায়াম-শিক্ষকদের সাহায্যে।"

"পঞ্চম পদ্ধতি—সরকারী ও বে-সরকারী ছাত্রাবাসের মারফত।"

"ষষ্ঠ পদ্ধতি—মেধাবী ছাত্র ও অল্পবয়স্ক বালকদের সহিত মিলামিশার মারফত। তাহাদের সহিত ছোট ভাইয়ের মত ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাদের যখন সাহায্যের প্রয়োজন হইবে তখন সাহায্য দিতে হইবে", ইত্যাদি।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে যখন স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন যে সকল সাধারণ ছাত্র ও যুবক বিলাতী বস্ত্র প্রভৃতির দোকানে পিকেটিং করিত তাহাদের মধ্য হইতেও গুপ্ত-সমিতির সভ্য সংগ্রহ করা হইত। এই সকল ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে যাহারা জঙ্গী মনোভাব ও সাহস দেখাইত গুপ্ত-সমিতির নেতারা তাহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া ও বৈপ্লবিক সাহিত্য পড়াইয়া তাহাদের মধ্যে বৈপ্লবিক মনোভাব জাগাইয়া তুলিতেন এবং উপযুক্ত বিবেচনা করিলে তাহাদিগকে দীক্ষিত করিয়া গুপ্ত-সমিতির সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করিতেন।

রাজনীতিক ডাকাতি

"ডাকাতি বা গুপ্ত হত্যা বীরত্বের লক্ষণ নহে। বীর জাতিরা এই সকল উপায় অবলম্বন করে না, তাহারা সম্মুখ-যুদ্ধ করে।"[১] এই সকল কথা বিপ্লবী নায়কদের অবিদিত ছিল না, তাঁহারা এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হইয়াই এই বিপজ্জনক পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু গরীব মধ্যশ্রেণীর যুবকদের অর্থ নাই, সম্পদ নাই, তাহাদের আছে কেবল "প্রবল ইংরেজ-শত্রুকে বিতাড়িত করিয়া স্বদেশের মুক্তি সাধনের" দুর্জয় সঙ্কল্প। কিন্তু "দেশের লোক টাকা দেয় না। দু'চার জন 'ব্রিফলেস্' ব্যারিস্টার, যাঁহারা নেতাগিরি করিতেন, তাহারাই কিছু কিছু সাহায্য করিতেন"। কাজেই "রাজনীতিক ডাকাতি করিয়া বৈপ্লবিক কর্মের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার মতবাদ বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতিতে প্রথম হইতেই ছিল।"[২]

কিন্তু বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, রাজনীতিক বা অরাজনীতিক যে কোন কারণেই হউক, ডাকাতি একটি সাংঘাতিক সামাজিক অপরাধ। "ইহা সর্বজন-স্বীকৃত সত্য যে, চুরি-ডাকাতি সামাজিক অপরাধ, কারণ ইহা দ্বারা সামাজিক মঙ্গলের মূলনীতি বিপর্যস্ত করা হয়। কিন্তু রাজনীতিক ডাকাতেরা সমাজের সর্বাধিক মঙ্গলের (বিপ্লবের) উদ্দেশ্য লইয়াই ডাকাতি করে। সুতরাং বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য ক্ষুদ্র মঙ্গল বিসর্জন দিলে তাহাতে পুণ্য ছাড়া পাপ হয় না।" কিন্তু তাই বলিয়া ডাকাতি দ্বারা সকলের অর্থ কাড়িয়া লওয়া চলিবে না। যে-ধনীর অর্থ সমাজের জন্য ব্যয়িত হয় না, তাহার অর্থই কাড়িয়া লওয়া উচিত। "কাজেই যদি বিপ্লবীরা সমাজের কোন কৃপণ অথবা বিলাসী সভ্যের অর্থ বলপূর্বক কাড়িয়া লয়, তবে তাহাদের কাজ সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে।"[৩] এই জন্য রাজনীতিক ডাকাতিকে ইংরেজ-বিরোধী গেরিলা-যুদ্ধের একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল।

ডাকাতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহের নীতি বিশেষভাবে বাঙলাদেশেই বৈপ্লবিক সংগ্রামের অংশ হিসাবে গৃহীত হয়, অন্যান্য প্রদেশে দুই-একটা ডাকাতি হইলেও তাহা সাধারণ নীতি হিসাবে গৃহীত হয় নাই। বাঙলাদেশের জমিদার-মধ্যস্বত্বভোগী প্রধান সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থাই বোধ হয় তাহার একমাত্র কারণ। কিন্তু বাঙলাদেশের বৈপ্লবিক সমিতিগুলির মধ্যেও ডাকাতি সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। অনুশীলন-সমিতির সভাপতি পি. মিত্র মহাশয় ডাকাতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ঢাকার অনুশীলন-সমিতি প্রথম হইতেই ডাকাতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহের পন্থা অবলম্বন করে। এই জন্য সভাপতি পি. মিত্র একবার ঢাকার অনুশীলন-সমিতির প্রধান পরিচালক পুলিনবিহারী দাসকে সমিতি হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।[৪]

১। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তঃ "দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম," পৃ ২০। ২। 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম', পৃ ১৯। ৩। "মুক্তি কোন পথে" নামক যুগান্তর-সমিতির একটি পুস্তিকা হইতে গৃহীত। ৪। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত "দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম", পৃ ১৮৭।

কিন্তু সভাপতি মিত্র মহাশয়ের প্রবল বিরোধিতা ঢাকার অনুশীলন-সমিতিকে ডাকাতির পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। ঢাকার সমিতির পরিচালকগণ ডাকাতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহের পন্থাকে বৈপ্লবিক সংগ্রামের একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়া গ্রহণ করেন এবং একদল সভ্যকে ঐ উদ্দেশ্যে বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলেন। কিন্তু এই "অসৎ কর্ম" যাহাতে এই সভ্যদিগকে ও সমিতিকে দুর্নীতির পথে লইয়া যাইতে না পারে তাহার জন্য দীক্ষার মধ্যে ডাকাতি সম্পর্কেও প্রতিজ্ঞা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। সমিতির যে সকল সদস্যকে ডাকাতির জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইত তাহাদের ডাকাতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাটি গ্রহণ করা ছিল বাধ্যতামূলক :

"স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বলিয়াই অসৎ কর্ম জানিয়াও আমরা ডাকাতি করিতে বাধ্য হই। ডাকাতি-লব্ধ অর্থ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এক কপর্দকও ব্যয় না করিয়া সমস্ত নেতার হস্তে অর্পণ করিব। তিনি প্রত্যেকের পারিবারিক অভাব বুঝিয়া যাহা আমাদের দিবেন, তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকিব।

"যাহারা দেশদ্রোহী, স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী, সরকারের গুপ্তচর, প্রতারক, মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত, অসৎ প্রকৃতির, দরিদ্র ও দুর্বলের প্রতি উৎপীড়ণকারী, যাহারা জ্ঞাতি বা দেশকে প্রতারণা করিয়া অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে, যাহারা অতিরিক্ত সুদখোর এবং ধনী অথচ কৃপণ, কেবলমাত্র তাহাদের বাড়ীতেই ডাকাতি করিব।

"শপথ করিতেছি যে আমরা ডাকাতি উপলক্ষে কোন রমণী, শিশু, দুর্বল, রুগ্ন, নিঃসহায় প্রভৃতির প্রতি কখনও কোন প্রকার অত্যাচার করিব না।"

বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র

বিপ্লবীরা ডাকাতি ও গুপ্ত হত্যার জন্য নানা প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত। প্রথম দিকে ডাকাতির জন্য এমন কি হাতুড়ি, মুগুর প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইত। রিভলভার, পিস্তল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারও কোন-কোন স্থলে প্রথম হইতেই দেখা যায়। মহারাষ্ট্রদেশে বোমা তৈরির চেষ্টা হইলেও রিভলভারই প্রায় সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু বাঙলাদেশে রিভলভার-পিস্তল অপেক্ষা বোমার দিকেই ঝোঁক ছিল বেশী। তবে ডাকাতির জন্য বোমার ব্যবহার কচিৎ দেখা যায়, এই উদ্দেশ্যে রিভলভারই ব্যবহৃত হইত বেশী। কিন্তু ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ডাকাতির জন্য আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারও খুব বেশী হয় নাই। আগ্নেয়াস্ত্রের দুষ্প্রাপ্যতাই সম্ভবত ইহার একমাত্র কারণ। আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীরা প্রথম হইতেই বোমা তৈরির দিকে বেশী দৃষ্টি দেয়। কিন্তু পরে ক্রমশ অধিক সংখ্যায় আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলেও বোমা তৈরি ও উহার ব্যবহারের উপরেই তাহারা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, বোমার কার্যকারিতা ও ধ্বংসকারী শক্তি আগ্নেয়াস্ত্র অপেক্ষা বহুগুণ বেশী।

বাঙলাদেশের বিপ্লবীরা প্রথম হইতেই বোমা তৈরির দিকে দৃষ্টি দিয়াছিল বলিয়া

১। ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত 'ভারতের বিপ্লব-কাহিনী' নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, পৃ ২৮।

বাঙলাদেশে এই ভয়ংকর অস্ত্রটি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। বাঙলাদেশের যুগান্তর-সমিতি ছিল বোমা তৈরির কাজে পথ-প্রদর্শক। যুগান্তর-সমিতির অন্যতম নায়ক উল্লাসকর দত্ত বোমা তৈরির জন্য গবেষণা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার বাড়ীতেই গোপনে একটি ক্ষুদ্র রসায়নাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সমিতির অন্যতম নায়ক হেমচন্দ্র দাস নিজের সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া ফরাসীদেশের রাজধানী প্যারী নগরীতে গিয়া উন্নত ধরনের বোমা তৈরির প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসেন।[১] তখন হইতে প্রথমে বাঙলাদেশে ও পরে ভারতের সর্বত্র ব্যাপকভাবে বোমা তৈরী ও উহার ব্যবহার হইতে থাকে। এই জন্যই সমগ্র সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক যুগ এই ভয়ংকর অস্ত্রটির নামের দ্বারা চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। তাই বৈপ্লবিক যুগের নাম হইয়াছে "বোমার যুগ", আর বিপ্লবীদের নাম হইয়াছে "বোমার দল"। বিপ্লবীরা বোমাকে যে দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং ইহার উপর যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইল :

"১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বোমার আবির্ভাব হয়। বাঙলায় বোমার আবির্ভাবের দুইটা কারণ ছিল। (ক) বাঙালী ভাব-প্রবণ, কল্পনা-প্রিয় জাতি। ইহা কোন জাতির ভাল কি মন্দ লক্ষণ তাহা জানি না; কিন্তু জানি, বাঙালী একদিকে যেমন হুজুগে, তেমনি অন্যদিকে কাজে চটপটে এবং বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া পৃথিবীর চারিদিকে দৌড়াইয়া বেড়াইতেছে। এই জন্যই বাঙলার উদ্যম চাপা রাখা যায় না।

"......আমাদের মধ্যে সকলের ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস জানা ছিল না, কিন্তু ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনী ভালভাবে জানা ছিল।...তৎপরে রুশীয় বৈপ্লবিকদের কার্যকলাপ আমরা পর্যবেক্ষণ করিতাম। নিরস্ত্র স্বদেশ-প্রেমিকতার পক্ষে জাতীয় অবমাননাকারী ও অত্যাচারীকে দণ্ড দিবার অন্য রাস্তা নাই এবং একটা 'কাপুরুষ' জাতিকে জাগাইয়া তুলিবার অন্য উপায়ও তখন ছিল না। 'কাপুরুষ' বাঙালীকে অন্যান্য প্রদেশের উপর টেক্কা দিতে হইবে—ইহাও আমাদের একটা জিদ হইয়া উঠিয়াছিল। এই সব কারণ একত্রিত হইয়াই বোমার আবির্ভাব ঘটাইয়াছিল। এক কথায়, ইহার উদ্দেশ্য ছিল যে, কংগ্রেস আবেদন-নিবেদনের পন্থাদ্বারা দেশের লোকের মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়া দিয়াছে। সেই বিনষ্ট মনুষ্যত্বকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য 'বিষস্য বিষমৌষধম' দরকার। সেই জন্য বৈপ্লবিক দলের লোক দৃঢ়-সংকল্প হইল যে, সাহস দেখাইয়া, আত্মজীবন ত্যাগ করিয়া ও অত্যাচারীকে দণ্ড দিয়া স্বাধীনতার স্পৃহা ও সাহস জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

"বোমা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মস্তিষ্কের খেয়াল বা পাগলামি নহে এবং ব্যক্তিগত চেষ্টার ফলও নহে। অনেকেই এ বিষয়ে ভাবিতেছিলেন, এবং ইহার আবির্ভাবও সমষ্টির কার্যের ফল। ভারতে বোমার আবির্ভাব বাঙালীর মানসিক ক্রমবিকাশের ফল। বাঙালীর মনস্তত্ত্ব রামমোহন রায় হইতে স্তরে স্তরে চরম পন্থার দিকে অগ্রসর

১। 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম, পৃ ১৫৩; এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষের বিবৃতি।

হইয়াছে। যদি বাঙলার ধর্ম ও সামাজিক পরিবেশে চরম পন্থার অভ্যুদয় না হইত, তবে হয়ত বাঙলায় বোমারও আবির্ভাব হইত না।"[১]

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবীরা বোমাকে তৎকালীন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির একটি চরম নিদর্শন হিসাবে দেখিতেন। তাঁহারা ইহার তাৎপর্য বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন:

"পিস্তল অথবা বন্দুক পুরাতন ধরনের অস্ত্র, আর বোমা হইল পাশ্চাত্ত্য-বৈজ্ঞানিকদের আধুনিকতম আবিষ্কার। যে পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞান নূতন কামান সৃষ্টি করিয়াছে, বন্দুক সৃষ্টি করিয়াছে, নূতন গোলা-বারুদ সৃষ্টি করিয়াছে, সেই পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞানই বোমাও সৃষ্টি করিয়াছে।……একথা সত্য যে, বোমাদ্বারা একটা গভর্নমেণ্টের সামরিক শক্তি ধ্বংস করা যায় না; একটা সৈন্য-বাহিনী চূর্ণ করিবার ক্ষমতা বোমার নাই, অথবা কোন সামরিক অভিযানের গতিরোধ করাও বোমাদ্বারা সম্ভব নহে, কিন্তু সামরিক শক্তির ঔদ্ধত্যের ফলে দেশের মধ্যে যে ভয়ংকর বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে তাহার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কেবল বোমার দ্বারাই সম্ভব।"[২]

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয়ের পিস্তলের গুলিতে র‍্যাণ্ডসাহেবের হত্যা এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীদ্বারা মজঃফরপুরে ব্যর্থ বোমা-নিক্ষেপ—এই দুইয়ের তুলনামূলক বিচারের মারফত বাঙলাদেশের বোমার কার্যকারিতা ও ইহার সুদূরপ্রসারী রাজনীতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া 'কেশরী' পত্রিকার পূর্বোক্ত সংখ্যায় লিখিত হয়:

"১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের (র‍্যাণ্ড) হত্যা ও বাঙলাদেশের বোমা-নিক্ষেপের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। সাহস ও নিপুণতার সহিত কর্তব্য সাধনের দিক হইতে বিচার করিলে বাঙলাদেশের বোমার দল অপেক্ষা মহারাষ্ট্রের চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয়ের স্থান বহু উচ্চে। কিন্তু উদ্দেশ্য ও উপায়ের দিক হইতে বিচার করিলে বাঙালীদেরই বেশী প্রশংসা প্রাপ্য। চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয় অথবা বাঙালী বোমা-নিক্ষেপকারীরা কেহই তাঁহাদের নিজেদের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য হত্যা করিতে যায় নাই; ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব বা ঝগড়া এই হত্যার উদ্দেশ্য নহে।……ইহা সাধারণ হত্যা-কাণ্ড হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্য থাকিলেও বাঙলাদেশের বোমার উদ্দেশ্য (র‍্যাণ্ড-হত্যা অপেক্ষা) অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের প্লেগের সময় পুণা-শহরবাসীদের উপর ভয়ংকর অত্যাচার চালান হইয়াছিল, তাহার ফলে ক্রোধের সঞ্চার হওয়ার মধ্যে একটা সম্পূর্ণ রাজনীতিক তাৎপর্য ছিল না। চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে, দেশের শাসন-ব্যবস্থাটাই খারাপ, যদি শাসকদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা না হয়, তবে তাহারা কখনই এই শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে সম্মত হইবে না। চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয়ের লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল প্লেগের

১। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃ ১০-১২।

২। 'Kesari', 22nd, June, 1908,—Quoted from 'Sedition Committee Report', p. 6.

মত একটা বিশেষ ঘটনার উপর, আর বঙ্গীয় বোমার লক্ষ্য ছিল বঙ্গভঙ্গের মত একটা বিশাল ক্ষেত্রের উপর প্রসারিত।"[১]

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবীরা পিস্তল বা অন্য কোন আগ্নেয়াস্ত্র অপেক্ষা বাঙলাদেশের বোমাকেই উচ্চতর স্থান দিয়াছেন, কারণ আক্রমণাত্মক অস্ত্র হিসাবে পিস্তল-রিভলভার অপেক্ষা বোমার কার্যকারিতা বহুগুণ অধিক।

বোমার শক্তি ও কার্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া বাঙলাদেশের অনুকরণে অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লবীরাও বোমা তৈরির প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন। মহারাষ্ট্রের বিনায়ক দামোদর সাভারকর প্যারী হইতে তাঁহার ভ্রাতা গণেশ সাভারকরের নিকট একটি বোমা তৈরির প্রণালী প্রেরণ করিয়াছিলেন। গণেশ সাভারকরের গৃহ খানাতল্লাসীর সময় এই প্রণালীটি পুলিসের হস্তগত হয়। এই প্রণালীটির অনুরূপ আরও কয়েকটি প্রণালী বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানি করা হইয়াছিল। তাহার একটি যুগান্তর-সমিতির গোপনকেন্দ্র 'মানিকতলা বাগান-বাড়ী' হইতে পুলিস হস্তগত করে। পরে অপর একটি হায়দরাবাদ হইতেও পুলিসের হস্তগত হয়। এই সকল প্রণালীর মধ্যে সাভারকরের প্রেরিত প্রণালীটিই ছিল অন্যগুলি অপেক্ষা অধিকতর সম্পূর্ণ ও উন্নত। সাভারকরের প্রণালীর মধ্যে পঁয়তাল্লিশ প্রকার বোমা ও 'মাইন'-এর নক্সা এবং উহা তৈরির উপায় বর্ণিত ছিল।

বিপ্লবীরা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকারের বোমা তৈরি করিয়াছিলেন। এই সকল বোমার বৈচিত্র্য ও নির্মাণ-কৌশল এমনকি শাসকদের মনেও বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছিল। কলিকাতার অত্যাচারী প্রেসিডেন্সি-ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীরা ডাকযোগে পাঠাইয়াছিলেন একখানা নির্দোষ আকারের পুস্তক। কিন্তু পুস্তকখানি ছিল একটি ভয়ংকর প্রকৃতির বিস্ফোরক বোমা। পুস্তকের ভিতরের অংশটি কাটিয়া মধ্যের শূন্য স্থলে বিস্ফোরক পুরিয়া এই অদ্ভুত বোমাটি তৈরী হইয়াছিল। কিন্তু ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বিপ্লবীরা সাধারণত গোলাকৃতি বোমাই তৈরি করিতেন। এই বোমার খোল ছিল তাম্র অথবা পিতল-নির্মিত। এমনকি ধাতু-নির্মিত প্রদীপও বোমার খোল হিসাবে ব্যবহৃত হইত। এই সকল বোমার বিস্ফোরক দ্রব্য হিসাবে সাধারণ পিক্‌রিক এসিড ব্যবহার করা হইত। প্যারী হইতে প্রেরিত বোমা তৈরির প্রণালী অনুসারেই বিপ্লবীরা এই সকল বোমা তৈরি করিতেন। বহু ক্ষেত্রে এক প্রকারের নারিকেলের বোমাও ব্যবহৃত হইয়াছিল। নারিকেলের ছোবড়াহীন খোলের মধ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য পুরিয়া ইহা তৈরি করা হইত, আর ইহা সাধারণত ব্যবহৃত হইত রেলগাড়ীর উপর। স্বভাবতই এই বোমার ধ্বংসকারী শক্তি ধাতু-নির্মিত বোমা অপেক্ষা অনেক অল্পই হইত। বাঙলাদেশে সাধারণত ব্যবহৃত হইত গোলাকার বোমা। লৌহ-নির্মিত গোলাকার খোলের মধ্যে অতি বিস্ফোরক-শক্তিসম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থ ভরিয়া উহার সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহার টুকরা দিয়া এই

১। 'Kesari' 22nd June, 1908—Quoted from 'Sedition Committee Report', p. 7.

বোমা তৈরী হইত। বোমার মুখে একটি পাট বা কাপড়ের পলিতা দেওয়া থাকিত। এই পলিতায় অগ্নি সংযোগ করিয়া বোমা ছুঁড়িয়া দিলেই ইহা সশব্দে ফাটিয়া যাইত। ইহাতে বিস্ফোরক হিসাবে সাধারণত পিক্‌রিক এসিড ব্যবহার করা হইত। ইহা তৈরি করা অপেক্ষাকৃত সহজ, অথচ ইহার বিস্ফোরণ-শক্তি খুবই বেশী, সম্ভবত এই কারণেই এই জাতীয় বোমা বিপ্লবীরা অধিক সংখ্যায় ব্যবহার করিতেন। যুগান্তর-সমিতির অন্যতম নায়ক হেমচন্দ্র দাস প্যারী হইতে বোমা তৈরী শিক্ষা করিয়া আসিয়া সিগারেট-কৌটা দ্বারা এক প্রকারের ক্ষুদ্র অথচ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন বোমা তৈরি করিয়াছিলেন। এই সকল প্রকারের বোমাই সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক যুগকে "বোমার যুগ" নামে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। বিদেশ হইতে কেহ কেহ রিভলভার তৈরির প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিলেও কখনও এদেশে বিপ্লবীরা কোন রিভলভার তৈরি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই।

●তৃতীয় ভাগ●

ভারতের প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টা ও বৈপ্লবিক গণসংগ্রাম

(১৮৯৭-১৯১৪)

প্রথম অধ্যায়

বোম্বাই প্রদেশে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা (১৮৯৭-১৯১৪)

রাজনৈতিক পটভূমিকা

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের জন্মের পর হইতে ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের পতাকাতলে নূতন জাতীয়তাবাদী ভারতের ক্রমবর্ধমান সংহতি ও সমাবেশ এবং জনগণের ক্রমবর্ধমান সংগ্রামী মনোভাব শাসকদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে। কংগ্রেসের প্রতি শাসকদের তথাকথিত সহানুভূতির পরিবর্তে দেখা দেয় তীব্র বিরূপ মনোভাব এবং তাহা ক্রমশ আক্রমণের রূপ গ্রহণ করে। কংগ্রেসের ধ্বংসই সেই আক্রমণের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। তাই ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড কার্জন সদম্ভে ঘোষণা করেন :

"কংগ্রেসের ধ্বংস আসন্ন, আর ভারতবর্ষে আমি যতদিন থাকিব ততদিন ইহার (কংগ্রেসের) শান্তিপূর্ণ মৃত্যুতে সাহায্য করাই হইবে আমার প্রধান কার্য।"[১]

একদিকে জাগরণোন্মুখ জাতীয় আন্দোলনের প্রতি শাসকদের প্রবল বিরোধিতা এবং অপর দিকে তাহাদের শাসন ও শোষণের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ জনগণের দুঃখ-দুর্দশার ক্রমবৃদ্ধি কংগ্রেসের আপসকামী নেতৃত্বকেও ইংরেজ-বিরোধী করিয়া তোলে। আবেদন-নিবেদনের পরিবর্তে তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে বিক্ষোভের সুর ধ্বনিত হইতে থাকে। এমনকি আপসপন্থী নেতৃবৃন্দের অগ্রগণ্য গোখেলেরও বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে,—

"আমলাতন্ত্রের স্বার্থান্ধতা ও ভারতের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাহাদের বিরোধিতা প্রতিদিন নগ্ন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।"[২]

এইভাবে কংগ্রেসের আপসপন্থী নেতৃত্বের বৃটিশ-বিরোধী বিক্ষোভ ও চরমপন্থী নেতৃত্বের বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের মৌলিক দাবি যুক্ত হইয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথ প্রস্তুত করে। আবেদন-নিবেদনের পরিবর্তে জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের ধ্বনি ঘোষিত হয়। তাহারই ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বিভিন্ন ভাবধারাসহ একটি প্রচণ্ড আন্দোলন গড়িয়া উঠিতে থাকে, ইহার মধ্য দিয়া জনগণের দীর্ঘকালের পদ-দলিত আত্মমর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার গভীর আগ্রহ উদ্দাম হইয়া উঠে। এই আন্দোলন হইতেই পরবর্তী দশকে একটা সুস্পষ্ট জাতীয় বিক্ষোভের প্রথম জোয়ার দেশকে প্লাবিত করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে একটা ভয়ংকর প্লেগের মহামারী সারা ভারতবর্ষকে ছারখার

১। Ronaldshay : 'Life of Lord Curzon', Vol. II. p. 511.

২। Gokhel's Speech—Quoted from Dr. Seetaramiya's "History of Indian National Congress", p. 111.

করিয়া দিতে থাকে এবং ১৮৯৬ হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী ছুর্ভিক্ষ ভারতের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশকে সর্বস্বান্ত করিয়া ফেলে। দাদাভাই নৌরজির ন্যায় আপসপন্থী নেতাও বলিতে বাধ্য হন যে, "ইংরেজরা ভারতের নৈতিক ও বৈষয়িক জীবন উচ্ছন্নে দিয়াছে।" এই ছুইটি ঘটনার ফলে ভারতীয় সমাজে যে ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের আসল রূপ আরও নগ্ন হইয়া পড়ে। কংগ্রেসের জন্ম হইতেই ভারতের মধ্যশ্রেণী কংগ্রেসকেই তাহাদের সংগ্রামী সংগঠন বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইহার পতাকাতলে ক্রমশ অধিক সখ্যায় মিলিত হইতেছিল। এই ছুই ঘটনার ফলে তাহাদের সংগ্রামী চেতনা আরও দ্রুত বিকাশ লাভ করে।

ছুর্ভিক্ষ ও প্লেগের মহামারীর সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অপেক্ষাও ভয়ংকর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ভারতের আর্থনীতিক ও রাজনীতিক জীবনকে পিষ্ট করিয়া ফেলিতে উদ্যত হয়। লর্ড ডাফ্‌রিন-এর পর লর্ড ল্যান্সডাউন ভারতের বড়লাট হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে "১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুনের অপরাধ" অনুষ্ঠিত হয়। এতদিন ভারতবাসীরা নিজেদের ইচ্ছামত সরকারী টাঁকশালে রৌপ্য রৌপ্য-মুদ্রায় পরিবর্তিত করিতে পারিত। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন আইনসভার নির্বাচিত সদস্যদের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া বড়লাট এমন একটি আইন পাশ করাইয়া লন যাহাদ্বারা ভারতীয়দের রৌপ্য ইচ্ছামত মুদ্রায় পরিবর্তিত করিবার অধিকার হরণ করা হয়। সি. ওয়াই. চিন্তামনি[১] তাঁহার গ্রন্থে বড়লাটের এই কুকর্মকে "১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুনের অপরাধ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই আইনের দ্বারা রৌপ্য-মুদ্রার উপর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বলবৎ করিয়া ভারতীয়দের উপর এক বিপুল পরোক্ষ-করভার চাপাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার ফলে ভারতের কয়েকটি ক্রমবর্ধমান শিল্প ও ব্যবসা বিশেষ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ এই আইনের ফলে ইংরেজ-কর্মচারীদের যে ক্ষতি হয় তাহা পূরণ করিবার জন্য তাহাদের ক্ষতিপূরণ-ভাতা দিবার ব্যবস্থা হয়। এই আইন যে বৃটিশ-বণিকগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার জন্যই করা হইয়াছিল তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীই বুঝিতে পারে। ইহার ফলে সমগ্র ভারতে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং সেই বিক্ষোভের প্রতিধ্বনিরূপে ঐ বৎসর লাহোর-কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে ইংরেজ-শাসকদের বিরুদ্ধে সতর্ক-বাণী ও তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া প্রস্তাব পাশ হয়।

আর্থিক ক্ষতি ছাড়াও শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণ জাতীয়তাবাদী মধ্যশ্রেণীর মনে এক প্রচণ্ড বিদ্রোহের ভাব জাগাইয়া তোলে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ শাসকগণ আরও ছুইটি শোষণ ও উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রথমটি হইল বৃটিশ বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের নির্দেশে ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্যের উপর একটি বিশেষ উৎপাদন-শুল্ক স্থাপন এবং অপরটি হইল কোন অঞ্চলে গণ-বিক্ষোভ দেখা দিলে সেই অঞ্চলে পুলিস বসাইবার ব্যয় বাবদ 'পিটুনি-কর' আদায়ের ব্যবস্থা। এই ছুই ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও সমগ্র দেশে বিক্ষোভের ঝড় উঠিতে থাকে এবং ঐ বৎসর মাদ্রাজ-কংগ্রেসের অধিবেশনে

১। C. Y. Chintamani : Indian Politics since the Mutiny.

ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া প্রস্তাব পাশ হয়। কিন্তু এই বিক্ষোভ এবং এত প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার আরও ভয়ংকর উৎপীড়নের দ্বারা ভারতের জাগ্রত জাতীয়তাবাদকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার আয়োজন করে। ইতিপূর্বে গণ-বিক্ষোভ ও গণ-সংগ্রাম দমন করিবার জন্য বিদেশী শাসকেরা যে সকল দমনমূলক আইন তৈরি করিয়াছিল এবার "তাহারা সেইগুলিই পুরাতন অস্ত্রাগার হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া" ক্রমবর্ধমান জাতীয় বিক্ষোভ পিষিয়া মারিবার জন্য তাহা প্রয়োগ করে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত তিনটি পুরাতন আইন "পুনরুজ্জীবিত" করিয়া তোলা হয়ঃ (১) ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫নং বোম্বাই-রেগুলেশন, (২) ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২নং বেঙ্গল-রেগুলেশন[১] এবং (৩) ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২নং মাদ্রাজ-রেগুলেশন। এই তিনটি পুরাতন আইন একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবার ফলে ভারত-সরকার ইচ্ছা করিলে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া বিনাবিচারে বহিষ্কার, আটক প্রভৃতির ক্ষমতা লাভ করে।[২] ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড এলগিন। এই বৎসর বড়লাট জব্বলপুর পরিদর্শন করিতে আসিয়া যে উপহাস-সূচক উক্তি করেন তাহাতে ভারতীয় জনগণের ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের প্রতিজ্ঞাই দৃঢ়তর হইয়া উঠে। যখন দুর্ভিক্ষ-কমিশনের ভাষাতেই দুর্ভিক্ষের ফলে "কীট-পতঙ্গের মত মানুষ মরিতেছিল", তখন বড়লাট উক্ত প্রদেশের সমৃদ্ধি ও জনসাধারণের সুখের জন্য উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তাঁহার এই উচ্ছ্বাসকে জনসাধারণ তাহাদের দুর্ভাগ্যের প্রতি উপহাস বলিয়া ধরিয়া লয়। তাহাদের বিক্ষোভ চারিদিকে ব্যাপক বিদ্রোহের আকারে দেখা দিতে থাকে; বড়লাট লর্ড এলগিন পদানত ভারতবাসীর এই স্পর্ধায় ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাহাদের এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন:

"তরবারি দ্বারাই ভারতবর্ষ জয় করা হইয়াছিল, আর তরবারি দ্বারাই ভারতবর্ষকে পদানত রাখা হইবে।"[৩]

বড়লাটের এই অস্ত্রের আস্ফালন চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী যুবশক্তির ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া দেয়, তাহারা দাম্ভিক শাসকের এই অস্ত্রের আস্ফালনের উপযুক্ত জবাব দিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া এক নূতন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। যুবশক্তির ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ এবার সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করে

অত্যাচারের প্রতিশোধ

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মতই মহারাষ্ট্রের পুনাশহর প্লেগের মহামারীতে উজাড় হইয়া যায়। বড়লাট 'প্লেগ-নিবারক আইন' নামক এক আইন পাশ করিয়া প্লেগ নিবারণ করিবার আয়োজন করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনাশহরে প্লেগ-নিবারণের কর্তা হইয়া আসেন র‍্যাণ্ড নামে এক ইংরেজ কর্মচারী। প্লেগ দূর করিবার নামে

১। এই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশন বাংলার ওয়াহাবী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রয়োগ করা হইয়াছিল।

২। C. Y. Chintamani : "Indian Politics Since the Mutiny", p. 46-48

৩। C. Y. Chintamani ; 'Indian Politics Since the Mutiny', p. 48.

প্লেগ-কমিশনার র‍্যাণ্ডসাহেব পুনাশহরে যে অত্যাচার আরম্ভ করেন তাহা প্লেগ অপেক্ষাও অধিক ভয়ংকর হইয়া উঠে। প্লেগ-নাশক ব্যবস্থার ফলে শহরবাসীরা গৃহহারা হইয়া মুক্ত আকাশ-তলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, কত শহরবাসী তাহাদের সম্পত্তি হারায়, 'প্লেগ-বিরোধী বাহিনী'র সৈন্যদের হাতে স্ত্রীলোকেরা লাঞ্ছনা ভোগ করে, শহরবাসীর দুর্দশা চরমে উঠে। কমিশনার র‍্যাণ্ড শহরবাসীদের প্রতিবাদ গ্রাহ্য না করিয়া প্লেগ দূর করিবার নামে প্লেগ অপেক্ষাও ভয়ংকর অত্যাচার চালাইতে থাকেন।

ভারতের নবজাগ্রত জঙ্গী জাতীয়তাবাদের প্রধান কেন্দ্র এবং বাল গঙ্গাধর তিলকের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত পুনার অধিবাসীরা কমিশনার র‍্যাণ্ডের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তিলক তাঁহার 'কেশরী' পত্রিকায় জ্বালাময়ী ভাষায় লিখিত এক প্রবন্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করেন যে, এই অত্যাচার "কেবল নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মচারীদেরই নহে, স্বয়ং সরকারেরই ইচ্ছাকৃত"। প্রবন্ধে বলা হয় যে, যে-সরকার স্বয়ং এই অত্যাচারের আদেশ দিয়াছে সেই সরকারের নিকট আবেদন করা বৃথা।[১]

১৫ই জুন, 'শিবাজীর রাজ্যাভিষেক-উৎসব'-এর দিন। এবারের উৎসবে অত্যাচারী ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ করিবার আহ্বান জানানো হইল। উৎসবের জন-সমাবেশে বক্তারা একে একে এই আহ্বান ধ্বনিত করিলেন:

"যদি কেহ দেশের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া দেশকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতে থাকে তবে তাহাকে কাটিয়া টুক্‌রা করিয়া ফেল, অন্যের পথে বাধা সৃষ্টি করিও না···।"

ইংরেজের অত্যাচারের জবাবে কর্তব্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়া আর একজন বক্তা বলিলেন:

"যাহারা ফরাসী-বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা কখনও স্বীকার করে নাই যে তাহারা হত্যা করিয়াছে, তাহারা জোর দিয়া বলিত যে, তাহারা তাহাদের পথের কাঁটা তুলিয়া ফেলিতেছে। মহারাষ্ট্রেও সেই যুক্তি খাটিবে না কেন?" স্বয়ং তিলকের নির্দেশ আরও স্পষ্ট: শিবাজী "অতি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া আফজল খাঁকে হত্যা করিয়াছিলেন। যদি আমাদের গৃহে চোর প্রবেশ করে, আর যদি সেই চোরকে তাড়াইবার শক্তি আমাদের না থাকে, তবে এক মুহূর্ত ইতস্তত না করিয়া সেই চোরকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া অগ্নিসংযোগে জীবন্ত হত্যা কর।···মহৎ ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর।"[২]

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেকের ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে পুনা শহরের গণেশখিন্দ অঞ্চলের সরকারী ভবনে ধুমধাম ও উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। একদিকে প্লেগের মহামারী ও প্লেগনিবারক ব্যবস্থার অত্যাচারে শহরবাসী জর্জরিত, গৃহহারা, ধন-সম্পদহারা, অপর দিকে বিপুল অর্থ

১। 'Sedition Committee Report', p. 2.

২। 'Sedition Committee Report', p. 3.

ব্যয় করিয়া শাসকগণ আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত। পুনার দুই সাহসী যুবক এই অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা লইয়া পথে বাহির হইলেন। এই যুবকদ্বয়ের একজন হইলেন এক গোপন বৈপ্লবিক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা দামোদর চাপেকার, আর অপর জন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বালকৃষ্ণ। তাহারা প্রথমে "তাঁহাদের আর্য-ভ্রাতাদের অন্তর আনন্দে ও ইংরেজদের অন্তর দুঃখে ভরিয়া দিয়া নিজেদের রাজদ্রোহী বলিয়া চিহ্নিত করিবার জন্য" স্বদেশের পরাধীনতার কলঙ্কস্বরূপ বোম্বাইয়ের মহারানী ভিক্টোরিয়ার মর্মরমূর্তিতে আলকাতরা লেপন করেন।

২২শে জুন রাত্রিকালে মহারানীর রাজ্যাভিষেক-উৎসবে আমোদ-প্রমোদ শেষ করিয়া প্লেগ-কমিশনার র‍্যাণ্ডসাহেব আয়ার্স্ট নামক অপর এক সাহেবের সহিত বাড়ী ফিরিতেছিলেন। চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয় রিভলভার লইয়া পথে তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত, অত্যাচারী প্লেগ-কমিশনার র‍্যাণ্ড হইবেন ভারতের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার প্রথম বলি এবং দরিদ্র ও লাঞ্ছিত ভারতবাসীদের অর্থে সাম্রাজ্যবাদীদের এই উৎসব-রাত্রিই সেই বলিদানের উপযুক্ত সময়। তাই চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদের রিভলভার উদ্যত করিয়া পথের উপর কমিশনার র‍্যাণ্ডের জন্য অপেক্ষমান। সঙ্গীসহ র‍্যাণ্ড নিকটবর্তী হইবামাত্র তাঁহাদের রিভলভার গর্জিয়া উঠিল, সাহেবদ্বয়ের দেহ ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।[১]

কমিশনার র‍্যাণ্ডই ছিলেন বিপ্লবীদের লক্ষ্য, আয়ার্স্ট সাহেবের হত্যা একটা দুর্ঘটনা মাত্র। পুনার পুলিস জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দামোদর চাপেকারকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। দুইটি নরহত্যার অপরাধে বিচারক তাঁহার ফাঁসির হুকুম দেন। দামোদর চাপেকার হইলেন ভারতের এই নূতন বৈপ্লবিক যুগের প্রথম শহীদ।

দামোদরের ফাঁসির পরেও তাঁহার বৈপ্লবিক সঙ্ঘের কাজ বন্ধ হইল না, বরং তাহা আরও জোরের সহিত চলিতে থাকে। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এই সঙ্ঘের সভ্যগণ পুনার চীফ কনেস্টবলকে হত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ঐ বৎসর এই উদ্দেশ্যে আবার চেষ্টা চলে, কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হয়। ইহার পর বিপ্লবীরা পুনাবাসী দুই গোয়েন্দা-ভ্রাতাকে হত্যা করে। কারণ, এই দুই ভ্রাতার সংবাদের উপর নির্ভর করিয়াই পুলিস দামোদর চাপেকারকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল এবং এই গোয়েন্দাগিরির জন্য সরকার উক্ত দুই ভাইকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়াছিল। এই সকল হত্যা-প্রচেষ্টা ও গোয়েন্দা-হত্যা সম্পর্কে চাপেকার-সঙ্ঘের কয়েকজন সদস্যকে (দামোদরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহ) গ্রেপ্তার করিয়া একটি ষড়যন্ত্র-মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলার বিচারে দামোদরের কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ চারিজনের প্রাণদণ্ড ও একজনের দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

সরকারী দমননীতি

ইতিমধ্যে দাক্ষিণাত্যের এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা অঙ্কুরে বিনাশ করিবার জন্য ইংরেজ শাসকগণ উন্মত্ত হইয়া আক্রমণ আরম্ভ করে। পুনার উপর দিয়া ভয়ংকর উৎপীড়নের

[১] 'Sedition Committee Report', p. 3.

ঝড় বহিয়া যাইতে থাকে। ইতিপূর্বে সরকার যে সকল পুরাতন দমনমূলক আইন তৈরি করিয়া রাখিয়াছিল, এবার সেইগুলির প্রয়োগ আরম্ভ হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুনের 'কেশরী' পত্রিকায় "রাজদ্রোহ"মূলক প্রবন্ধ লিখিবার অভিযোগে স্বয়ং বাল গঙ্গাধর তিলককে গ্রেপ্তার করিয়া বিচার করা হয়। বিচারে দেড় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া মহারাষ্ট্র-কেশরী তিলক কারাগারে আবদ্ধ হন। বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপের সহিত সম্পর্ক রাখিবার অভিযোগে সরকার পুনার বিখ্যাত নাটু-পরিবারভুক্ত দুই ভ্রাতাকে '১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫নং আইন' অনুসারে নির্বাসিত করে। কিন্তু তিলককে অপসারিত করিয়াও পুনায় বৃটিশ-বিরোধী প্রচারের কণ্ঠরোধ করা সম্ভব হইল না। শিবরাম মহাদেব পরাঞ্জপে দ্বারা সম্পাদিত 'কাল'নামক বিখ্যাত মারাঠী পত্রিকাখানি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যাচারী ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে মারাঠী যুবসম্প্রদায়কে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পরাঞ্জপেকে "রাজদ্রোহ" প্রচারের জন্য সরকার হইতে কঠোর ভাষায় সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। নির্ভীক পরাঞ্জপে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজের কর্তব্য চালাইয়া যান। ইহার পর ১৯০০, ১৯০৪, ১৯০৫ এবং সর্বশেষে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে শেষ বারের মত সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর তিনি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীদ্বারা মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষেপ সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ রচনার জন্য "রাজদ্রোহ"-এর অভিযোগে গ্রেপ্তার ও উনিশ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পুনার 'বিহারী' নামক অপর একখানি সংবাদপত্র সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখিবার জন্য অক্লান্তভাবে যুবসম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করিতে থাকে। ১৯০৬, ১৯০৭ ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকার তিনজন সম্পাদক "রাজদ্রোহ"মূলক প্রবন্ধ রচনার অভিযোগে পর পর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই উন্মত্ত দমননীতি সত্ত্বেও তিলকের 'কেশরী' পত্রিকা সংগ্রামের পুরোভাগে থাকিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃটিশ-বিরোধী প্রচার-কার্য চালাইতে থাকে এবং প্রতিদিন ইহার বিক্রয়-সংখ্যা বাড়িয়া চলে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সরকারের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ইহার বিক্রয়-সংখ্যা বিশ হাজারে পরিণত হয়। তৎকালে ইহা নিরবচ্ছিন্নভাবে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবীদের রুশিয়ার বৈপ্লবিক সংগঠন-নীতি ও কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করিবার নির্দেশ দান করিত।"[১]

কংগ্রেসের প্রতিবাদ

মহারাষ্ট্রের উপর সরকারের এই উন্মত্ত দমননীতির বিরুদ্ধে সারা ভারতে প্রতিবাদের ঝড় উঠিতে থাকে। এমনকি কংগ্রেসের আপসপন্থী নেতৃবৃন্দও এই বর্বরতার প্রতিবাদ না করিয়া পারেন নাই। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের অমরাবতী-অধিবেশনে বিশিষ্ট উদারপন্থী নায়ক স্যার শঙ্করণ নায়ার অধিবেশনের সভাপতি-হিসাবে নাটু-ভ্রাতৃদ্বয়ের বহিষ্কার ও বাল গঙ্গাধর তিলকের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং অধিবেশনের সদস্যদের সম্মতি লইয়া তিলকের

১। 'Sedition Committee Report', p. 4-5.

'মারাঠা' নামক সংবাদপত্র হইতে নিম্নোক্ত উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া পুনায় সরকারী অত্যাচারের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন :

"এই শহরে (পুনায়) মনুষ্যরূপী প্লেগের (ইংরেজ-সরকারের) যে অত্যাচার চলিতেছে তাহা অপেক্ষা প্লেগ-রোগ আমাদের প্রতি অনেক বেশী সদয়।"[১]

কংগ্রেসের এই তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও শাসকগণ উন্মত্তভাবে দমননীতি চালাইতে থাকে। ভারত-সরকার ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দেই 'রাজদ্রোহ"মূলক অপরাধের সহজ বিচার ও কঠোর দণ্ড দানের ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি নূতন আইন পাশ করে। ডাক-বিভাগের কর্মচারীরা যাহাতে যে কোন পার্সেল ও চিঠি খুলিতে পারে তাহার জন্যও একটি নূতন আইন পাস হয়। কংগ্রেসের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ ও দেশব্যাপী বিক্ষোভ সত্ত্বেও সরকারী দমননীতি অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। ইহার ফলে বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা, বরং তাহা প্রতিদিন বাড়িয়া সারা ভারতে বিস্তার লাভ করে।

লণ্ডন ও প্যারীর বিপ্লব-কেন্দ্র

পুনার ঘটনাসমূহ ঘটিবার অল্পদিন পরেই শ্যামজি কৃষ্ণ বর্মা[২] নামে গুজরাটের এক ভদ্রলোক বোম্বাই হইতে লণ্ডনে গমন করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বিদেশযাত্রা পলায়ন ভিন্ন অন্য কিছু নহে। তাঁহার বিদেশযাত্রা সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি পুনার বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর সহিত, বিশেষত র‍্যাণ্ড-হত্যার সহিত জড়িত ছিলেন। এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে পুলিস তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছিল। ইহা জানিতে পারিয়াই তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন।[৩]

কৃষ্ণ বর্মা কিছুদিন গোপনে বাস করিয়া ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি' নামে একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেই হন এই সঙ্ঘের সভাপতি। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এই সঙ্ঘের মুখপত্র হিসাবে 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলোজিস্ট' নামে ইংরাজী ভাষায় একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় তিনি তাঁহার সঙ্ঘের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের জন্য 'হোমরুল' বা স্বায়ত্তশাসন লাভ এবং ইংলণ্ডে সকল উপায়ে ভারতের স্বপক্ষে প্রচার-কার্য চালানই এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। কৃষ্ণ বর্মা

১। Congress Presidential speeches, Vol. I (G. A. Nateson & Co.)

২। কৃষ্ণ বর্মার পূর্ব-ইতিহাস : শ্যামজি কৃষ্ণ বর্মা ছিলেন গুজরাটের অধিবাসী ও একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে যাইয়া ব্যারিস্টার হন এবং দেশে ফিরিয়া আসিয়া ভবনগর দেশীয় রাজ্যের দেওয়ানের পদ গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর দেশ হইতে পলায়ন করিয়া লণ্ডনে গমন করেন এবং অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতভাষা ও প্রাচ্য-দর্শনের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুদিন পর কর্তৃপক্ষের সহিত মতান্তর হওয়ায় তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা এবং 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলোজিস্ট' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার লণ্ডনস্থ নিজ বাড়ীতেই 'ইণ্ডিয়া হাউস' প্রতিষ্ঠিত করেন।

৩। Sedition Committee Report, p. 5.

আয়ার্লণ্ডের 'হোমরুল' আন্দোলন হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণ বর্মা ভারতের জনগণের মধ্যে ঐক্য ও স্বাধীনতার বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ছয়টি বৃত্তি ঘোষণা করেন। প্রত্যেকটি বৃত্তির পরিমাণ ছিল এক হাজার টাকা। এই বৃত্তি লইয়া কোন ভারতীয় গ্রন্থকার, সাংবাদিক ও অন্য যে-কোন যোগ্য ব্যক্তি ভারতের বাহিরে য়ুরোপ, আমেরিকা বা অন্যত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা লাভ করুক এবং দেশে ফিরিয়া গিয়া তাহাদের সেই অভিজ্ঞতা দ্বারা দেশের মানুষকে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাইতে সাহায্য করুক—ইহাই ছিল এই শ্রেষ্ঠ স্বদেশ-প্রেমিকের উদ্দেশ্য। তাঁহার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্যারী হইতে 'এস. আর. রানা' নামক এক ভারতীয় ভদ্রলোক রাণা প্রতাপ, শিবাজী ও অন্য একজন ইতিহাস-বিখ্যাত মুসলমান-শাসকের নামে দুই হাজার টাকার তিনটি বৃত্তি ঘোষণা করেন। এইভাবে প্রথমে লণ্ডন ও পরে ফরাসীদেশের রাজধানী প্যারী নগরীতে ভারতীয় বিপ্লবীদের দুইটি কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতে থাকে

এই সময় নাসিক জেলার অধিবাসী বিনায়ক দামোদর সাভারকর নামক বাইশ বৎসর বয়স্ক এক যুবক কৃষ্ণ বর্মার বৃত্তি লইয়া লণ্ডনে আসিয়া কৃষ্ণ বর্মার সহিত মিলিত হন। ইনি পুনার ফার্গুসন কলেজ হইতে বি. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রকাল হইতেই সাভারকার বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতি অনুরক্ত হন। তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশ সাভারকার একসঙ্গে মিলিয়া ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 'মিত্রমেলা' নামে একটি সংগঠন স্থাপন করেন। 'গণপতি-উৎসব' পালনের উদ্দেশ্যেই ইহা প্রথমে গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে ইহা একটি বৈপ্লবিক সমিতিতে পরিণত হয়। ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মহাত্মা শ্রীঅগম্য গুরু পরমহংস নামক জনৈক সাধুদ্বারা পরিচালিত এক বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেন। এই সাধু দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীর ঘৃণা জাগাইয়া তুলিতেন এবং ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ করিতে বলিতেন। তাঁহার এই প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া পুনার একদল ছাত্র ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে একটি গুপ্তসমিতি স্থাপন করে। বিনায়ক দামোদর সাভারকার এই গুপ্তসমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতি সাভারকরের পরামর্শে আন্দোলন চালনার জন্য সমিতির নয় জন সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। অগম্য গুরুর পরামর্শে পুনা শহরের সকল লোকের নিকট হইতে এক আনা করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সমিতির একটি তহবিল গঠনেরও সিদ্ধান্ত হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে দামোদর সাভারকর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই গুপ্তসমিতিও ভাঙিয়া যায়। দামোদর সাভারকর লণ্ডনে আসিয়া কৃষ্ণ বর্মার সহিত মিলিত হন এবং দুইজনে একত্রে মিলিয়া পূর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ করেন।

কৃষ্ণ বর্মা ইতিপূর্বেই লণ্ডনে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া ইহার নাম রাখেন 'ইণ্ডিয়া হাউস'। ১৯০৬ ও ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ ব্যাপিয়া 'ইণ্ডিয়া হাউস' ভারতীয়দের বৈপ্লবিক

ক্রিয়া-কলাপের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠে। যে সকল ভারতীয় যুবক 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ আসিত তাহাদের কৃষ্ণ বর্মা এই শিক্ষা দিতেন :

ইংরেজেরা ভারতের মিত্র নহে ; ভারত হইতে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিতে না পারিলে ভারতের অব্যাহতি নাই; অতএব বিপ্লববাদ—সন্ত্রাসবাদ অবলম্বন করিতে হইবে। এইজন্য রুশ, পোলিশ, আইরিশ বিপ্লবীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গুপ্ত হত্যা, বিদ্রোহ, ট্রেজারী-লুণ্ঠন প্রভৃতি করিবার জন্য দলবদ্ধ হইতে হইবে।

এই সময় বাসুদেব ভট্টাচার্য নামে একজন ভারতীয় ছাত্র ও 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর সভ্য ভারত-সচিবের সহকারী লি ওয়ার্নরের গণ্ডে চপেটাঘাত করেন। ইহার ফলে ইংলণ্ডে ও সারা য়ুরোপে হৈ চৈ পড়িয়া যায়। বিচারে বাসুদেবের দশ পাউণ্ড জরিমানা হয়।

'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর ক্রিয়া-কলাপ ইংলণ্ডের শাসকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পার্লামেণ্টে 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর পরিচালক কৃষ্ণ বর্মার বিরুদ্ধে সরকারী হস্তক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা হয়। ইহার কিছুদিন পরেই সরকারী হস্তক্ষেপের আশঙ্কা করিয়া কৃষ্ণ বর্মা ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া ফরাসীদেশের রাজধানী প্যারী নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হন। বহু পূর্ব হইতেই প্যারী নগরীতে মাদাম কামা নামক একজন ভারতীয় পার্শী মহিলা, জিজিভাই নামক একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী, এস. আর. রানা নামক একজন ভারতীয় ধনী ব্যক্তি ও অপর কয়েকজন একত্রে মিলিয়া একটি বৈপ্লবিক কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। এতদিন ইহারা লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের নানাভাবে সাহায্য করিতেছিলেন। কৃষ্ণ বর্মা আসিয়া ইহাদের সহিত যোগদান করায় প্যারীর বৈপ্লবিক কেন্দ্রটি আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে। প্যারী নগরীতে আসিয়া তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে বৈপ্লবিক কাজকর্ম চালাইতে থাকেন। কিন্তু তখনও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলোজিস্ট' নামক মাসিক পত্রখানি লণ্ডন হইতেই প্রকাশিত হইত এবং ইহাতে নিয়মিতভাবে কৃষ্ণ বর্মার বৈপ্লবিক প্রবন্ধ ছাপা হইত। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সরকার কর্তৃক পত্রিকার মুদ্রাকর "রাজদ্রোহ"-এর অপরাধে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহার পর অপর এক ব্যক্তি পত্রিকাখানির মুদ্রণের ভার গ্রহণ করিলে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাহারও এক বৎসরের কারাদণ্ড হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পত্রিকাখানি প্যারী নগরী হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। এই পত্রিকাখানি মারফত প্রধানত ভারতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্বপক্ষে প্রচার-কার্য চালান হইত এবং ইহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করিয়া রুশিয়ার, বৈপ্লবিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া ভারতীয় বৈপ্লবিক সমিতিগুলির গোপন সংগঠন গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করা হইত।

ইংলণ্ড-সরকারের দমননীতি উপেক্ষা করিয়া কৃষ্ণ বর্মা প্যারী হইতে লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া-হাউস'-এর বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ পরিচালনা করিতেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে

প্যারীর এস. আর. রানা নামক ভদ্রলোকটির সাহায্য গ্রহণ করিতেন। রানাকে কৃষ্ণ বর্মার নির্দেশ লইয়া প্রায়ই প্যারী হইতে লণ্ডনে যাতায়াত করিতে হইত।

কৃষ্ণ বর্মার লণ্ডন ত্যাগ করিবার পর, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের বার্ষিক দিবস উদ্‌যাপিত হয়। প্রায় একশত প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র ইংলণ্ডের বিভিন্ন শহর হইতে আসিয়া এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানে "স্মরণীয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের" শহীদগণের উদ্দেশ্যে রচিত "শহীদদের স্মরণে" নামক একখানি প্রবন্ধ-পুস্তিকা পঠিত হয়। ইহাতে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধ'-এর শহীদদের আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য ভারতবাসীদের আহ্বান জানান হয়। এই পুস্তিকার বহু কপি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও প্রেরিত হইয়াছিল। 'কঠোর সতর্কবাণী' নামে একখানা ইস্তাহারও 'ইণ্ডিয়া হাউস' হইতে বিতরণ ও ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত এখানে প্রত্যেক রবিবার প্রবাসী ভারতীয়দের লইয়া সভা হইত এবং তাহাতে ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক সংগ্রাম পরিচালনা ও এই উদ্দেশ্যে বোমা তৈরী সম্পর্কে আলোচনা চলিত।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বিনায়ক দামোদর সাভারকর 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর প্রধান পরিচালকের পদ লাভ করেন। ঐ বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে বিনায়কের নিকট প্যারী হইতে কুড়িটি 'ব্রাউনিং' অটোম্যাটিক পিস্তলের একটি প্যাকেট প্রেরিত হয়। ভারতবর্ষে প্রেরণের জন্যই ইহা তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। তিনি ঐ পিস্তলগুলি তাঁহার ভাই গণেশের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু ঐগুলি ভারতে পৌঁছিবার পূর্বেই গণেশ গ্রেপ্তার হন। সাভারকরের নির্দেশে 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর সভ্যগণ লণ্ডনের কোন এক নিভৃত অঞ্চলে যাইয়া রিভলভার ছোঁড়া অভ্যাস করিতে থাকেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই লণ্ডনের 'ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট'-এর এক জনসভায় 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর মদনলাল ধিংরা নামক একজন মারাঠী সভ্যের রিভলভারের গুলিতে ভারত-সচিবের এ-ডি-সি স্যার উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলি নিহত হন। গ্রেপ্তারের সময় মদনলালের পকেটে যে পত্রখানি পাওয়া যায় তাহাতে এই কয়েকটি কথা লিখিত ছিল :

"অমানুষিকভাবে ভারতীয় যুবকদের দ্বীপান্তর ও প্রাণদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ক্ষীণ প্রতিবাদ হিসাবে আমি স্বেচ্ছায় ইংরেজদের রক্তপাতের চেষ্টা করিলাম।"[১]

ইহার কিছুদিন পূর্বেই মহারাষ্ট্রে কেবলমাত্র একখানি বৈপ্লবিক কবিতার পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশনার অপরাধে বিনায়ক সাভারকরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশ সাভারকর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

কার্জন ওয়াইলির হত্যার পর বৃটিশ সরকার সাভারকরকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারের জন্য তাঁহাকে জাহাজে করিয়া ভারতে প্রেরণ করে। জাহাজটি যখন দক্ষিণ-ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরে উপস্থিত হয়, তখন সাভারকর এক বিস্ময়কর উপায়ে জাহাজের স্নানঘরের ছিদ্রপথ দিয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং সাঁতার কাটিয়া সমুদ্র পার হইয়া ফরাসী দেশে প্রবেশ করেন। কিন্তু জাহাজের লোকেরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন

১। Sedition Committee Report, p. 19.

করায় তিনি ফরাসী পুলিসের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ফরাসী সরকার বৃটিশ সরকারের চাপে তাঁহাকে বৃটিশ পুলিসের হস্তে অর্পণ করে।

এই ঘটনার ফলে বৃটেন ও ভারতবর্ষে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তাঁহার বিচারের জন্য চারিদিক হইতে দাবি উঠে। কিন্তু সকল দাবি ও সকল আন্দোলন অগ্রাহ্য করিয়া বৃটিশ সরকার সাভারকরকে ভারতবর্ষে লইয়া আসে। ইহার পর বোম্বাইয়ের আদালতে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হয়। বিচারে সাভারকর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন

সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ

লণ্ডন ও প্যারীকে কেন্দ্র করিয়া যখন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা অব্যাহত গতিতে চলিতেছিল, তখন বৈপ্লবিক সংগ্রামের অগ্নি-তরঙ্গ পুনা শহরের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশকে, বিশেষত বাঙলাদেশকে প্লাবিত করিতে থাকে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী নামে বাঙলাদেশের দুইজন বিপ্লবী দ্বারা নিক্ষিপ্ত বোমায় ভ্রমক্রমে মজঃফরপুরে দুইজন শ্বেতাঙ্গ রমণী নিহত হয়। কলিকাতার অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ড সাহেবই ছিল বিপ্লবীদের লক্ষ্য। অত্যাচারী ইংরেজ-কর্মচারীর শাস্তিবিধানের উদ্দেশ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া পুনার বিভিন্ন বিপ্লবপন্থী সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখা হয়। স্বয়ং বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁহার 'কেশরী' পত্রিকায় বঙ্গীয় বোমার প্রশস্তি গাহিয়া দুইটি বৈপ্লবিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উন্মত্ত শাসকগণ এই অপরাধে নামমাত্র বিচারের পর তাঁহাকে দীর্ঘ ছয় বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। এই প্রকার প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে পুনার 'কাল' পত্রিকার সম্পাদক শিবরাম মহাদেব পরাঞ্জপে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কারাদণ্ড লাভ করেন। উন্মত্ত শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া বাঙলা ও মহারাষ্ট্রের উপর বিভীষিকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করে।

নাসিকের বিপ্লব-প্রচেষ্টা

বিনায়ক দামোদর সাভারকর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার বহু পূর্বে, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিনায়ক ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশ সাভারকার নাসিকে 'মিত্রমেলা' নামক যে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই সংগঠনটিকে গণেশ সাভারকর বিনায়কের ভারত ত্যাগের পর একটি গুপ্তসমিতিরূপে পুনর্গঠিত করেন। ম্যাৎসিনির 'ইয়ং ইটালী' নামক গুপ্তসমিতির অনুকরণে নাসিকের এই পুনর্গঠিত গুপ্তসমিতির নাম রাখা হয় 'অভিনব ভারত-সঙ্ঘ'। ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন গণেশ সাভারকর। বিনায়ক লণ্ডন হইতে এই সমিতির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন এই বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিতেন।[১]

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বিনায়ক লণ্ডন হইতে কুড়িটি 'ব্রাউনিং' পিস্তল চতুর্ভুজ আমিন নামক এক ব্যক্তির মারফত গণেশের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু

১। এই গুপ্তসমিতির সংগঠন-পদ্ধতি ও আদর্শ পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

এই অস্ত্রগুলিসহ চতুর্ভুজ ভারতে পদার্পণ করিবার এক সপ্তাহ পূর্বে পুলিস গণেশকে রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করে। গণেশ এই পিস্তলগুলির সংবাদ পূর্বেই পাইয়াছিলেন এবং এই গুলির আশায় একটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাও তৈরি করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী "সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম"-এর অভিযোগে গণেশকে গ্রেপ্তার করা হয়। 'লঘু অভিনব ভারত-মেলা' নামে একখানি বিপ্লবাত্মক কবিতার পুস্তক রচনা ও তাহা প্রকাশ করাই ছিল তাঁহার বিরুদ্ধে একমাত্র প্রমাণযোগ্য অপরাধ। গণেশের গ্রেপ্তারের সময় তাঁহার গৃহে পুলিস যাট পৃষ্ঠায় টাইপ করা একটি বোমা তৈরির প্রণালী হস্তগত করে। ইহা বিনায়ক লণ্ডন হইতে গণেশের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এই অপরাধে গণেশ সাভারকরকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

গণেশের প্রতি এই অমানুষিক দণ্ডদানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য 'অভিনব ভারত-সঙ্ঘ'-এর সভ্যগণ এক কঠোর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। গণেশের প্রতি এই প্রকার দণ্ড দানের জন্য সমগ্র মহারাষ্ট্রে ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠে। গণেশের বিচারক ছিলেন নাসিকের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাক্সন সাহেব। গুপ্ত-সমিতির সভ্যগণ জ্যাক্সনকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু নাসিকের গুপ্ত-সমিতির কোন সভ্যকে ইহার ভার দিলে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া 'অভিনব ভারত-সঙ্ঘ'-এর ঔরঙ্গাবাদ-শাখার একজন অল্পবয়সী সভ্যকে এই উদ্দেশ্যে আনয়ন করা হয়।১

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর স্থানীয় থিয়েটার-গৃহে জ্যাক্সন সাহেবকে বিদায়-সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এক জনসভার আয়োজন হয়। জনাকীর্ণ সভাগৃহে জ্যাক্সন উপস্থিত এবং ঔরঙ্গাবাদ গুপ্ত-সমিতির সভ্যটিও বিনায়কের প্রেরিত একটি ভয়ংকর 'ব্রাউনিং' পিস্তল লইয়া প্রস্তুত। জ্যাক্সন সাহেব বিদায়-সংবর্ধনার উত্তর দিতে উঠিবামাত্র উক্ত সভ্যের হস্তস্থিত পিস্তলের গুলিতে তৎক্ষণাৎ জ্যাক্সনের মৃত্যু ঘটে। অত্যাচারী বিচারক জ্যাক্সন নাসিক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে উঠিয়া ধরাধাম হইতেই চিরবিদায় গ্রহণ করেন। হত্যাকারী বিপ্লবী যুবক পলায়নের কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া পুলিসের নিকট ধরা দেন।

জ্যাক্সন-হত্যার পর নাসিকের পুলিস আতঙ্কে অস্থির হইয়া চারিদিকে উন্মত্তের মত হত্যাকারীর সহযোগীদের অনুসন্ধান করিতে থাকে এবং গণেশ সাভারকরকে কেন্দ্র করিয়া এক বিরাট ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে। এই অনুসন্ধানের ফলে মোট আটত্রিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাহাদের লইয়া বিখ্যাত 'নাসিক ষড়যন্ত্র-মামলা' আরম্ভ হয়। মামলার বিচারে সর্বসমেত সাতাশ জন দোষী সাব্যস্ত হন এবং জ্যাক্সনের হত্যা প্রভৃতির অপরাধে তিনজনের ফাঁসী ও অপর সকলের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। এইভাবে 'নাসিক ষড়যন্ত্র-মামলা'র সঙ্গে সঙ্গে নাসিকের বিপ্লব প্রচেষ্টার অবসান ঘটে।

১। 'Sedition Committee Report', p. 9.

গোয়ালিয়র রাজ্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা

'নাসিক ষড়যন্ত্র-মামলা'র সূত্র ধরিয়া পুলিস গোয়ালিয়র দেশীয় রাজ্যেও একটি ব্যাপক বৈপ্লবিক সমিতির সন্ধান পায়। পূর্বেই এই দেশীয় রাজ্যে 'নবভারত-সঙ্ঘ' নামে একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সঙ্ঘের প্রধান পরিচালক ছিলেন 'যোশী' নামে এক ব্যক্তি। যোশীর সহিত নাসিকের গণেশ সাভারকরের নিয়মিত পত্র আদান-প্রদান চলিত। সম্ভবত গণেশ সাভারকরের চেষ্টাতেই 'গোয়ালিয়র নব-ভারত-সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং গণেশের সাহায্য লইয়াই যোশী এই সঙ্ঘের কার্য পরিচালনা করিতেন। গণেশের গ্রেপ্তারের সময় তাঁহার গৃহ খানাতল্লাস করিবার কালে পুলিস যোশীর একখানি পত্র হস্তগত করে। এই পত্রের সূত্র ধরিয়াই 'গোয়ালিয়র নবভারত-সঙ্ঘ'-এর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়।

এই সঙ্ঘের আদর্শ ও ক্রিয়া-কলাপ ছিল নাসিকের 'অভিনব ভারত সঙ্ঘ'-এর অনুরূপ। "রিভলভার দ্বারা লক্ষ্যভেদ, তরবারি-চালনা শিক্ষা, বোমা ও ডিনামাইট তৈরী শিক্ষা, রিভলভার সংগ্রহ, বিভিন্ন অস্ত্রের ব্যবহার-প্রণালী শিক্ষা" প্রভৃতি বিষয়গুলি এই সঙ্ঘের অবশ্য করণীয় কর্তব্য ছিল। সঙ্ঘের গঠনতন্ত্রে ইহার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছিল :

"যে-কোন প্রদেশে একটা সাধারণ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান যখনই আরম্ভ হইবে তখনই সকলকে সেই অভ্যুত্থানে যোগদান করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। প্রথমে দেশবাসীর মন শিক্ষাদ্বারা বিপ্লবের জন্য তৈরি করিতে হইবে, তাহার পর অভ্যুত্থান আরম্ভ করিতে হইবে, আর কৌশল ও বুদ্ধি দ্বারাই স্বাধীনতা-যুদ্ধ চালাইয়া জয় লাভ করিতে হইবে।"

গণেশ সাভারকরের নিকট প্রাপ্ত যোশীর পত্রের সূত্র ধরিয়া 'গোয়ালিয়র নব-ভারত সঙ্ঘ'-এর অস্তিত্ব ও ক্রিয়া-কলাপের সন্ধান পাইবামাত্র গোয়ালিয়র রাজ্যের পুলিস রাজ্যব্যাপী গ্রেপ্তার আরম্ভ করে। সর্বসমেত একচল্লিশজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদের সহিত সঙ্ঘের পরিচালক যোশীও গ্রেপ্তার হন। এবার ইহাদের লইয়া 'গোয়ালিয়র-ষড়যন্ত্র-মামলা' আরম্ভ হয়। ভারত-সরকারের নির্দেশে গোয়ালিয়র রাজ্যের সরকার একটি স্টেট-ট্রাইবুনাল গঠন করিয়া এই মামলার বিচারের ব্যবস্থা করে। সাক্ষ্য-প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ধৃত একচল্লিশজনের মধ্যে বাইশজন 'গোয়ালিয়র নবভারত সঙ্ঘ'-এর সভ্য এবং অপর উনিশ জন 'অভিনব ভারত সঙ্ঘ'-এর সভ্য। এই মামলার বিচারে বিভিন্ন অপরাধে উনত্রিশ জনের দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়।

আমেদাবাদের গুপ্তসমিতি

গুজরাটের প্রধান শহর ও ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্প-কেন্দ্র আমেদাবাদেও বৈপ্লবিক কর্ম-প্রচেষ্টা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এখানকার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা যে মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমেদাবাদের গুপ্ত-সমিতি ও ইহার কর্ম-প্রচেষ্টার বিস্তারিত বিবরণ

এমনকি 'সিডিসন কমিটি'ও সংগ্রহ করিতে পারে নাই। কেবল একটি মাত্র ঘটনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, এখানেও একটি বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তৎকালীন বড়লাট লর্ড মিণ্টো সস্ত্রীক আমেদাবাদ ভ্রমণ করিতে আসিয়া যখন ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতেছিলেন, তখন বিপ্লবীরা ভিড়ের মধ্য হইতে তাঁহার গাড়ীর উপর দুইটি বোমা ছুড়িয়া মারেন। কিন্তু ঐ বোমাগুলির একটিও ফাটে নাই। এই দুইটি ছিল নারিকেল-বোমা। পরে একটি লোক বোমা দুইটি তুলিতে গেলে উহাদের একটি ফাটিয়া যাওয়ায় তাহার একখানি হাত উড়িয়া যায়। এই ঘটনাটি ব্যতীত আমেদাবাদের বৈপ্লবিক কর্ম-প্রচেষ্টার আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

সাতারার বিপ্লব-প্রচেষ্টা

সাতারা জেলায় বৈপ্লবিক সমিতি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। দেশের স্বাধীনতা লাভ করাই ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। এই সমিতির প্রকৃতপক্ষে নাসিকের গণেশ সাভারকরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'অভিনব ভারত সঙ্ঘ'-এর একটি শাখা হিসাবেই গড়িয়া উঠে। এই সমিতির সদস্যগণের সকলেই ছিলেন কোলাপুর ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী। 'নাসিক-ষড়যন্ত্র-মামলা'র কোন সূত্র ধরিয়াই পুলিস প্রথম ইহার সন্ধান পায় এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে এই সমিতির তিনজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার-কালে একজন সদস্য বোমা তৈরি করিতেছিলেন। ইহা ব্যতীত পুলিশ ইহাদের নিকট হইতে কতকগুলি বৈপ্লবিক সাহিত্যও হস্তগত করে। এই তিনজন সদস্যকে লইয়াই 'সাতারা-ষড়যন্ত্র-মামলা' আরম্ভ হয় এবং বিচারে তিনজন সদস্যই বিভিন্ন অভিযোগে দীর্ঘ কারাদণ্ড লাভ করেন।

পুনার শেষ বৈপ্লবিক কর্মোদ্যম

পর-পর তিনটি ষড়যন্ত্র-মামলা এবং বহু বিপ্লবী নায়ক ও কর্মীর কারাদণ্ডের ফলে মহারাষ্ট্রের বিপ্লব-প্রচেষ্টা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ইহার পর ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের কোথাও কোন বৈপ্লবিক কর্ম-প্রচেষ্টার লক্ষণ দেখা যায় নাই। কিন্তু অপর দিকে এই সময় সারা ভারতে, বিশেষত বাঙলাদেশে, বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যাপক ভাবে আরম্ভ হয়। যখন সমগ্র ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, ঠিক তখনই মহারাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়—ইহা উপলব্ধি করিয়া মহারাষ্ট্রের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যেও আবার বৈপ্লবিক চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে। মহারাষ্ট্র-কেশরী তিলকের কর্মস্থান পুনার যুবকগণই মহারাষ্ট্রের এই কলঙ্ক মোচনের জন্য অগ্রসর হন। সম্ভবত ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে তাহারা আবার নূতন করিয়া বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ আরম্ভ করেন। কিন্তু তখন আর প্রকাশ্যভাবে সংবাদ-পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রেরণা জাগাইয়া তুলিবার সুযোগ ছিল না। সরকার পূর্বেই ইহার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং পুনার বিপ্লবীরা গোপনে একটি ছাপাখানা বসাইয়া মারাঠী ভাষায় ইস্তাহার ও

পুস্তিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। দুইজন মারাঠী যুবক এই গোপন ছাপাখানায় দিবা-রাত্র কাজ করিতেন।

প্রথম ইস্তাহারটি প্রকাশিত হয় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী। ইহার কয়েক দিন পূর্বে দিল্লীতে বড়লাট লর্ড হার্ডিজ-এর উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাহার ফলে বড়লাট ভীষণ আহত হন। এই ঘটনাই ছিল প্রথম ইস্তাহারের উপলক্ষ। ইস্তাহারখানির উপরে মারাঠী ভাষায় লিখিত ছিল, "মারাঠাবাসীদের প্রতি আহ্বান", আর উহার নীচে এই স্বাক্ষর ছিলঃ "বাঙলার বিপ্লবিগণ"। এই ইস্তাহারে আবার বিপ্লব-প্রচেষ্টা আরম্ভ করিবার জন্য মারাঠী যুবকদের প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলা হয়ঃ

"মারাঠীরা এখনও চুপ করিয়া বসিয়া আছে কেন? মহারাষ্ট্রে দুই বৎসর পূর্বে কয়েকটি স্বদেশপ্রেমিক তারকা জলিয়া উঠিয়া অস্তমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কি তাহারা স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা ত্যাগ করিয়াছে? সমস্ত দেশ আশা করিয়াছিল যে, মহারাষ্ট্র কিছু অসাধারণ কর্মের দ্বারা অক্ষয় খ্যাতি অর্জন করিবে; সেই আসা কি তবে মিথ্যা? সেতুবন্ধ হইতে হিমালয় পর্যন্ত সমগ্র দেশ আজ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, আজিকার এই শুভ দিনটিতে (১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী) সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হইবে।"[১]

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবীরা 'স্বাধীনতা' শীর্ষক বহু ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছিলেন। উপরোক্ত ইস্তাহারটি সেইগুলির অন্যতম। তাঁহারা পুনার ফার্গুসন কলেজের ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানাইয়াও বহু ইস্তাহার কলেজের মধ্যে প্রচার করেন। এই প্রকারের বহু ইস্তাহার পুনার বিজ্ঞান-কলেজ এবং কৃষি-কলেজের মধ্যে প্রচার করা হয়। সর্বসমেত চারখানি 'স্বাধীনতা' শীর্ষক ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছিল। চতুর্থখানির মুদ্রণের সময় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পুলিশ এই ছাপাখানাটি আবিষ্কার করে। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই পুনা এবং সমগ্র মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার অবসান ঘটে।

১। Sedition Committee Report, p, 11.

পেশ করা হইল। সারা বাঙলার মধ্যশ্রেণী বৃটিশের এই বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।"[১]

স্বদেশী আন্দোলন

বোম্বাইয়ে প্লেগের প্রাদুর্ভাব প্রশমিত হয় এবং শ্রমিকগণ আবার শহরে ফিরিয়া আসিলে বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের এবং উহার সঙ্গে সমগ্র ভারতের বস্ত্রশিল্পের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দেই সমগ্র ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ২০৪টি এবং উহার মোট মূলধনের পরিমাণ হয় ১৭ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা।

কিন্তু ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বৃটেনের অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের বস্ত্র ভারতের বাজার তলাইয়া ফেলিতে থাকে। তাহার ফলে অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা হ্রাস পাইতে থাকে। বৃটেনের বস্ত্রশিল্পের মালিক-গোষ্ঠীর সহিত ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের মালিকগোষ্ঠীর যে স্বার্থের সংঘাত বহু পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা ক্রমশ আরও ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। এই স্বার্থের সংঘাত ক্রমশ রাজনীতিক সংগ্রামের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। এই সংগ্রামই ভারতে বুর্জোয়া জাতীয়তাবোধের প্রধান ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গভঙ্গ' উপলক্ষে যে ব্যাপক 'স্বদেশী আন্দোলন' আরম্ভ হয় তাহাতে প্রধান স্থান গ্রহণ করে বৃটিশ পণ্য, বিশেষত বৃটিশ বস্ত্র বর্জন (বয়কট)। জাতীয়তা-বাদীদের দ্বারা প্রবর্তিত এই 'বর্জন' বা 'বয়কট আন্দোলন' ভারতীয় শিল্পের প্রসারের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। এই আন্দোলনের মধ্যেই সমগ্র দেশে নূতন নূতন বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁতশিল্পও দ্রুত বাড়িয়া উঠিতে থাকে।

এই জন্যই বলা হয় যে, ভারতীয় বস্ত্রশিল্প 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর নিকট বিশেষভাবে ঋণী। এমনকি সরকারী বিবরণীতেও একথা স্বীকার করিয়া বলা হইয়াছে :

"সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন অংশে যে 'স্বদেশী আন্দোলন, দেখা দিয়াছে তাহা স্থানীয় শিল্পের বিশেষ সহায়ক হইয়াছে।"[২]

* * * *

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রায় দুই হাজার বড় বড় সভা অনুষ্ঠিত হয়, সরকারের নিকট শত শত প্রতিবাদ-পত্র প্রেরিত হয়। কিন্তু এই প্রতিবাদ ও আন্দোলন উপেক্ষা করিয়া ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ভারত-সরকার ঘোষণা করেন যে, ১৬ই অক্টোবর হইতে বঙ্গ-বিভাগ তো কার্যকরী হইবেই, এমনকি উত্তর-বঙ্গের ছয়টি জেলাও পূর্ব-বঙ্গের নূতন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই ভয়ঙ্কর আঘাতে বাঙালী মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত অংশ আবেদন-নিবেদন বা হা-হুতাশ করিল না, তাহারা ক্রোধে গর্জিয়া উঠিল। সেদিন সারা

১। Lester Hutchinson : "Empire of the Nabobs", p. 193.

২। Gazetteer of Bombay City and Island, p. 490.

ভারতবর্ষ এই বিপদে বাঙলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বাঙলার নেতৃবৃন্দ সমবেত হইয়া পরামর্শ করিলেন, তাঁহারা বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবার জন্য খুঁজিয়া পাইলেন একটি নূতন অস্ত্র। তাঁহারা বিদেশী দ্রব্য বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট কলিকাতায় এক বিশাল জন-সমাবেশে "স্বদেশী আন্দোলন" আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। এই স্বদেশী আন্দোলন বাঙলা-দেশের যুবশক্তিকে স্বদেশ-প্রেমের নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করিল। সাম্রাজ্যবাদী দৈত্যের আঘাতে এক নূতন বাঙলার—বিপ্লবী বাঙলার জন্ম হইল।

রুশ-জাপান যুদ্ধে ক্ষুদ্র ও অখ্যাত জাপানের নিকট য়ুরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশাল রুশিয়ার শোচনীয় পরাজয় হইতে বাঙলার বিপ্লবী যুবশক্তি ভরসা খুঁজিয়া পাইল। সামান্য শক্তি লইয়া ক্ষুদ্র দেশ জাপান যদি রুশিয়ার মত একটা বিশাল ও পরাক্রমশালী শক্তিকে পরাজিত করিতে পারে, তবে অফুরন্ত ধন-সম্পদের অধিকারী বিশাল ভারতবর্ষের ত্রিশকোটি মানুষ কেন বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করিতে পারিবে না? বাঙলার যুবশক্তি নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া এক নূতন বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইল। রুশ-জাপান যুদ্ধে রুশিয়ার পরাজয় হইতে বাঙলার যুব-সম্প্রদায় যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিল, তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হিসাবে সি. এফ. এণ্ড্রুজ সাংসারিক সমস্যাবলী দ্বারা বিশেষভাবে পীড়িত একটি যুবক সম্পর্কে নিম্নোক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করিয়াছেন:

যুবকটি রুশ-জাপান যুদ্ধ হইতে "একটি নূতন দৃষ্টি লাভ করিতে আরম্ভ করে। দূর প্রাচ্য হইতে প্রতিদিন নূতন নূতন জয়ের সংবাদ আসিতে থাকে। অবশেষে একদিন সে সংবাদ পাইল, শুসিমা-প্রণালীতে সমগ্র রুশ-নৌবহরটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সে আমাকে বলিল যে, সেই রাত্রে সে ঘুমাইতে পারে নাই। তাহার দেশমাতা যেন প্রায় বাস্তব মূর্তি ধরিয়া তাহার নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহার মনে হয় যেন তাহার মাতা (দেশ) বিষণ্ণ বদনে ও কাঙালিনী রূপে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি যেন তাহার নিকট সন্তানের ভক্তি দাবি করিতেছেন। সে যেন তাহার মায়ের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিবার দুর্নিবার আহ্বান শুনিতে পায়। ইহার পর সে আর কিছু স্মরণ করিতে পারে না।"[১]

নূতন জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ বাঙলার যুব-সম্প্রদায়ও ঐ যুবকের মতই দেশ-মাতৃকার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করিবার সেই দুর্নিবার আহ্বান শুনিতে পাইল। তাহারা বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ঐক্যতানে গাহিয়া উঠিল, "বন্দেমাতরম"। কার্জনের "অপরিবর্তনীয়" সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিবার জন্য বাঙলার যুবশক্তি দেশব্যাপী বিপ্লবের আগুন জ্বালাইয়া দিল।

"উত্তর-বাঙলায়, বিশেষত পূর্ব-বাঙলায় এমন একটা বিক্ষোভ দেখা দিল তিক্ততার দিক হইতে যাহার কোন তুলনা নাই। বিভিন্ন সংবাদপত্রে, পুস্তিকায় ও বক্তৃতামঞ্চ হইতে ঘোষিত হইল, সম্পদশালিনী, মহিমাময়ী বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ করা

১। C. F. Andrews: "The Renaissance in India." p. 34.

হইয়াছে ; মায়ের সকল সন্তানের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁহাকে দ্বিখণ্ডিত করা হইয়াছে, এই কথা বৃটিশ-পণ্য বর্জনের মারফত বৃটিশ জনসাধারণকে বুঝাইতে হইবে ; নিজেদের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণে কর্ম-প্রচেষ্টা আরম্ভ করিতে হইবে। ইহার সহিত বিপ্লবের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গও উঠিতে থাকে। য়ুরোপের সর্বাপেক্ষা গর্বিত জাতির সহিত যুদ্ধে জাপানের অপূর্ব জয়ের সহিত এইভাবে বাঙালীর এই সংগ্রামের তুলনা করা হয় ঃ 'বাঙালীর কি কোন ধর্ম নাই, স্বদেশ ভক্তি নাই ? বাঙালি ! শক্তির দেবী মা-কালীকে স্মরণ কর, শক্তি-সাধনায় রত হও, মহারাষ্ট্র-বীর শিবাজীর মহান কার্যাবলী স্মরণ কর !......তোমার নিজের মঙ্গল সাধনের জন্য তৎপর হও।"[১]

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর ছিল বঙ্গভঙ্গের নির্দিষ্ট তারিখ। ঐ দিন অসংখ্য জন-সমাবেশ ও শোভাযাত্রার মধ্য দিয়া বাঙলার জনসাধারণ যে বিক্ষোভ প্রকাশ করে, ভারতের ইতিহাসে তাহার কোন তুলনা নাই। ঐ দিন সারা বাঙলাদেশব্যাপী জনসাধারণ উপবাস করিয়া ও নগ্নপদে থাকিয়া দেশ-মাতৃকার অঙ্গচ্ছেদের জন্য শোক প্রকাশ করে, দোকানীরা দোকান-পাট বন্ধ রাখে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাব অনুসারে সমগ্র বাঙালীর ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীকস্বরূপ হস্তে হলুদ-বর্ণের সূত্র বাঁধিয়া "রাখীবন্ধন"-এর অনুষ্ঠানে এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রস্তাব অনুসারে "অরন্ধন" পালন করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় ; বাঙালী মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণ তাহাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়া জন্মভূমির ঐক্য অব্যাহত রাখিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত প্রথমে বাঙালীর ও পরে ভারতের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয় এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ সমগ্র জাতির সাধারণ কর্মপন্থারূপে গৃহীত হয়। বাঙালীর এই নূতন স্বদেশ-প্রেমের মন্ত্র দ্রুত সারা ভারতবর্ষকেও দীক্ষিত করে, সারা ভারতের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে আরম্ভ করে।

যখন সারা বাঙলা এবং ক্রমশ সারা ভারতবর্ষ বিক্ষোভে চঞ্চল হইয়া উঠে, তখন কংগ্রেসের আপসপন্থী নেতৃবৃন্দও দেশব্যাপী বিক্ষোভে চঞ্চল হইয়া তাঁহাদের গতানুগতিক পদ্ধতিতে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত রদ করাইবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে থাকেন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় দাঁড়াইয়া গোপালকৃষ্ণ গোখেল বড়লাটকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, "মহাশয়, বাঙলাকে শান্ত করুন !" বৃটিশ জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য তিনি ইংলণ্ডেও গমন করেন। কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না, আবেদনে বৃটিশ-প্রভুদের মন গলিল না। কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের আবেদনের উত্তরে ভারত-সচিব মর্লে ঘোষণা করিলেন ঃ যদিও বঙ্গভঙ্গ "সংশ্লিষ্ট জনগণের অধিকাংশের ইচ্ছার বিরোধী বলিয়া সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তরূপে প্রমাণিত হইয়াছে," তথাপি "যে বিষয়টি পূর্বেই কার্যকরী করা হইয়াছে" তাহা পরিবর্তন করা অসম্ভব। সুতরাং এবার ইহার পরিবর্তন করাইবার ভার পড়ে বাঙলাদেশের উপর, এবং বাঙলাদেশ স্বেচ্ছায় সেই ভার গ্রহণ করে। আপসপন্থী নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতার পর বাঙলা ও ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ

[১] Sedition Committee Report, p. 10.

করিবার জন্য আগাইয়া আসেন চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা। সংগ্রামী বাঙলা ও সংগ্রামী ভারতের জন্ম তৎকালীন সামাজিক অবস্থায় দেখা দেয় একটা অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক ঘটনা রূপে।

'নরম' ও 'চরম' পন্থার বিরোধ

উপরি-উক্ত রাজনীতিক পটভূমিকায় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। অধিবেশনের সভাপতি হন গোপালকৃষ্ণ গোখেল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের ফলে বিক্ষুব্ধ চরমপন্থীদের নিয়ন্ত্রিত করা এই নেতার পক্ষেও সম্ভব হইল না। 'বিষয়-নির্বাচনী কমিটি'র অধিবেশনে কংগ্রেস-নেতৃত্বের পক্ষ হইতে যখন সপত্নীক 'প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্'-এর আসন্ন ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষে রাজ-দম্পতিকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের প্রস্তাব তোলা হয়, তখন মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়, বাঙলার বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির নেতৃত্বে চরমপন্থীরা গোখেলসহ আপসপন্থী নেতৃবৃন্দের ইংরেজ-তোষণ-নীতির প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বিদ্রূপ বাক্য বর্ষণ করিতে থাকেন। এই ঘৃণ্য প্রস্তাবের আলোচনা আরম্ভ হইবামাত্র চরমপন্থীরা অধিবেশন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কিন্তু আপসপন্থীরাও শর্তাধীন ভাবে হইলেও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বৃটিশ-পণ্য বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং এইভাবে কংগ্রেস-নেতৃত্ব ও চরমপন্থীদের মধ্যে একটা সাময়িক আপস স্থাপিত হয়।

চরমপন্থীরা তাঁহাদের সংগ্রামের প্রচার অব্যাহতভাবে চালাইতে থাকেন এবং বাঙলা ও ভারতের মধ্যশ্রেণী ক্রমশ তাঁহাদের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল কংগ্রেস-নেতৃত্বের আপসপন্থী রাজনীতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া জনগণকে বৃটিশ-বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ দেখাইতে থাকেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চরমপন্থীদের বৃটিশ-বিরোধী প্রচার চরমে উঠে এবং জনসাধারণের মধ্য হইতেও সংগ্রামের ধ্বনি উঠিতে থাকে। ইহার ফলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ গণ-আন্দোলনের সহিত সমান তালে অগ্রসর হইতে না পারিয়া পিছাইয়া পড়েন এবং বাঙলার বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ, মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ দেশের রাজনীতিক আন্দোলনের পুরোভাগে স্থান গ্রহণ করেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা ও মহারাষ্ট্রের চরমপন্থীদের যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। ইহার পূর্ব হইতেই বাঙলাদেশেও মহারাষ্ট্রের আদর্শে 'শিবাজী-উৎসব'-এর অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের 'শিবাজী-উৎসব' ও 'স্বদেশী মেলা' উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া স্বয়ং বাল গঙ্গাধর তিলক এবং পাঞ্জাবের চরমপন্থীদের নায়ক লালা লাজপৎ রায় বাঙলাদেশে আগমন করেন। এই দুই দেশ-বিখ্যাত চরমপন্থী নায়কের পদার্পণে বাঙলার যুবশক্তি বৈপ্লবিক উৎসাহে চঞ্চল হইয়া উঠে, মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীদের সহিত বাঙলার বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং মহারাষ্ট্র ও বাঙলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্রোত পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশেও পৌঁছিবার পথ প্রস্তুত হয়।

বারাণসী কংগ্রেসে আপসপন্থী নেতৃত্ব ও চরমপন্থীদের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা তখন সাময়িকভাবে মিটান সম্ভব হইলেও অল্পকাল পরেই আবার তীব্রভাবে আরম্ভ হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় কলিকাতায়। এই অধিবেশনে দুই দলের বিরোধের ফলে অধিবেশনের কার্য-পরিচালনা অসম্ভব হইয়া উঠে। বাঙলাদেশে দুই দলের বিরোধ চরম আকারে দেখা দেয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ রহিলেন একদিকে, আর একদিকে রহিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি বামপন্থী নেতৃবৃন্দ। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একদিকে গেলেন গোখেল ও ফিরোজশা মেটার নেতৃত্বে সকল আপসপন্থীরা, আর তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন তিলক ও লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে সকল চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ। কলিকাতা-কংগ্রেসে এই দুই পরস্পর-বিরোধী দল দুইটি পরস্পর-বিরোধী রাজনীতিক লক্ষ্য লইয়া শেষ বুঝাপড়ার জন্য দণ্ডায়মান হইল।

দক্ষিণপন্থীদের রাজনীতিক লক্ষ্য ছিল, বৃটিশ-সাম্রাজ্যের যে সকল দেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেগুলির অনুরূপ একটি শাসন-ব্যবস্থা, অবশ্য তাহা পরে হইলেও ক্ষতি নাই। বামপন্থীদের রাজনীতিক লক্ষ্য ছিল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সেই স্বাধীনতা ভারতবাসীরা, আবেদন-নিবেদনের দ্বারা নহে, নিজেদের শক্তি দ্বারাই অর্জন করিবে। দক্ষিণপন্থীদের লক্ষ্য সিদ্ধির উপায় ছিল নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, আর বামপন্থীদের লক্ষ্য সিদ্ধির উপায় ছিল বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাদ্বারা অবিলম্বে বৃটিশ শাসনের ধ্বংসসাধন।

কলিকাতা-কংগ্রেসে এই দুই পরস্পর-বিরোধী দল ও উদ্দেশ্যের সমন্বয় সাধন করিয়া কংগ্রেসের ঐক্য বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিলে কেবলমাত্র সর্বজনমান্য নেতা দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্ব গ্রহণের ফলেই তাহা কোন প্রকারে রক্ষা করা সম্ভব হয়। এবারেও সভাপতি দাদাভাই নৌরজির বিশেষ চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত এই দুই দলের মধ্যে একটা আপস স্থাপিত হয় এবং কংগ্রেসের সাংগঠনিক ঐক্য কোন প্রকারে বজায় থাকে।[১] আপসের শর্ত অনুসারে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের লক্ষ্য হিসাবে 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন' ঘোষণা করিলেও বৃটিশ-পণ্য বর্জন ও স্বদেশী পণ্য গ্রহণের আন্দোলন সমর্থন করিবার স্বীকৃতি দেন। এই কংগ্রেসেই "স্বরাজ" (ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন) কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। চরমপন্থীরা কংগ্রেসের অধিবেশনে পরাজয় বরণ করিলেও তাঁহারা তাঁহাদের মতবাদের জন্য দেশের মধ্যে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করিলেন, তাহা এ পর্যন্ত অন্য কোন দলের বা নেতার ভাগ্যে ঘটে নাই। সারা দেশের যুবশক্তি তাঁহাদের নিকট হইতে বিপ্লবের পথে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের মন্ত্র গ্রহণ করে।

কিন্তু কলিকাতা-কংগ্রেসে ভারতের প্রবীণতম নেতা দাদাভাই নৌরজির চেষ্টায় দুই দলের মধ্যে সাময়িকভাবে আপস স্থাপন সম্ভব হইলেও পরবর্তী অধিবেশনে

১। C. Y. Chintamani : "Indian Politics Since the Mutiny", p. 80-81,

কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা কোন প্রকারেই সম্ভব হইল না। পর বৎসর, অর্থাৎ ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে, কংগ্রেসের অধিবেশন হয় সুরাটে। প্রথমে নাগপুর অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু নাগপুর ছিল তিলকের পরিচালনাধীন চরমপন্থী মারাঠীদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। তাই নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইলে দক্ষিণপন্থীরা বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবে না ভাবিয়া ফিরোজশা মেটার চেষ্টায় সুরাটে অধিবেশনের আয়োজন হয়। বামপন্থীরা লাজপৎ রায়কে সভাপতি করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহাতে শাসকগণ রুষ্ট হইতে পারে এই ভয়ে দক্ষিণপন্থীরা রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি নির্বাচিত করেন। বামপন্থীদের সহিত দক্ষিণপন্থীদের বিরোধ আর এক ধাপ অগ্রসর হয়।

দক্ষিণপন্থীরা যেন পূর্ব হইতেই এবারের কংগ্রেস-অধিবেশনে চরমপন্থীদের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব হইতেই ঘোষণা করেন যে, এবারের কংগ্রেস-অধিবেশনে বৃটিশ-পণ্য বর্জন, স্বরাজ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা চলিবে না। ইহার ফলে দুই দলের বিরোধ চরমে উঠে। দক্ষিণপন্থীরা এবার প্রকাশ্যেই বিচ্ছেদের কথা বলিতে থাকেন। কারণ, তাঁহারাই ছিলেন কংগ্রেসের মধ্যে সংখ্যাধিক দল। দক্ষিণপন্থীদের নেতা ফিরোজশা মেটার চেষ্টায় দুই দলের বিচ্ছেদ স্পষ্ট হইয়া উঠে। অধিবেশনের পূর্বে সুরাটে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে চরমপন্থীদের এক সভা হয়। এই সভায় দক্ষিণপন্থীদের "অপচেষ্টা" ও আপস-নীতির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়া বাধা দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কংগ্রেস-অধিবেশনে বাম-পন্থীদের প্রস্তাব উত্থাপন করেন বাল গঙ্গাধর তিলক। কিন্তু ভোটাধিক্যে প্রস্তাবগুলি পরাজিত হয়। প্রস্তাবের উপর বিতর্কের সময় চরমপন্থীরা ক্রুদ্ধ হইয়া সুরেন্দ্রনাথ ও ফিরোজশা মেটাকে লক্ষ্য করিয়া পাদুকা নিক্ষেপ করেন। এই অধিবেশনে কোন কাজই সম্ভব হইবে না বুঝিয়া চরমপন্থীরা অধিবেশন পণ্ড করিয়া দেন। দুই দলের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইল। ইহার পর কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে দক্ষিণপন্থীদের অধিকারে চলিয়া গেলেও দেশের স্বাধীনতাকামী যুবশক্তি চরমপন্থীদের নেতৃত্বই মানিয়া লয় এবং চরম-পন্থীদের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিই প্রাধান্য লাভ করে।[১]

সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম

কংগ্রেসের এই আভ্যন্তরিক বিরোধ বাহিরের প্রচণ্ড আন্দোলনেরই অনিবার্য পরিণতি। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া সারা বাঙলাদেশের ও সমগ্র ভারতবর্ষে যে সংগ্রামের আগুন জ্বলিতেছিল, তাহাতে দক্ষিণপন্থীদের আপস-নীতির কোন স্থান ছিল না, তাই সেই সংগ্রাম কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে অব্যবহার্য বলিয়া বিসর্জন দিয়া সক্রিয় বৃটিশ-বিরোধিতা ও বিপ্লবের পথ গ্রহণ করে। এই সংগ্রাম বঙ্গভঙ্গের মত কোন স্থানীয় সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া কোন স্থান বা সময়ের গণ্ডির মধ্যে আর আবদ্ধ থাকিতে পারে না, তাই ইহা এখন বাঙলাদেশের গণ্ডি পার হইল এবং সমগ্র

১ Ambika Charan Majumdar : "Indian National Evolution", p. 972.

ভারতবর্ষের বিস্তৃত ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইল। তাই দেখা যায়, মহারাষ্ট্রে যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের আগুন প্রথম জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা ক্রমশ বাঙলাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়া দ্রুত সারা ভারতবর্ষকে গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়াছে এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হইবার পরেও তাহা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়াছে। বামপন্থী বা চরমপন্থী নেতৃত্ব ছিল সেই সংগ্রামের মুখপাত্র। বঙ্গভঙ্গ না হইলেও সেই সংগ্রাম অনিবার্যভাবেই বাঙলাদেশে ও ভারতবর্ষে দেখা দিত। বঙ্গভঙ্গ তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়াছিল মাত্র। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে—

"বৃটিশ-বিরোধী ও বৈপ্লবিক চরিত্র লইয়া যে সংগ্রামের আরম্ভ, তাহার পক্ষে বঙ্গভঙ্গ ছিল কেবল একটা উপলক্ষ মাত্র, কারণ নহে।"[১]

সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক ভ্যালেন্টাইন চিরোল-এর কথায়, কংগ্রেসের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া সেই সংগ্রামের রূপই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া সেই সংগ্রামের রূপ এইভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন:

"বাহিরে যাহা ঘটিতেছিল তাহারই প্রতিচ্ছবি হইল কংগ্রেসের এই অধিবেশনের (১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের সুরাট-কংগ্রেসের) পরিণতি।......'স্বরাজ'-এর ধ্বনি জনগণ অন্তর দিয়া গ্রহণ করে এবং তাহা বৃটিশ-ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। কলিকাতার বিখ্যাত কালী-মন্দিরে এক বিরাট সভায় 'স্বদেশী'র প্রতিজ্ঞা গৃহীত হয়।...সর্বত্যাগী হিন্দু-সন্ন্যাসীরা জনগণের অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করে এবং আইন-ব্যবসায়ীদের প্রত্যেকটি সঙ্ঘ পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক আদর্শে এক-একটি সক্রিয় রাজনীতিক প্রচার-কেন্দ্র হইয়া উঠে। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের লেখা-পড়া বন্ধ করিয়া পথে বাহির করা হয়, তাহারা দেশভক্তরূপে প্রচারের গাড়ীতে চাপিয়া 'স্বরাজ'-এর ধ্বনি তুলিতে থাকে, অথবা বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জন্য পিকেটিং আরম্ভ করে। ...এই ভাবে অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা ও সংবাদপত্রে জ্বালাময়ী রচনা প্রকাশ করিয়া নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের উত্তেজনা চরমে তোলেন। তাঁহারা হিন্দুধর্মের কাহিনীর সহিত রুশীয় 'এ্যানার্কিস্ট' মতবাদের সমন্বয় সাধন করিতেও সমান দক্ষ ছিলেন। ধ্বংসের দেবতা শিব ও হত্যাকারীদের সহিত বোমার সমন্বয় সাধিত হয় এবং দেশীয় ও বৃটিশ সরকারী কর্মচারীরা উভয়েই সেই হত্যাকারীদের শিকার হইয়া উঠে। আর সেই হত্যাকাণ্ডই ধর্ম ও স্বদেশ-প্রেমের নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে থাকে। এমনকি উচ্চ শ্রেণীর যুবকরাও দেশভক্তির নামে একত্র হইয়া লুণ্ঠনের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে।"[২]

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাটের কাউন্সিলে নূতন সংবাদপত্র-আইনের খসড়া উপস্থিত করিয়া ভারত-সরকারের আইন-সচিব স্যার হার্বার্ট রিজ্‌লি আতঙ্কে অস্থির হইয়া বিশেষত বাঙলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের নিম্নোক্ত চিত্রটি অঙ্কিত করেন:

১। L. S. S. O'Malley: "History of Bengal, Bihar and Orissa under British Rule", p. 528-29.

২। Valentine Chirol: "India, Old and New" p. 118-119.

"প্রতিদিন সংবাদপত্রে সরাসরি বা প্রকারান্তরে ঘোষণা করা হইতেছে যে, ভারতের সকল ব্যাধির একমাত্র ঔষধ হইল বিদেশী শাসন হইতে স্বাধীনতা লাভ। আর সেই স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে দেশের যুবকদের বীরত্বপূর্ণ কার্য, আত্মত্যাগ ও শহীদের মৃত্যু বরণ করিয়া, অর্থাৎ কোন না কোন বৈপ্লবিক কর্মের দ্বারা। হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, এবং বিশেষত য়ুরোপীয় বৈপ্লবিক সাহিত্য মন্থন করিয়া সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষে দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া বাহির করা হইতেছে। সেই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখান হইয়া থাকে যে সফলতা অবশ্যম্ভাবী। সার্কাসিয়া, স্পেন ও দক্ষিণ আফ্রিকায় যে গেরিলা যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি, ম্যাৎসিনির রাজনীতিক নরহত্যার মতবাদ, কস্থ্-এর বৈপ্লবিক মতবাদ, রুশীয় 'নিহিলিস্ট'দের ক্রিয়াকলাপ, মার্কুইস ইটো-এর হত্যা, গীতায় অর্জুনের সহিত কৃষ্ণের কথোপকথন—ইহাদের সকলই ভাবপ্রবণ মনে আগুন জালাইয়া দিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ......ঠিক এই মুহূর্তে আমরা একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র-মামলায় ব্যস্ত আছি। ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি দ্বারা সরকার ও বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদ করাই ছিল এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য। ইহাদের সংগঠন খুবই ব্যাপক ও কার্যকরী, ইহাদের সংখ্যা অগণিত, ইহাদের নেতৃবৃন্দ অতি-গোপনে কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন এবং অল্পবয়সী অনুচরগণ নেতৃবৃন্দের কথা অন্ধের মত মানিয়া চলে। বর্তমানে তাঁহারা রাজনীতিক নরহত্যার পদ্ধতি অনুসরণ করিতেছেন।"[১]

সরকারী দমননীতি

সুরাটের ঘটনার পর নরমপন্থীরাই কংগ্রেস দখল করিয়া থাকেন। শাসকগণ এই বিভেদের সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে। তাহারা একদিকে কংগ্রেসের সংগ্রাম-বিরোধী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে আরও কাছে টানিতে থাকে এবং অপর দিকে চরমপন্থীদের উপর পূর্ণোদ্যমে দমন-নীতি প্রয়োগ করে। চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে 'মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কার' প্রবর্তিত হয়। এই শাসন-সংস্কার ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের শাসন-সংস্কারের সামান্য বর্ধিত সংস্করণ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এই সংস্কার অনুসারে পরোক্ষ-ভাবে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে বাছিয়া কয়েকজনকে বড়লাটের পরামর্শ-পরিষদে গ্রহণ করা হয় এবং প্রাদেশিক পরিষদে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাধিক্য সৃষ্টির ব্যবস্থা হয়। কিন্তু শাসকদের পরামর্শদান ব্যতীত এই পরিষদগুলির অন্য কোন ক্ষমতাই ছিল না।

এই অন্তঃসার-শূন্য সংস্কারকে চরমপন্থীরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু দক্ষিণ-পন্থীরা এই সংস্কারকেই "প্রকৃত ও আন্তরিক" বলিয়া বরণ করিয়া ইহাকে নিজেদের চেষ্টার ফল বলিয়া জাহির করেন। তাঁহারা এই সংস্কারের জন্য আনন্দের সহিত ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট সাহেবকে রাজভক্তিমূলক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। প্রচণ্ড

১। L. S. S. O' Malley: 'Bengal, Bihar and Orissa under British Rule' p. 535-36.

দমন-নীতি সত্ত্বেও গণ-আন্দোলন ও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা দমন করিতে না পারিয়া বৃটিশ সরকার ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে যখন বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে তখনও কংগ্রেস-সভাপতি বিষণ নারায়ণ দাস ইহাকে "আধুনিক ভারতের নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য জয়" হিসাবে ঘোষণা করিয়া বলেন :

"এই সিদ্ধান্তের ফলে বৃটিশ-শাসনের প্রতি ভারতের প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয় শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে এবং বৃটিশের রাজনীতি-জ্ঞানের প্রতি ভারতবর্ষে পুনরায় বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতার জোয়ার বহিতেছে।"[১]

এই শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন দমন-নীতির খড়্গ শাণিত করিয়া তোলা হয়। এই শাসন-সংস্কার ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর প্রথম প্রবর্তিত হয়। বড়লাট লর্ড মিণ্টো নূতন ব্যবস্থা-পরিষদের উদ্বোধন-কালে আরও কঠোর দমন-নীতি দ্বারা স্বদেশী আন্দোলন ও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা চূর্ণ করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করিবার জন্য নূতন প্রেস-আইন প্রয়োগ করা হয়।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই সরকার উন্মত্তের মত দমন-নীতি প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। একমাত্র বাঙলাদেশেই ১৯০৮ হইতে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে কমপক্ষে ৫৫০টি রাজনীতিক মামলা দায়ের করা হয়। চরমপন্থী নেতৃবৃন্দকে বিনা-বিচারে আটক করিবার জন্য ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কুখ্যাত '১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের তিন নং আইন' পুনঃপ্রবর্তিত হয়, ঐ বৎসর 'রাজদ্রোহ-মূলক জনসভা-আইন', ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বিস্ফোরক দ্রব্য-আইন', 'প্রেস-আইন' প্রভৃতি দমনমূলক আইনের বন্যা সারা ভারতবর্ষকে প্লাবিত করে। কিন্তু এই সকল দমনমূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও বৃটিশ-বিরোধী প্রচার ও আন্দোলন অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে, বরং এই উৎপীড়নের ফলে তাহা আরও উদ্দাম হইয়া উঠে। কলিকাতার 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা' ও 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া যায়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের লাল লাজপৎ রায় ও সর্দার অজিত সিংকে আটক করা হইলে বাঙলার বৈপ্লবিক সংগ্রামের মুখপত্র 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় পাঞ্জাবের জনসাধারণের প্রতি এই বৈপ্লবিক আহ্বান জানান হয় :

"বক্তৃতা ও কাব্য রচনার দিন শেষ হইয়াছে, আমলাতন্ত্র আমাদের যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছে। আমরা সেই আহ্বান গ্রহণ করিতেছি। পাঞ্জাবের ভাইসব! সিংহের জাতি! যাহারা লাজপৎ রায়কে ছিনাইয়া লইয়াছে তাহারা তোমাদের ধূলিসাৎ করিয়া দিতে চায়, তোমরা তাহাদের দেখাইয়া দাও, যে লাজপৎ রায়কে তাহারা ছিনাইয়া লইয়াছে, একশত লাজপৎ তাঁহার শূন্য স্থান গ্রহণ করিবেন। শতগুণ বেশী উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনিত হউক—'জয় হিন্দুস্থান'।"[২]

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক এবং আরও পাঁচজন নেতা বিনাবিচারে বন্দী হন। দুইটি প্রবন্ধ রচনার জন্য

১। C. Y. Chintamoni : Indian Politics Since the Mutiny', p. 95-96.

২। Hirendranath Mukherjee : Indian Struggles for Freedom,' p. 93.

বাল গঙ্গাধর তিলককে ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মাদ্রাজের জননায়ক চিরম্বরম পিলাই, হরিসর্বোত্তম রাও এবং অন্ধ্রের বহু লোককে আটক করা হয়। ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশের উপর দিয়া অত্যাচার ও গ্রেপ্তারের বন্যা বহিতে থাকে। কিন্তু ইহাতেও শাসকদের আতঙ্ক দূর হইল না, বরং তাহা দিন দিন বাড়িয়া চলে। এই আতঙ্ক এতদূর বাড়িয়াছিল যে, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচ্‌নার সারা ভারতবর্ষে সামরিক আইন জারি করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন।[১]

কিন্তু এত উৎপীড়ন সত্ত্বেও ভারতের বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রাম ও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা কিছু মাত্র হ্রাস পাইল না, তাহা ক্রমশ দেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করিয়া বিদেশী শাসনকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল। এইভাবে মহারাষ্ট্রে প্লেগ-ব্যাধিকে উপলক্ষ করিয়া যে-বিপ্লবের আগুন প্রথম জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাই পরে মনুষ্যরূপী প্লেগ কার্জনের বর্বরসুলভ আক্রমণকে উপলক্ষ করিয়া বাঙলাদেশ ও সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পরাধীন ভারতের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশরঞ্জিত করিয়া তুলিল। ভারতের পরাধীন মানুষ সেই বিপ্লব-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া উহার শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিক অবদানস্বরূপ পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী সর্বপ্রথম শুনিতে পাইল।

তৃতীয় অধ্যায়

বঙ্গদেশে প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টা (১৯০৬-১৯১৪)

১৯০৬-০৮ খ্রীষ্টাব্দ

১. প্রাথমিক চেষ্টা

প্রথমে বাঙলার বিপ্লব-প্রচেষ্টা ডাকাতি ও গুপ্ত হত্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। সমিতিগুলির দ্রুত বিস্তার ও সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অর্থের অনটন আরও বৃদ্ধি পায়। তাহার ফলে এমন অবস্থা দেখা দেয় যে, অর্থ সংগ্রহ না করিতে পারিলে কোন কাজেই অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। তাই ডাকাতি দ্বারাই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়।

প্রথমে বিপ্লবীরা ডাকাতিতে বিশেষ অপটু ও অভিজ্ঞতাহীন ছিল বলিয়া গোড়ার দিকের ডাকাতির চেষ্টাও নিতান্ত হাস্যকর পরিণতি লাভ করে। কিন্তু শীঘ্রই এই বিষয়ে তাহাদের সকল দুর্বলতা কাটিয়া যায় এবং তাহারা বড় বড় চাঞ্চল্যকর ডাকাতি করিতে সক্ষম হয়।

শুনা যায়, বাঙলাদেশের বিপ্লবীদের প্রথম ডাকাতির চেষ্টা হয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে। বলা বাহুল্য, সেই চেষ্টা হাস্যকর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে যুগান্তর

১। Thomson & Garrat: 'Rise and Fulfilment of British Rule in India,' p. 577.

দলের কয়েকজন অল্পবয়স্ক সভ্য একত্রিত হইয়া তারকেশ্বরের নিকটবর্তী কোন স্থানে ডাকাতি করিতে যায়। তাহারা সংবাদ পাইয়াছিল যে, ঐ অঞ্চলের জনৈক ব্যক্তির গৃহে যথেষ্ট টাকা আছে। কিন্তু ছেলেরা নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া কেবল কয়লার বড় বড় স্তূপ দেখিতে পায়। তাহারা মনের দুঃখে ফিরিয়া আসে।[১]

ইহার পর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে রংপুর জেলায় কোন এক বিধবার গৃহে বিপ্লবীরা ডাকাতি করিবার মতলব আঁটিয়াছিলেন। তাঁহারা রাত্রিকালে ঐ উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট গ্রামে ঢুকিয়া শুনিতে পান যে, ঐ গ্রামে এক দারোগা আছে। দারোগার উপস্থিতির সংবাদে তাঁহারা ভয় পাইয়া পলাইয়া যান।[২] ইহার কয়েক দিন পরে ডাকাতি হয় নারায়ণগঞ্জে। ঢাকার অনুশীলন সমিতির সভ্যদের দ্বারা এই ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। তাহারা এক গৃহস্থের বাড়ী ডাকাতি করিয়া এক হাজার রৌপ্য-মুদ্রাপূর্ণ একটি থলি লইয়া ফিরিবার সময় থলিটি ছিঁড়িয়া যায় এবং মাত্র আশী টাকা ব্যতীত আর সবই পথে পড়িয়া যায়। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকার শেখনগর নামক স্থানে একটি বড় রকমের ডাকাতি হয়। সশস্ত্র বিপ্লবীদের একটি বড় দল এক গৃহস্থ-বাড়ী ডাকাতি করিতে গিয়া প্রকাণ্ড একটা লোহার সিন্দুক দেখিতে পায়। তাঁহাদের নিকট লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিবার কোন যন্ত্র ছিল না। কাজেই তাঁহারা সিন্দুকটাই লইয়া আসিয়া নৌকায় তোলেন। কিন্তু লোহার সিন্দুকের ভারে নৌকা ডুবিয়া যায়। বিপ্লবীরা সামান্য কয়েকটি টাকা লইয়া হতাশ মনে ফিরিয়া আসেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে নয়-দশ জনের একটি দল ঢাকার আরস্থলিয়া নামক স্থানের একটি পাটের অফিসে ডাকাতি করিতে গিয়া ঐ অফিসে একটি দোনালা বন্দুক আছে শুনিবামাত্র চম্পট দেন।

বিপ্লবীদের প্রাথমিক চেষ্টার ব্যর্থতা ও হাস্যকর পরিণতিই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহাদের কঠোর করিয়া তোলে এবং অভিজ্ঞতা আনিয়া দেয়। ইহার পর হইতে তাঁহারা আরও দুঃসাহসিক কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার এক উন্নততর স্তরে আরোহণ করে।

২. গভর্নর ফ্রেজার-হত্যার চেষ্টা

বাঙলার লেফ্টানান্ট গভর্নর এণ্ড্রু ফ্রেজার ছিলেন লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ-পরিকল্পনার প্রধান উৎসাহদাতা। বিপ্লবীরা গভর্নর ফ্রেজারকে হত্যা করিয়া অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। কলিকাতার বিপ্লবীরা প্রথম হইতেই তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। পূর্বে ফ্রেজার-হত্যার চেষ্টা তিনবার ব্যর্থ হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে বিপ্লবীরা নূতন করিয়া চেষ্টা আরম্ভ করেন। ঐ বৎসর ৬ই ডিসেম্বর ফ্রেজারসাহেব ট্রেনে মেদিনীপুর সফরে যাইতেছিলেন। পথে নারায়ণগড় স্টেশনের নিকট বোমা দ্বারা

১। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম," পৃঃ ১৩১।

২। 'Sedition Committee Report', p. 31.

ফ্রেজারের ট্রেন উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হয়। বোমার প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ট্রেনখানির কয়েকটি কামরা লাইনচ্যুত হয়। যে স্থানে বোমাটি পড়িয়াছিল সেই স্থানটিতে পাঁচ ফুট চওড়া ও পাঁচ ফুট গভীর একটি গর্ত হইয়া যায়। কিন্তু ছোট লাটসাহেব প্রাণে বাঁচিয়া যান। ইহার পূর্বে ঐ বৎসর অক্‌টোবর মাসেও দুইটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর গোয়ালন্দ স্টেশনে ঢাকার ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট এলেন সাহেবকে গুলি করা হয়। কিন্তু আঘাত গুরুতর ছিল না বলিয়া তিনি বাঁচিয়া যান। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল গুপ্ত-সমিতির সাতজন সভ্য পিস্তল ও ছোরা লইয়া শিবপুরের জনৈক গৃহস্থের বাড়ী ডাকাতি করিয়া চারশত টাকা সংগ্রহ করে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে চন্দননগরে একটি জনসভা বন্ধ করিবার শাস্তিস্বরূপ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল চন্দননগরের মেয়রের গৃহে বিপ্লবীরা একটি বোমা নিক্ষেপ করেন। বোমাটি ফাটিলেও কেহ হতাহত হয় নাই।

৩. কিংসফোর্ড-হত্যার চেষ্টা

কিংসফোর্ড সাহেব ছিলেন কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি-ম্যাজিস্ট্রেট। যাহারা স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে গ্রেপ্তার হইত তাহাদের উপর কিংসফোর্ডের নির্দেশে ভয়ঙ্কর নির্যাতন চালান হইত। এই ম্যাজিস্ট্রেট একবার এক বালককে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আদালত-প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যে বালকটির উপর নিষ্ঠুরভাবে বেত্রদণ্ড প্রয়োগ করা হয়। এই নিষ্ঠুর ঘটনা উপলক্ষে কলিকাতায় প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কলিকাতার বিপ্লবীরা ইহার প্রতিশোধের জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। যুগান্তরের পরিচালকগণ পরামর্শ করিয়া কিংসফোর্ডকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। বারীন্দ্র ঘোষ এই দণ্ড কার্যকরী করিবার ভার দেন ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী নামক যুগান্তর সমিতির দুইজন সভ্যের উপর। ইতিমধ্যে কিংসফোর্ড মজঃফরপুরের জেলা-জজ হইয়া বদলী হন। কাজেই ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্লও মজঃফরপুর যাত্রা করেন।

ইহার পূর্বেও কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। বিপ্লবীরা একখানি পুস্তকের আকারে একটি ভয়ঙ্কর বোমা কিংসফোর্ডের নামে পার্শেল করিয়া ডাকে প্রেরণ করেন। ইহাতে এমন ব্যবস্থা ছিল যে, পার্শেলের মধ্যস্থিত পুস্তকখানি হাতে লইয়া খুলিবামাত্র বোমাটি ফাটিয়া যাইবে। পুস্তকের মধ্যভাগ কাটিয়া তাহাতে বিস্ফোরক পদার্থ ভরিয়া বোমাটি তৈরী হইয়াছিল। কিন্তু সেই পার্শেলটি কিংসফোর্ড নিজে না খুলিয়া অন্য একজনকে খুলিবার জন্য দেন। যে চাপরাসীটি ইহা খুলিয়াছিল, সে বোমা-বিস্ফোরণে নিহত হয়।

পূর্ব-ব্যবস্থা অনুসারে প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম মজঃফরপুর আসিয়া সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল তারিখে সন্ধ্যাকালে কিংসফোর্ডের গাড়ির মত একখানা গাড়িতে চড়িয়া দুইজন শ্বেতাঙ্গ-মহিলা (ব্যারিস্টার কেনেডি সাহেবের

স্ত্রী ও কন্যা) যাইতেছিলেন। প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম ভ্রমক্রমে ঐ গাড়ীর উপরেই বোমা নিক্ষেপ করেন। তাহার ফলে মহিলা দুইজন নিহত হন।

পরদিন, ১লা মে, বেলা দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি নন্দলাল ব্যানার্জি নামক একজন পুলিশ-কর্মচারীর হস্তে গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য প্রফুল্ল চাকী নিজের রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম সন্ত্রাসবাদী শহীদ হইবার গৌরব অর্জন করেন। ঐ দিন বেলা ১টার সময় মজঃফরপুর হইতে চব্বিশ মাইল দূরবর্তী ওয়াইলী নামক স্টেশনে প্রফুল্লের সহকর্মী ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন। ইহার পর মজঃফরপুর-আদালতে হত্যার অভিযোগে ক্ষুদিরামের বিচার আরম্ভ হয়। ক্ষুদিরাম আদালতে হত্যার অভিযোগ স্বীকার করেন এবং বিচারে তাঁহার ফাঁসীর হুকুম হয়। এই হুকুমের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হইলেও ঐ দণ্ডাদেশ বহাল থাকে। ১১ই আগস্ট ইংরেজ সরকারের ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দিয়া বাঙলার বীর সন্তান ক্ষুদিরাম বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় সন্ত্রাসবাদী শহীদ হিসাবে চিরবরেণ্য হইয়া থাকেন।[১]

৪. আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা

মজঃফরপুরের বোমা-বিস্ফোরণ এবং প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা ও ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তারের সূত্র ধরিয়া কলিকাতার পুলিশ ২রা মে তারিখে যুগান্তর সমিতির কলিকাতার প্রধান কর্মকেন্দ্র মানিকতলার বাগান-বাড়ী ও বিপ্লবীদের অন্যান্য বাসস্থান খানাতল্লাসী করে। এই খানাতল্লাসীর ফলে বাগান-বাড়ী হইতে বোমা, ডিনামাইট ও কার্তুজ প্রস্তুত করিবার যন্ত্রপাতি, বন্দুক, রিভলভার ও বহু চিঠি-পত্র পুলিশের হস্তগত হয় এবং বিভিন্ন স্থান হইতে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস, অবিনাশ ভট্টাচার্য, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, উল্লাসকর দত্ত, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল দত্ত প্রভৃতি যুগান্তর সমিতির চৌত্রিশ জন নেতা ও প্রধান কর্মী গ্রেপ্তার হন। ইঁহাদের লইয়া এবার ইতিহাস-বিখ্যাত 'আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা' আরম্ভ হয়। এই মামলার যুগান্তর সমিতির অন্যতম সভ্য নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী রাজসাক্ষী হইয়া পুলিশের নিকট সকল তথ্য প্রকাশ করিয়া দেয়।[২] রাজসাক্ষী হইবার পর নরেন্দ্র গোস্বামীকে আলিপুর জেলের হাসপাতালে অপসারিত করা হয়।

১। এই দুই বিপ্লবী যুবকের, বিশেষত ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তার ও অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে মতভেদ আছে। এই সম্পর্কে ব্রজবিহারী বমন-রচিত 'ক্ষুদিরামের জীবনী' প্রামাণ্য পুস্তক হিসাবে গ্রহণ করা চলে। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভারতের 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম' নামক প্রামাণ্য গ্রন্থেও ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লের দুইটি সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া আছে

২। নরেন্দ্র গোস্বামী সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, নরেন্দ্র পুলিসের গুপ্তচর হিসাবে যুগান্তর সমিতির গোপন সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্য লইয়াই সে বিপ্লবিদলে যোগদান করে; আবার কেহ বলেন যে, নরেন্দ্রের বিপ্লবিদলে যোগদানের পিছনে কোন অসদুদ্দেশ্য ছিল না, ধরা পড়িবার পর ভয় পাইয়া সে রাজসাক্ষী হয়। তৎকালীন নেতাদের মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথমোক্ত মত এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষ দ্বিতীয় মত সমর্থন করেন।

বারীন্দ্রকুমার এই ষড়যন্ত্রের প্রধান দায়িত্ব নিজের উপর লইয়া পুলিসের নিকট এক স্বীকারোক্তি করেন। তাঁহার স্বীকারোক্তির ফলে (রাজা) সুবোধ মল্লিক[১] এবং আরও কয়েকজন গ্রেপ্তার হন। বারীন্দ্রের পর উল্লাসকর, উপেন্দ্রনাথ এবং আরও কয়েকজন স্বীকারোক্তি দেন। ধৃত বিপ্লবীদের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন অন্যতম। এইভাবে ধৃত মোট চল্লিশজন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে 'সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম'-এর অভিযোগে আলিপুর-ষড়যন্ত্র মামলার বিচার আরম্ভ হয়।

নরেন গোস্বামীর হত্যা

আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা চলিবার সময় মামলায় অভিযুক্ত কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসু বাহির হইতে পিস্তল সংগ্রহ করিয়া আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের হাসপাতালে যান এবং ১লা সেপ্টেম্বর নরেন গোস্বামীকে হত্যা করেন। হত্যার অভিযোগে তাঁহাদের দুইজনের থক পৃথক বিচার করিয়া ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। কানাইলাল বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় শহীদ এবং সত্যেন্দ্রনাথ চতুর্থ শহীদ ও "ফাঁসির সত্যেন" রূপে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকেন।[২]

নরেন্দ্র গোস্বামীর হত্যা উপলক্ষে লাল ইস্তাহার

কানাইলাল দত্ত কর্তৃক আলিপুর জেলের মধ্যে রাজসাক্ষী নরেন্দ্র গোস্বামীর হত্যা উপলক্ষে বিপ্লবীরা 'স্বাধীন ভারত' নামে একখানি লাল ইস্তাহার বাহির করেন। ইস্তাহারখানি নিম্নরূপ:

"নরেন্দ্র যখন এক নূতন খেয়ালের বশে চরম দুর্বলতার লক্ষণ দেখাইতেছিল এবং আত্মসংযম সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তখনই আমাদের শয়তানতুল্য ব্যবসায়ী শাসকগোষ্ঠী আমাদের সমগ্র দেশের উপর এক ভয়ঙ্কর বজ্র নিক্ষেপ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সেই মুহূর্তে আমাদের মহান বীর কানাইলাল নিজের সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া ভারতবর্ষের অভাবনীয় শক্তির পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে এবং এক মহাশক্তি জাগাইয়া তুলিবার জন্য জাদুকরের বজ্র তৈয়ার করিয়াছেন। তিনি যখন আলিপুর জেলের প্রত্যেকটি কক্ষ কম্পিত করিয়া লৌহশৃঙ্খল আর দেয়ালঘেরা, সুরক্ষিত বৃটিশ জেলখানার মধ্যেই বিশ্বাসঘাতকের বুকের রক্তে ধরণী রঞ্জিত করিয়াছেন, তখনই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বুঝিতে পারিয়াছে, বাঙলার বুকে যে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহার মূলে কি বিস্ময়কর শক্তি নিহিত!"[৩]

বিপ্লবীদের 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার ১৯০৮ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় নরেন্দ্র গোস্বামীর হত্যা সম্পর্কে লিখিত হয়:

"কানাই নরেন্দ্রের প্রাণ সংহার করিয়াছে। যে অধম ভারতীয় তাহার সহকর্মীদের হস্তলেহন করিয়াছে, সে যেন কোনদিন প্রতিহিংসার হস্ত হইতে

১। দেশ-সেবার উদ্দেশ্যে তাঁহার উল্লেখযোগ্য দানের জন্য তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি দেওয়া হইয়াছিল।

২। ব্রজবিহারী বর্মণ-রচিত 'কানাইলাল' ও 'ফাঁসির সত্যেন' দ্রষ্টব্য।

৩। Sedition Committee Report, p. 78 হইতে অনূদিত।

রক্ষা পাইবার আশা না করে। প্রতিহিংসাপরায়ণতার ইতিহাসে প্রথম কানাইলালের নাম জলন্ত অক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। যে মুহূর্তে কানাই সেই প্রাণসংহারকারী গুলিটি ছুঁড়িয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত হইতেই তাঁহার দেশের আকাশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে কেবল সেই একটি কথা :

"বিশ্বাসঘাতকতার চরম শাস্তির কথা কখনও ভুলিও না।"[১]

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত দুইভাগে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালিত হয়। চিত্তরঞ্জন দাস ব্যারিস্টার হিসাবে অরবিন্দের মামলা পরিচালনা করেন। বিচারে অরবিন্দ মুক্তি লাভ করেন। এই মামলায় মোট ২০৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর ৬ই মে মামলার রায় বাহির হয়। সেসন আদালতে বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের ফাঁসি এবং হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি সরকার, ঋষিকেশ কাঞ্জিলাল, বীরেন্দ্র সেন, সুধীর সরকার, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অবিনাশ ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু ও ইন্দুভূষণ রায় প্রমুখ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু হাইকোর্টের আপীলে বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের ফাঁসির আদেশের পরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়; হেমচন্দ্র ও উপেন্দ্রনাথের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড বহাল থাকে এবং বিভূতি সরকার, ঋষিকেশ কাঞ্জিলাল ও ইন্দু রায়ের দশ বৎসরের দ্বীপান্তর আর সুধীর সরকার, পরেশ মৌলিক, অবিনাশ ভট্টাচার্য— ইহাদের প্রত্যেকের সাত বৎসরের দ্বীপান্তর-দণ্ড হয়। অরবিন্দসহ সতের জন মুক্তিলাভ করেন।

'আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা' বিভিন্ন কারণে ভারতের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। প্রথমত, ইহাই বিংশ শতাব্দীর বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসে প্রথম ষড়যন্ত্র-মামলা। দ্বিতীয়ত, ভারতে এই প্রথম বোমা দ্বারা বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা চলে এবং এই বিপ্লবীরাই ভারতে প্রথম বোমা ব্যবহার করেন। তৃতীয়ত, কানাইলাল ও সত্যেনের দ্বারা জেলের মধ্যে নরেন গোস্বামীর হত্যা কেবল ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসে নহে, "সমগ্র বিশ্বের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসে এক অতি বিস্ময়কর ঘটনা" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। এই সম্পর্কে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার গ্রন্থে এই সংবাদটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :

"গোস্বামীর মৃত্যু-শাস্তিতে য়ুরোপীয় বৈপ্লবিকেরা বাহবা দিয়াছিলেন। প্যারিসের (তৎকালে) সোসালিস্ট (বর্তমানে) কমিউনিস্ট-মুখপত্র 'Humanite' ('হুমানিতে') লিখিয়াছিল : 'ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা যে-প্রকারে শত্রুপুরীর মধ্যে থাকিয়াও রক্ষী-বেষ্টিত বিশ্বাসঘাতক স্বজাতিদ্রোহীকে শাস্তি দিয়াছে, তাহা জগতের বৈপ্লবিক ইতিহাসে প্রথম।' "[২]

১। Sedition Committee Report, p. 78 হইতে অনুদিত।

২। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম', পৃঃ ৬০

৫. 'বোমার বিভীষিকা'

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে তারিখে কলিকাতার বিপ্লবীদের একটি বিরাট দলকে গ্রেপ্তার করিয়া ও ৪ঠা মে হইতে তাঁহাদের লইয়া 'আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা' আরম্ভ করিয়া বাঙলাদেশের পুলিশ যখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠে, সেই সময়েই তাহাদের সাফল্যের উল্লাস হতাশায় পরিণত করিয়া কলিকাতার রাস্তাঘাট ঘন ঘন বোমা-বিস্ফোরণে কম্পিত হইতে থাকে এবং পূর্ব-বঙ্গে বিপ্লবীদের দুঃসাহসিক ডাকাতি ও গুপ্ত হত্যা শাসকগোষ্ঠীকে সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে।

নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া লইয়াই যুগান্তর দলের সভ্যগণ এই গ্রেপ্তারের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে 'আলিপুর-মামলা'র সরকারী উকিল মিঃ হিউম-এর প্রাণনাশের জন্য তৎপর হইয়া উঠেন। এই সময়, অর্থাৎ অরবিন্দ প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর যুগান্তর দলের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম, পাবনার অবিনাশ চক্রবর্তী দলের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন এবং প্রধান কর্মকর্তারূপে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) সহযোগে দলের বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ অব্যাহত রাখেন।[১]

কলিকাতার বিপ্লবীরা তাঁহাদের নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজিতে থাকেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে সরকারী উকিল হিউম সাহেব গ্রে স্ট্রীট দিয়া গাড়ীতে যাইবার সময় তাঁহার উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া চারিজন পথচারীকে আহত করে। জুন মাসের প্রথম দিকে রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিবার সময় কলিকাতার নিকটবর্তী হাওড়া স্টেশনে বিপ্লবীরা হিউমের কামরা লক্ষ্য করিয়া চারটি নারিকেল-বোমা নিক্ষেপ করেন, কিন্তু হিউমসাহেব এবারেও বাঁচিয়া যান। এই ব্যক্তিকে হত্যার জন্য পরে আরও দুইবার—১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী ও ৫ই এপ্রিল—চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হয়। ইহার পর হিউম-হত্যার চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়।

৬. ডাকাতি ও গুপ্তহত্যা

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন ঢাকার অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ ঢাকা জেলার বাড়ড়া গ্রামের এক কুখ্যাত ধনীর গৃহে ডাকাতি করেন। ঐদিন রাত্রিকালে প্রায় পঞ্চাশ-জন লোক রাইফেল, রিভলভার ও অন্যান্য অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নৌকাযোগে বাড়ড়া গ্রামে উপস্থিত হন। বিপ্লবীরা নির্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিয়া অর্থ ও অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করিতে থাকেন, ইতিমধ্যে গ্রামবাসারা আসিয়া তাঁহাদের বাধা দেয়। বিপ্লবীরা প্রায় ২৬ হাজার টাকা লইয়া গুলি বর্ষণ করিতে করিতে নৌকায় আরোহণ করেন। গুলিবর্ষণের ফলে গ্রামের চৌকিদার নিহত হয়, গ্রামবাসীদের বল্লমের আঘাতে কয়েকজন বিপ্লবীও আহত হন। সকাল বেলা পুলিস ও গ্রামের লোক একত্র হইয়া বিপ্লবীদের নৌকার পশ্চাৎধাবন করে এবং

১। ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত: 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম', পৃঃ ১৩৩।

তুই পক্ষে গুলিবর্ষণ চলে। ইহার ফলে গ্রামবাসীদের কয়েকজন এবং বিপ্লবীদের একজন নিহত হন। বিপ্লবীদের গুলিবর্ষণে পুলিস ও গ্রামবাসীরা ভয় পাইয়া পলায়ন করে। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর আর একদল লোক বিপ্লবীদের আক্রমণ করে। এখানেও একটি বড় রকমের সংঘর্ষ হয় এবং শেষ পর্যন্ত ঐ লোকগুলি ভয় পাইয়া পলায়ন করে। ইতিমধ্যে এই ডাকাতির সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং বিপ্লবীদের বড় নৌকাখানি দেখিবামাত্র বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামবাসীরা সন্দেহ করিয়া বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের বাধা দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু বিপ্লবীরা সকল বাধা অতিক্রম করিয়া পরদিন অস্ত্র ও লুণ্ঠিত অর্থসহ ঢাকা শহরে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হন। পুলিস বহু অনুসন্ধান করিয়া মাত্র তিনজন বিপ্লবীকে বিচারের জন্য আদালতে উপস্থিত করে। কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণাদি না থাকায় তাঁহারা মুক্তি লাভ করেন।

আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে অনুশীলন সমিতির তিনজন সভ্য ডাকাতির উদ্দেশ্যে নৌকায় যাইবার সময় পুলিস কর্তৃক গ্রেপ্তার হন। পুলিস নৌকা খানাতল্লাস করিয়া কয়েকখানি ছোরা হস্তগত করে। এই নৌকাখানি বিপ্লবীরা বাঢ়ড়া ডাকাতির সময় অপহরণ করিয়াছিলেন। ঐ মাসের ১৫ই তারিখে ময়মনসিংহ জেলার বাজিতপুর নামক স্থানে বিপ্লবীরা এক ধনীর গৃহে ডাকাতি করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। এই ডাকাতিতে বিপ্লবীরা পুলিসের বেশে ঐ ধনীর গৃহে খানাতল্লাসীর অজুহাতে উপস্থিত হন এবং পুলিস দেখিয়া গৃহস্বামী সভয়ে দ্বার খুলিয়া দেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর ঠিক এই কৌশলে বিপ্লবীরা হুগলী জেলার বিঘাতি নামক স্থানে ডাকাতি করেন। এই তুই ডাকাতিতে একই কৌশল অবলম্বন করিতে দেখিয়া পুলিস সহজেই বুঝিতে পারে যে, এই উভয় ক্ষেত্রেই একই দলভুক্ত বিপ্লবীরা ডাকাতি করিয়াছিলেন। পরের ঘটনা সম্পর্কে চারি ব্যক্তি ধরা পড়েন ও তাঁহারা দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১লা সেপ্টেম্বর 'আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা'য় অভিযুক্ত কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের হাসপাতালে ঐ মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোস্বামীকে হত্যা করেন।

৩০শে অক্টোবর ফরিদপুর জেলার নড়িয়া নামক স্থানের বাজারে একটি বড় রকমের ডাকাতি হয়। বিপ্লবীরা (ঢাকা অনুশীলন সমিতি) পূর্বে সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, নড়িয়া বাজারের এক মহাজনের নিকট আশী হাজার টাকা ও অন্যান্য দোকানে বহু টাকা সঞ্চিত আছে। এই সংবাদ পাইয়া প্রায় চল্লিশ জন বিপ্লবী বন্দুক, রিভলভার ও অন্যান্য অস্ত্রসহ নৌকা করিয়া নড়িয়া গ্রামের খেয়াঘাটে উপস্থিত হন এবং বন্দুক ছুড়িয়া খেয়াঘাটের মাঝিদের তাড়াইয়া দেন। ইহার পর তাঁহারা খেয়াঘাটের ষ্টিমার-অফিস ও তিনটি দোকান লুট করেন। ষ্টিমার-অফিসের লোকেরা ও দোকানদারগণ সম্ভবত পূর্বেই সংবাদ পাইয়া তাহাদের সঞ্চিত অর্থ লুকাইয়া ফেলিয়াছিল। কাজেই বিপ্লবীরা এখানে আশানুরূপ অর্থলাভ করিতে না পারিয়া হতাশ মনে ফিরিয়া যান। এই বিপ্লবীদের সম্পর্কে পুলিসকে সংবাদ দিলে এক

হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া সরকার ঘোষণা করে। কিন্তু কেহই পুরস্কারের লোভে পুলিসকে বিপ্লবীদের সংবাদ দেয় নাই। কাজেই পুলিস এই ডাকাতি সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার বা শাস্তি দিতে পারে নাই।

২রা নভেম্বর বৃটিশ সরকার বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও গণ-আন্দোলন শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে একটি অন্তঃসারশূন্য শাসন-সংস্কার ঘোষণা করে। কিন্তু বিপ্লবীরা এই শাসন-সংস্কার ঘৃণাভরে ছুড়িয়া ফেলিয়া পূর্ণোদ্যমে তাঁহাদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা চালাইতে থাকেন।

৭ই নভেম্বর বাঙলার ছোটলাট ফ্রেজার সাহেবকে হত্যার জন্য কলিকাতা ওভারটুন হলে এক সভায় আবার গুলি বর্ষিত হয়। কিন্তু ফ্রেজার সাহেব এবারেও বাঁচিয়া যান। এই সম্পর্কে এক যুবক গ্রেপ্তার ও দশ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ৯ই নভেম্বর মজঃফরপুরে প্রফুল্ল চাকীর গ্রেপ্তারকারী সাব-ইনস্পেকটর নন্দলাল ব্যানার্জি কলিকাতার আরপুলি লেনে বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ দিয়া দেশদ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত করে। নভেম্বর মাসে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সুকুমার চক্রবর্তী, কেশব দে ও অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ নামক তিনজন সভ্যকে দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহে হত্যা করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। কারণ, ইহাদের প্রত্যেকেই গ্রেপ্তার হইয়া পুলিসের নিকট দলসম্পর্কিত গোপন তথ্য প্রকাশ করিয়াছিল। ইহারা গ্রেপ্তার হইয়া মুক্তিলাভের পর ইহাদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রধান পরিচালক পুলিনবিহারী দাসকে '১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের তিন আইন' অনুসারে আটক করা হয়। নভেম্বর মাসের শেষে ও ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে নদীয়া জেলার রায়টা ও হুগলী জেলার মোরেহাল নামক স্থানে দুইটি ডাকাতি হয়। এই উভয় ক্ষেত্রেই বিপ্লবীরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেন। ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে বাখরগঞ্জের দেহেরগতি নামক স্থানে একটি ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা প্রচুর অর্থ লাভ করেন। পুলিস কেবলমাত্র মোরেহালের ডাকাতি সম্পর্কে এক যুবককে আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয়। বিচারে এই যুবকের সাত বৎসর কারাদণ্ড হয়। কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায় অন্য দুইটি ডাকাতি সম্পর্কে পুলিস কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। ১৯০৬ হইতে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ এইভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে

১. দমননীতি

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর '১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪নং সংশোধিত ফৌজদারী আইন' প্রবর্তিত হয়। এই আইন অনুসারে কতকগুলি বিশেষ অপরাধের অভিযোগে হাইকোর্টের তিনজন জজ জুরির সাহায্য ব্যতীত সংক্ষিপ্ত ও নামমাত্র অনুসন্ধানের

পর সরাসরি বিচার করিতে পারিতেন। এই আইনের দ্বারা সরকার যে-কোন সভা-সমিতি বেআইনী ঘোষণা করিবার ক্ষমতা লাভ করে। আইনের দ্বারা এই ক্ষমতা লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পূর্ববঙ্গের নিম্নোক্ত সমিতিগুলি বেআইনী ঘোষিত হয়ঃ

১। ঢাকার অনুশীলন সমিতি
২। বাখরগঞ্জের স্বদেশ-বান্ধব সমিতি
৩। ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি
৪। ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি
৫। ,, সাধনা সমিতি

২. বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লা শহরে বিপ্লবীরা ঢাকার নবাবের একটি মাল-গুদাম হইতে তিনটি রাইফেল অপহরণ করেন। এই উপলক্ষে একজন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করিয়া অন্তরীণ করা হয়।

১০ই ফেব্রুয়ারী সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস কলিক'তা সুবার্বন পুলিস কোর্টের সম্মুখে বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হন। এই সরকারী উকিল অন্যান্যদের সহযোগে প্রথমে 'আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা' এবং পরে কানাইলাল ও সত্যেন বসুর মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বিদেশী সরকারকে সাহায্য করিবার শাস্তি হিসাবেই বিপ্লবীরা তাঁহাকে হত্যা করেন। এই হত্যা সম্পর্কে পুলিস ঘটনাস্থলেই খুলনা জেলার শোভনা গ্রামের চারুচন্দ্র বসু নামক যুগান্তর সমিতির এক সভ্যকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে তাঁহার ফাঁসী হয়। ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখেই চব্বিশ পরগনা জেলার আগড়পাড়া নামক স্থানে এক পুলিস-কর্মচারীর উপর দুইটি নারিকেল-বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বোমা দুইটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া দুইজন লোককে আহত করে। ৩রা এপ্রিল চব্বিশ পরগনার ডায়মণ্ড হারবার থানার 'নেত্র' নামক গ্রামে বিপ্লবীরা ডাকাতি করিয়া ২৪ শত টাকা সংগ্রহ করেন। বিপ্লবীরা মুখোস পরিয়া ও রিভলভার উদ্যত করিয়া গৃহস্বামীর নিকট হইতে লোহার সিন্ধুকের চাবি আদায় করেন। তাঁহারা টাকা লইয়া চলিয়া আসিবার সময় গৃহস্বামীকে বলিয়া আসেন যে, ইংরেজদের এদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য তাহারা এই অর্থ ঋণ হিসাবে গ্রহণ করিতেছেন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুন অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ ফরিদপুর জেলার ফতেজঙ্গপুর গ্রামের গাবেশ চট্টোপাধ্যায়কে পুলিসের সহিত সহযোগিতার শাস্তি-স্বরূপ হত্যা করিতে গিয়া ভ্রমক্রমে তাহার ছোট ভাই প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়কে হত্যা করেন। পূর্বে গাবেশ কোন ক্রমে বিপ্লবীদের গোপন তথ্য জানিতে পারিয়া পুলিসকে বলিয়া দেয়। বিপ্লবীরা গাবেশের দেশদ্রোহিতার শাস্তি দানের সিদ্ধান্ত করেন। এই হত্যা সম্পর্কে এক যুবক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

৩. নাঙ্গলা ষড়যন্ত্র মামলা

১৬ই আগস্ট খুলনা জেলার নাঙ্গলা নামক স্থানে একটি উল্লেখযোগ্য ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। ঐ তারিখে রাত্রিকালে আট-নয় জন যুবক মুখোস পরিয়া ও পিস্তল-রিভলভার প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এক ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হন। তাঁহারা রিভলভার উদ্যত করিয়া গৃহস্বামীর নিকট হইতে সিন্দুকের চাবি আদায় করিয়া নগদে ও অলংকারে মোট ১০৭০ টাকা পান। এই ডাকাতি সম্পর্কে বহুস্থানে খানাতল্লাসী হয় এবং বিধুভূষণ দে, অশ্বিনীকুমার বসু, ব্রজেন্দ্রকুমার দত্ত প্রভৃতি ১৬ জন বিপ্লবী গ্রেপ্তার হন। খানাতল্লাসীর সময় পুলিস বহু "রাজদ্রোহ" মূলক পুস্তক ও বোমা তৈরির নিয়মাবলী হস্তগত করে। এই বিপ্লবীদের লইয়া ৩০শে আগস্ট 'নাঙ্গলা ষড়যন্ত্র-মামলা' আরম্ভ হয়। এই মামলার বিচারে একজনকে সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে এবং ছয়জনকে সাত বৎসরের জন্য, তিনজনকে পাঁচ বৎসরের জন্য এবং দুইজনকে তিন বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর ঢাকা জেলার রাজেন্দ্রপুর স্টেশনে বিপ্লবীরা এক দুঃসাহসিক ট্রেন-ডাকাতি করিয়া ২৩ হাজার টাকা লুণ্ঠন করেন। ঐ দিন সাতটি থলিয়ায় করিয়া এক ব্যবসায়ী ২৩ হাজার টাকা লইয়া ট্রেনে যাইতেছিলেন। পূর্ব হইতে এই সংবাদ পাইয়া গুপ্ত-সমিতির সাত-আটজন সভ্য রিভলভার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ট্রেনে আরোহণ করেন। ট্রেনখানি রাজেন্দ্রপুর স্টেশন ত্যাগ করিবামাত্র বিপ্লবীরা রিভলভার ও ছোরা লইয়া টাকার থলিয়াবাহী তিনজন লোককে আক্রমণ করেন। এইভাবে ঐ তিনজন লোককে আহত করিয়া তাঁহারা টাকার থলিয়াগুলি হস্তগত করেন এবং থলিয়াগুলি ট্রেন হইতে ছুড়িয়া ফেলিয়া নিজেরা লাফাইয়া পড়েন। পরে পুলিস অনুসন্ধান করিয়া প্রায় ১২ হাজার টাকার তিনটি থলিয়া উদ্ধার করিতে সক্ষম হয়। এই ঘটনায় থলিয়াবাহীদের একজন নিহত ও অপর দুইজন আহত হয়। পুলিস এই উপলক্ষে কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাদের লইয়া এক মামলা আরম্ভ করে। মামলার বিচারে একজনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও কয়েক জনকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই মামলার অভিযুক্তদের মধ্যে চারিজন স্বীকারোক্তি করে। তাহাদের স্বীকারোক্তি হইতে জানা যায় যে, যুগান্তর ও অনুশীলন এই উভয় সমিতির সভ্যেরা একত্রিত হইয়াই এই ডাকাতি করিয়াছিলেন এবং লুণ্ঠিত অর্থ দুই সমানভাগে ভাগ করা হইয়াছিল।[১] এই সময় বাঙলাদেশের দুইটি শ্রেষ্ঠ বৈপ্লবিক সমিতি যে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিত, এই ডাকাতিটি তাহারই একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

এই বৎসর আরও কয়েকটি বড় ডাকাতি হয়। ১৬ই অক্টোবর অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ মুখোস, রিভলবার, ছোরা, হাতুড়ি ও টর্চ দ্বারা সজ্জিত হইয়া ফরিদপুর জেলার দরিয়াপুর গ্রামে একটি ডাকাতি করিয়া ২৬ শত টাকা সংগ্রহ করেন। পুলিশ সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। ২৮শে অক্টোবর যুগান্তর

[১] "Sedition Committee Report", p. 41.

সমিতির সভ্যগণ নদীয়া জেলার হলুদবাড়ী গ্রামে এক ডাকাতি করিয়া ১৪ শত টাকা লুণ্ঠন করেন। এই ডাকাতি উপলক্ষে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাদের পাঁচজন আট বৎসর, এক জন সাত বৎসর এবং একজন পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রয়োজন হইলে আত্মহত্যার জন্য ইঁহারা 'পটাসিয়াম সায়ানাইড' নামক তীব্র বিষ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন।

১০ই নভেম্বর অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ ঢাকা জেলার রাজনগর গ্রামে একটি ডাকাতি করিয়া নগদে ও অলংকারে প্রায় ২৮ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। পরদিন ১১ই নভেম্বর তাঁহারা ত্রিপুরা জেলার মোহনপুরের বাজারে ডাকাতি করিয়া নগদ ১৬ হাজার টাকা লুণ্ঠন করেন। বহু চেষ্টা করিয়াও পুলিস কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। তবে পুলিস অনুমান করে যে, ঢাকার অনুশীলন সমিতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'সোনারং ন্যাশনাল স্কুল'-এ বসিয়াই উক্ত সমিতির পরিচালকগণ উপরোক্ত ডাকাতি-গুলির পরিকল্পনা তৈরি করিয়াছিলেন।

এই বৎসর আরও বহু রাজনীতিক ডাকাতি হইয়াছিল। সেইগুলির কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লেখ করা হইল। এই বৎসর বিভিন্ন গুপ্তসমিতি কয়েকটি গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভবত প্রয়োজনীয় সুবিধা-সুযোগের অভাবেই সেইগুলি কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। এই বৎসরের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, পূর্ববাঙলার নূতন প্রদেশের ছোটলাটকে হত্যার চেষ্টা। নভেম্বর মাসে ছোটলাট সাহেব পার্বত্য ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় আসিয়াছিলেন। লাটসাহেবের বাড়ীর সম্মুখে সাধুর ছদ্মবেশে তিনজন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া পরে মুক্তি দেওয়া হয়। এই তিনজনের মধ্যে দুইজন পরে অপর একটি বৈপ্লবিক কর্মের অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ

১. সামশুল আলম-হত্যা

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কলিকাতা পুলিসের গোয়েন্দা-বিভাগের কুখ্যাত অফিসার সামশুল আলমের হত্যা। এই গোয়েন্দা-অফিসারটি 'আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা'র তদ্বির করিতেছিলেন। ২৪শে জানুয়ারী কলিকাতা হাইকোর্টে উক্ত মামলার আপীলের শুনানীর পর যখন সামশুল আলম হাইকোর্টের সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিলেন, তখন বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত নামে যুগান্তর সমিতির আঠার বৎসর বয়স্ক এক যুবক তাঁহাকে পিছন হইতে গুলি করেন। পুলিস-অফিসারটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে বীরেন্দ্র উত্তেজনার বশে পলায়ন না করিয়া রাস্তায় নামিয়া গুলি চালাইতে থাকেন। এই সময় একজন পুলিস-সার্জেণ্ট তাঁহাকে ধরিয়া ফেলে। বীরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হইবার পর পুলিসের নিকট এক স্বীকারোক্তি করেন। স্বীকারোক্তিতে তিনি যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে (বাঘা যতীন) যুগান্তর সমিতির প্রধান পরিচালক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, যতীন্দ্রনাথই তাঁহাকে এই কার্যে

নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বীরেন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তির কয়েকদিন পরেই যতীন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হন।

২. হাওড়া ষড়যন্ত্র-মামলা

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী যশোহর জেলার ধূলগাঁও গ্রামে বিপ্লবীরা একটি ডাকাতি করিয়া ৬১৭৫ টাকা সংগ্রহ করেন। এই ডাকাতি উপলক্ষে পুলিস কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয় নাই।

মার্চ মাসে বিখ্যাত 'হাওড়া ষড়যন্ত্র-মামলা'র বিচার আরম্ভ হয়। সামশুল আলমের হত্যার পর কলিকাতা-পুলিস উন্মাদের মত চারিদিকে খানাতল্লাস করিয়া যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়সহ ৪৬ জনকে গ্রেপ্তার করে। ইঁহাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি বড় বড় ডাকাতি, গুপ্ত হত্যা, হত্যার সহযোগিতা, এবং সর্বোপরি 'ভারত-সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম"-এর অভিযোগ আনয়ন করা হয়। অভিযোগের মধ্যে পূর্বোক্ত বিঘাতি, রায়টা, মোরেহাল, হলুদবাড়ী প্রভৃতি স্থানের ডাকাতিগুলিও উল্লেখ করা হয় এবং অভিযুক্তদের মধ্যে 'হলুদবাড়ী ডাকাতি-মামলা'র ছয় জন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হন। এই মামলার বিচার আরম্ভ হয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে, আর শেষ হয় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। অর্থাৎ অভিযুক্ত সকলকে এক বৎসরকাল জেল হাজতে কাটাইতে হইয়াছিল। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় ধরিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও পুলিস অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই প্রমাণ করিতে পারে নাই। অবশেষে বাধ্য হইয়া পুলিস ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলিয়া লইয়া 'হলুদবাড়ী ডাকাতি-মামলা'র দণ্ডপ্রাপ্ত ছয়জন ব্যতীত অন্য সকলকে মুক্তি দান করে। এইভাবে সরকারের বহু-ঘোষিত 'হাওড়া ষড়যন্ত্র-মামলা'র অবসান ঘটে। এই ষড়যন্ত্র-মামলা চলিবার সময়েই সামশুল আলমকে হত্যার অভিযোগে ধৃত বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের বিচার চলে এবং বিচারে তাহার ফাঁসি হয়। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপরেও এই হত্যার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ইহা হইতেও তিনি মুক্তিলাভ করেন।

সর্বসমেত ৪৬ জন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে "সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম"-এর অভিযোগে 'হাওড়া ষড়যন্ত্র-মামলা'র বিচার আরম্ভ হইয়াছিল। সরকার হইতে এই ষড়যন্ত্রের স্থান বলিয়া চিহ্নিত করা হয়"হাওড়া জেলার শিবপুর এবং বৃটিশ ভারতের অন্যান্য স্থান"কে। অভিযুক্তদের বিভিন্ন বিপ্লবিদলের সভ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয় ; যথা, 'শিবপুর দল', 'কুরচি দল', 'খিদিরপুর দল', 'চিংড়িপোতা দল', 'মজিলপুর দল', 'হলুদবাড়ী দল', 'কৃষ্ণনগর দল', 'নাটোর দল', 'ঝাউগাছা দল', 'যুগান্তর দল', 'ছাত্রভাণ্ডার দল' এবং 'রাজশাহী দল' (রামপুর-বোয়ালিয়া দল)।

সরকারী মতে উপরি উক্ত ১২টি বিপ্লবিদল ঐক্যবদ্ধ হইয়াই "সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম'-এর ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। এই মামলা চলিবার সময় অভিযুক্তদের মধ্য হইতে ললিতমোহন চক্রবর্তী আর যতীন্দ্রনাথ হাজরা রাজসাক্ষী হন। কিন্তু তাঁহাদের

সাক্ষ্য বিচারকদের ও গোয়েন্দা পুলিসের বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ায় তাঁহাদিগকে রাজসাক্ষীর মর্যাদা দেওয়া হয় নাই।[১]

৩. যশোহর-খুলনায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়াস[২]

গুপ্তসমিতির প্রতিষ্ঠা

যশোহর-খুলনার প্রথম যুগের বৈপ্লবিক সংগঠনের প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন খুলনা জেলার ফুলতলার আলকা গ্রামের শ্রীসুধীরচন্দ্র দে মহাশয়। কলিকাতায় অনুশীলন সমিতি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পকাল পরেই তিনি ঐ সমিতির সভ্য হন এবং সমিতির পরিচালকদের নির্দেশে খুলনায় আসিয়া আলকা গ্রামে অনুশীলন সমিতির একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই খুলনা জেলার প্রথম বৈপ্লবিক সংগঠন। পরে অনুশীলন সমিতির এই খুলনা শাখা অরবিন্দ, বারীন্দ্র, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত 'যুগান্তর দল'-এর অনুগামী হয়।

প্রথমে বিভিন্ন গ্রামের বাছাই করা যুবকদের এই সমিতির সভ্য করা হয় এবং তাঁহাদের মারফত সংগঠন বিভিন্ন গ্রামে বিস্তার লাভ করে। সুধীরচন্দ্রের নেতৃত্বে ও যোগ্য পরিচালনায় ক্রমশ পার্শ্ববর্তী যশোহর জেলায়ও এই সমিতির শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।

নগেন্দ্রনাথ সরকার নামে শোলপুর গ্রামের এক উৎসাহী তরুণ সমিতির সভ্যপদ লাভ করিয়া নিজগ্রামে ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামে সমিতির শাখা গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ উৎসাহী ও দেশভক্ত যুবকদের লইয়া সমিতির কয়েকটি শাখা গঠনে সক্ষম হন।

সমিতির সভ্যদের প্রাথমিক কর্তব্য ছিল বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণের পক্ষে প্রচার কার্য চালানো। এই সকল কার্যের মধ্য দিয়াই সমিতির সভ্যদের রাজনীতিক কার্যে হাতেখড়ি হইত। এই সকল কার্যে যাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বুদ্ধিমত্তা, সাহস ও বৈপ্লবিক মনোভাবের পরিচয় দিতেন তাঁহাদিগকে লইয়া গুপ্ত সংগঠন গড়িয়া তোলা হয়। শোলপুর অঞ্চলে এই সকল কার্যের দায়িত্ব ছিল নগেন্দ্রনাথ সরকারের উপর। তিনি তাঁহার অঞ্চলে যথেষ্ট যোগ্যতার সহিত এই সকল কার্য পরিচালনা করিয়া একদিকে ব্যাপকভাবে বিলাতী-বর্জন আন্দোলন গড়িয়া তোলেন এবং অপর দিকে বাছাই করা কর্মীদের লইয়া গুপ্তসমিতির কয়েকটি শাখার প্রতিষ্ঠা করেন।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের পর হইতে স্বদেশী আন্দোলনের এক ধারা বিপ্লবের পথে চলিতে থাকে। এই সময় শ্রীসুধীরচন্দ্র দে'র নেতৃত্বে খুলনার 'যুগান্তর সমিতি' খুলনা ও যশোহর জেলার প্রায় সকল মহকুমায় এবং বহু গ্রামে বিস্তার লাভ করিয়া এক বিশাল সংগঠনে পরিণত হইয়াছিল।

১। Sedition Committee Report. p. 96.

২। এই বিবরণটি খুলনার প্রথম যুগের গুপ্তসমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক শ্রীসুধীরচন্দ্র দে মহাশয়ের নিকট হইতে সেযুগের অন্যতম বিপ্লবী নগেন্দ্রনাথ সরকারের পুত্র শ্রীহারাণ সরকার কর্তৃক সংগৃহীত।

এই সময় বিভিন্ন জেলার বৈপ্লবিক সমিতিগুলি একযোগে সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া উহার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এই সাধারণ পরিকল্পনারই অংশ হিসাবে খুলনার বিপ্লবীরাও তাঁহাদের জেলার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। তাঁহাদের এই পরিকল্পনাটি ঢাকা অনুশীলন সমিতির সহিত একত্রে কার্যকরী করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। খুলনার বিপ্লবীদের এই পরিকল্পনাটি ছিল নিম্নরূপ :

যাহাতে কলিকাতা হইতে কোন ট্রেন না আসিতে পারে তাহার জন্য বিপ্লবীদের একটি দল নাভারণ ও বেনাপোল রেল স্টেশনের মধ্যবর্তী রেলপথ তুলিয়া ফেলিবে ; ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীদের আর একটি দল খুলনার ট্রেজারী আক্রমণ ও দখল করিবে এবং পুলিস-লাইনের সকল রাইফেল ও গোলাগুলি অধিকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে।

এই পরিকল্পনা সফল করিয়া তুলিবার জন্য বিপ্লবীদের কয়েকজনকে প্রকাশ্য ক্রিয়াকলাপ হইতে সরাইয়া লইয়া কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়। কলিকাতার জোড়াবাগানে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সেইস্থানে তাঁহারা আত্মগোপন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উপর অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের ভার ন্যস্ত করা হয়। তাঁহারা দুইটি বন্দুকের দোকানের কর্মচারীদের মারফত কয়েকটি বন্দুক, রিভলভার ও পিস্তল সংগ্রহ করেন। এইভাবে তাঁহারা ঢাকার অনুশীলন সমিতিকেও কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

গ্রেপ্তার ও ষড়যন্ত্র-মামলা

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করিবার জন্যই বিপ্লবীদের অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাঁহারা ডাকাতি করিয়া অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত করেন। ডাকাতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিবার ভার পড়ে কলিকাতায় আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের উপর। তাঁহারা ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে খুলনা জেলার কয়েকটি স্থানে ডাকাতি করিয়া কয়েক হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। এই বিপ্লবীরা শোলগাঁতির ডাকাতিতে ২০০ টাকা, ধূলগ্রামের ডাকাতিতে ৬১৭৫ টাকা, নন্দনপুরের ডাকাতিতে ৬৫০০ টাকা এবং মহীষার ডাকাতিতে ২২০৪ টাকা সংগ্রহ করেন।[১]

এই বিপ্লবীরা শেষ ডাকাতি করেন নাভ্‌লা গ্রামের এক ধনীগৃহে। যাঁহারা ডাকাতি করিতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের দুইজনের অসাবধানতা বশত পুলিস তাঁহাদের সকলের সন্ধান পায় এবং তাঁহাদের কলিকাতার জোড়াবাগানের গোপন বাসস্থানের ঠিকানাও জানিয়া ফেলে। একদিন শেষরাত্রে পুলিস এই স্থানে হানা দিয়া সকলকে ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। জোড়াবাগানের বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া পুলিস কোন অস্ত্রশস্ত্র না পাইলেও অস্ত্রশস্ত্রের একটি তালিকা ও নম্বর তাহাদের হস্তগত হয়।

বিভিন্ন সূত্র হইতে সংবাদ পাইয়া পুলিস খুলনা জেলার গুপ্তসমিতির প্রায় সকল সভ্যের নামধাম জানিয়া ফেলে এবং একে একে প্রায় সকলকেই গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম

১। Sedition Committee Report, p. 98.

হয়। এই সময় শোলপুরের গুপ্ত সমিতির ভারপ্রাপ্ত নগেন্দ্রনাথ সরকার ও অন্যান্য সকলে গ্রেপ্তার হন।

খুলনা-যশোহরের বৈপ্লবিক সমিতির প্রধান নায়ক সুধীর দে মহাশয় এই সময় ছিলেন জলপাইগুড়িতে। খুলনায় ব্যাপক গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া তিনি খুলনায় আসিবামাত্র তাঁহাকেও ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহার পর ধৃত বিপ্লবীদের লইয়া আরম্ভ হয় ডাকাতির মামলার বিচার। বিচারকালে বিপ্লবীদের একজন, অবনী চক্রবর্তী স্বীকারোক্তি করিয়া রাজসাক্ষী হন। কিন্তু হাইকোর্টের শুনানীর সময় অবনী তাঁহার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করেন। ইহার ফলে বিচারক অবনী ব্যতীত অন্য সকলকে ডাকাতির অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হন। অবনী ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন।

অন্য সকল বিপ্লবীকে ডাকাতির অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিয়া পুনরায় জেলে আবদ্ধ করা হয় এবং তাঁহাদের লইয়া এক নূতন ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ করিবার আয়োজন চলে।

দীর্ঘ ১০ মাস ধরিয়া ষড়যন্ত্র মামলার বিচার চলে। বিচারে অবনী চক্রবর্তী, শচীন্দ্রলাল মিত্র, বিধুভূষণ দে, অশ্বিনীকুমার বসু, কালিদাস ঘোষ ও নরেন্দ্রনাথ চন্দ্রের প্রত্যেকের ৭ বৎসর, সুধীরচন্দ্র দে ও নগেন্দ্রনাথ সরকারের প্রত্যেকের ৫ বৎসর, আর অপর দুইজনের ৩ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হয়। ইঁহারা সকলেই আন্দামান দ্বীপে প্রেরিত হন। এইভাবে খুলনা ষড়যন্ত্র মামলার সমাপ্তি ঘটে।

৪. ঢাকা ষড়যন্ত্র-মামলা

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'ঢাকা ষড়যন্ত্র-মামলা'। ইতিপূর্বে ঢাকা জেলায় যে সকল বড় বড় ডাকাতি ও অন্যান্য বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেগুলির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও দলকে প্রমাণসহ গ্রেপ্তার করিতে না পারায় এবং এই প্রকার ঘটনার ক্রমবৃদ্ধির ফলে পুলিস বিশেষভাবে অপদস্থ হয়। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ না থাকিলেও তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল যে এইগুলি ঢাকার 'অনুশীলন সমিতির'ই কাজ।

সুতরাং এই সমিতিকে একটা মারাত্মক আঘাত দিবার উদ্দেশ্যে পুলিস "সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম' প্রভৃতির বহু অভিযোগ একত্র করিয়া একটি বড় রকমের ষড়যন্ত্র দাঁড় করাইবার চেষ্টা করে।

এই বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পরিচালক পুলিনবিহারী দাসও নির্বাসন-দণ্ড ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসেন। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া পুলিস কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়। চারিদিকে গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাসী পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে। পুলিন দাস এবং আরও ৫৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার পর জুলাই মাসে ইঁহাদের লইয়া "সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম", ডাকাতি, নরহত্যা প্রভৃতির অভিযোগে 'ঢাকা ষড়যন্ত্র-মামলা'র বিচার আরম্ভ হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া বিচারের পর মাত্র পনের জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়। পুলিন দাস

মহাশয় সাত বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং অপর চোদ্দ জনকে দুই হইতে সাত বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অন্য সকলে মুক্তিলাভ করেন। এইভাবে বিখ্যাত 'ঢাকা ষড়যন্ত্র-মামলা'র পরিসমাপ্তি ঘটে।

কিন্তু এত করিয়াও ঢাকার অনুশীলন সমিতির বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করা গেল না, বরং তাহা ক্রমশ বাড়িয়া চলিতে থাকে। তাই 'সিডিসন কমিটি' সখেদে মন্তব্য করিয়াছেন :

"দুঃখের বিষয়, এই বিচার ও শাস্তিবিধান এই জেলার অপরাধ নিবারণের দিক হইতে নিষ্ফল হয়। সম্ভবত এই ব্যর্থতার কারণ এই যে, ষড়যন্ত্রকারীদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী এবং তাহাদের সংগঠন বড় বেশী রকমে বিস্তৃত, আর গ্রেপ্তারের জালও বেশী দূর বিস্তৃত করা যায় নাই।"[১]

তাই দেখা যায় যে, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের পর হইতে, অর্থাৎ 'ঢাকা ষড়যন্ত্র-মামলা' আরম্ভ হইবার পর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে নিম্নোক্ত বড় ডাকাতিগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং পুলিস একটি ব্যতীত অপর কোন ডাকাতি উপলক্ষে কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে বা শাস্তি দিতে পারে নাই।

২১শে জুলাই তারিখে ময়মনসিংহের গোরক্ষপুর নামক স্থানে ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা একটি বন্দুক ও একটি রিভলভার সংগ্রহ করেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকার হলদিয়াহাটের ডাকাতিতে ১৫০০ টাকা লুণ্ঠিত হয়। এই ডাকাতির সময় বিপ্লবীদের গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত ও এক ব্যক্তি আহত হয়। ৭ই নভেম্বর ফরিদপুরের কলারগাঁও নামক স্থানে ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা ১২৬৬০ টাকা সংগ্রহ করেন। ৩০শে নভেম্বর বাখরগঞ্জের দাদপুর নামক স্থানের ডাকাতিতে বিপ্লবীদের দ্বারা ৪৯৩৬৮ টাকা লুণ্ঠিত হয়। এই ডাকাতির সময় বিপ্লবীদের গুলিতে পাঁচ ব্যক্তি আহত হয়। ইহা ব্যতীত ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকার মুন্সীগঞ্জের এক গৃহে খানাতল্লাসী করিয়া পুলিস একটি বোমা আবিষ্কার করে। এই ঘটনায় একজন বিপ্লবী ধৃত হইয়া ১০ বৎসরের দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

৫. দমননীতি

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল দমননীতির কার্যকরী অস্ত্র হিসাবে ভারত-সরকার কর্তৃক প্রেস-আইনের সংশোধন (১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১নং আইনের প্রবর্তন)। বৈপ্লবিক প্রচার বন্ধ করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। এই আইনের খসড়া ঐ বৎসরের ৯ই ফেব্রুয়ারী বড়লাটের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়া আইনে পরিণত হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের 'সংবাদপত্র-আইন'-এর দ্বারা 'রাজদ্রোহ' মূলক রচনাযুক্ত সংবাদপত্র মুদ্রণের অভিযোগে যে-কোন মুদ্রাযন্ত্র বাজেয়াপ্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের প্রেস-আইনের দ্বারা সরকার যে-কোন ছাপাখানার নিকট জামিন দাবি করিবার ক্ষমতা লাভ করে। এই কুখ্যাত আইনের ফলে ছাপাখানাগুলির

১। Sedition Committee Report, p. 46.

পক্ষে কাজকর্ম চালান অসম্ভব হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন দেখা দেয়। এমন কি, কংগ্রেসের ইংরেজ-ভক্ত আপসপন্থী নেতৃবৃন্দও ইহার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ

১. ডাকাতি

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবীদের দ্বারা সারা বাঙলায় মোট আঠারটি ডাকাতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ষোলটি হইয়াছিল পূর্ব-বঙ্গে। পূর্ব-বঙ্গে অনুষ্ঠিত বড় বড় ডাকাতিগুলি এখানে উল্লেখ করা হইল :

২১শে জানুয়ারী সোনারং গ্রামে বিপ্লবীরা ডাক-পিয়নের নিকট হইতে একটি মেল-ব্যাগ কাড়িয়া লয়। এই ব্যাগের মধ্যে বহু টাকার 'মনি-অর্ডার' ছিল। লুণ্ঠিত টাকার পরিমাণ অজ্ঞাত। এই উপলক্ষে বিখ্যাত সোনারং ন্যাশনাল স্কুলের চৌদ্দ জন শিক্ষক ও ছাত্র গ্রেপ্তার হন এবং তাঁহাদের সাতজনের কারাদণ্ড ও জরিমানা হয়। সোনারং গ্রামের রসুল দেওয়ান নামে একটি মুসলমান ও তাহার ভ্রাতা এই ঘটনাটি দেখিতে পায় এবং পুলিসের নিকট বিপ্লবীদের নাম বলিয়া দেয়। বিপ্লবীরা ইহাতে রসুল দেওয়ান ও তাহার ভ্রাতার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের হত্যা করিবার সুযোগ খুঁজিতে থাকেন।

৫ই জানুয়ারী অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ ফরিদপুর জেলার পণ্ডিতচরের এক বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া নগদ ৫৫০০ টাকা সংগ্রহ করেন। পুলিস কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। ২০শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার গোয়াড়িয়া নামক স্থানে ডাকাতি হয় এবং তাহাতে নগদে ও অলংকারে ৭৪৫৭ টাকা লুণ্ঠিত হয়। এই ডাকাতি সম্পর্কে কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই। ৩১শে মার্চ ডাকাতি হয় ময়মনসিংহ জেলার শুয়াকাইর নামক স্থানে। ইহাতে ১২ শত টাকা লুণ্ঠিত এবং একজন আহত হয়। উক্ত সমিতির সভ্যগণ ২২শে এপ্রিল তারিখে বাখরগঞ্জ জেলার লক্ষ্মণকাঠী গ্রামে ডাকাতি করিয়া ১০২০০ টাকা লইয়া পলায়ন করেন। ৩০শে এপ্রিল ডাকাতি হয় ময়মনসিংহ জেলার চরশশা গ্রামে। এই ডাকাতিতে ২১৫০ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকা জেলার সিংঘাইর নামক স্থানে এক ডাকাতিতে ৮১৭০ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ৩রা অক্টোবর ময়মনসিংহের কালিয়াচক নামক স্থানের ডাকাতিতে ৩১২৫ টাকা, ৬ই নভেম্বর যুগান্তর সমিতি দ্বারা রংপুরের বালিয়া গ্রামের ডাকাতিতে ১২১৮ টাকা, ৩১শে ডিসেম্বর অনুশীলন সমিতি দ্বারা নোয়াখালির চাউলপালি গ্রামের ডাকাতিতে ১৯৭৭ টাকা লুণ্ঠিত হয়। পুলিস উপরোক্ত ডাকাতিগুলি সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই।

২. গুপ্তহত্যা

এই বৎসরের ২১শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতার অনুশীলন সমিতির একজন সভ্য কলিকাতা-পুলিসের সি-আই-ডি বিভাগের হেড কনেস্টবল শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তীকে হত্যা করেন। এই লোকটি দিবারাত্র বিপ্লবীদের পিছনে ছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইত।

২রা মার্চ বিকাল পাঁচটার সময় ষোল বৎসর বয়স্ক এক যুবক সি-আই-ডি পুলিসের বড় কর্তা ডেনহাম সাহেবকে হত্যার উদ্দেশ্যে কলিকাতার রাস্তায় একটি ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক বোমা নিক্ষেপ করে। বোমাটি ভ্রমক্রমে কাউলি নামক এক সাহেবের গাড়ির মধ্যে পতিত হয়। কিন্তু উহা বিস্ফোরিত না হইবার ফলে কাউলি সাহেব বাঁচিয়া যান। এই প্রকারের ভয়ঙ্কর বোমা নাকি চন্দননগরে বসিয়া বিপ্লবীরা তৈরি করিতেন। ১০ই এপ্রিল ঢাকা জেলার রাউথভোগ গ্রামের মনোমোহন দে নামক এক গোয়েন্দা অনুশীলন সমিতির সভ্যদের দ্বারা নিহত হয়। এই গোয়েন্দাটির জ্বালায় বিপ্লবীরা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৯শে জুন বিপ্লবীরা ময়মনসিংহ শহরে পুলিস সাব্-ইন্স্পেক্টর রাজকুমারকে হত্যা করেন। ১১ই জুলাই ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ সোনারং গ্রামের রসুল দেওয়ান ও তাহার ভ্রাতা এবং অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুলিসের সহিত সহযোগিতাকরিবারপ্রতিশোধ গ্রহণকরেন। ইহারা ২১শে জানুয়ারী সোনারং ডাক-লুটের ঘটনাটি দেখিয়া লুণ্ঠনকারী বিপ্লবীদের নাম পুলিসের নিকট বলিয়াছিল এবং এই মামলায় পুলিসকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। ১১ই ডিসেম্বর বরিশালের অনুশীলন সমিতি উহার যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করার অপরাধে পুলিস-ইন্স্পেক্টর মনোমোহন ঘোষকে হত্যা করে।

৩. 'রাজদ্রোহ'মূলক জনসভা-নিবারক আইন

এই বৎসর সরকার ইহার দমননীতির অপর একটি অস্ত্র হিসাবে 'রাজদ্রোহমূলক জনসভা-নিবারক আইন' (১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১০নং আইন) প্রবর্তন করে। পুলিস এই আইন অনুসারে পূর্বে বিজ্ঞপ্তি দিয়া যে-কোন জনসভা বন্ধ করিবার ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু, 'সিডিসন কমিটি'র ভাষায়, "ইহাতেও বিশেষ কোন ফল হয় নাই।"

৪. বঙ্গভঙ্গ রদ

যখন দমননীতি, গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড, জরিমানা এবং নানাবিধ অত্যাচার-উৎপীড়ন করিয়াও বাঙলার বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও গণ-আন্দোলন দমন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হইল না, তখন বৃটিশ সরকার "বাঙলাকে শান্ত করিবার" অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার সিদ্ধান্ত করে। এই বৎসর দিল্লীতে বৃটিশ সম্রাটের রাজ্যাভিষেক-দরবারে এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। বিভক্ত বাঙলার পূর্ব ও পশ্চিম অংশ আবার এক হইল। কিন্তু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য যে বৈপ্লবিক সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল, সেই বৈপ্লবিক সংগ্রাম বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে কিছুমাত্র হ্রাস পাইল না, বরং বৃটিশ শক্তির এই পরাজয়ের ফলে তাহা আরও জোরের সহিত চলিতে থাকিল।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ

১. ডাকাতি

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানত পূর্ববঙ্গের অনুশীলন সমিতি ও 'মাদারীপুর সমিতি' দ্বারা কয়েকটি বড় বড় ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে ছয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ-

যোগ্য। ২৩শে জানুয়ারী ঢাকা জেলার বাইগুনতেয়ারী নামক স্থানে একটি ডাকাতি হয়। বিপ্লবীরা এখানে ৩৪৭০ টাকা সংগ্রহ করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী একটি ডাকাতি হয় ঢাকা জেলার আয়নাপুর গ্রামে, এখানে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ৭৫৯৩ টাকা। ২৩শে মে বিপ্লবীরা ঢাকার বিরঙ্গল নামক স্থনে ডাকাতি করিয়া ৮০৮০ টাকা সংগ্রহ করেন। ১১ জুলাই ঢাকা জেলার পানাম নামক স্থানের ডাকাতিতে ২০ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। অনুশীলন সমিতি ১৫ই জুলাই বাখরগঞ্জ জেলার প্রতাপপুর গ্রামের ডাকাতিতে ৭৫৯৫ টাকা এবং ১৪ই নভেম্বর ঢাকার নাঙ্গলবন্দ নামক স্থানে ডাকাতি করিয়া ১৬ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। উপরোক্ত ডাকাতিগুলির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পিস্তল, রিভলভার বা বন্দুক ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং কেবলমাত্র নাঙ্গলবন্দের ডাকাতি সম্পর্কেই পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে মাত্র একজন পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহা ব্যতীত অন্য সকল ডাকাতি সম্পর্কে পুলিস যাঁহাদের গ্রেপ্তার করে তাঁহাদের সকলেই সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে মুক্তি লাভ করেন।

১৭ই এপ্রিল বাখরগঞ্জের কুশঙ্গল নামক স্থানে যে ডাকাতি হয় তাহা পর বৎসরের বিখ্যাত 'বরিশাল ষড়যন্ত্র-মামলা'র সহিত জড়িত করা হইয়াছিল। এই ডাকাতিতে বিপ্লবীদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একজন সরকারী কর্মচারীর একটি বন্দুক হস্তগত করা। ১৯শে এপ্রিল বাখরগঞ্জের কাকুড়িয়া নামক স্থানের ডাকাতি উপলক্ষে পুলিস যাঁহাদের গ্রেপ্তার করে তাঁহাদের মধ্যে রজনী দাস নামক অনুশীলন সমিতির একজন সভ্য রাজসাক্ষী হইয়া সমিতির বহু গোপন তথ্য পুলিসের নিকট ফাঁস করে। তাহার বিবৃতি হইতে পুলিস জানিতে পারে যে, বরিশালের গুপ্ত সমিতি ঢাকা অনুশীলন সমিতিরই একটি শাখাবিশেষ। বরিশালের গুপ্ত সমিতির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সংক্রান্ত সকল তথ্য এবং গুপ্ত সমিতির পরিচালক ও সভ্যদের তালিকাও পুলিসের হস্তগত হয়। এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিবার সময় হইতে পুলিস স্থানীয় গুপ্ত সমিতির মূলোচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে একটি বড় রকমের ষড়যন্ত্র-মামলা দাঁড় করাইবার চেষ্টা আরম্ভ করে। পর বৎসর এই মামলাটি আরম্ভ হয়। এই মামলাই 'প্রথম বরিশাল ষড়যন্ত্র-মামলা' নামে খ্যাত।

২. মাদারিপুর সমিতি

এই বৎসর নূতন একটি বৈপ্লবিক সমিতির সন্ধান প্রথম পাওয়া যায়। ইহা 'মাদারিপুর সমিতি' নামে খ্যাত। সম্ভবত ইহা পূর্বেই অনেকটা স্বাধীনভাবে, অর্থাৎ বাঙলাদেশের দুই প্রধান দল অনুশীলন বা যুগান্তর সমিতির অধীনে না থাকিয়া, ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর শহরকে কেন্দ্র করিয়া স্থানীয় যুবকদের উদ্যোগে গঠিত হইয়াছিল। এই সমিতির আদর্শ ও কর্মপন্থা ছিল অনেকটা ঢাকার অনুশীলন সমিতির অনুরূপ। যুগান্তর বা অনুশীলন সমিতির মত এই সমিতিও রাজনীতিক ডাকাতিকে বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে পরাধীন ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অপরিহার্য অংশস্বরূপ 'গেরিলা-যুদ্ধ' হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। এই নীতি অনুসারে তাঁহারা ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে

বড় বড় তিনটি 'গেরিলা-যুদ্ধ' করেন জানুয়ারী মাসে বাইগুনতেয়ারীর ডাকাতি, ফেব্রুয়ারী মাসে আয়নাপুরের ডাকাতি ও নভেম্বর মাসে কোলার পোস্টঅফিস ডাকাতি। এই তিনটি ডাকাতি দ্বারা তাঁহারা প্রায় ১১ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। তাঁহারা এই সকল ডাকাতিতে আগ্নেয়াস্ত্র, মুখোস প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং "ডাকাতেরা সামরিক শিক্ষার পরিচয়ও দিয়াছিলেন"। তাঁহারা বোমা তৈরি করিতে জানিতেন। প্রথম দুইটি ডাকাতিতে তাঁহারা বোমা ফাটাইয়া গ্রামবাসীদের বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

৩. গুপ্তহত্যা

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে অনুশীলন সমিতির নোয়াখালি-শাখার সারদাচরণ চক্রবর্তী নামক এক সভ্যকে সমিতির শৃঙ্খলা-বিরোধী কার্যের অপরাধে হত্যা করা হয়। সারদাচরণ সমিতির কয়েকটি রাইফেল কোন প্রকারে হস্তগত করিয়া নিজে একটি দল গঠনের প্রয়াস পায়। এই জন্য পার্টি হইতে তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পুলিস যাহাতে এই নিহত ব্যক্তিকে সনাক্ত করিতে না পারে তাহার জন্য বিপ্লবীরা তাহার মৃতদেহ কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া একটি পুকুরে নিক্ষেপ করেন। পরে সমিতির কয়েক জন সভ্য রাজসাক্ষী হইয়া ইহা পুলিসের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়।

২৪শে সেপ্টেম্বর ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ রতিলাল রায় নামক এক হেড কনেস্টবলকে ঢাকা শহরের জনবহুল রাস্তায় সন্ধ্যা ৭টার সময় গুলি করিয়া হত্যা করেন। রতিলাল পুলিসের বড় কর্তাদের নির্দেশে সমিতির কর্মীদিগকে সকল সময় ছায়ার মত অনুসরণ করিত। বিপ্লবীরা এই "দুষ্ট ছায়া"টিকে অপসারিত করিয়া অন্যান্য গোয়েন্দাদের সতর্ক করিবার জন্য ইহাকে হত্যা করেন। পুলিস রতিলালের হত্যাকারীর সন্ধান পায় নাই।

১৩ই ডিসেম্বর রাত্রিকালে 'মেদিনীপুর-বোমার মামলা'র তথ্যানুসন্ধানকারী গোয়েন্দা আব্‌দুর রহমানকে হত্যার জন্য তাহার গৃহে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু ঐ রাত্রে রহমান গৃহে না থাকায় এই হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ

১. ডাকাতি

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবীরা অর্থ সংগ্রহের জন্য দশটি স্থানে ডাকাতি করেন। এই সকল ডাকাতি দ্বারা মোট ৬১ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। এই ডাকাতিগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা জেলার ভরাকাইর নামক স্থানে যে ডাকাতি হয় তাহাতে ৩৪০০ টাকা লুণ্ঠিত হয়। পুলিস এই সম্পর্কে কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করে, তাঁহাদের মধ্যে একজনের দুই বৎসর কারাদণ্ড হয়। ঐ তারিখে ময়মনসিংহের ধুধুলিয়া নামক স্থানে ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা ৯ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। ডাকাতির সময় গ্রামবাসীরা বিপ্লবীদের বাধা দিলে তাঁহারা

গ্রামবাসীদের উপর গুলি ছুঁড়িতে বাধ্য হন এবং তাহার ফলে একজন নিহতও তিনজন আহত হয়। ৩রা এপ্রিল ডাকাতি হয় গোপালপুর নামক স্থানে। এই ডাকাতিতে প্রায় ৭ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয় এবং বিপ্লবীদের গুলিতে একজন আহত হয়। ২৯শে তারিখে অপর একটি ডাকাতি হয় ফরিদপুর জেলার কাওয়াকুরি নামক গ্রামে। ইহাতে ৫১৩০ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ১৬ই আগস্ট ময়মনসিংহ জেলার কেদারপুর নামক স্থানে একটি ভীষণ ডাকাতি হয় এবং ইহাতে ১৯৮০০ টাকা বিপ্লবীরা হস্তগত করেন। এই ডাকাতির সময় গৃহে এক ব্যক্তি বাধা দিলে সে বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। ফিরিবার সময় গ্রামবাসীরা বাধা দিলে বিপ্লবীরা গুলি ছুঁড়িয়া আত্মরক্ষা করেন, তাহার ফলে পাঁচজন গ্রামবাসী আহত হয়। ইহা ব্যতীত ২৪শে নভেম্বর ময়মনসিংহের সরাচর নামক স্থানে (৪৩৯০ টাকা), ৩রা ডিসেম্বর ত্রিপুরা জেলার থরমপুর নামক স্থানে (৬ হাজার টাকা) এবং ১৯শে ডিসেম্বর ত্রিপুরার পশ্চিমসিং নামক স্থানে (৩১০০ টাকা) তিনটি উল্লেখযোগ্য ডাকাতি হয়। সম্ভবত ইহার সবগুলিই অনুশীলন সমিতি দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

২. গুপ্তহত্যা

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে আসামের শ্রীহট্ট জেলার ম্যাজিস্ট্রেট গর্ডন সাহেবের অত্যাচারে শ্রীহট্টবাসীরা অস্থির হইয়া প্রতিকারের পথ খুঁজিতেছিল। এই সময় বিপ্লবীরা এই অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করিয়া ইংরেজ-শাসকদের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন। ২৭শে মার্চ এক সাহসী যুবক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া শ্রীহট্টের মৌলভীবাজারে গর্ডন সাহেবের বাগানবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল একটি ভয়ঙ্কর বোমা ও দুইটি রিভলভার। গর্ডন সাহেব যাহাতে কোন প্রকারেই প্রাণ লইয়া পলাইতে না পারেন তাহার জন্যই এত সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। কিন্তু বাগানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার সময় যুবকের হস্তস্থিত বোমাটি একটা ঝাকুনি লাগিয়া ফাটিয়া যায় এবং যুবকের দেহের উপরাংশ টুকরা টুকরা হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। এই দুর্ঘটনার ফলে গর্ডন সাহেব সে যাত্রা বাঁচিয়া যান।

এপ্রিল মাসে বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জের এক গৃহের মধ্যে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু বোমাটি না ফাটিবার ফলে কেহ হতাহত হয় নাই। ২৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাকালে হরিপদ দেব নামে কলিকাতার গোয়েন্দা বিভাগের একজন কনেস্টবল যুগান্তর সমিতির দুইজন কর্মীর পশ্চাদনুসরণ করিতে করিতে মধ্য-কলিকাতার জনাকীর্ণ কলেজ-স্কোয়ারে প্রবেশ করে। হরিপদ পূর্ব হইতেই কোন প্রকারে বিপ্লবীদের অনেককে চিনিয়া ফেলিয়াছিল এবং তাঁহাদের পিছনে দিবা-রাত্র ঘুরিয়া তাহাদের অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে হরিপদ দুইজন বিপ্লবীর পিছনে থাকিয়া কলেজ-স্কোয়ারে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহারা একটা ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া যান এবং পিছন হইতে তাহার পৃষ্ঠে গুলি করিয়া ভিড়ের মধ্যে সরিয়া পড়েন। হরিপদের গোয়েন্দাগিরির সাধ চিরতরে মিটিয়া যায়। পুলিস বহু চেষ্টা করিয়াও হত্যাকারীদের কোন সন্ধান পায় নাই।

ময়মনসিংহের বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী ছিল পূর্ববঙ্গের পুলিসের গোয়েন্দা-বিভাগের একজন কুখ্যাত ইনস্‌পেক্টর। 'ঢাকা ষড়যন্ত্র-মামলা'র সময় এই ব্যক্তি অনুশীলন সমিতির বিশেষ ক্ষতি সাধন করিয়াছিল। তাই সমিতি ইহাকে হত্যা করিবার সিদ্ধান্ত করে। কিন্তু দুই বারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর বঙ্কিম সন্ধ্যাকালে যখন বাড়ী বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, তখন তাহার সম্মুখে অকস্মাৎ একটি বোমা পড়ে। বোমাটি ভয়ংকর শব্দে ফাটিয়া যায় এবং বঙ্কিম সঙ্গে সঙ্গেই নিহত হয়। পুলিস এই সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই।

গত বৎসর মেদিনীপুরের কুখ্যাত গোয়েন্দা আব্‌দুর রহমানের হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পরেও বিপ্লবীরা সেই চেষ্টা পরিত্যাগ করেন নাই। এই বৎসর ৯ই ডিসেম্বর মুসলমানদের একটি ধর্ম-সংক্রান্ত শোভাযাত্রা পরিচালনা কালে বিপ্লবীরা তাহার উপর আবার বোমা নিক্ষেপ করেন। কিন্তু উহা না ফাটিবার ফলে তাঁহাদের চেষ্টা এবারেও ব্যর্থ হয়। ৩০শে ডিসেম্বর হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর থানায় দুইজন পুলিস-অফিসারকে হত্যা করিবার জন্য একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু উহা না ফাটিবার ফলে কেহ হতাহত হয় নাই।

৩. প্রথম বরিশাল ষড়যন্ত্র-মামলা

পূর্ব-বৎসর বাখরগঞ্জ জেলার পরপর কতকগুলি রাজনীতিক ডাকাতি অনুষ্ঠিত হওয়ায় অনুসন্ধানের পর পুলিস এই জেলার অনুশীলন সমিতি সম্পর্কে বহু সংবাদ জানিয়া ফেলে। তখন হইতে একটি ষড়যন্ত্র-মামলা দাঁড় করাইবার আয়োজন চলে। পূর্ব-বৎসর, অর্থাৎ ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের একটি ঘটনায় মামলার আয়োজন আরও কয়েক ধাপ আগাইয়া যায়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর ঢাকার জনৈক এডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের পুত্র গিরীন্দ্রমোহন দাস নামক অনুশীলন সমিতির এক সভ্যের নিকট হইতে পুলিস অনুশীলন সমিতির বহু গোপন কাগজ-পত্র এবং বন্দুক-রিভলভারের বহু কার্তুজ, গান-পাউডার প্রভৃতি উদ্ধার করে। ইহার মধ্যে বাখরগঞ্জে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ডাকাতিতে লুণ্ঠিত অলংকারও তাহাদের হস্তগত হয়। কাগজ-পত্রের মধ্যে সমিতির সভ্যদের নাম-ধামও ছিল। এবার এই সকল প্রমাণ লইয়া পুলিস ষড়যন্ত্র-মামলার আয়োজন করে। এই সম্পর্কে মোট ৪৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে ''সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম"-এর অভিযোগে ৪৪ জন বিপ্লবীকে লইয়া 'প্রথম বরিশাল ষড়যন্ত্র-মামলা' আরম্ভ হয়। ইঁহাদের মধ্যে ৩৭ জনকে কিছুকাল পূর্বে বিভিন্ন বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। পরে বাকি সকলকে গ্রেপ্তার করিয়া বঙ্গীয় সরকারের নির্দেশে 'বরিশাল ষড়যন্ত্র-মামলা' আরম্ভ করা হয়। অভিযুক্তদের মধ্যে রজনীকান্ত দাস ও গিরীন্দ্রমোহন দাস স্বীকারোক্তি করিয়া রাজসাক্ষী হয়। এই দুইজন ব্যতীত শৈলেশ মুখার্জি এবং আরও ১১ জন অপরাধ স্বীকার করিয়া বিবৃতি দেন। মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে সকলেই ছিলেন বয়সে তরুণ। পরবর্তীকালের বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নায়ক রমেশ আচার্য মহাশয়ও এই মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকেই এই মামলায়

প্রধান আসামী বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল। কিন্তু গ্রেপ্তারের সময় তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ১২ বৎসর।

'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'র বরিশাল শাখার প্রথম জেলা সংগঠক ছিলেন যতীন্দ্রনাথ ঘোষ। তাঁহার পর রমেশ আচার্য মাত্র ২১ বৎসর বয়সে জেলা সংগঠকের পদে নিযুক্ত হন। রমেশ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করিবার পরেই 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'র সভ্য হইয়াছিলেন। আই. এ. পরীক্ষায় পাশ করিবার পর অবিলম্বে তাঁহাকে ঢাকার সোনারং-এর ন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। সুকাইর ডাকাতির পর সোনারং ন্যাশনাল স্কুলটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে তাঁহাকে 'বরিশাল সমিতি'র পরিচালক-পদে নিযুক্ত করা হয়। 'প্রথম বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায়' তিনি ১২ বৎসরের কারাদণ্ড লাভ করিয়াছিলেন।

অভিযুক্ত বিপ্লবীদের জেলা-সংগঠন পরিকল্পনায় দেখা যায়, পূর্ববঙ্গের সকল জেলায় ইহাদের সুদৃঢ় সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এবং "প্রায় সকল জেলা লইয়াই বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তৃত হইয়াছিল।"[১] যাঁহারা অপরাধ স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বাখরগঞ্জ জেলার, কয়েকজন ত্রিপুরার এবং কয়েকজন ঢাকার অধিবাসী। মামলার রায়ে বলা হয়:

"বিচারের সওয়াল, স্বীকারোক্তি ও দলিল-পত্রাদি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই ভদ্রশ্রেণীর তরুণগণ সমগ্র দেশময় এক বিপজ্জনক সংগঠন বিস্তারের উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ভারতের বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধনই ছিল এই সংগঠনের একমাত্র লক্ষ্য। সংগঠন বিস্তারের উদ্দেশ্যেই তাঁহারা কয়েকটি ডাকাতি করিয়াছিলেন। ...প্রকৃতপক্ষে এই ষড়যন্ত্র ঢাকার ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ বিশেষ। ঢাকার সংগঠনের আরও বহু শাখা ছিল।"[২]

মামলার বিচারে প্রথম দফায় ৭ জন, দ্বিতীয় দফায় ২ জন এবং শেষ পর্যন্ত ১২ জন বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইঁহারা ব্যতীত অপর সকলে মুক্তিলাভ করেন। এই ১২ জনের ১২ বৎসর হইতে ২ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড হয়।

যে সকল বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের ফলে 'প্রথম বরিশাল ষড়যন্ত্র-মামলা'র ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার বিবরণ নিম্নরূপ:

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'র বরিশাল শাখা বাখরগঞ্জ জেলার কুশঙ্গল নামক স্থানে একটি ডাকাতি করিয়া বহু অর্থ লাভ করে। ইহার দুই-দিন পর, ১৯শে এপ্রিল, কাকুড়িয়ায় এবং একমাস পর বিরঙ্গলে ইহাদের দ্বারা দুইটি ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয় (রাজসাক্ষীদের স্বীকারোক্তি হইতে প্রমাণিত)। এই সকল ডাকাতিতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। কুশঙ্গলের ডাকাতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একটি সরকারী বন্দুক হস্তগত করা। বিপ্লবীরা সরকারী বন্দুকটি হস্তগত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে রজনী দাস নামে সমিতির এক তরুণ সভ্য

১। "Sedition Committee Report", p. 91. 2. Ibid, p. 91.

ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়া পুলিসের নিকট স্বীকারোক্তি করে। তাহার স্বীকারোক্তির ফলে সমিতির বহু দলিলপত্র পুলিসের হস্তগত হয়। নভেম্বর মাসে কুমিল্লার এক দারোগার পুত্রের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া পুলিস এক গৃহ হইতে সমিতির ১২ জন সভ্যকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকালে সকলের পোশাক-পরিচ্ছদই জলে ভিজা ছিল। সম্ভবত ইঁহারা সাঁতরাইয়া নদী পার হইয়া কোথাও ডাকাতি করিবার উদ্দেশ্যে এই গৃহে সমবেত হইয়াছিলেন। পুলিস এই বিপ্লবীদের দেহ ও গৃহ তল্লাস করিয়া দুইটি রিভলভার, একটি বন্দুক, অনেকগুলি মুখোস এবং সমিতির সভ্যদের নামের একটি তালিকা হস্তগত করে। এইভাবে ধৃত ১২ জন বিপ্লবীকে ডাকাতির চেষ্টার অভিযোগে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। মামলার বিচারে দশজন বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং বাকি দুইজন মুক্তিলাভ করেন।

নভেম্বর মাসে সমিতির অন্যতম সভ্য গিরীন্দ্রমোহন দাসের গৃহ হইতে পুলিস বহু অস্ত্রশস্ত্র ও দলিলপত্র হস্তগত করে। গিরীন্দ্র তাহার পিতার আদেশেই এই সকল জিনিস পুলিসের হস্তে অর্পণ করিয়াছিল। এই সকল জিনিসের মধ্যে ছিল তিনটি রিভলভার, বহু গুলি, ছোরা, মুখোস প্রভৃতি। ইহা ব্যতীত তাহার নিকট হইতে নাঙ্গলবন্দের ডাকাতিতে লুণ্ঠিত বহু অলংকারও পুলিসের হস্তগত হয়। গিরীন্দ্র এই সকল জিনিস গৃহে রাখিবার অপরাধে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ডাকাতিতে লুণ্ঠিত অলংকারগুলি রাখিবার অপরাধে ৫ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করে। গিরীন্দ্রের নিকট হইতে পুলিস সমিতির টাকার হিসাব ও সভ্যদের নামের একটি তালিকা এবং দলিলপত্র হস্তগত করিয়াছিল। এই হিসাবপত্র ও তালিকাটি পুলিসকে ষড়যন্ত্র-মামলা আরম্ভ করিতে বিশেষ সাহায্য করে। পরে ষড়যন্ত্র-মামলা আরম্ভ হইলে পিতার নির্দেশে গিরীন্দ্র রাজসাক্ষী হয় এবং সমিতির ক্রিয়াকলাপ ও গোপন সংবাদাদি পুলিসের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়। সরকারী মতে, বরিশালের অনুশীলন সমিতি এই বৎসরের মধ্যে দুইটি হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে। প্রথমত, সমিতির সভ্য সারদা চক্রবর্তীকে শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে হত্যা করা হয়। দ্বিতীয়ত, ২৪শে সেপ্টেম্বর রতিলাল রায় নামক একজন হেড-কনেস্টবলকে বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টার অপরাধে হত্যা করা হয়। পুলিস হত্যাকারীকে গ্রেপ্তারের জন্য ৫ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করিয়াও হত্যাকারীর সন্ধান পায় নাই। ইহা ব্যতীত, সরকারী মতে, ঢাকার পানাম ডাকাতিও 'অনুশীলন সমিতি' দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ডাকাতিতে বিপ্লবীরা নগদ ও অলংকারে ২০ হাজার টাকা লাভ করিয়াছিলেন। বিপ্লবীরা সামরিক পোশাকে সজ্জিত হইয়া সামরিক কায়দায় এই ডাকাতি করিয়াছিলেন এবং কোন লোককে তাঁহাদের নিকটবর্তী হইতে দেখিবামাত্র তাহার দিকে গুলি ছুঁড়িয়াছিলেন। বিপ্লবীরা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে টেলিগ্রাফের তারও কাটিয়া দিয়াছিলেন।[১]

১। Sedition Committee Report, p. 90-91.

৪. দ্বিতীয় বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা

'প্রথম বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা' শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 'দ্বিতীয় বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা' আরম্ভ হয়। "ভারতের বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ" এবং "ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের উদ্দেশ্যে দলগঠন ও ষড়যন্ত্র" করিবার অভিযোগে ৪৪ জন বিপ্লবী এই মামলায় অভিযুক্ত হন। শেষ পর্যন্ত ২৮ জনকে দায়রায় সোপর্দ করিয়া বাকি সকলকে মুক্তি দান করা হয়। পরে আরও দুইজনকে ছাড়িয়া দিয়া ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ২৬ জনের বিচার আরম্ভ হয়। মামলা চলিবার সময় অভিযুক্তদের মধ্যে ১২ জন অপরাধ স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়।

এই মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন বাঙলাদেশের পরবর্তীকালের বিখ্যাত বিপ্লবী ; যেমন—(১) মদনমোহন ভৌমিক, (২) শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, (৩) খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, (৪) প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, (৫) রমেশচন্দ্র দত্তচৌধুরী। ইঁহারা সকলেই মামলার আরম্ভকালে পলাতক ছিলেন। পরে তাঁহারা সকলেই একে একে গ্রেপ্তার হন।

এই বিখ্যাত বিপ্লবীদের বিরুদ্ধেই শেষ পর্যন্ত এই ষড়যন্ত্র-মামলার বিচার চলে। বিচার শেষে দায়রা জজ এক দীর্ঘ রায় দান করেন। বিচারক তাঁহার রায়ে অনুশীলন সমিতির বরিশাল শাখার সাংগঠনিক কাঠামোর বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করেন :

১. বরিশাল শাখার ৫টি বিভাগ ছিল ; যথা—(১) অস্ত্র-বিভাগ, (২) কর্ম-সম্পাদন (ডাকাতি প্রভৃতি) বিভাগ, (৩) হিংসাত্মক কার্যের বিভাগ, (৪) সাংগঠনিক বিভাগ, (৫) সাধারণ বিভাগ।

২. বিপ্লবীরা স্কুলের বালকদিগকে দলে টানিতেন, ডাকাতি প্রভৃতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতেন এবং গোয়েন্দা-অনুচরদের আর দলের বিশ্বাসঘাতক সভ্যদের হত্যা করিতেন।

৩. "ইঁহাদের (বিপ্লবীদের) সংগঠন ছিল নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ। ছাত্রদের, বিশেষত স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রচারকার্য চালানো হইত। বাছাই করা ছাত্রদের দলভুক্ত করিয়া দীক্ষা প্রভৃতির মারফত তাহাদিগকে সংগঠনের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইত। স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে প্রচারকার্য চালনা ও তাহাদের দলে টানিবার সুবিধার জন্য স্কুল-শিক্ষকদের সমিতির সভ্য করা সম্পর্কে তাঁহাদের বিশেষ পরিকল্পনা ছিল।"[১]

এই মামলার বিচারকালে প্রকাশ পায় যে, পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলে 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'র সভ্যদের দুইটি কৃষিজোত (farm) ছিল। একটি জোত ছিল বিলোনিয়া অঞ্চলে, আর একটি ছিল আদিয়াপুর অঞ্চলে। বাহির হইতে সকলে এই জোত দুইটিকে কৃষিজোত বলিয়াই জানিত। কিন্তু এখানে বিপ্লবীরা রিভলভার

Sedition Committee Report, p. 91.

ও বন্দুক চালনা শিক্ষা করিতেন। বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনাও এখানেই রচিত হইত।

৫. রাজাবাজার বোমার মামলা

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শ্রীহট্টের মৌলভীবাজারে ম্যাজিস্ট্রেট গর্ডন সাহেবকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে একটি বোমা নিক্ষেপ করিবার জন্য এক যুবক তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন। কিন্তু বোমাটি নিক্ষেপ করিবার পূর্বেই উহা যুবকটির হাতেই ফাটিয়া যায় এবং তাহার ফলে যুবকটির মৃত্যু ঘটে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাস হয়। এই ঘটনার সূত্র ধরিয়া কলিকাতার রাজাবাজার অঞ্চলের একটি গৃহে খানাতল্লাস হয়। পুলিস এই গৃহে প্রবেশ করিয়া অমৃতলাল হাজরা এই ছদ্মনামধারী শশাঙ্কশেখর হাজরা, দীনেশ সেনগুপ্ত, চন্দ্রশেখর দে এবং সারদা গুহ নামক চারিজন বিপ্লবীকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। পুলিস এই গৃহে বহু সিগারেটের টিনবাক্স আর সেই সঙ্গে বোমা তৈরির পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য এবং বহু বৈপ্লবিক সাহিত্য হস্তগত করে। পরে এই সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে কালীপদ ঘোষ ওরফে উপেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী এবং খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ওরফে সুরেশচন্দ্র চৌধুরী নামক অপর দুইজন যুবককেও গ্রেপ্তার করে। অবশেষে ধৃত বিপ্লবীদের লইয়া আলিপুর আদালতে এক ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়। এই মামলাই 'রাজাবাজার বোমার মামলা' নামে খ্যাত। মামলার বিচারে খগেন্দ্রনাথ ব্যতীত অপর সকলে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড লাভ করেন। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে বিপ্লবীরা হাইকোর্টে আপীল করিলে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই দণ্ড বৃদ্ধি পায়, এমন কি খগেন্দ্রনাথও শাস্তি লাভ করেন। শশাঙ্কের কারাদণ্ড ৭ বৎসর হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫ বৎসরের দ্বীপান্তর-দণ্ডে পরিণত হয়।

মামলার বিচারে প্রকাশ পায় যে, স্বল্প মূল্যে বোমা তৈরি করিয়া তাহা ভারতবর্ষের সর্বত্র সরবরাহ করাই ছিল এই বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ডালহৌসি স্কোয়ারে, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর মেদিনীপুরে, ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীতে বড়লাটের উপর, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ শ্রীহট্টের মৌলভীবাজারে ম্যাজিস্ট্রেটের গৃহ-প্রাঙ্গণে, ঐ বৎসর মে মাসে লাহোরে, সেপ্টেম্বর মাসে ময়মনসিংহে এবং ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার নিকটবর্তী ভদ্রেশ্বরে যে সকল বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা এবং এই বিপ্লবীদের দ্বারা নির্মিত বোমা একই প্রকারের বলিয়া স্থির হয়। এই বোমা এক বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত হইত। সিগারেট বা জমানো দুধের কৌটা এই বোমার খোল রূপে ব্যবহৃত হইত। এই বোমার মধ্যে যে বারুদ ব্যবহৃত হইত তাহাও বিশেষ শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা তৈরী হইত এবং বারুদের মধ্যে লোহার টুকরা দেওয়া হইত। 'সিডিসন কমিটি'র রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে :

"বোমা-বিশেষজ্ঞগণ বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ঐ সকল স্থানে নিক্ষিপ্ত বোমা একই জাতির এবং একই মস্তিষ্কপ্রসূত। খ্যাতনামা বোমা-বিশেষজ্ঞ

মেজর টার্নার বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার জীবনে এই প্রকারের বোমা পূর্বে কোনদিন দেখেন নাই।"[১]

মামলার বিচারের রায়ে শশাঙ্কশেখর হাজরাকে এক বিশাল বিপ্লবী দলের অন্যতম নায়ক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, এই বিপ্লবীদলের সহিত সমগ্র ভারতবর্ষের যোগাযোগ ছিল। এই দলটিই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এই প্রকারের ভয়ঙ্কর বোমা সরবরাহ করিত। এই বোমাই কলিকাতায়, লাহোরে, দিল্লীতে, শ্রীহট্টে, ময়মনসিংহে, মেদিনীপুরে এবং ভদ্রেশ্বরে ব্যবহৃত হইয়াছিল। শশাঙ্কের গৃহে যে কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছিল তাহার একটিতে স্পষ্ট ভাষায় লিখিত ছিল :

"দেশভক্ত বীরদের দ্বারা রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ডের মারফত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যেই এই আয়োজন।"[২]

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ

১. গুপ্তহত্যা

কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিসের কুখ্যাত ইন্‌স্পেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতার বিপ্লবীদের সম্পর্কে তথ্যাদি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার জন্য তৎপর হইয়া উঠেন। ইহার জন্য বিপ্লবীরা তাঁহাকে হত্যা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একদিন সন্ধ্যাকালে নৃপেন ঘোষ চিৎপুর-শোভাবাজার মোড়ে ট্রাম হইতে নামিবামাত্র কয়েকজন যুবক একত্রে তাঁহাকে গুলি করেন। নৃপেন্দ্রের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। তাঁহার দেহরক্ষী পুলিসটিও বিপ্লবীদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বিপ্লবীদের গুলির আঘাতে নিহত হয়, বিপ্লবীরা অসংখ্য মানুষের ভিড়ের মধ্য দিয়া পলায়ন করেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন পুলিস গোলমাল শুনিয়া দৌড়াইয়া আসে এবং পাড়ার কয়েক জন গুণ্ডার সাহায্যে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। এই যুবকটি নির্মলকান্ত রায় নামে কলেজের একটি ছাত্র। এবার নির্মলকে লইয়া হাইকোর্টে জুরির বিচার আরম্ভ হয়। নির্মলের পক্ষ সমর্থন করেন সেই সময়ের বিখ্যাত ব্যারিস্টার নর্টন সাহেব। জুরিরা নির্মলকে নির্দোষ বলিয়া রায় দেন, কিন্তু জজসাহেব পুনর্বিচারের আদেশ দেন। এবারের বিচারেও জুরিরা নির্দোষ বলিয়া রায় দিলে নির্মল মুক্তিলাভ করেন।

চট্টগ্রামের সত্যেন সেন নামক এক ব্যক্তি পুলিসের বেতনভোগী গুপ্তচর হিসাবে বিপ্লবীদের পিছনে ছায়ার মত ঘুরিত। তাহার জ্বালায় বিপ্লবীদের কাজে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ১৯শে জুন চট্টগ্রাম শহরের রাজপথে বিপ্লবীরা তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করেন। রামদাস নামক এক ব্যক্তি প্রথমে ছিল গুপ্তসমিতির সভ্য, পরে সে পুলিসের সহিত যোগ দিয়া বিপ্লবীদের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। এই ব্যক্তি কুখ্যাত ডেপুটি পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বসন্ত চাটার্জির সহিত ঘুরাফিরা করিত। ১৯শে জুলাই তারিখে রামদাস ও বসন্ত চাটার্জি একত্রে ঢাকার বাক্‌ল্যাণ্ড ব্রিজের উপর দিয়া

১। Ibid, p. 92. ২। Ibid, p. 92.

যাইবার সময় লুক্কায়িত বিপ্লবীদের রিভলভার গর্জিয়া উঠে। রামদাস ধারাশায়ী হয়, কিন্তু বসন্ত চাটার্জি জলে ঝাঁপাইয়া কোন রকমে সে যাত্রায় বাঁচিয়া গেলেও রামদাসের হত্যাই এই কুখ্যাত ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর মৃত্যুর নোটিশ হইয়া থাকে। এই নোটিশ পুনরায় জারি করাও হইয়া যায়। ২৫শে নভেম্বর সন্ধ্যাকালে বসন্ত চাটার্জি কলিকাতার এক বাড়িতে বসিয়া যখন বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের পরামর্শ করিতেছিলেন, তখনই সেই ঘরে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি বাহিরে গিয়াছিলেন বলিয়া সেবারেও তিনি প্রাণে বাঁচিয়া যান।

২. 'রডা' কোম্পানির মশার-পিস্তল চুরি

'রডা-কোম্পানি' বিদেশ হইতে আগ্নেয়াস্ত্র আমদানি করিয়া এদেশে ব্যবসা করিত। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের শেষ দিকে এই কোম্পানি বিদেশ হইতে 'মশার' নামক পিস্তলের বড় একটি চালান লইয়া আসে। মশার-পিস্তল একটি ভয়ংকর আগ্নেয়াস্ত্র, ইহার অংশ বিশেষ খুলিয়া ইহাকে পিস্তল হিসাবেও ব্যবহার করা যায়, আবার ঐ অংশটি জুড়িয়া ইহাকে রাইফেলের মতও ব্যবহার করা চলে। এই জন্যই বরাবর এই পিস্তলের উপর বিপ্লবীদের লোভ ছিল। কোম্পানির মালপত্র কাস্টম্‌স্-অফিস হইতে খালাস করিয়া অফিসের গুদামে লইয়া আসিবার ভার ছিল একজন বাঙালী কর্মচারীর উপর। ২৬শে আগস্ট ঐ কর্মচারীটি কাস্টমস্-অফিস হইতে মশার-পিস্তল ও উহার গুলিপূর্ণ ২০২টি বাক্স বুঝিয়া লয় এবং উহা হইতে ১৫২টি বাক্স অফিসের গুদামে লইয়া আসে। তাহার পর বাকী বাক্সগুলি লইয়া অসিবার অজুহাত দিয়া কর্মচারীটি পুনরায় রাস্তায় বাহির হন। বলা বাহুল্য, কর্মচারীটি আর অফিসে ফিরিয়া যান নাই এবং মশার-পিস্তলের পঞ্চাশটি বাক্স বিপ্লবীদের হস্তগত হয়। সিডিসন-কমিটির ধারণা যে, যুগান্তর সমিতির অন্তর্ভুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর দলের দ্বারাই এই কার্যটি সম্পন্ন হইয়াছিল। পরে এই অপহৃত মশার-পিস্তলগুলি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সমিতির নিকট বিলি করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালিত যুগান্তর সমিতি, সতীশ চক্রবর্তীর পরিচালিত চন্দননগরের যুগান্তর-শাখা, বিপিন গাঙ্গুলীর পরিচালিত যুগান্তর-শাখা, মাদারীপুর সমিতি, ঢাকা ও বরিশালের অনুশীলন সমিতি প্রভৃতি নয়টি বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান এই অস্ত্রগুলি লাভ করিয়াছিল এবং তখন হইতে প্রায় প্রত্যেকটি বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে এইগুলি ব্যবহৃত হইয়াছিল। 'সিডিসন কমিটি'র মতে :

"পুলিস যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, অপহৃত পিস্তলগুলির মধ্যে চুয়াল্লিশটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলাদেশের নয়টি বৈপ্লবিক সমিতির মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল এবং ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এইভাবে বিলি-করা পিস্তলগুলি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের পর অনুষ্ঠিত চুয়ান্নটি ডাকাতি ওনরহত্যায়, অথবা ডাকাতি ও নরহত্যার চেষ্টায় ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহা অনায়াসে বলা চলে যে, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের পর এমন বৈপ্লবিক ঘটনা খুব কমই অনুষ্ঠিত হইয়াছে, যাহাতে 'রডা-কোম্পানি' হইতে অপহৃত মশার-পিস্তলগুলি ব্যবহৃত হয় নাই।

পরে পুলিসের বহু চেষ্টার ফলে অপহৃত পিস্তলগুলির একত্রিশটি বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছিল।"[১]

পরবর্তীকালে 'মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার' সম্পর্কিত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, পঞ্চাশটি মশার-পিস্তল বাঙলাদেশের শাসন প্রায় অচল করিয়া ফেলিয়াছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে য়ুরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়। এই বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশশক্তি জড়িত হইবার ফলে বিপ্লবীদের সম্মুখে এক অভাবনীয় সুযোগ উপস্থিত হয়। সমগ্র ভারতের বিপ্লবীরা এই সুযোগে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য দেশব্যাপী এক সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বিভিন্ন উপায়ে বৈদেশিক সাহায্য লাভের জন্যও চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দেন। তাঁহাদের এই নূতন উদ্যম ও কর্ম-প্রচেষ্টা মধ্যশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

পাঞ্জাবে বিপ্লব-প্রচেষ্টা (১৯০৭-১৯১৪)

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ

বিপ্লবের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাষ্ট্র হইতে যে বিপ্লবের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উঠিয়াছিল তাহা প্রথমে বাঙলায় ও পরে পাঞ্জাবে বিরাট অগ্নি-প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছিল। বাঙলার পরেই পাঞ্জাব ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করিয়াছে। কংগ্রেসের জন্মের পর নরমপন্থা ও চরমপন্থা নামে জাতীয় সংগ্রামের যে দুইটি স্পষ্ট ধারা জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বিরাট সংঘাতের সৃষ্টি করে, সমগ্রভাবে পাঞ্জাব উহার দ্বিতীয় ধারাটিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে। সংগ্রামী পাঞ্জাব চরমপন্থার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উঠে। পাঞ্জাব-কেশরী লাল লাজপৎ রায় ছিলেন সেই অগ্নিমন্ত্রের পুরোহিত। মহারাষ্ট্র-কেশরী বাল গঙ্গাধর তিলক, বাঙলার অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পালের মতই লাল লাজপৎ রায় বৈপ্লবিক ভাবধারায় পাঞ্জাব ও পশ্চিম-ভারতকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তৎকালীন জাতীয় জাগরণের মুখে কংগ্রেস-নেতৃত্বের নরম পন্থা বা আপসপন্থার বিরুদ্ধে ইঁহারা সমবেত চেষ্টায় ভারতের সংগ্রামী যুব-সম্প্রদায়কে যে সংগ্রামের পথ দেখাইয়াছিলেন, সেই সংগ্রামই অবশেষে দেশব্যাপী বৈপ্লবিক সংগ্রামে

১ Sedition Committee Report, p. 65.

পরিণত হয়। লাজপৎ রায়ের পাঞ্জাব সেই বৈপ্লবিক সংগ্রামকেই একমাত্র জাতীয় সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করে।

লাজপৎ রায় জাতীয় কংগ্রেসের উচ্চ আসন হইতে পাঞ্জাবী জনগণের নিকট কেবল বৈপ্লবিক সংগ্রামের আহ্বান জানাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ভারতের অন্যান্য চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের মত তিনিও এই আহ্বানকে সাংগঠনিক রূপে রূপায়িত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার সেই প্রয়াসের ফলেই মহারাষ্ট্র ও বাঙলার মত পাঞ্জাবেও একদল একনিষ্ঠ বৈপ্লবিক কর্মী গড়িয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব দ্বারা সেই কর্মিদলের কর্ম-প্রচেষ্টাকে শাসকগণের শ্যেনদৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তিলকের মতই শাসকগোষ্ঠীর প্রথম আঘাত নিজে বুক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্র ভারতের এই যুগের সন্ত্রাসমূলক বিপ্লববাদের গুরু হইলেও বাঙলার বিপ্লবী সংগ্রামের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গই সাক্ষাৎভাবে পাঞ্জাবে বিপ্লবের আগুন জ্বালাইতে সাহায্য করিয়াছিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী-উৎসব উপলক্ষে তিলকের সহিত লাজপৎ রায়ের বাঙলা-ভ্রমণ ও বাঙলার বিপ্লবী নায়কদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন অর্থহীন ছিল না। বাঙলাদেশ হইতে ফিরিয়া গিয়া তিনি পাঞ্জাবের জনগণের মধ্যে বিপ্লবের বীজ ছড়াইতে আরম্ভ করেন, আর সেই বীজ হইতেই কালক্রমে বিপ্লবের মহীরুহ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। পাঞ্জাবের প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টা বঙ্গভঙ্গের প্রবল আন্দোলন ও বাঙলার বৈপ্লবিক প্রভাবেরই সাক্ষাৎ পরিণতি। লাজপৎ রায়ের বঙ্গ-ভ্রমণের অল্প কিছু দিন পরেই পাঞ্জাবের আকাশে নূতন সংগ্রামের যে রক্ত-মেঘ দেখা দেয়, তাহা লক্ষ্য করিয়া পাঞ্জাবের তৎকালীন ছোটলাট সাহেব আতঙ্কে অস্থির হইয়া বড়লাটকে লিখিয়া পাঠান যে, সর্বত্রই জনসাধারণের মধ্যে একটা নূতন পরিবর্তন দেখা যাইতেছে, তাহাদের মনে একটা "নূতন হাওয়া" লাগিয়াছে, তাহারা যেন কিছু-একটার অপেক্ষা করিতেছে।[১] শাসকগোষ্ঠীর এই আতঙ্ক অহেতুক নয়, পাঞ্জাবীদের বৈপ্লবিক ভাবধারা গ্রহণ ভারতের ইংরেজ-শাসনের পক্ষে এক ভয়ংকর বিপদের ইঙ্গিত ভিন্ন অন্য কিছু নয়। কারণ "বহু বৎসর হইতেই পাঞ্জাব ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সৈন্য সংগ্রহের সর্বাপেক্ষা উর্বর-ভূমি, আর আজিও পাঞ্জাবের সেই সুনাম অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।"[২] পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক চাঞ্চল্যের উপর বাঙলাদেশের সমসাময়িক বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করিয়া 'সিডিসন কমিটি' মন্তব্য করে :

"এই 'নূতন হাওয়া' সম্পর্কে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই সময় (বাঙলাদেশের) 'যুগান্তর' পত্রিকা ও এই প্রকারের অন্যান্য প্রচার-সাহিত্য প্রতিদিনই বাঙলাদেশের হাজার হাজার লোকের মনে বিষ ঢালিয়া দিতেছিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আলিপুর ও ঢাকার ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁহাদের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিতেছিলেন, সভ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দল ভারী করিতেছিলেন এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত

১। Punjab Provincial Record, 1907.

২। 'Sedition Committee Report', p. 141.

হইতেছিলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই নূতন ভাবধারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও যে ঝড় তুলিবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।"[১]

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই পাঞ্জাবের আকাশে সংগ্রামের ঝড় উঠিতে আরম্ভ করে। পাঞ্জাবের তৎকালীন ছোটলাট স্যার ডেনজিল ইবেট্‌সন সেই ঝড় লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে বড়লাটকে লিখিয়া পাঠান :

"প্রদেশের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে এই নূতন ভাবধারা (বৈপ্লবিক ভাবধারা) কেবলমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, আর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা হইল উকিল, কেরানী ও ছাত্র। প্রদেশের কেন্দ্রস্থলের দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে, শহরের লোকের মনোভাব ক্রমশ উত্তেজনাপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহাদের মধ্যে বিক্ষোভ ও কর্মচাঞ্চল্যের লক্ষণও দেখা যাইতেছে। লাহোরের উত্তেজনা সৃষ্টিকারীরা অমৃতসর ও ফিরোজপুর শহরে আসিয়া রাজদ্রোহের মনোভাব জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ফিরোজপুরে তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ করা সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু অমৃতসরে তাহা সম্ভব নয় নাই। রাওয়ালপিণ্ডি, শিয়ালকোট ও লায়ালপুর শহরে ইংরেজ-বিরোধী প্রচার প্রকাশ্যভাবেই বিশেষ জোরের সহিত চালান হইতেছে। প্রদেশের রাজধানী লাহোরের প্রচার-পদ্ধতি ভীষণ উগ্র এবং তাহার ফলে ঐ শহরে একটা বিক্ষোভের অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে।"

ছোটলাটের রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, লাহোরে কয়েকজন ইংরেজ লাঞ্ছিত হইয়াছে ; রাজদ্রোহ প্রচারের জন্য একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক ও প্রেসের মালিকের শাস্তি হইতে সরকার-বিরোধী দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছিল ; শিক্ষিত চরমপন্থী প্রচারকগণ প্রকাশ্য জনসভায় রাজদ্রোহ প্রচার করিতেছে, ইত্যাদি।[২]

কিন্তু ছোটলাট সাহেবের আতঙ্কের ইহাই একমাত্র কারণ নহে, তাঁহার আতঙ্কের সর্বাপেক্ষা "বিপজ্জনক" কারণটি ছিল অন্যত্র—গ্রামাঞ্চলে ও শিল্প-কলকারখানায়। সেই সময় চন্দ্রভাগা নদীর খালের জল-কর আদায়ের বিরুদ্ধে সমগ্র পাঞ্জাবের কৃষকদের মধ্যে এক বিরাট বিক্ষোভের ঝড় উঠিতেছিল। এই আন্দোলনে কৃষকদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল পাঞ্জাবের কল-কারখানা ও উত্তর-পশ্চিম রেলপথের শ্রমিকগণ। প্রদেশব্যাপী এই কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের সহিত শিক্ষিত সম্প্রদায় উহার বৈপ্লবিক কর্মপন্থা লইয়া যোগদান করে। 'সিডিসন কমিটি'র মতে :

"চন্দ্রভাগা নদীর খাল-উপনিবেশের চাষীদের রাজস্ব সম্পর্কে প্রস্তাবিত আইন গ্রামবাসীদের মধ্যে তুমুল বিক্ষোভ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তাহার সহিত 'বড় দোয়াব' অঞ্চলের জল-কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধেও বিরাট বিক্ষোভ যুক্ত হয়। ছোটলাট সাহেব বলেন যে, এই বিক্ষোভ দমন করা খুবই কঠিন হইয়াছিল এবং শিখদের রাজদ্রোহমূলক মনোভাবও তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা দেশীয় পুলিসকে দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাকারী বলিয়া গালি দিতেছিল, দেশীয় পুলিসকে অবিলম্বে সরকারী

১। 'Sedition Committee Report', p. 141.

২। Punjab Provincial Records, 1907.

চাকরি ত্যাগ করিবার জন্য উসকানি দেওয়া হইতেছিল এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রতিও সেই আবেদন করা হইতেছিল। এই সময় আর একটি ঘটনার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। যখন উত্তর-পশ্চিম রেলপথের এক অংশের শ্রমিকগণ ধর্মঘট ঘোষণা করে তখন তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য বহু প্রকাশ্য জনসভা হয় এবং তাহাদের সাহায্যের জন্য বহু টাকা চাঁদা উঠে। ছোটলাট সাহেব লক্ষ্য করেন যে, নেতৃবৃন্দের অনেকে হয় বল প্রয়োগের দ্বারা, না হয় সমগ্র জনসাধারণের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা বৃটিশকে এদেশ হইতে, অন্তত শাসন-ক্ষমতা হইতে বিতাড়িত করিবার প্রচেষ্টা আরম্ভ করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা সরকারের শাসন-যন্ত্র অচল করিয়া দিবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে ভয়ংকর বৃটিশ-বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ছোটলাট সাহেব প্রদেশের সমগ্র অবস্থাকে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলিয়া মনে করেন এবং ইহার আশু প্রতিকার দাবি করেন।"[১]

এই "বিপজ্জনক" আন্দোলনের প্রধান নায়ক লালা লাজপৎ রায় বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে প্রদেশব্যাপী কৃষক ও শ্রমিক-সংগ্রামের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ ও সদ্ব্যবহার করিবার জন্য কিরূপ ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এই সময়ে লিখিত একখানি পত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়। পরবর্তীকালের বিখ্যাত বিপ্লবী ভাই পরমানন্দ সেই সময় ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। ভাই পরমানন্দের নিকট এই কৃষক-আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া লাজপৎ রায় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল লিখিয়া পাঠান:

"জনসাধারণ ক্রোধে ফাটিয়া পড়িতেছে। এমনকি কৃষিজীবী শ্রেণীর বিক্ষোভও চরমে উঠিয়াছে। আমার একমাত্র ভয় এই যে, হয়ত উপযুক্ত সুযোগ আসিবার পূর্বেই বিস্ফোরণ ঘটিবে।"[২]

মহারাষ্ট্রের প্লেগ ও বাঙলাদেশের বঙ্গভঙ্গ প্রভৃতি কার্জনী নীতির মতই পাঞ্জাবে খাল-উপনিবেশের করবৃদ্ধি ও চন্দ্রভাগা খালের জল-কর-আইনকে উপলক্ষ করিয়া পাঞ্জাবের প্রথম বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়।

প্রথম সাংগঠনিক প্রচেষ্টা

সারা প্রদেশের উপর দিয়া যখন গণ-আন্দোলনের প্রবল বন্যা বহিয়া যাইতেছিল, তখন সেই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টাও আরম্ভ হয়। যুবক-সহকর্মীদের সহিত লালাজী নিজেও এই প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। বৈপ্লবিক প্রচার ও সংগঠনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বৈপ্লবিক সাহিত্য। কিন্তু বাঙলাদেশে যেমন অরবিন্দ, বারীন্দ্র, ভূপেন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব, গণেশ দেউস্কর প্রভৃতি একদল খ্যাতনামা বিপ্লবী লেখক দেখা দিয়াছিলেন, পাঞ্জাবে তাহা ছিল না। পাঞ্জাবে এই অভাব পূরণের জন্য লালাজী ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাই পরমানন্দের নিকট ইংলণ্ডে লিখিয়া

১। Sedition Committee Report, p. 142.

২। Sedition Committee Report, p. 143.

পাঠান যে, দেশে "বৈপ্লবিক, রাজনীতিক, অথবা ঐতিহাসিক উপন্যাস" প্রয়োজন। পরমানন্দ যেন ইংলণ্ডে কৃষ্ণ বর্মার নিকট ঐ সকল সাহিত্য ক্রয়ের জন্য অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করেন। বৈপ্লবিক সংগঠন ও প্রচেষ্টার জন্য অর্থের প্রয়োজন। লণ্ডনে কৃষ্ণ বর্মা বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে যে দশ হাজার টাকা দান করিবার কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার একটা অংশ পাঞ্জাবের জন্য পাওয়ার চেষ্টাকরিতে তিনিউক্ত পত্রে পরমানন্দকে অনুরোধ করেন। পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক-সংগঠন তৈরি করিবার কার্যে তাঁহার সহায় ছিলেন পাঞ্জাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক অজিত সিং, আর পাঞ্জাবের "প্রথম বিপ্লবী" বলিয়া খ্যাত সুফি অম্বাপ্রসাদ।

কিন্তু লালা লাজপৎ রায় ও অজিত সিং গণ-আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া সেই আন্দোলন পরিচালিত করিতেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে এই সকল বৈপ্লবিক কার্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হইত না। তাই পাঞ্জাবে বৈপ্লবিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রধান দায়িত্ব পড়ে সুফি অম্বাপ্রসাদের উপর। সুফি অম্বাপ্রসাদের সহকর্মীদের মধ্যে একজন ছিলেন ডাঃ হরিচরণ মুখার্জি নামক এক বাঙালী বিপ্লবী। অম্বাপ্রসাদের পরিচালনায় পাঞ্জাবের প্রথম বিপ্লবীরা লালা লাজপৎ রায় ও অজিত সিংয়ের পরিচালিত ব্যাপক গণ-আন্দোলনের আড়ালে থাকিয়া বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া তুলিতে থাকেন। অম্বাপ্রসাদের অন্যতম সহকর্মী ডাঃ হরিচরণ মুখোপাধ্যায় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে একবার কলিকাতার যুগান্তর সমিতির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে আসিয়া পাঞ্জাবের সাংগঠনিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলেন ঃ

"পাঞ্জাবে তাঁহারা জনকতক বড় নেতারপশ্চাতে থাকিয়া কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। পাঞ্জাবের সেই সময়ের রাজনীতিক গোলমালের নায়কেরা এই দলের লোক।···তিনি (অম্বাপ্রসাদ) পাঞ্জাবের সর্বপ্রথম বিপ্লবী।"[১]

দমননীতির প্রয়োগ

পাঞ্জাবের আন্দোলনের ব্যাপকতা ও বৈপ্লবিক লক্ষণসমূহ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে আতঙ্কিত করিয়া তোলে। এই আন্দোলনের আড়ালে বিপ্লববাদীদের নেতৃত্ব ও কর্মতৎপরতা সরকারের দৃষ্টি এড়ায় নাই। ইহাতে শাসকদের আতঙ্ক আরও বৃদ্ধি পায়। কাজেই তাহারা ইহাকে অবিলম্বে চূর্ণ করিবার সিদ্ধান্ত করে। পাঞ্জাবের ছোটলাট প্রথম হইতেই প্রতিকারের দাবি জানাইতেছিলেন। বড়লাটের সম্মতিতে সেই প্রতিকার-ব্যবস্থা, অর্থাৎ সরকারী দমননীতির আক্রমণ আরম্ভ হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে সমগ্র পাঞ্জাবের সর্বজনমান্য নায়ক লালা লাজপৎ রায় ও তাঁহার প্রধান সহকর্মী অজিত সিংকে '১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের তিন আইন' অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। পাঞ্জাবে "রাজদ্রোহ"মূলক জন-সমাবেশ বে-আইনী ঘোষণা করিবার জন্য ঐ বৎসরের ১লা নভেম্বর বড়লাটের শাসন-পরিষদে যে বিল

১। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃ; ৬৫

উপস্থিত করা হয় তাহা সমর্থন করিয়া স্বয়ং বড়লাট দেশের সম্মুখে এই আতঙ্কের ছবি ফুটাইয়া তোলেন :

"এই বৎসরের প্রথম ভাগে যে সকল ভয়ংকর ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না। লাহোরের দাঙ্গা, ইংরেজ-সাহেবদের প্রতি অপমানকর আচরণ, পিণ্ডি নামক স্থানের দাঙ্গা, পাঞ্জাব প্রদেশের অবস্থা সম্পর্কে উহার ছোটলাটের দ্বারা বর্ণিত ভয়ংকর চিত্র, তাহার ফলস্বরূপ লালা লাজপৎ রায় ও অজিত সিংয়ের গ্রেপ্তার এবং অর্ডিনান্স প্রয়োগ; আর এই অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-বঙ্গে প্রতিদিনকার নরহত্যা, আক্রমণ, লুণ্ঠন, বিদেশী দ্রব্য বর্জন ওসব কিছু মিলিয়া একটা ভয়ংকর অরাজক অবস্থার সৃষ্টি, এই সকলের সহিত 'রাজদ্রোহ'মূলক প্রকাশ্য বক্তৃতা, সংবাদপত্রে 'রাজদ্রোহ'মূলক প্রবন্ধ, 'রাজদ্রোহ'মূলক প্রচার-পত্র প্রভৃতি দ্বারা বেপরোয়া বিক্ষোভ-সৃষ্টিকারীদের উৎসাহ দান ও গুপ্ত দলসমূহের ভয়ংকর ইংরেজ-বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিবার অবিরাম চেষ্টা—ইহাই হইল এই বৎসরের (১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের) প্রথম দিকের সমগ্র অবস্থার চিত্র।"[১]

ইহার পর হইতে সমগ্র পাঞ্জাবের উপর দিয়া যে অত্যাচার ও গ্রেপ্তারের বন্যা বহিয়া যাইতে থাকে তাহার কোন তুলনা নাই। কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যশ্রেণীর শত শত লোক গ্রেপ্তার হয়, জেলখানার মধ্যে তাহাদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চলে, গ্রামের কৃষকদের ঘরবাড়ী ভাঙিয়া জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। এই অত্যাচারের ফলে পাঞ্জাবের সংগ্রাম-শক্তি সাময়িকভাবে দুর্বল হইয়া পড়ে এবং বৈপ্লবিক সংগঠন ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যায়। কিন্তু এই বর্বরসুলভ অত্যাচার সমগ্র প্রদেশে এক অতলস্পর্শী বিক্ষোভ জাগাইয়া তোলে এবং শতগুণ শক্তিশালী গণ-আন্দোলন ও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখে।

১৯০৮-০৯ খ্রীষ্টাব্দ

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগের ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের দমননীতির প্রচণ্ড দাপটে পাঞ্জাবে বিপ্লবের প্রথম সাংগঠনিক প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়, এমন কি বহুক্ষেত্রে দুর্বল সংগঠন নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। কয়েকজন মাত্র নেতা বাহিরে থাকিয়া আবার বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। এই সময়, অর্থাৎ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে লালা লাজপৎ রায়ের প্রধান সহকর্মী অজিত সিং জেল হইতে মুক্তি লাভ করেন। অজিত সিং মুক্তি পাইয়া সুফি অম্বাপ্রসাদের সহিত মিলিত হন এবং তাহার ফলে বৈপ্লবিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার কাজ আবার দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলে। তাঁহাদের চেষ্টায় প্রদেশের রাজধানী লাহোরে গুপ্ত সমিতির কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং লাহোরকে কেন্দ্র করিয়া পাঞ্জাবের বিভিন্ন শহরে, এমনকি গ্রামাঞ্চলেও বৈপ্লবিক সংগঠনের শাখা গড়িয়া উঠিতে থাকে। বিপ্লবী নায়কগণ এবার প্রদেশের বিক্ষুব্ধ জনগণের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচার-কার্য চালাইবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। "সমগ্র ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ ব্যাপিয়া লাহোর হইতে 'রাজদ্রোহ'মূলক প্রচার-সাহিত্যের স্রোত

১। Govt. of India Records, 1907.

বহিতে থাকে।"[১] এই প্রচার-সাহিত্য লাহোর হইতে বিভিন্ন শহরে এবং শহর হইতে গ্রামাঞ্চলে গিয়া পৌছে।

সরকার বহু কষ্টে যে বৈপ্লবিক আন্দোলনকে একেবার চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছিল সেই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার লক্ষণ আবার দেখা দিবামাত্র সরকার সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। ইংরেজ সরকারের সৈন্যবাহিনীর "সৈন্য-সংগ্রহের উর্বর ক্ষেত্রটি"কে বিপ্লবের স্পর্শ হইতে মুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা অঙ্কুরে বিনাশ করিবার জন্য ইংরেজ সরকার উন্মত্ত হইয়া উঠে। সমগ্র পাঞ্জাব ব্যাপিয়া গ্রেপ্তারের হিড়িক পড়িয়া যায়, দলে দলে লোক গ্রেপ্তার হইতে থাকে। বিপ্লব-প্রচেষ্টার নায়ক অজিত সিং ও সুফি অম্বাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সমগ্র প্রদেশ জুড়িয়া পুলিস-গোয়েন্দার জাল বিস্তৃত হয়। এই অবস্থায় আর বেশীদিন গ্রেপ্তার এড়ান অসম্ভব বুঝিয়া বৈপ্লবিক কর্মীদের পরামর্শে অজিত সিং ও অম্বাপ্রসাদ বিদেশে পলায়নের সিদ্ধান্ত করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় পাঞ্জাবের প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টার এই দুই বিখ্যাত নায়ক গোপনে জাহাজযোগে ইরানে পলায়ন করেন।[২] প্রথম যুগে পাঞ্জাবের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় যে সকল বাঙালী অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন হৃষীকেশ নামক এক বাঙালী যুবক তাঁহাদের অন্যতম। হৃষীকেশও অজিত সিং এবং অম্বাপ্রসাদের সহিত ইরানে পালাইয়া যান।[৩]

প্রচণ্ড দমননীতির দাপটের মধ্যেও যে সকল বিপ্লবী পাঞ্জাবে বিপ্লব-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিবার জন্য দেশে রহিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অজিত সিংহের ভ্রাতা ও লালচাঁদ ফালাক নামক এক ব্যক্তি পরে বৈপ্লবিক সাহিত্য ও বোমা তৈরির নিয়মাবলীসহ গ্রেপ্তার হইয়া দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টার এই দুঃসময়ে বৈপ্লবিক কর্মে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে ভাই পরমানন্দ পাঞ্জাবে ফিরিয়া আসিবামাত্র পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। তাঁহার গৃহ খানাতল্লাস করিয়া পুলিস কতকগুলি বৈপ্লবিক সাহিত্য ও মাণিকতলার বাগানবাড়ীতে প্রাপ্ত বোমা তৈরির নিয়মাবলীর অনুরূপ একটি নিয়মাবলী হস্তগত: করে। এইজন্য তাঁহাকে অন্তরীণ করিয়া রাখা হয়।

১৯১০-১২ খ্রীষ্টাব্দ
নূতন প্রচেষ্টা

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের দমননীতির দাপটে একদিকে যেমন পাঞ্জাবের নবগঠিত বৈপ্লবিক সংগঠন ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যায়, তেমনি উহারই আড়ালে থাকিয়া নূতন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। এই নূতন প্রচেষ্টাই বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া

১। Sediton Committee Report, p. 142

২। অজিত সিং পরে ইরান হইতে আমেরিকায় গিয়া গদর সমিতিতে যোগদান ও ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুফি অম্বাপ্রসাদ ইরানে থাকিয়াই ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় নানাভাবে সাহায্য করেন। শুনা যায়, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজরা নাকি তাঁহাকে হত্যা করে।

৩। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম', পৃঃ ৬৫।

ও বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করিয়া একদিন প্রবলপ্রতাপ ইংরেজ শাসনকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল।

হরদয়াল নামে দিল্লীর অধিবাসী এক যুবক পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য সরকারী বৃত্তি লইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ডে থাকাকালে তিনি বিখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী কৃষ্ণ বর্মার নিকটে বিপ্লব-বাদে দীক্ষা লাভ করিয়া ভারতের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করেন। ইহার পর ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকারের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিবাদে সরকারী বৃত্তি ত্যাগ করিয়া ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টায় যোগদানের উদ্দেশ্যে তিনি লাহোরে আগমন করেন। লাহোরে আসিয়া তিনি এক রাজনীতি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন দুইজন—জে. এন. চাটার্জি নামে এক বাঙালী ও দীননাথ নামে যুক্তপ্রদেশের এক যুবক। হরদয়াল তাঁহার ছাত্রদের সাধারণ বয়কট ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা ভারতের ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ করিবার উপায় শিক্ষা দিতেন। ইহার পর তিনি ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে আবার ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

হরদয়ালের ভারত ত্যাগের পর দীননাথ ও চাটার্জি দুইজনেই আমীরচাঁদ নামক দিল্লীর এক শিক্ষকের সহিত পরিচিত হন। ইহার কিছু দিন পরেই চাটার্জি ব্যারিস্টারি পরীক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি দীননাথকে রাসবিহারী বসু নামক একজন বাঙালী বিপ্লবীর সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। রাসবিহারী সেই সময় দেরাদুনে কয়েকজন যুবককে বৈপ্লবিক শিক্ষা দিতেছিলেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে রাসবিহারী বসু 'আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা' সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়া অল্প কয়েকদিন পরেই প্রমাণাভাবে মুক্তিলাভ করেন। ইহার পর তিনি দেরাদুনে আসিয়া দেরাদুনের 'ফরেস্ট রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট'-এ হেড ক্লার্কের চাকরি গ্রহণ করেন এবং কিছু দিন নিষ্ক্রিয় থাকিবার পর উত্তর-ভারতে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হন। রাসবিহারী যাঁহাদের লইয়া কার্য আরম্ভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে আমীরচাঁদ, দীননাথ, অবোধবিহারী ও বালমুকুন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা প্রায় সকলেই ছিলেন কলেজের ছাত্র। বসন্তকুমার বিশ্বাস নামক এক বাঙালী বিপ্লবীও এই বিপ্লবিদলের অন্তর্ভুক্ত হন। তখন ইনি ছিলেন রাসবিহারীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ।

এই গুপ্ত সমিতির শাখা-প্রশাখা দ্রুত বিস্তার লাভ করে। লাহোর ও দিল্লীর ছাত্রদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচার চলিতে থাকে। ছাত্রদের মধ্যে নিয়মিতভাবে বৈপ্লবিক প্রচার-পত্র বিলি করিবার ব্যবস্থা হয়। এই সময়ে লাহোর ও দিল্লীর বহু ছাত্র এই গুপ্তসমিতির সভ্য হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে রাসবিহারী সমিতির বিশিষ্ট সভ্যদের বোমা তৈরির উপায় ও রিভলভার-বন্দুক ছোঁড়া শিক্ষা দেন। রাসবিহারী কলিকাতার যুগান্তর সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়াই কাজ চালাইতে থাকেন। এই সময় কলিকাতার যুগান্তর সমিতির বহু বৈপ্লবিক ইস্তাহার লাহোর ও দিল্লীর ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই সকল আয়োজনে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ প্রায় শেষ হইয়া আসে।

ইতিমধ্যে রাসবিহারীর নেতৃত্বে যুক্তপ্রদেশ ও লাহোরের বিপ্লবীরা একটা ব্যাপক বৈপ্লবিক পরিকল্পনা লইয়া কাজ আরম্ভ করিবার জন্য প্রস্তুত হন।

বড়লাট হত্যার চেষ্টা

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারত-ভ্রমণ শেষ করিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। যথা সময়ে বিপ্লবীরা এই সংবাদ জানিতে পারেন। তাঁহারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য প্রস্তুত হন। বড়লাট সাহেব রেল-স্টেশন হইতে জুড়ি-গাড়ীতে চড়িয়া দিল্লী প্রবেশ করিতে উদ্যত, এমন সময় তাঁহার গাড়ীর উপর একটি বোমা পড়ে। বোমাটি ছিল 'পিনবদ্ধ'শ্রেণীর, অর্থাৎ বোমাটির মধ্যে বিস্ফোরক পদার্থের সহিত বহু ছোট পেরেক দেওয়া হইয়াছিল। বোমা বিস্ফোরণের ফলে বড়লাট সাংঘাতিকরূপে আহত হন এবং তাঁহার গাড়ীর পশ্চাৎ ভাগের একজন গার্ড নিহত হয়। পথের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান দর্শকশ্রেণীর উপর পুলিসের নির্মম অত্যাচার চলে, কিন্তু বোমা-নিক্ষেপকারীকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ

দিল্লী ষড়যন্ত্র-মামলা

এত চেষ্টা ও আয়োজন সত্ত্বেও বড়লাটকে হত্যা করা সম্ভব হইল না দেখিয়া বিপ্লবীরা মরিয়া হইয়া উঠেন, তাঁহারা আবার নূতন এক পরিকল্পনা করেন। এবারের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ভার পড়ে লাহোর সংগঠনের উপর। লাহোরের বিপ্লবীরা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, লাহোরের 'লরেন্স গার্ডেন'-এর একটি পথ দিয়া বহু ইংরেজ দল বাঁধিয়া সন্ধ্যাকালে যাতায়াত করে। বিপ্লবীরা এক সঙ্গে বহু ইংরেজ সাহেবকে হত্যা করিয়া বড়লাট-বধের ব্যর্থতা পূরণ করিবার সিদ্ধান্ত করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর বসন্ত বিশ্বাস সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া 'লরেন্স গার্ডেন'-এর উক্ত পথের উপর একটি ভয়ংকর বিস্ফোরক বোমা পাতিয়া রাখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কোন ইংরেজসাহেব ঐ পথে আসিবার পূর্বেই একজন ভারতীয় চাপরাশী ঐ পথে সাইকেলে যাইবার সময় সাইকেলের চাকার ধাক্কা লাগিয়া বোমাটি ফাটিয়া যায় এবং চাপরাশীটি তৎক্ষণাৎ নিহত হয়।

এই সময় লাহোরে কতকগুলি বৈপ্লবিক ইস্তাহার বিতরণ করা হয়। সেই সকল ইস্তাহারের কতকগুলি পরবর্তীকালে কলিকাতার 'রাজাবাজার বোমার মামলা'য় অভিযুক্ত অমৃত (শশাঙ্ক) হাজরা কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া পরে প্রমাণিত হয়। এই সকল ইস্তাহার বিতরণ করিবার সময় পুলিস কয়েকজন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে। ইঁহাদের মধ্যে দীননাথ অন্যতম। দীননাথ গ্রেপ্তার হইবার সঙ্গে সঙ্গে এক স্বীকারোক্তি করিয়া রাজসাক্ষী হয়। তাহার স্বীকারোক্তির ফলে আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাস গ্রেপ্তার হন। গুপ্ত সমিতির পরিচালক

রাসবিহারী বসুকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিস পাঞ্জাব ও দিল্লী তোলপাড় করে। কিন্তু রাসবিহারী ততক্ষণে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছেন।[১] এবার ধৃত বিপ্লবীদের লইয়া এক ষড়যন্ত্র-মামলা আরম্ভ হয়। এই মামলাই 'দিল্লী ষড়যন্ত্র-মামলা' নামে বিখ্যাত। মামলার বিচারে আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাসের ষড়যন্ত্র ও "সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম"-এর অপরাধে ফাঁসির আদেশ হয়। সরকার রাসবিহারীকে 'পলাতক আসামী' বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাঁহার গ্রেপ্তারের জন্য বহু সহস্র টাকার একটি পুরস্কার ঘোষণা করে।

হরদয়াল ও গদর সমিতি

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে হরদয়াল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো শহরে উপস্থিত হন। সানফ্রান্সিস্‌কোতে পৌঁছিয়াই তিনি আমেরিকা-প্রবাসী শিখদের মধ্যে প্রায় দুই বৎসর কাল ধরিয়া বৈপ্লবিক প্রচার-কার্য চালান। তাঁহার বৃটিশ-বিরোধী ও বৈপ্লবিক প্রচারে প্রবাসী শিখদের মধ্যে স্বাধীনতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতে থাকে।

হরদয়াল, বরকতুল্লা[২], পরমানন্দ, রামচন্দ্র প্রভৃতি বিপ্লবী নায়কগণ আমেরিকা ও কানাডার বিভিন্ন শহরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে সভা করিতেন। সেই সকল সভায় ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব ও সেই বিপ্লব পরিচালনার জন্য বৈপ্লবিক সমিতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হইত। 'গদর' পত্রিকা বাহির হইবার পূর্ব হইতেই বৈপ্লবিক সমিতি গঠনের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসরের মধ্যভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এস্তোরিয়া প্রদেশের প্রধান শহর এস্তোরিয়ায় প্রবাসী শিখ ও অন্যান্য ভারতীয়দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন হরদয়াল। এই সভায় ভারতের বিপ্লব সম্পর্কে বহু আলোচনার পর 'প্রশান্ত মহাসাগর-উপকূলের হিন্দু-সঙ্ঘ' নামে একটি বৈপ্লবিক সমিতি ও উহার স্থানীয় শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠা এবং 'গদর' অর্থাৎ 'বিদ্রোহ' নামে বৈপ্লবিক সমিতির একটি মুখপত্র বাহির করিবার সিদ্ধান্ত হয়। উপস্থিত সকলে এই পত্রিকার জন্য অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো শহর হইতে 'গদর' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। বাঙলার যুগান্তর সমিতি ও উহার মুখপত্র 'যুগান্তর'-এর নাম অনুসারে 'গদর' পত্রিকার ছাপাখানার নাম রাখা হয় 'যুগান্তর আশ্রম'। সংবাদপত্র সম্পাদনায় অভিজ্ঞ রামচন্দ্র 'গদর' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। 'গদর' পত্রিকাখানি বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও

১। রাসবিহারী বসুর পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ এই অধ্যায়ের শেষ দিকে এবং 'যুক্ত প্রদেশের বিপ্লব প্রচেষ্টা' শীর্ষক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

২। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে (অধ্যাপক) বরকতুল্লা আমেরিকা হইতে জার্মানি ও জার্মানী হইতে কাবুলে গমন করিয়া মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রভৃতি প্রবাসী বিপ্লবীদের সহিত একত্রে 'ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র'-এ যোগদান করেন। পরবর্তী এক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

কানাডার সর্বত্র প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে প্রচার করা হইত। ইহার বিভিন্ন ভাষার সংস্করণ ভারতের বিভিন্ন শহরে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এবং ব্রহ্মদেশ ও শ্যামের ভারতীয়দের নিকট প্রেরিত হইত। 'গদর' পত্রিকার নাম অনুসারেই আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত এই ভারতীয় বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান 'গদর সমিতি' নামে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। এইভাবে এক দিকে 'গদর' পত্রিকার বৈপ্লবিক প্রচার ও অপর দিকে হরদয়াল প্রভৃতি বিপ্লবীদের চেষ্টার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার প্রবাসী ভারতীয়দের, বিশেষত শিখদের লইয়া এক বিরাট বৈপ্লবিক সমিতি গড়িয়া উঠে এবং সানফ্রান্সিস্কো শহরের 'যুগান্তর আশ্রম'কে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র আমেরিকায় এই সমিতির শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমিতির মুখপত্র 'গদর' পত্রিকায় সমিতির উদ্দেশ্য ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইত। ইহাতে জ্বালাময়ী ভাষায় সমিতির বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হইত। বৈপ্লবিক উপায়ে বিদেশী বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিয়া ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—ইহাই ছিল ইহার প্রচারের মূল বিষয়। কিন্তু বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদের প্রয়োজন কি? এই প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিবার জন্য "বৃটিশ শাসনের স্বরূপ" এই শিরোনামায় বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে চৌদ্দটি অভিযোগ একের পর এক প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:

"(১) ইংরেজরা প্রতি বৎসর ৫০ কোটি টাকা ভারত হইতে ইংলণ্ডে লইয়া যায়।...(৩) তাহারা ভারতের ২৪ কোটি লোকের শিক্ষার জন্য ব্যয় করে মাত্র ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা, স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করে ২ কোটি টাকা, আর সৈন্যবাহিনীর জন্য ব্যয় করে ২৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। (৪) দুর্ভিক্ষ প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং গত দশ বৎসরে ২ কোটি পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু অনাহারে মরিয়াছে।...(১১) ভারতের টাকায় এবং ভারতীয় সৈন্যদের বলি দিয়া তাহারা আফগানিস্থান, ব্রহ্ম, মিশর, পারস্য ও চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়াছে· (১৪) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর সাতান্ন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এখন আর একটা বিদ্রোহ বিশেষ জরুরী হইয়া উঠিয়াছে।"[১]

সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাইতে হইবে। তাহার জন্য সকল প্রবাসী ভারতীয়দের ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়া "বিপ্লবের দ্বারা বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিতে হইবে।" এই বিপ্লবের আয়োজন করিবার জন্য সর্বত্র গুপ্ত-সমিতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতের বিপ্লবী শহীদগণ হইবে তাহাদের আদর্শ। উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য হরদয়াল ও তাঁহার সহকর্মীরা আমেরিকার সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া সভা এবং বৈপ্লবিক কার্যের তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাক্রামেণ্টো নামক স্থানে গদর সমিতির উদ্যোগে শিখদের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায়

১। 'Sedition Committee Report', p, 168.

"ছায়াচিত্রের মারফত ভারতের বিখ্যাত রাজদ্রোহী ও (বৈপ্লবিক) হত্যাকারীদের চিত্র এবং বৈপ্লবিক ধ্বনি প্রদর্শন করা হয়। ইহার পর হরদয়াল তাঁহার শ্রোতাদের নিকট বক্তৃতায় বলেন যে, শীঘ্রই জার্মানী ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে, আর সেই সময় বিপ্লবে যোগদান করিবার জন্য ভারতবর্ষে যাইবার আয়োজন করিতে হইবে।"[১] এই প্রকারের আরও কয়েকটি জনসভায় হরদয়াল ভারতের আসন্ন বিপ্লবের জন্য প্রবাসী শিখদের প্রস্তুত হইতে বলেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ

হরদয়ালের এই সকল বক্তৃতা শীঘ্রই মার্কিন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ হরদয়াল গ্রেপ্তার হন। মার্কিন সরকার তাঁহাকে "অবাঞ্ছিত বিদেশী" হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত করিয়া জামিনে মুক্তি দেয়। এই সুযোগে হরদয়াল য়ুরোপের সুইজারল্যাণ্ড দেশে পলাইয়া যান। রামচন্দ্র তাঁহার স্থান গ্রহণ করিয়া আমেরিকা ও কানাডার গদর সমিতি, 'গদর' পত্রিকা এবং উহার ছাপাখানা ও গদর সমিতির কেন্দ্র 'যুগান্তর-আশ্রম' পরিচালনা করিতে থাকেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ হরদয়ালের গ্রেপ্তারের সংবাদ 'গদর' পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার পর হইতেই যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার শিখ ও অন্যান্য ভারতীয়দের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। তাহাদের প্রিয় নেতার প্রতি এই উৎপীড়ন সহ্য করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। তাহাদের নিকট বৃটিশ সরকার, যুক্তরাষ্ট্র সরকার, কানাডা সরকার—সকল ইংরেজ সরকারই এক, সকল ইংরেজ সরকারই অত্যাচারী। তাহাদের এই বিক্ষোভ বিপ্লবের আগুন জ্বালাইতে উদ্যত হয়, ভারতে ফিরিয়া এক রক্তাক্ত বিপ্লবের দ্বারা উৎপীড়ক ও শোষক বৃটিশ সরকারের উচ্ছেদের জন্য তাহাদের মধ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পাইতে থাকে।

এই সময় সমগ্র আমেরিকায় ও কানাডায় একখানি বৈপ্লবিক পুস্তিকা প্রচার করা হয়। ইহার একটি কবিতায় তিলক, বরকতুল্লা, অজিত সিং, সাভারকর, অরবিন্দ ঘোষ, কৃষ্ণ বর্মা, হরদয়াল ও অন্যান্য বহু ভারতীয় বিপ্লবীদের নাম উল্লেখ করিয়া প্রবাসী ভারতীয়দের নিকট আবেদন করিয়া বলা হয়:

"তাহারা সকলেই বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন, সকল শিখ, সকল হিন্দু, সকল মুসলমান সেই পতাকার নীচে সমবেত হইয়াছে; চল, আমরাও আমাদের দেশে ফিরিয়া গিয়া সেই বিদ্রোহে যোগদান করি—ইহাই আমাদের শেষ নির্দেশ।"

এবার হইতে সর্বত্র একই ধ্বনি উঠিতে থাকে—"চল, দেশে ফিরিয়া গিয়া বিদ্রোহে যোগদান করি।"

১। Judgment of the Lahore Conspiracy Case.

ইতিমধ্যে য়ুরোপে সমরানল জ্বলিয়া উঠে। জার্মানীর দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তির নিকট বৃটিশ প্রভৃতি মিত্র-শক্তির ক্রমাগত পরাজয়ের ফলে বিশেষত ইংরেজশক্তি চারিদিক হইতে ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হয়। বিপ্লবীরাও এই সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। গদর সমিতির নেতৃবৃন্দ সকল স্বাধীনতাকামী শিখ ও ভারতীয়কে অবিলম্বে ভারতে ফিরিয়া যাইবার নির্দেশ দেন। 'গদর' পত্রিকায় জ্বালাময়ী ভাষায় লেখা হইতে থাকে :

"য়ুরোপে যুদ্ধ চলিতেছে, তোমরা এই সুযোগে প্রস্তুত হও। নির্ভীক বন্ধুগণ, অবিলম্বে প্রস্তুত হও, বিদ্রোহের দ্বারা তোমাদের প্রতি সকল অত্যাচারের অবসান ঘটাও। এই বিদ্রোহের জন্য চাই, ভারতবর্ষে বিদ্রোহ সংঘটিত করিবার জন্য নির্ভীক সৈন্য ; তাহাদের বেতন—মৃত্যু ; পুরস্কার—শহীদের সম্মান, অবসর-জীবনের প্রাপ্য—মুক্তি ; যুদ্ধক্ষেত্র—ভারতবর্ষ।"

"উঠ, চোখ খোল। গদরের জন্য (বিদ্রোহের জন্য) অর্থ সংগ্রহ কর, ভারতে ফিরিয়া চল। মুক্তি লাভের জন্য জীবন উৎসর্গ কর।" "ভারতে ফিরিয়া চল, ইংরেজকে পরাজিত করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে শাসন-ক্ষমতা কাড়িয়া লও।" ভারতে ফিরিয়া গিয়া গদর-কর্মীদের 'গদর-সাহিত্য' বিক্রয় করিতে হইবে ; জনসাধারণকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের জন্য উৎসাহিত করিতে হইবে ; সর্বত্র রেলপথ তুলিয়া ফেলিতে হইবে ; ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইবার জন্য জনসাধারণকে বুঝাইতে হইবে, শয়তান ফিরিঙ্গিদের নির্মূল করিবার জন্য দেশীয় সৈন্যবাহিনীকে উৎসাহিত করিতে হইবে।" "এইভাবে বিদ্রোহের দ্বারা বৃটিশ শাসনের কবল হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে হইবে, এইভাবে ইংরেজদের ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়া জনসাধারণের নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।"[১]

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও বৃটিশ-কলাম্বিয়ার প্রবাসী সহস্র সহস্র শিখ, হিন্দু, মুসলমান গদর-বিপ্লবীদের এই আহ্বানে সাড়া দেয়। দীর্ঘ প্রবাস-জীবনের শত অত্যাচার, উৎপীড়ন, শোষণ, দুঃখ-লাঞ্ছনা এই ভারতীয় মানুষগুলিকে প্রতিশোধের নেশায় উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের এত দুঃখ-লাঞ্ছনার জন্য একমাত্র দায়ী ভারতের বিদেশী বৃটিশ শাসন। মহাযুদ্ধের সুযোগে সেই বিদেশী শত্রুর উপর চরম প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে তাহারা বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া দলে দলে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করে।

বজবজের যুদ্ধ

পাঞ্জাবের অমৃতসর জেলার গুরুদিৎ সিং নামক এক শিখ দীর্ঘকাল ধরিয়া সিঙ্গাপুর ও মালয়ে ঠিকাদারী ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময় তিনি পাঞ্জাবে ফিরিয়া আসেন এবং বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ইহার পর তিনি এক নূতন উদ্দেশ্য লইয়া হংকং-এ ফিরিয়া যান। এই সময় বহু পাঞ্জাবী

১। Proceedings of the Lahore Conspiracy Case.

শিখ জীবিকা অর্জনের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কুলি ও শ্রমিকের কার্যে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু এই সকল স্থানে মজুরির হার অত্যন্ত নীচু বলিয়া তাহারা অধিক মজুরির আশায় কানাডা গমনের সিদ্ধান্ত করে। তাহাদের কানাডা গমনের জন্য জাহাজ সংগ্রহের ভার গ্রহণ করেন গুরুদিৎ সিং।

কলিকাতায় কোন জাহাজ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া তিনি হংকং হইতে 'কোমাগাতামারু' নামে একখানি জাপানী জাহাজ ভাড়া করেন। জাহাজখানি, হংকং, সাংহাই, মোজি ও ইয়োকোহামা হইতে শিখদের লইয়া ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল কানাডার ভাঙ্কুভার বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

সম্ভবত দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া গুরুদিৎ সিং এই কার্যে উদ্যোগী হন: প্রথমত, প্রাচ্য-প্রবাসী শিখদের জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করা; দ্বিতীয়ত, কানাডা সরকারের অত্যাচারমূলক 'বিদেশীদের প্রবেশাধিকার সম্পর্কিত আইন'-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। কানাডা সরকারের এই আইন অনুসারে দুই শত ডলার জমা না দিলে এবং দেশ হইতে সরাসরি কানাডায় না আসিলে, বিদেশীরা কানাডায় প্রবেশ করিতে পারিত না। ইহা ব্যতীত, কানাডায় প্রবেশ করিবার পরেও বিদেশীদের বহু উৎপীড়নমূলক সরকারী আইন মানিয়া চলিতে হইত এবং এই সকল আইন বিশেষত ভারতীয়দের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হইত। এই সকল আইনের বিরুদ্ধে কানাডার প্রবাসী ভারতীয়রা দীর্ঘ কাল হইতে আন্দোলন করিয়া আসিতেছিল। কানাডার প্রবাসী শিখদের এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তোলাই ছিল গুরুদিৎ সিং-এর অন্যতম উদ্দেশ্য। শিখদের লইয়া 'কোমাগাতামারু' জাহাজ ভাঙ্কুভার বন্দরে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে কানাডার শিখদের এই আন্দোলন উগ্র আকার ধারণ করে।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন বন্দরে গদর সমিতির প্রচারকগণ 'কোমাগাতামারু' জাহাজের শিখদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচার-কার্য চালাইতে থাকেন। জাহাজের শিখগণ প্রয়োজন হইলে যাহাতে পুলিসের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে তাহার জন্য বহু রিভলভারও সংগ্রহ করা হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে জাহাজখানি ভাঙ্কুভার বন্দরে প্রবেশ করে। কিন্তু যেহেতু জাহাজের সকল আরোহীর নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না এবং যেহেতু তাহারা সরাসরি ভারতবর্ষ হইতে আসে নাই, সেই হেতু কানাডা সরকার শিখদের বন্দরে নামিতে দিতে অস্বীকার করে। আরোহীরা কানাডা সরকারের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেও কোন ফল হইল না। কানাডার প্রবাসী ভারতীয়রা আরোহীদের বন্দরে নামিবার ব্যবস্থার জন্য বাইশ হাজার ডলার চাঁদা তুলিয়া দিল। কিন্তু তাহাতেও তাহাদের বন্দরে নামিবার অনুমতি পাওয়া গেল না।

কানাডা সরকারের এই অত্যাচারে কানাডা-প্রবাসী ভারতীয় ও জাহাজের আরোহী ভারতীয়দের মধ্যে ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠে। গদর সমিতির প্রচারকদের প্রচারে এই বিক্ষোভ ক্রমশ বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। 'গদর' পত্রিকা এবং

বহু পুস্তিকা ও ইস্তাহারে কানাডা সরকারকে তথা সকল দেশের ইংরেজ সরকারকে, বিশেষত ভারতের ইংরেজ সরকারকে সকল পরাধীন মানুষের চরম শত্রু বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং ঐ সরকারের বিরুদ্ধে এই বলিয়া বিদ্রোহের আহ্বান জানান হয় :

সকল দেশের ইংরেজ সরকারই এক এবং তাহাদের এই দুঃখ-লাঞ্ছনার জন্য ভারতের ইংরেজ সরকারই প্রধানত দায়ী। সুতরাং সকল ইংরেজ সরকারকে, বিশেষত ভারতের ইংরেজ সরকারকে সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা উচ্ছেদ করিতে হইবে।

কানাডার প্রবাসী শিখ ও 'কোমাগাতামারু' জাহাজের আরোহীদের মধ্যে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উঠিতে দেখিয়া কানাডা সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। তাহারা জাহাজখানিকে অবিলম্বে কানাডা ত্যাগ করিবার নির্দেশ দেয়। নির্দেশ পালনে বাধ্য করিবার জন্য একটি বিরাট পুলিস-বাহিনী জাহাজে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিলে আরোহীরা রিভলভার হইতে গুলি বর্ষণ করিয়া পুলিস-বাহিনীকে বাধা দেয়। পুলিস-বাহিনী পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। এই খণ্ডযুদ্ধে পুলিস-বাহিনীর পরাজয়ের ফলে কানাডার শাসকগণ ভয় পাইয়া 'কোমাগাতামারু' জাহাজকে বন্দর ত্যাগে বাধ্য করিবার জন্য কয়েকখানি যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরণ করে। অবশেষে যুদ্ধ-জাহাজের কামানের মুখে 'কোমাগাতামারু' নঙ্গর তুলিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু জাহাজের আরোহীদিগকে কানাডায় নামিতে না দিবার ফল হইল ভীষণ। কারণ, জাহাজের শিখগণ তাহাদের যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়াই কানাডায় জীবিকার্জনের আশায় আসিয়াছিল। তাহাদের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, ভারতের ইংরেজ সরকার তাহাদের সাহায্য করিবে। কিন্তু সাহায্য না করিয়া ইংরেজ সরকার জাহাজখানি ভারতে ফেরৎ পাঠাইবার জন্য কানাডা সরকারকে অনুরোধ করে। শিখদের এই ব্যর্থতার ফলে এবার তাহাদের বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া ভারতের ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাহাদিগকে উন্মাদ করিয়া তোলে। গদর-বিপ্লবীরা এই বিক্ষোভকে বিদ্রোহের আকারে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। জাহাজের আরোহীরা বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া ভারত অভিমুখে যাত্রা করে।

ইতিমধ্যে য়ুরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। 'কোমাগাতামারু' বৃটিশের অধিকারভুক্ত হংকং-এ পৌঁছিলে যুদ্ধের অজুহাতে আরোহীদের হংকং বন্দরে অবতরণ করিতে দেওয়া হইল না। আরোহীরা প্রাচ্যের পূর্ব কর্মস্থলে ফিরিয়া যাইবার আবেদন জানাইল, কিন্তু বৃটিশ সরকার তাহাদের সেই আবেদনেও কর্ণপাত করিল না। আরোহীদের সিঙ্গাপুরে নামিবার চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। ইতিমধ্যে ভারত সরকার এই বিদ্রোহীদের ভারতবর্ষে লইয়া গিয়া ইহাদের শাস্তি দানের সিদ্ধান্ত করিল। প্রকৃতপক্ষে ভারত সরকারই জাহাজখানিকে ভারতবর্ষের দিকে লইয়া চলিল।

'কোমাগাতামারু' জাহাজখানি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর বঙ্গোপসাগর পার হইয়া হুগলী নদীতে প্রবেশ করে এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর বেলা ১১টার সময় বজবজে আসিয়া নঙ্গর ফেলে। পূর্ব হইতেই একখানি স্পেশাল ট্রেন বজবজে

অপেক্ষা করিতেছিল। 'কোমাগাতামারু' জাহাজের যাত্রীদের সেই স্পেশাল ট্রেনে করিয়া পাঞ্জাব লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু জাহাজের যাত্রীরা ততক্ষণে সরকারের চক্রান্ত বুঝিয়া ফেলে, তাহারা সরকারের এই চক্রান্তে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হয়।

শিখগণ ট্রেনে চড়িতে অস্বীকার করিয়া সকলে একত্রে পায়ে হাঁটিয়া কলিকাতার দিকে যাত্রা করে। ইহারা যে ট্রেনে চাপিতে অস্বীকার করিয়া কলিকাতা পৌছিবার চেষ্টা করিবে তাহা শাসকগণ পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল। সুতরাং তাহারা বিদ্রোহীদের বাধা দিবার জন্য একটি সৈন্যবাহিনীও প্রস্তুত রাখিয়াছিল। শিখগণ কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিবামাত্র সৈন্যবাহিনী তাহাদের বাধা দেয়। সৈন্যরা পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবামাত্র সশস্ত্র শিখগণ রিভলভার হইতে গুলিবর্ষণ আরম্ভ করে, দেখিতে না দেখিতে বজবজ এক রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। উভয় পক্ষেই বহু লোক হতাহত হয়। শিখদের পক্ষে আঠার জন নিহত হয়। যুদ্ধ চলিবার সময় গুরুদিৎ সিং আঠাশ জন অনুচরসহ পলায়ন করেন। বিদ্রোহীদের একত্রিশ জনকে জেলে আটক করিয়া রাখা হয় এবং অবশিষ্ট সকলকে বলপূর্বক ট্রেনে চাপাইয়া পাঞ্জাব লইয়া গিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়।

কিন্তু 'কোমাগাতামারু' ও বজবজের ঘটনার এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটিল না। এই দুইটি সংবাদ দাবাগ্নির মত সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়া বিক্ষোভের আগুন জ্বালাইয়া দিল। সমগ্র পাঞ্জাবে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া গেল। গদর সমিতির নেতারা অনেকেই ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন, আর পাঞ্জাবেও পূর্ব হইতেই বিদ্রোহ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল। এবার সেই ধূম অগ্নিশিখায় পরিণত হইল।

বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও বিভিন্ন প্রাচ্যদেশ হইতে শিখদের পাঞ্জাবে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব হইতেই পাঞ্জাবে ব্যাপকভাবে বিপ্লবের আয়োজন আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতাদের অন্যতম ভাই পরমানন্দ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকা হইতে পাঞ্জাবে ফিরিয়া আসিয়াই বিপ্লবের আয়োজনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ড হইতে পাঞ্জাবে ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার হইয়া এক বৎসর অন্তরীণ থাকিবার পরেই আবার ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান। ইংলণ্ড হইতে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া তিনি হরদয়ালের সহিত মিলিত হন এবং গদর সমিতি গঠনে সাহায্য করেন। য়ুরোপে যুদ্ধ আসন্ন বুঝিয়া তিনি পাঞ্জাবে প্রত্যাবর্তন করিয়া বৈপ্লবিক আয়োজনে আত্মনিয়োগ করেন।

পরমানন্দ ও অন্যান্য বিপ্লবীরা একত্রে পাঞ্জাবে গুপ্ত সমিতি গড়িয়া তুলিতে থাকেন। স্কুল ও কলেজগুলিতে বিপ্লবের শাখা-প্রশাখা স্থাপিত হয় এবং পাঞ্জাবের সর্বত্র 'গদর' অর্থাৎ বিদ্রোহের প্রচার-কার্য চলিতে থাকে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় এবং প্রবাসী শিখগণ ফিরিয়া আসিতে থাকায় বিদ্রোহের আয়োজন দ্রুত অগ্রসর হয়। বিদ্রোহের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টাও চলিতে থাকে।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অকৃটোবর রাত্রিকালে ফিরোজপুর-লুধিয়ানা রেলপথের চৌকিমান স্টেশনে বিপ্লবীদের জন্য বহু অস্ত্রশস্ত্রের একটি বড় চালান আসিবার কথা ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচ জন শিখ-যুবক রিভলভার প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উক্ত স্টেশনে উপস্থিত হন। তাঁহারা স্টেশনে অপেক্ষমান লোকদের চলিয়া যাইতে বলিয়া গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। গাড়ী আসিল, কিন্তু মাল আসিল না। ইতিমধ্যে স্টেশন-মাস্টারের সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় সে বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করিতে অগ্রসর হয়। বিপ্লবীরা আত্মরক্ষার জন্য গুলি বর্ষণ করিলে স্টেশন-মাস্টার ও অপর এক ব্যক্তি নিহত হয়। ইহার পর বিপ্লবীরা স্টেশনের সিন্দুক হইতে বহু টাকা হস্তগত করিয়া চলিয়া যান।

২৯শে অকৃটোবর আমেরিকা, ফিলিপাইন, সাংহাই ও হংকং হইতে ১৭৩ জন শিখযাত্রী লইয়া 'তোসামারু' নামে আর একখানি জাহাজ কলিকাতায় উপস্থিত হয়। এই যাত্রীরা প্রায় সকলেই ছিলেন গদর সমিতির সভ্য। তাহারা ভারতের আসন্ন বিদ্রোহে যোগদানের উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবে যাইতেছিলেন। এই যাত্রীরা জাহাজে থাকিতেই বৈপ্লবিক সমিতির সংগঠনের অনুকরণে বহু ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়া এক একজন পরিচালকের অধীনে পাঞ্জাবের এক একটি অঞ্চলে বিদ্রোহ সংগঠিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাহাজখানি কলিকাতা পৌঁছিবার পূর্বেই ভারত সরকার এই সকল শিখদের পাঞ্জাবে যাইবার উদ্দেশ্য ও বিদ্রোহের আয়োজনের সংবাদ পাইয়াছিল এবং ভারতে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের আটক করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। 'তোসামারু'র যাত্রীরা জাহাজ হইতে নামিবামাত্র তাহাদের বন্দী করিয়া পাঞ্জাবে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পাঞ্জাবে তাহাদের এক শত জনকে দীর্ঘকালের জন্য জেলে আটক ও অবশিষ্ট সকলকে গ্রামে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই ৭৩ জন নজরবন্দী শিখের প্রায় সকলেই নজরবন্দী অবস্থা হইতে পলায়ন করিয়া বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে যোগদান করেন। তাঁহারা দল বাঁধিয়া প্রকাশ্যেই বিদ্রোহের জন্য প্রচার-কার্য চালাইতে থাকেন।[১] পাঞ্জাবের অসংখ্য যুবক বৈপ্লবিক প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করে। শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে গোপন বৈঠক চলিতে থাকে। বিপ্লবী নেতারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিদ্রোহের আয়োজনের তত্ত্বাবধান করেন।

নভেম্বর মাসে বিপ্লবীদের সহিত পুলিসের কয়েকটি বড় রকমের সংঘর্ষ হয়। ইহাদের মধ্যে ফিরোজপুর জেলার এক গ্রামের একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২৭শে নভেম্বর রাত্রিকালে পনের জন বিপ্লবী সশস্ত্র হইয়া মগা মহকুমার সরকারী ধনাগার লুণ্ঠন করিতে যাইতেছিলেন। এমন সময় একজন দারোগা এক দফাদারকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের সম্মুখীন হয়। কিছুক্ষণ বচসার পর গুলি করিবার জন্য দারোগাটি তাহার রিভলভার বাহির করিবামাত্র বিপ্লবীরা দারোগা ও দফাদার

১। পরে বিভিন্ন বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের জন্য নজরবন্দী শিখদের ছয়জনের ফাঁসি, ছয় জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং অনেকের দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়।

উভয়কেই গুলি করিয়া হত্যা করেন। বিপ্লবীরা আরও অগ্রসর হইলে পথে সশস্ত্র পুলিসের একটি বড় দলের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইবামাত্র পুলিস বিপ্লবীদের ঘিরিয়া ফেলে। উভয় পক্ষ প্রচণ্ড গুলি বর্ষণ করিতে থাকে এবং উভয় পক্ষে কয়েক জন হতাহত হয়। বিপ্লবীদের দুইজন নিহত ও সাত জন ভীষণ আহত হন এবং অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করেন। ২৮শে নভেম্বর রাত্রিকালে বিপ্লবীদের একটি দল পুলিস ও অশ্বারোহী সৈন্যদের একটি বড় দলের মুখে পড়িয়া যান। বিপ্লবীরা বন্দুক ও রিভলভার হইতে বেপরোয়াভাবে গুলি বর্ষণ করিয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হন। আম্বালা জেলার বিপ্লবীদের পরিচালক ছিলেন পৃথ্বী সিং রাজপুত নামক একজন গদর বিপ্লবী। ৮ই ডিসেম্বর রাত্রিকালে কয়েক জন পুলিসসহ এক দারোগা তাঁহার গোপন আশ্রয়স্থল ঘিরিয়া ফেলে। পৃথ্বী সিং কয়েকটি গুলি-ভরা রিভলভার লইয়া একাকী পুলিসদলের বিরুদ্ধে বহুক্ষণ যুদ্ধ করেন। তাঁহার গুলি বর্ষণে দারোগাটি আহত হয় এবং পৃথ্বী সিং পলায়ন করেন। ১৭ই ডিসেম্বর রাত্রিকালে হিসার জেলার পিপ্‌লী গ্রামের এক ধনী ব্যবসায়ীর গৃহে ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা নগদে ও অলঙ্কারে ২২ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন।

উপরোক্ত বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ ব্যতীত "গত কয়েক মাসে আরও বহু ভীষণ অপরাধ, 'মেল ব্যাগ' লুণ্ঠন, ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টা আমেরিকা-প্রত্যাগত ও স্থানীয় বিপ্লবীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সরকারের নিকট আরও যে সকল সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই বিপ্লবীরা সৈন্যবাহিনীকেও ক্ষেপাইয়া তুলিবার চেষ্টা এবং আরও ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।" পাঞ্জাবের লাটসাহেবের আশঙ্কা ছিল এই যে, "যদি এই ব্যক্তিদের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে তবে ক্রমবর্ধমান দুর্ভিক্ষের অবস্থায়, ধন-সম্পত্তির উপর ব্যাপক আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। তাহার ফলে সমগ্র প্রদেশে একটা অরাজক অবস্থা ও ত্রাসের সৃষ্টি হইবে।" "সুতরাং ছোটলাট সাহেব 'অস্ত্র-আইন',' 'বিস্ফোরক-আইন' ও অন্যান্য দমনমূলক আইনের সহিত কয়েকটি সম্পত্তি-রক্ষামূলক আইনও (নব-প্রবর্তিত) অর্ডিনান্স-এর অন্তর্ভুক্ত করেন।"[১]

আসন্ন বিদ্রোহ ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের পরামর্শে পাঞ্জাব সরকার 'পাঞ্জাব-অর্ডিনান্স' নামক যে বিশেষ আইন প্রয়োগ করে, সেই আইনটি ভারতের ইংরেজ শাসনের অন্যতম কুকীর্তিস্বরূপ অতি ভয়ংকর 'উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা আইন'-এরই নামান্তর।

১। Sedition Committee Report', p. 150-51.

পঞ্চম অধ্যায়

মাদ্রাজ প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা (১৯০৭-১৯১২)

ঝড়ের হাওয়া

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র, বাঙলা ও পাঞ্জাবে বিপ্লব-প্রচেষ্টা পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল, বাঙলা ও পাঞ্জাবে বিদেশী-পণ্য বর্জন প্রভৃতি গণ-আন্দোলন ও বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ সমগ্র ভারতকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান প্রদেশ মাদ্রাজে তখনও কোন চাঞ্চল্য দেখা দেয় নাই। এই সময় এক দিকে বাঙলার বিপ্লবীরা ও অপর দিকে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা মাদ্রাজ প্রদেশেও বৈপ্লবিক সংগ্রামের আগুন ছড়াইয়া দিবার জন্য সচেষ্ট হন। বাঙলাদেশের চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ পরামর্শ করিয়া ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালকে মাদ্রাজে প্রেরণ করেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসব্যাপী মাদ্রাজের পূর্ব-উপকূলবর্তী শহরগুলিতে বহু বৈপ্লবিক বক্তৃতার পর বিপিনচন্দ্র ১লা মে তারিখে মাদ্রাজ শহরে উপস্থিত হন। তিনি মাদ্রাজ শহরে 'স্বরাজ' (পূর্ণ স্বাধীনতা), 'স্বদেশী' ও 'বয়কট' সম্পর্কে তিনটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দান করিয়া মাদ্রাজের ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তোলেন। রাজমুন্দ্রী শহরে তাঁহার বক্তৃতার ফলে স্থানীয় সরকারী কলেজের ছাত্রগণ উত্তেজনাবশে ধর্মঘট করিয়া বসে। তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতায় মাদ্রাজের যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগ্রামের চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে।

ঐ বৎসর ১০ই মে মাদ্রাজের একটি জনসভায় বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতা করিবার কথা ছিল। লালা লাজপৎ রায়ের গ্রেপ্তারের সংবাদ মাদ্রাজে পৌছিবামাত্র সভার উদ্যোক্তাগণ সভা বন্ধ করিয়া বিপিনচন্দ্রকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। কারণ, মাদ্রাজের বক্তৃতার জন্য তাঁহারও গ্রেপ্তার হইবার আশঙ্কা ছিল। বিপিনচন্দ্র কলিকাতায় পৌছিয়া কালীপূজা উপলক্ষে এক জনসভায় মাদ্রাজের যুব-সম্প্রদায়কে উদ্দেশ করিয়া এক বক্তৃতা দান করেন। তাঁহার এই বক্তৃতার সারমর্ম তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামক ইংরেজী-সংবাদপত্র মারফত মাদ্রাজ প্রদেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। তিনি এই বক্তৃতায় প্রতি গ্রামে প্রতি অমাবস্যায় কালীপূজা (শক্তির আরাধনা) করিবার উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে, এই কালী সাধারণ কালী নহেন, ইনি রক্ষাকালী ; কারণ, প্রত্যেক মানুষ বিপদের সময় রক্ষাকালীকেই ডাকে ; সুতরাং আমাদের এই জাতীয় বিপদেও রক্ষাকালীর (শক্তির) আরাধনা করাই সকলের কর্তব্য ; রক্ষাকালীর রং কালো নহে, শাদা, আর এই শাদা রং হইল আলোর প্রতীক ; রক্ষাকালীর সম্মুখে যে ছাগল বলি দেওয়া হইবে তাহারও রং হইবে শাদা (শাদা ছাগলকে শ্বেতকায় ইংরেজের প্রতীক বলিয়া ধরিতে হইবে)। বিপিনচন্দ্র ১০৮টা শাদা ছাগল (শ্বেতকায় ইংরেজ) বলি দিয়া রক্ষাকালীর (দেশ মাতৃকার) পূজা করিবার পরামর্শ দান করেন।

বিপিনচন্দ্রের সহিত "জনৈক মাদ্রাজী ভদ্রলোক"[১] কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি মাদ্রাজে ফিরিয়া গিয়া এক বক্তৃতায় বলেন, ভারতবাসীদের বিদেশে গিয়া বোমা ও অন্যান্য ধ্বংসকারী অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করিবার প্রণালী শিক্ষা করা কর্তব্য; বিশেষত বোমা তৈরির প্রণালী শিক্ষা করা উচিত, কারণ বোমার ভয়ে রুশিয়ার প্রবল-প্রতাপান্বিত জারেরও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়; তাহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রতি অমাবস্যায় ১০৮টা শ্বেতকায়কে (ছাগল নহে, যাহারা দেশের শত্রু তাহাদিগকে) বলিদান করুক; তাহা হইলেই দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

বিপিনচন্দ্রের আহ্বানে মাদ্রাজের যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে রুশিয়ার সন্ত্রাসবাদী 'নিহিলিস্ট'দের অনুকরণে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানাইয়া ছাত্রদের মধ্যে একখানি পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। এই পুস্তিকায় 'নিহিলিস্ট'দের সংগঠন-পদ্ধতিও ব্যাখ্যা করা হয়। ইহার পর হইতে যুবকদের মধ্যে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া উঠিতে থাকে।

বিদ্রোহ

মাদ্রাজের চরমপন্থী নায়ক চিদম্বরম পিল্লাই ও সুব্রহ্মনীয় শিব উভয়ে একত্রে বিভিন্ন জেলায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া যুব-সম্প্রদায়কে বৈপ্লবিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে থাকেন। তাঁহারা ৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী এবং ৫ই মার্চ তারিখে তুতিকোরিণ শহরে তিনটি বক্তৃতা করেন। এই সকল বক্তৃতায় তাঁহারা "পূর্ণ স্বরাজ" (স্বাধীনতা) লাভের জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানান। শেষের সভাটিতে চিদম্বরম পিল্লাই তাঁহার বক্তৃতায় বিপিনচন্দ্র পালকে "স্বাধীনতার সিংহ" বলিয়া বর্ণনা করিয়া সকলকে তাঁহার নির্দেশ অনুসরণ করিতে বলেন। ইতিপূর্বে অরবিন্দ ঘোষের মামলায় সাক্ষী হইবার সরকারী নির্দেশ অমান্য করিবার অপরাধে বিপিনচন্দ্রের ছয়মাস কারা-দণ্ড হইয়াছিল। ৯ই মার্চ ছিল তাঁহার জেল হইতে মুক্তির দিন। চিদম্বরম পিল্লাই ঐ দিন সকলকে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিবার নির্দেশ দেন। ৯ই মার্চ তারিখে চিদম্বরম তিনেভেলি শহরের এক জনসভায় বিপিনচন্দ্র পালের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া সকলকে তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিবার আবেদন জানাইয়া বলেন, যাহা কিছু বিদেশী তাহাই বর্জন করিতে হইবে এবং এইভাবে মাত্র ছয় মাসের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হইবে। চিদম্বরমের বক্তৃতা চারিদিকে আগুন জ্বালাইয়া দিতে থাকে। মাদ্রাজ সরকার শঙ্কিত হইয়া ১২ই মার্চ তাঁহাকে ও সুব্রহ্মনীয় শিবকে গ্রেপ্তার করে।

মাদ্রাজের এই সর্বজনমান্য নেতৃদ্বয়ের গ্রেপ্তারের ফলে জনগণের ধূমায়িত ক্রোধ বিদ্রোহের আগুনে পরিণত হয়। গ্রেপ্তারের পর দিন, ১৩ই মার্চ তিনেভেলি জেলার সর্বত্র জনসাধারণ সরকারের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। জনসাধারণ সর্বত্র সরকারী

১। এই "মাদ্রাজী ভদ্রলোক" হইলেন মাদ্রাজের চরমপন্থী নায়ক চিদম্বরম পিল্লাই। যুগান্তর সমিতির তারকনাথ দাস ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য জাপানে পলায়নের উদ্দেশ্যে চিদম্বরম পিল্লাই মহাশয়ের গৃহে 'তারক ব্রহ্মচারী' নামে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। সেই সময় তারকনাথ পিল্লাই মহাশয়কে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

সম্পত্তি ভাঙিয়া চুরিয়া তছনছ করিয়া ফেলে। জনসাধারণ তিনেভেলি শহরে অবস্থিত তুতিকোরিণ জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট, মুন্‌সেফের কাছারী, পুলিস-ব্যারাক, থানা প্রভৃতি প্রত্যেকটি সরকারী দপ্তরখানা লুট করিয়া দপ্তরগুলির আসবাব ও কাগজপত্র জ্বালাইয়া এবং দালানগুলি ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলে। শহরের মিউনিসিপ্যালিটির দপ্তরটি আগুন দিয়া ভস্মীভূত করা হয়। ১৩ই মার্চ সারাদিন ধরিয়া এই ধ্বংস-কার্য চলিতে থাকে। অবশেষে সন্ধ্যার দিকে বাহির হইতে সৈন্যবাহিনী আসিয়া বিদ্রোহ দমন করিতে সক্ষম হয়। এই বিদ্রোহ উপলক্ষে ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদের ২৭ জন দীর্ঘ কারাদণ্ড লাভ করে।

১৭ই মার্চ কৃষ্ণস্বামী নামে কোয়েম্বাটুর জেলার এক বিপ্লবী ঐ জেলার কারুর শহরের এক বিরাট জনসভায় তিনেভেলি-বিদ্রোহের সংবাদ ঘোষণা করিয়া বলেন যে, তিনেভেলির জনসাধারণের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা এত বেশী যে, তাহারা "পর-দেশী" (বিদেশী) কালেক্টরের কোর্ট, মুনসেফের কাছারী, পুলিসের ব্যারাক ও দপ্তর প্রভৃতি সবকিছু নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়াছে ; এই সকল কার্য কারুর-এর জনসাধারণ কেন করিতে পারিবে না? এখানে যে সৈন্য-রেজিমেণ্ট রহিয়াছে তাহাদের বেতন খুবই অল্প, স্বাধীনতার জন্য তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা যাইতে পারে, তাহারা তাহাদের বন্দুকগুলি দেশের লোকের হাতে তুলিয়া দিতে পারে এবং দেশের লোকেরা সেই বন্দুক দিয়া শাদামুখোদের' (ইংরেজদের) গুলি করিয়া হত্যা করিতে পারে। এইভাবেই দেশের স্বাধীনতা লাভ হইবে। ইতিমধ্যে শাসকগণ বিশেষ সতর্ক হইয়া গিয়াছিল, তাহারা অবিলম্বে কৃষ্ণস্বামীকে গ্রেপ্তার ও "রাজদ্রোহ" প্রচারের অভিযোগে আদালতে অভিযুক্ত করিয়া দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

'স্বরাজ' পত্রিকা

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ বাঙলাদেশে বিপিনচন্দ্র পালের জেল হইতে মুক্তি লাভ উপলক্ষে কৃষ্ণা জেলার বেজোয়াদা শহরে 'স্বরাজ' নামে তেলেগু ভাষায় একখানি চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী পত্রিকা বাহির হয়। চিদম্বরম পিল্লাই-এর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ২৬শে মার্চ এই পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল:

"ওরে ফিরিঙ্গি, হিংস্র ব্যাঘ্রের দল! তোরা বিনা দোষে একবারে তিন জন নির্দোষ ভারতবাসীকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিস্। তোরা তাদের নিজেদের আইন-কানুন পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়াছিস্। তোরা ভয়ে মরিতেছিস্ ; তোদের মত যাহারা ঔদ্ধত্যে অন্ধ হইয়া নীচ মনোভাব গ্রহণ করে তাদের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। তোরা তোদের আচরণের দ্বারা ইহাই জাহির করিয়াছিস্ যে, ভারতের জাগ্রত জাতীয়তা-বাদের বাতাস লাগিবামাত্র তোদের স্বেচ্ছাচারী ফিরিঙ্গি-রাজত্ব শুকাইয়া যাইবে!"[১]

এই প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রেসের স্বত্বাধিকারী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১। Quoted from the 'Sedition Committee Report', p. 163.

'ভারত' পত্রিকা

মাদ্রাজ শহরে 'ভারত' নামে একখানি তামিল পত্রিকাও বৈপ্লবিক প্রচারকার্য আরম্ভ করে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মে ও জুন মাসে পর পর তিন-চারটি 'রাজদ্রোহ'মূলক প্রবন্ধ বাহির হয়। এই অপরাধে পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়। ইহার পর 'ভারত' পত্রিকার ছাপাখানাটি মাদ্রাজ হইতে ফরাসীদের অধিকারভুক্ত পণ্ডিচেরীতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বেশী 'রাজদ্রোহ'মূলক প্রবন্ধ বাহির হইতে থাকে। একজন সম্পাদক ছিলেন তিরুমল আচার্য নামে এক যুবক। তিরুমল ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে পণ্ডিচেরী হইতে লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া বিনায়ক দামোদর সাভারকর দ্বারা পরিচালিত 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ যোগদান করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিরুমল লণ্ডন হইতে প্যারী নগরীতে যাইয়া সেখানকার প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্যারী হইতে পণ্ডিচেরীর 'ভারত' অফিসে পত্র মারফত অবিলম্বে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করিবার নির্দেশ পাঠান।

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বিখ্যাত প্রবাসী মাদ্রাজী বিপ্লববাদী মাদাম কামা প্যারী নগরী হইতে 'বন্দেমাতরম্' নামে একখানি সংবাদপত্র বাহির করেন। এই পত্রিকার মারফত তিনি মাদ্রাজের বৈপ্লবিক সংগ্রামে প্রেরণা যোগাইতে থাকেন। এই পত্রিকার বিভিন্ন প্রবন্ধে ইংরেজ-হত্যা প্রভৃতি বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইত। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যায় মাদাম কামা লিখিয়াছিলেন:

"সভায়, বাঙলোতে, রেলপথে, রেলগাড়ীতে, দোকানে, গির্জায়, বাগানে অথবা কোন মেলায়—যেখানে পার, যেখানে সুবিধা হইবে সেইখানেই ইংরেজদের হত্যা কর। অফিসার ও সাধারণ লোকের মধ্যে কোন বাদ-বিচার করিও না। মহামতি নানা সাহেব এই সত্যটি বুঝিয়াছিলেন, আর আমাদের বাঙলাদেশের বন্ধুরাও ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হউক, তাঁহাদের হস্ত প্রসারিত হউক। এখন আমরা ইংরেজদের বলিতে পারি, 'এই জঙ্গল হইতে যতদিনে তোমাদের না তাড়াই, ততদিন চুপ করিয়া থাক'।"[১]

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনেভেলি জেলার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসের হত্যা উপলক্ষে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার জুলাই-সংখ্যায় লেখা হয়:

"যখন জমকালো পোষাকপরা হিন্দুস্থানের ক্রীতদাসের দল রাজকীয় সার্কাসের মত লণ্ডনের রাস্তায় কুচ-কাওয়াজ করিতেছে এবং (রাজা পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে) কতকগুলি গরুর মত ইংলণ্ডের রাজার পদতলে লুটাইয়া পড়িতেছে, ঠিক তখনই তিনেভেলি ও ময়মনসিংহ জেলায়[২] আমাদের দুইজন দেশবাসী

১। Quoted from 'Sedition Committee Report', p. 165.

২। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুন ময়মনসিংহ জেলায় রাজকুমার চক্রবর্তী নামক জনৈক দারোগা হত্যা সম্পর্কে এখানে বলা হইয়াছে।

তাঁহাদের সাহসিকতাপূর্ণ কার্যের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দুস্থান ঘুমাইয়া নাই।"[১]

মাদাম কামা ইহাকে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার নির্দেশ বলিয়া উল্লেখ করেন।

'ফিরিঙ্গি ধ্বংসকারী প্রেস'

তিনেভেলি শহরে ব্যাপক খানাতল্লাস করিয়া পুলিস কতকগুলি বৈপ্লবিক পুস্তিকা ও ইস্তাহার হস্তগত করে। এই সকল পুস্তিকা ও ইস্তাহার 'ফিরিঙ্গি ধ্বংসকারী প্রেস'-এ মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রথম হইতেই বিপ্লবীরা তিনেভেলি শহরে এই প্রেসটি স্থাপন করিয়া বহু পুস্তিকা ও ইস্তাহার মুদ্রিত করেন। 'আর্যদের প্রতি একটি পরামর্শ' শীর্ষক একখানি পুস্তিকায় বলা হয়ঃ

"ভগবানের নামে শপথ গ্রহণ কর, তুমি আমাদের দেশ হইতে ফিরিঙ্গি পাপীদের দূর করিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিবে। শপথ লও, যতদিন এই ভারতের মাটিতে ফিরিঙ্গিরা আধিপত্য করিবে ততদিন তুমি তোমার জীবন বৃথা বলিয়া মনে করিবে। শাদামুখো ফিরিঙ্গিগুলিকে ধরিয়া কুকুরের মত প্রহার কর, তাহার পর ছুরি, লাঠি, ইটপাটকেল অথবা ভগবানের দেওয়া হাত দিয়াই ঐ ফিরিঙ্গিদের হত্যা কর।"[২]

এই বিপ্লবীরা 'অভিনব ভারত-সঙ্ঘের সভ্যপদের শপথ' শীর্ষক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সম্ভবত মহারাষ্ট্রের বিনায়ক ও গনেশ সাভারকরের প্রতিষ্ঠিত 'অভিনব ভারত-সঙ্ঘ'-এর সভ্যপদের নিয়মাবলী মাদ্রাজের বিপ্লবী সমিতিতেও প্রচলন করিবার জন্য ইহা করা হইয়াছিল। তিনেভেলি-সংগঠনের এই সকল পুস্তিকা ও ইস্তাহার মাদ্রাজের বিভিন্ন জেলা ব্যতীত পণ্ডিচেরী প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট সংখ্যায় প্রেরিত হইত।

ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসে হত্যা

মাদ্রাজের অপর দুইজন বিপ্লবী, নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী ও শঙ্করকৃষ্ণ আয়ার, প্রথম হইতেই মাদ্রাজের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৈপ্লবিক প্রচার-কার্য চালাইতেছিলেন। তাঁহাদের প্রচারে ও প্রেরণায় মাদ্রাজ প্রদেশে বহু যুবক বৈপ্লবিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে শঙ্করকৃষ্ণ ও নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারীর সহিত শঙ্করের শ্যালক বাঁচি আয়ার নামক আর একজন বিপ্লবী যোগদান করেন। ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে ভি. ভি. এস. আয়ার নামক আর একজন বিপ্লবী প্যারী হইতে পণ্ডিচেরীতে আসিয়া উপস্থিত হন।

ভি. ভি. এস. আয়ার এতদিন লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ বিনায়ক সাভারকরের সহকারীরূপে ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় নানাভাবে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। পরে তিনি লণ্ডন হইতে প্যারী নগরীতে গিয়া শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা, মাদাম কামা প্রভৃতি প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লববাদীদের সহিত মিলিত হন। মাদ্রাজের বিপ্লব-প্রচেষ্টার সংবাদ

১। Quoted from the 'Sedition Committee Report', p. 163.

২। Quoted from the same, p. 165.

পাইয়া আয়ার পণ্ডিচেরীতে উপস্থিত হইয়া বিপ্লবের আয়োজনে যোগদান করেন। পণ্ডিচেরীতে তিনি কয়েকজন যুবককে বৈপ্লবিক কার্যের শিক্ষা দিতে থাকেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য গুপ্তহত্যার আবশ্যকতার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। আয়ার এই উদ্দেশ্যে যুবকদের রিভলভার ছোঁড়া শিখাইতে আরম্ভ করেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বাঁচি আয়ার পণ্ডিচেরী আসিয়া ভি. ভি. এস. আয়ারের সহিত মিলিত হন। বাঁচিও ভি. ভি. এস.-এর নিকট রিভলভার ছোঁড়া শিক্ষা করেন। ইঁহারা উভয়ে মিলিয়া তিনেভেলি জেলার অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসে সাহেবকে হত্যা করিবার পরিকল্পনা করেন। ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসেই ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের তিনেভেলি-বিদ্রোহের সময় অত্যাচারের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিলেন। অ্যাসে সাহেবের সেই কুকীর্তি বিপ্লবীরা কখনও ভুলিয়া যান নাই। তাই এই অ্যাসেই বিপ্লবের প্রথম বলিরূপে নির্দিষ্ট হইলেন। ইহার পর বাঁচি তিনেভেলি শহরে ফিরিয়া আসেন। প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন সম্রাট পঞ্চম জর্জ-এর রাজ্যাভিষেকের দিন অ্যাসেকে হত্যা করা হইবে। কিন্তু ঐ দিন বিপ্লবীরা বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করিতে থাকেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন রাত্রিকালে তিনেভেলি জেলার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসে স্থানান্তর গমনের উদ্দেশ্যে রেলগাড়ীর একখানি কামরায় আরোহণ করেন। বাঁচি এবং শঙ্করকৃষ্ণ আয়ারও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া ঐ গাড়ীর অপর একখানি কামরায় উঠিয়া বসেন। ট্রেনখানি তিনেভেলি শহরের বাহিরে রেল-জংসনে আসিয়া থামিয়া পড়ে। ট্রেন থামিবামাত্র বাঁচি ও শঙ্কর ম্যাজিস্ট্রেটের কামরার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইলেন। তখন ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসে কামরার মধ্যে বসিয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিতে-ছিলেন। বাঁচি মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া অ্যাসের কামরায় উঠিয়া রিভলভার হইতে গুলি করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসের দেহ লুটাইয়া পড়িল। শঙ্কর নীচে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিলেন। কার্যসিদ্ধি করিয়া বাঁচি ম্যাজিস্ট্রেটের মৃতদেহের উপর একখানি পত্র রাখিয়া শঙ্করকে লইয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হন।

বাঁচি ম্যাজিস্ট্রেটের মৃতদেহের উপর যে পত্রখানি স্থাপন করেন তাহা ছিল তামিল ভাষায় লিখিত। পত্রখানির বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ:

"প্রত্যেক ভারতবাসীই এইভাবে ইংরেজদের তাড়াইয়া ভারতের স্বাধীনতা ও সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের এই পুণ্যভূমিতে একদিন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ ও অর্জুন প্রজাপালন ও ধর্মরক্ষা করিয়াছেন, আর আজ ইংরেজরা ভারতের এই পুণ্যভূমিতে পঞ্চম জর্জ নামক এক গোমাংস-ভোজী ম্লেচ্ছের রাজ্যাভিষেক করিতেছে; তিন হাজার মাদ্রাজী শপথ গ্রহণ করিয়াছে যে, যে মুহূর্তে পঞ্চম জর্জ এই পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করিবে, সেই মুহূর্তেই তাঁহারা পঞ্চম জর্জকে হত্যা করিবেন। অ্যাসের হত্যা তাহার পূর্বাভাস মাত্র।"[১]

১। Ibid, p. 167.

তিনেভেলি ষড়যন্ত্র-মামলা

ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসের হত্যাকারীকে খুঁজিয়া না পাইয়া পুলিস পরিচিত বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার এবং এক ষড়যন্ত্র-মামলা আরম্ভ করিয়া প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার পরিকল্পনা করে। অতঃপর নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী, শঙ্করকৃষ্ণ আয়ার, বাঁচি আয়ার প্রভৃতি বিপ্লবীরা একে একে গ্রেপ্তার হন। তাহার পর "রাজদ্রোহ", "বৈপ্লবিক প্রচার", "সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম", "নরহত্যা" প্রভৃতির অভিযোগে এক ষড়যন্ত্র-মামলা আরম্ভ হয়। নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী হইলেন সেই ষড়যন্ত্র-মামলার প্রধান আসামী। এই মামলাই 'তিনেভেলি ষড়যন্ত্র-মামলা' নামে খ্যাত।

মামলার বিচারে "রাজদ্রোহ", "বৈপ্লবিক প্রচার" প্রভৃতি কয়েকটি অভিযোগ সপ্রমাণ হইলেও ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসের হত্যাকারী অথবা ঐ সম্পর্কে কোন প্রমাণ বা সাক্ষ্য না পাওয়ায় সরকারের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। মামলার বিচারে নয়জন বিপ্লবীর কারাদণ্ড হয়। ইহার পর এই সময় মাদ্রাজ প্রদেশে আর কোন বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের সন্ধান পাওয়া যায় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্যপ্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা

১৯০৭-০৮ খ্রীষ্টাব্দ

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় কলিকাতা নগরীতে। এই সময় কংগ্রেসের নরমপন্থীদের সহিত চরমপন্থীদের বিরোধ চরমে উঠে, কিন্তু দাদাভাই নৌরজি প্রভৃতির চেষ্টায় সেই সময় দুই দলের মধ্যে আপস হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় পশ্চিম-ভারতের চরমপন্থী রাজনীতির প্রধান কেন্দ্র নাগপুর শহরে। নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব হইতে নাগপুরের ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে প্রবল চাঞ্চল্য দেখা দেয়। সারা বৎসর ধরিয়া স্থানীয় নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ চলিতে থাকে। নাগপুরে চরমপন্থীদের একচ্ছত্র প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে চরমপন্থী বৈপ্লবিক সংগ্রামের ধ্বনি লইয়া নাগপুরের বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী পত্রিকা হিন্দী 'কেশরী' প্রথম প্রকাশিত হয়। তিলকেরমারাঠী পত্রিকা 'কেশরী'র মত হিন্দী 'কেশরী'ও হিন্দীভাষা-ভাষী ছাত্র ও যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক চাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিতে থাকে। হিন্দী 'কেশরী' এত জনপ্রিয় হইয়া উঠে যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইহার প্রচার-সংখ্যা বাড়িয়া তিন হাজারে পরিণত হয়। সরকারী রিপোর্টেই দেখা যায় যে, ইহার ব্যাপক জনপ্রিয়তার ফলে সরকার ইহার প্রকাশ বন্ধ করিতে না পারিয়া দেশীয় সৈন্যদের ইহার বৈপ্লবিক প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য

সৈন্যদের পক্ষে ইহা ক্রয় করা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করে। এই সময় 'দেশ-সেবক' নামে আর একখানি পত্রিকাও বৈপ্লবিক প্রচারে যোগদান করে।

এই সময় নাগপুরের ছাত্র ও যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে চরমপন্থী আন্দোলন দেখা দিয়াছিল তাহা মধ্যপ্রদেশের ইনস্পেক্টর জেনারেল-এর নিকট লিখিত নাগপুরের চীফ কমিশনারের একখানি পত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়। চীফ কমিশনার তাঁহার পত্রে লিখিয়াছিলেন:

"নাগপুর-পুলিসের ছাত্র-হাঙ্গামা দমনের চেষ্টা মোটেই সন্তোষজনক নহে। বর্তমান অবস্থা চলিতে থাকিলে নাগপুরের ভদ্রলোকেরা ভয় পাইয়া নাগপুর হইতে পলাইতে আরম্ভ করিবে। এই বিশৃঙ্খলা দমন করিতে আমি দৃঢ়সংকল্প।...কলেজগুলির প্রিন্সিপালদের ও স্কুলের হেডমাস্টারদের এক সভা আহ্বান করিবার জন্য আমি কমিশনারকে নির্দেশ দিয়াছি। সেই সভায় শৃঙ্খলা স্থাপনের সমস্যা লইয়া আলোচনা করা হইবে। কিন্তু ছাত্রদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য পুলিসকে ছাত্র-হাঙ্গামাকারীদের গ্রেপ্তার করিতেই হইবে। নাগপুরের সংবাদপত্রগুলি এই সকল ঘটনায় ইন্ধন যোগাইতেছে। ইহা বন্ধ করিতেই হইবে। নাগপুরকে কিছুতেই 'রাজদ্রোহী'-দের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছাত্র-হাঙ্গামাকারীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না।"[১]

চীফ-কমিশনার সাহেবের শত চেষ্টা সত্ত্বেও নাগপুরে আন্দোলনের ঝড় বহিতে থাকে। বাঙলার চরমপন্থী বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ ঘোষ সুরাট-কংগ্রেসে যোগদান করিতে যাইবার পথে ২২শে ডিসেম্বর নাগপুর শহরে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি এক বিরাট ছাত্র-সভায় বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার ফলে নাগপুরের আন্দোলন চরমে উঠে। সুরাট-কংগ্রেসে 'চরমপন্থী' ও 'নরমপন্থী'দের মধ্যে বিচ্ছেদ এবং 'চরমপন্থী'দের দ্বারা কংগ্রেস-বর্জনের ফলে এই আন্দোলন বৈপ্লবিক রূপ গ্রহণ করিতে থাকে।

কংগ্রেসের অধিবেশনের শেষে বাঙলাদেশে ফিরিবার পথে অরবিন্দ পুনরায় নাগপুরে উপস্থিত হন। তাঁহার আগমন উপলক্ষে নাগপুরে এক বিরাট জনসভা হয়। এই সভাতেও তিনি বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলন আরও জোরের সহিত চালাইবার নির্দেশ দেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় সুরাট-অধিবেশনে তিলক ও 'চরমপন্থী'দের আচরণ সমর্থন করিয়া বলেন যে, বাঙালী ও মারাঠীরা উভয়েই এক পিতামাতার সন্তান, সুতরাং উভয়ের সুখদুঃখ সমানভাবে ভাগ করিয়া লওয়া উচিত; বিদেশী দ্রব্য বর্জন-আন্দোলন সর্বাপেক্ষা বেশী সফলতা লাভ করিয়াছে বাঙলাদেশে; সম্প্রতি বাঙালীরা যেভাবে সাহসের সহিত সকল যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে তাঁহার তুলনা নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি 'যুগান্তর' পত্রিকার নাম উল্লেখ করেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণের পর নাগপুরের 'দেশ-সেবক' পত্রিকায় বোমার প্রশস্তি গাহিয়া সকল ভারতবাসীকে বোমা-তৈরী শিক্ষা করিবার পরামর্শ দেওয়া হয়। একটি প্রবন্ধে বলা হয় যে, ইংরেজদের সংস্পর্শে

১। 'Sedition Committee Report', p. 137-38.

আসিবার ফলে ভারতবাসীদের মধ্যে যে সকল দুর্বলতা প্রবেশ করিয়াছে তাহার মধ্যে একটি হইল বোমা তৈরি সম্বন্ধে অজ্ঞতা; উচিত কথা বলিতে গেলে সকলপ্রকার অস্ত্রের ব্যবহার এবং বোমা তৈরি ও বোমার ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান সঞ্চয় করা ভারতের প্রত্যেকটি সম্ভ্রান্ত নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। ১৬ই মে তারিখে নাগপুরের হিন্দী 'কেশরী' পত্রিকার একটি প্রবন্ধে বলা হয় যে, যদিও (বাঙলাদেশের) 'যুগান্তর' পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক এখন বিচারাধীন রহিয়াছেন, যদিও 'মানিকতলা ষড়যন্ত্র-মামলা' উপলক্ষে বহু লোক গ্রেপ্তার হইয়াছেন, তথাপি এখনও 'যুগান্তর' পত্রিকা বাহির হইতেছে। ঐ প্রবন্ধে 'আলিপুর বোমার মামলা' সম্পর্কে বলা হয় যে, 'যুগান্তর' পত্রিকার কথায় ইহা হইল স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা; কিন্তু ইংরেজরা কি ভারতবর্ষের রাজা যে তাহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে হইবে? ডাকাত, চোর, গুণ্ডা, বদমাসদের দমন করিবার চেষ্টাকে ষড়যন্ত্র বলা চলে না।

মধ্যপ্রদেশে বৈপ্লবিক আলোড়নের লক্ষণ দেখা দিবামাত্র প্রাদেশিক সরকার সমগ্র প্রদেশে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। সকল বিপ্লব-প্রচেষ্টা অঙ্কুরে বিনষ্ট করিবার জন্য সরকার এক প্রচণ্ড দমননীতির খড়্গ উদ্যত করে। বাহির হইতে দলে দলে সৈন্য আসিয়া নাগপুর ও অন্যান্য শহরগুলিতে ঘাঁটি স্থাপন করে, নাগপুর এক বিরাট সৈন্য-শিবিরে পরিণত হয়। তাহার ফলে ১৮ই জুলাই তিলকের জন্মদিবসে 'শান্তি' অব্যাহত থাকে। ঐ দিবস নাগপুরে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। সেই সমাবেশে বক্তৃতা করেন দিল্লীর চরমপন্থী মুসলমান-নেতা হায়দর রাজা সাহেব। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় মহারাষ্ট্রকেশরী বাল গঙ্গাধর তিলককে সমগ্র ভারতের রাজনীতিক দীক্ষাগুরু বলিয়া অভিহিত করেন।

ইহার পর তিলকের কারাদণ্ড উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন অংশে হাঙ্গামা আরম্ভ হইবামাত্র পুলিস ও সৈন্যদল তাহা কঠোর হস্তে দমন করেন। এই উপলক্ষে বহু লোক গ্রেপ্তার হয়। তিলকের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সভা নিষিদ্ধ করা হয়। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিবার অপরাধে ছয় জনের কারাদণ্ড ও বহু লোকের অর্থদণ্ড হয়। 'রাজদ্রোহ'মূলক প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে হিন্দী 'কেশরী' ও 'দেশ-সেবক' পত্রিকার সম্পাদকগণ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, স্থানীয় সরকারের নির্দেশে বহু "সন্দেহভাজন" ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে আটক করা হয়। নাগপুর ও অন্যান্য শহরে এক ভয়ংকর সন্ত্রাসের রাজত্ব স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অত্যাচারের প্রতিবাদ-স্বরূপ নাগপুরের যুবকগণ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রস্তর-মূর্তি ভাঙিয়া ফেলিয়া তাহাতে আলকাত্‌রা লেপিয়া দেয়। তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে নাগপুরের শ্রমিকশ্রেণী ধর্মঘট পালন করে। ইহাই ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাজনীতিক ধর্মঘট।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ

দীর্ঘকাল পর্যন্ত সরকারী দমননীতি অব্যাহত থাকিবার ফলে মধ্যপ্রদেশের সকল বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। ইহার পর ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আবার বৈপ্লবিক

প্রচেষ্টার সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন রাসবিহারী বসুর পরিচালনায় উত্তর-ভারতে গদর-বিপ্লবের প্রচেষ্টা চলে, তখন রাসবিহারী বেনারসের গুপ্ত সমিতির বিশিষ্ট সভ্য নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়কে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর শহরে অবস্থিত দেশীয় সৈন্যদলকে বিপ্লবের পক্ষে আনয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু নলিনীমোহন অকৃতকার্য হইয়া বেনারসে ফিরিয়া যান।

ইহার পর ঢাকা অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সভ্য নলিনীকান্ত ঘোষ[১] মধ্যপ্রদেশে বৈপ্লবিক সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে নাগপুর প্রভৃতি শহরে আসিয়াছিলেন। সম্ভবত তাঁহার সেই চেষ্টাও সফল হয় নাই। ইহার পর বেনারস গুপ্ত সমিতির বিনায়ক রাও কপিল ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে জব্বলপুর শহরে আসিয়া গুপ্ত সমিতির একটি শাখা প্রতিষ্ঠা ও পলাতক বিপ্লবীদের জন্য একটি আশ্রয়স্থল সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখানে কপিলের চেষ্টায় সাত জন লোক লইয়া একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাত জনের মধ্যে দুই জন ছিলেন ছাত্র, দুই জন শিক্ষক, একজন উকিল, একজন অফিসের কেরানী ও অপর জন দর্জি। কিছুদিন পরে ইহাদের সকলেই গ্রেপ্তার হইয়া মাত্র দুই জন মুক্তি লাভ করেন। অবশিষ্ট সকলকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। ইহার পর পুলিসের সহিত সহযোগিতা করিবার শাস্তিস্বরূপ কপিল বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়।

সপ্তম অধ্যায়

উড়িষ্যা প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে বাঙলাদেশের যুগান্তর সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দেবব্রত বসু উড়িষ্যায় গিয়া সর্বপ্রথম বৈপ্লবিক সমিতি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। ইহার পর বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন বিপ্লবী নেতা উড়িষ্যায় বৈপ্লবিক সমিতির প্রতিষ্ঠাকার্যে সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও তিন বার উড়িষ্যায় প্রেরিত হন। সেই যুগের আর একজন বিপ্লবী নেতা গণেশ ঘোষ মহাশয়ও উড়িষ্যায় থাকিয়া সমিতি গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন :

এই বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সমবেত চেষ্টার ফলে—"উড়িষ্যায় দলে দলে বাঙালী (উড়িষ্যাবাসী বাঙালী), ওড়িয়াভাষা-ভাষী যুবকের দল, মাস্টার, উকিল, লেখক, ডাক্তার, জমিদার, বড় বড় মঠের মোহান্ত ও উচ্চপদস্থ প্রবীণ ব্যক্তিরা আমাদের দলভুক্ত হইয়াছিলেন বা সহানুভূতি দেখাইতেন। কটকের ব্যায়াম-সমিতি আমাদের

১। ইনি পরে আসামের গৌহাটি শহরে আত্মগোপন করিয়া থাকার সময় পুলিসের সহিত সশস্ত্র সংঘর্ষের পর আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন।

দলের একটি বড় ব্যায়াম-সমিতি ছিল। এক সময় কটক, পুরী, বালেশ্বর ও অন্যান্য স্থানসমূহ আমাদের সমিতির কার্যের ফলে স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লববাদে মুখরিত হইত। উড়িষ্যার যাহা কিছু স্বদেশী আন্দোলন তাহা আমাদের দলের লোকের দ্বারাই সংঘটিত হইত। উড়িষ্যাবাসীদের এত বৈপ্লবিক উৎসাহ ও উদ্যম দেখিয়া আমরা আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। ইহার কারণ এই যে, পূর্ববঙ্গ ও উড়িষ্যা—এই দুই জায়গায় আমাদের বিশেষ কর্মক্ষেত্র ছিল।······উড়িষ্যাতে আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম যে, উড়িষ্যার লোক স্বাধীনতাবাদকে বাঙলার চেয়ে শীঘ্র গ্রহণ করিয়াছিল। যে কারণেই হউক, উড়িষ্যায় আমাদের কার্য খুব বিস্তৃতি লাভ করে”[১]।

পুরীর গোবর্ধন-মঠের জগৎগুরু শঙ্করাচার্য নাকি বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপে আকৃষ্ট হইয়া বিপ্লববাদে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলকর্ণী প্রভৃতি বিপ্লবীদের সহিত ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করিতেন। বাঙলার বিপ্লবীরা বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে ‘ভবানী-মন্দির’ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিতেছিলেন শুনিয়া তিনি নাকি তাঁহার মঠ বিপ্লবীদের ব্যবহার করিতে দিতে চাহিয়াছিলেন।

উড়িষ্যার বিখ্যাত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও বিপ্লবীদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিল। এমনকি এই সম্প্রদায়ের কিছু লোক প্রথম যুগের বৈপ্লবিক সমিতিতে যোগদান করিয়াছিল। ‘মালিকা’ নামক পুরাতন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়টি তাহাদের বৈষ্ণব-ধর্মের সহিত বৈপ্লবিক মতবাদের সমন্বয় সাধন করিয়া বহু ‘রাজদ্রোহ’-মূলক প্রচার ও ক্রিয়া-কলাপ আরম্ভ করে। উড়িষ্যা সরকার ইহাদের বৈপ্লবিক প্রচার ও ক্রিয়াকলাপে ভীত হইয়া বহু নির্যাতন করিয়া এই সম্প্রদায়টিকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। বাঙলাদেশের বিপ্লবীরা ইহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবার পূর্বেই ইহারা পুলিসের দমন-নীতির ফলে ছত্রভঙ্গ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে।

কিন্তু প্রথম যুগের এত চেষ্টা, উৎসাহ ও সম্ভাবনা সত্ত্বেও সেই সময় উড়িষ্যায় বিপ্লব-প্রচেষ্টা দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। বাঙলার বিপ্লব প্রচেষ্টার অন্যতম নায়ক ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এই ব্যর্থতার নিম্নোক্ত কারণসমূহ উল্লেখ করিয়াছেন :

“···একদল যুবক যাঁহারা স্বাধীনতা-পন্থার পাণ্ডাগিরি করিতেন তাঁহারা সরকারী চাকরি লইয়া দল হইতে অন্তর্হিত হইলেন বা এই মতবাদ ভুলিয়া গেলেন।[২] আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে ইহাই মনে হয় যে, উত্তর-পশ্চিম ও উড়িষ্যা তৎকালে চিন্তার ক্রম-বিকাশের ক্ষেত্রে বঙ্গ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পশ্চাতে ছিল। তৎকালে এই সব প্রদেশে ধর্ম ও সামাজিক সংস্কারের হুজুগ ছিল। বৃদ্ধেরা সংস্কারকের দলে ছিলেন ; কিন্তু যুবকদের মন কোন প্রকারের সংস্কারদ্বারা আবদ্ধ না থাকায় তাহারা স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়া স্বাধীনতাবাদের বাণী শ্রবণ করে।

১। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : “ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম”, পৃঃ ৬০-৬১।

২। “উড়িষ্যাবাসীদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুবই কম বলিয়া “গভর্ণমেণ্ট উড়িষ্যাবাসী domiciled বাঙালীদের ডেপুটি ও সাব-ডেপুটিগিরি দেন।”—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ৬১।

কিন্তু তাহাদের চিন্তাশক্তির স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা না থাকায় সেই মতবাদ দৃঢ়ীভূত হইতে পারে নাই—তাহা হুজুগে পরিণত হইয়াছিল, এবং যখন প্রধান প্রধান কর্মীরা ডেপুটি-সাবডেপুটি হইল, তখন বালকের দল আর কি করিবে? প্রধান কর্মীদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই বোধ হয় শেষে কর্মক্ষেত্রে ভাঁটা পড়িয়াছিল"।[১]

ইহার পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত উড়িষ্যায় বিপ্লব-প্রচেষ্টা অথবা কোন বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর উড়িষ্যায় দুইটি বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে এবং দুইটি ঘটনাই বাঙলাদেশের বিপ্লবীদের দ্বারা সংঘটিত হয়। প্রথম ঘটনাটি ছিল একটি রাজনীতিক ডাকাতি। বাঙলাদেশের যুগান্তর সমিতির কতিপয় সভ্য একজন স্থানীয় ওড়িয়া-ছাত্রের সাহায্যে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর কটক জেলার এক ধনী জমিদারের বাড়ী ডাকাতি করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে। অপর ঘটনাটি বালেশ্বর জেলার বুড়ীবালাম নদীর তীরে ইংরেজ-বাহিনীর সহিত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সম্মুখ-যুদ্ধ। এই যুদ্ধের স্মৃতি বুকে লইয়া উড়িষ্যা প্রদেশের বালেশ্বর জেলা ও বুড়ীবালাম নদী ভারতের মধ্য-শ্রেণীর বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

বিহার প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা

প্রথম চেষ্টা

বাঙলাদেশের যুগান্তর সমিতির উদ্যোগেই বিহারে প্রথম বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ হয়। এই প্রথম উদ্যোগ সম্পর্কে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার গ্রন্থে নিম্নোক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :

"স্বদেশী আন্দোলনের আগে (অর্থাৎ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের আগে) ইন্দ্রনাথ নন্দী প্রভৃতি আমাদের দলের কতিপয় যুবক ম্যাজিক-লণ্ঠন সঙ্গে লইয়া বিহার প্রদেশে প্রচার করিতে যান। তাঁহারা গ্রামে গ্রামে ম্যাজিক-লণ্ঠনদ্বারা স্বাধীনতাবাদ প্রচার করিতেন। ইঁহাদের সহিত বিহারের একটি পুরাতন ছত্রভঙ্গ বৈপ্লবিক দলের এক পাণ্ডার[২] সহিত আলাপ-পরিচয় হয়। তৎপরে 'ভবানী-মন্দির' স্থাপনা উপলক্ষে আমাদের জনকতকের বিহারে গমনের ফলে আরা, বাঁকিপুর প্রভৃতি স্থানের সহানুভূতিসম্পন্ন উকিল, মাস্টার ও ছাত্রদলের সহিত পরিচয় হয়। ইঁহারা স্বদেশী আন্দোলন করিতেন এবং আমাদের কার্যের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। পরে মন্দিরের জন্য নগরের মাতব্বর

১। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃঃ ৬১-৬২।

২। এই পাণ্ডা হইলেন পাটনার বাবু পুনিত লাল। তৎকালে তিনি S. K. Lahiri কোম্পানির এজেন্ট ছিলেন।

লোকদের নিকট হইতে সহানুভূতি পাওয়া যায়। পশ্চিমে (বিহারে) এই প্রকারে কার্যক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করে। উত্তর-পশ্চিমের বিভিন্ন শহরে আমাদের লোক মাস্টারি করিতে গিয়া এক একটি ছোটখাট কেন্দ্র স্থাপন করেন ও ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনতাবাদ প্রচারের চেষ্টা করেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, বিপ্লববাদ হিন্দি বা হিন্দুস্থানী-ভাষীদের মধ্যে বিশেষভাবে স্ফূর্তিলাভ করে নাই। কারণ জানিনা, হয়ত স্থানীয় লোকদ্বারা প্রচার করান হয় নাই বলিয়া ছাত্রবৃন্দের মধ্যে বিশেষ ফল লাভ হয় নাই, অথবা তৎস্থানীয় ছাত্রবৃন্দের মানসিক চিন্তা তৎকালে বিপ্লববাদ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই।···চাঁইবাসার (সিংভূমে) কোন ঘটনা হইতে এই অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছি যে, কোন কোন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক নিজে ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতা-বাদী হইলেও বাঙালীকে একর্মে বিশ্বাস করিতে রাজি হইতেন না। ইহার কারণ, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলাদেশ ইংরেজকে সাহায্য করিয়াছিল।···সিপাহীদের সহিত কথা বলিলে তাঁহারা বলিতেন, 'আমরা সর্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু ভদ্রশ্রেণীকে অগ্রে আগিতে হইবে ও আমাদের সাহায্য করিতে হইবে!' তাঁহারা বলিতেন, 'আমরা কুমার সিংহের দেশের লোক, আমাদের কাছে একথা নূতন নহে, তবে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের 'মিউটিনি'র মতন আবার অকৃতকার্য যেন না হয়।'·· কথাটা সত্য। বৃথা রক্তপাত এবং নৃশংস হত্যা ও জুলুমের ফলে উত্তর-পশ্চিমের জনসাধারণ ভয়ে দমিয়া গিয়াছে।

"উত্তর-পশ্চিমে (বিহারে) আমরা যে প্রকার কৃতকার্য হই নাই, ছোটনাগপুরে তৎবিপরীত হইয়াছিল। রাঁচি ও চাঁইবাসার বাঙালী ও বিহারী ছাত্রদের মধ্যে অনেককেই পাওয়া যায়। রাঁচি আমাদের বড় একটি কেন্দ্র হইয়াছিল।[১] রাঁচিতে একটি হিন্দুস্থানী পল্টনের এক অংশ আমাদের দলের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করে। ছোটনাগপুর-বিদ্রোহের নায়ক বীরশা ভগবান-এর[২] দলের তৎকালীন নেতা জোহান সর্দারের সন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু সাক্ষাৎ লাভ করিতে কৃতকার্য হই নাই।···সন্ধান করিয়া শুনিয়াছিলাম যে, নেতা জোহান সর্দার জঙ্গলের মধ্যে থাকেন। তাঁহার সহিত আলাপ করা সম্ভব নয়। এই প্রকারে কোলদের মধ্যে কার্য করা সম্ভব হয় নাই বটে, তবু দরকার হইলে কোলদের ক্ষেপাইবার আশা রাখিতাম।

"হিন্দুস্থানী-ভাষীদের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে কলিকাতায় জনকতক বিহারী ছাত্রের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। ইহারা উৎসাহিত হইয়া হিন্দী ভাষায় 'যুগান্তর'-এর একটি সংস্করণ বাহির করিবার পরামর্শ আমাদের সহিত করিয়াছিলেন এবং টাকাও উঠাইয়াছিলেন। এই জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে মনে পড়ে না কি কারণে এই উদ্যোগ কার্যে পরিণত হয় নাই। হয়ত পুলিসের হাঙ্গামার জন্যই এই চেষ্টা স্থগিত হয়।"[৩]

১। যুগান্তর সমিতির অন্যতম প্রধান কর্মী গণেশচন্দ্র ঘোষের চেষ্টায় রাঁচি কেন্দ্রটি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

২। কোল উপজাতির স্বাধীনতা লাভের জন্য বীরশার নেতৃত্বে মুণ্ডা বিদ্রোহের ইতিহাস এই গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়ের ৯৪-১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৩। 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম', পৃঃ ৬১-৬৫।

বিহার-প্রবাসী বাঙালীদের প্রচেষ্টা

বিহার প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা প্রথমত ও প্রধানত বাঙালীদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেই বিপ্লব-প্রচেষ্টায় বিহার-প্রবাসী বাঙালীদের দানই সর্বাগ্রগণ্য। বাঙলার বিপ্লব-প্রচেষ্টার দুই প্রধান নায়ক অরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমার বিহারের দেওঘরেই বাল্যজীবন যাপন করেন এবং সেখানে তাঁহাদের পিতামহ রাজনারায়ণ বসুর নিকট হইতে সর্বপ্রথম রাজনীতিক শিক্ষা ও ঐতিহ্য গ্রহণ করেন। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন বাঙলাদেশে রাজনীতিক চিন্তাধারার প্রথম প্রবর্তকদের অন্যতম। তিনি দেওঘরে কর্মজীবন অতিবাহিত করিয়া সেইখানেই বসবাস করিতেন। অরবিন্দ ও বারীন্দ্র সেই রাজনীতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। দেওঘরে শিক্ষাকালেই বারীন্দ্র-কুমার দেওঘরে 'গোল্ডেন লীগ' নামক একটি রাজনীতিক সংগঠনের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় এই সংগঠন বিহারে 'স্বদেশী আন্দোলন' প্রথম আরম্ভ করে।

'আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা'র সাক্ষ্য-প্রমাণাদি হইতে দেখা যায় যে, এই প্রথম বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার আরও কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মী বিহারের প্রবাসী বাঙালী-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। এই বিপ্লবীরা দেওঘরে 'শীল লজ' নামে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে বোমা তৈরি ও বোমা মজুত করিবার জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বাড়িতে রক্ষিত একটি বোমা 'আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা'র বহু পরে, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে পুলিসের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়।

বিহারের মজঃফরপুরে বোমা-বিস্ফোরণও বাঙলাদেশের বিপ্লবীদেরই কীর্তি। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী কর্তৃক মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষেপের ফলে সেই সময় সমগ্র ভারতের যুবকদের মনে বৈপ্লবিক চাঞ্চল্য জাগিয়াছিল।

মোহান্ত হত্যা

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ পশ্চিম-ভারতের কয়েকজন বিপ্লবী বিহারের 'নিমেজ' নামক স্থানের একটি মন্দিরে ডাকাতি করিতে গিয়া ভুলবশত মন্দিরের মোহান্তকে হত্যা করে। প্রায় এক বৎসর পরে পুলিস এই বিপ্লবীদের সন্ধান পায়।

এই হত্যা-মামলার সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, বোম্বাই প্রদেশের শোলাপুর জেলার মতিচাঁদ ও মাণিকচাঁদ নামে দুই জন ছাত্র প্রথমে কোন বিপ্লবীর নিকট হইতে বৈপ্লবিক প্রেরণা লাভ করে। পরে তাহারা নিজেদের চেষ্টায় 'ম্যাৎসিনির জীবনী', 'তিলকের প্রথম আট বৎসর' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং 'কাল', 'ভোলা', 'কেশরী, প্রভৃতি সংবাদপত্রের বৈপ্লবিক প্রচারে অনুপ্রাণিত হয়। এই সময় জয়পুর দেশীয় রাজ্যে অর্জুনলাল শেঠি নামক একটি লোক একটি বিদ্যালয় চালাইতেছিলেন। মতিচাঁদ ও মাণিকচাঁদ এই বিদ্যালয়ে যোগদান করে। এই বিদ্যালয়ে অর্জুনলাল ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন, আর বিষণ দত্ত নামক এক ব্যক্তি রাজনীতি শিখাইতেন। বিষণ দত্ত তাঁহার বক্তৃতায় ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য ডাকাতি, গুপ্তহত্যা প্রভৃতি বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তিনি

দেশের দুরবস্থার জন্য ইংরেজদের দায়ী করিয়া তাহাদের এদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার প্রচেষ্টা আরম্ভ করিতে বলিতেন। এই উপলক্ষে তিনি বাঙলার বিপ্লবী ক্ষুদিরাম, কানাইলাল প্রভৃতির কাহিনী বলিতেন।

কিছুদিন পরে বিষণ দত্ত ছাত্রদের মধ্য হইতে মতিচাঁদ, মাণিকচাঁদ ও জয়চাঁদ নামক তিনটি ছাত্রকে বাছিয়া লন এবং তাহাদের কাজ আরম্ভ করিতে বলেন। তিনি একটি ডাকাতির পরিকল্পনা করিয়া উক্ত তিনজনকে লইয়া বিহারে উপস্থিত হন। পথে জোরাভর সিং নামক এক ব্যক্তি তাঁহাদের সহিত যোগদান করে। বিহারে উপস্থিত হইয়া বিষণ দত্ত তাহাদের ডাকাতির স্থান বলিয়া দিয়া ঐ উদ্দেশ্যে তাহাদের চারিজনকে সেই স্থানে প্রেরণ করেন।

মতিচাঁদ, মাণিকচাঁদ প্রভৃতি চারিজন ছাত্র রাত্রিকালে নিমেজ-এর মন্দিরে উপস্থিত হইয় মোহান্তকে সিন্দুকের চাবি বাহির করিয়া দিতে বলে। ইহাতে মোহান্তের সহিত বিপ্লবীদের তুমুল বচসা হয়, মোহান্তও তাহাদের পুলিসে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করে। এই অবস্থায় মোহান্ত ও তাহার ভৃত্য এই বিপ্লবীদের হস্তে নিহত হন।

প্রায় এক বৎসর পর সিউ নারায়ণ নামে ঐ স্কুলের অপন একজন ছাত্র বৈপ্লবিক কাগজপত্রসহ গ্রেপ্তার হইয়া পুলিসের নিকট এই হত্যার বিবরণটি প্রকাশ করিয়া দেয়। পুলিস বহু অনুসন্ধান করিয়া মতিচাঁদ, মাণিকচাঁদ ও বিষণ দত্তকে গ্রেপ্তার করে। ইহাদের লইয়া হত্যার অভিযোগে মামলা আরম্ভ হয়। মামলার বিচারে মতিচাঁদের ফাঁসি হয় এবং বিষণ দত্ত দশ বৎসরের দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হন।

বেনারস-সমিতির প্রচেষ্টা

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে 'বেনারস-সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যালের উদ্যোগে বিহারে বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়। শচীন্দ্রনাথ স্বয়ং বহু চেষ্টা করিয়া বিহারের তৎকালীন রাজধানী বাঁকিপুর শহরে 'বেনারস-সমিতি'র একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। বাঁকিপুর কলেজের কয়েকজন ছাত্র এই শাখা-সমিতির সভ্য হইয়াছিল। পরে 'বেনারস-সমিতি'র অপর একজন সভ্য বঙ্কিমচন্দ্র মিত্রের উপর বাঁকিপুরের শাখা-সমিতির পরিচালনার ভার পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র তখন ছিলেন 'বিহার ন্যাশনাল কলেজ'-এর ছাত্র। কলেজে পড়িবার সময় তিনি রঘুবীর সিং নামক একজন বিহারী ছাত্রকে বৈপ্লবিক সমিতির সভ্য করেন। রঘুবীর সিং ক্রমশ বঙ্কিমের প্রধান সহকারীর পদ লাভ করে। 'বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলা'র বিচারকালে বঙ্কিমচন্দ্রের জনৈক সহপাঠী ছাত্র তাহার সাক্ষ্যে বঙ্কিমের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছিল:

"বঙ্কিমচন্দ্র অধ্যয়নের জন্য 'বিহার ন্যাশনাল কলেজ'-এ প্রবেশ করে এবং কলেজের কয়েকজন ছাত্র লইয়া বঙ্কিম একটি সমিতি স্থাপন করে। সমিতির বৈঠকে সে বিবেকানন্দের রচনাবলী ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইত। আমি (সাক্ষী) নিজেও একজন শিক্ষক ছিলাম। সমিতিতে প্রবেশ করিবার সময় কোন বাহিরের লোকের নিকট সমিতির গোপন কথা প্রকাশ না করিবার জন্য প্রত্যেক সভ্যকে ভগবান ও পুরোহিতের নামে শপথ গ্রহণ করান হইত। এদেশ হইতে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদের জন্য বঙ্কিম আমাদের উদ্বুদ্ধ

করিয়া তুলিত। সে আমাদের এমনভাবে প্রস্তুত হইতে বলিত যাহাতে আমরা বৃটিশকে এদেশ হইতে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হই।"[১]

কিছুদিন পর রঘুবীর সিং এলাহাবাদে চলিয়া যায় এবং সেখানে একটি পদাতিক সৈন্যবাহিনীর অফিসে কেরানীর চাকরি গ্রহণ করে। চাকরি করিবার সময়ই একবার রাজদ্রোহমূলক ইস্তাহার বিলি করিতে যাইয়া রঘুবীর পুলিসের হস্তে গ্রেপ্তার হয় এবং তুই বৎসরের কারাদণ্ড লাভ করে। ইহার পর 'বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলা'র সময় গ্রেপ্তার হইয়া বঙ্কিম দশ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

ঢাকার অনুশীলন সমিতির প্রচেষ্টা

'বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলা'র পর ঢাকার অনুশীলন সমিতি সরাসরি বিহারে সংগঠন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আরম্ভ করে। এই উদ্দেশ্যে ঢাকা হইতে কয়েকজন সভ্যকে একের পর এক বিহারে পাঠান হয়। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে রেবতী নাগ ব্যতীত অপর কাহারও চেষ্টা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে।

রেবতী ছিলেন একজন পলাতক বিপ্লবী। বাঙলাদেশে কয়েকটি বৈপ্লবিক ঘটনা সম্পর্কে পুলিস তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রেবতী ভাগলপুরকে কেন্দ্র করিয়া একটি বৈপ্লবিক সমিতি গঠনের চেষ্টা আরম্ভ করেন। তিনি ভাগলপুর-কলেজের ও ভাগলপুরের 'বাররী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়'-এর কয়েকটি ছাত্রের সহিত পরিচয় করিয়া তাহাদের সহিত রাজনীতিক আলোচনা চালাইতে থাকেন। রেবতী তাহাদের সামনে বাঙলার বিপ্লবীদের সাহসিকতাপূর্ণ কার্যকলাপের দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়া তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেন এবং ইংরেজ শাসকদের শোষণ ও উৎপীড়নের নগ্ন চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাদের মনে ক্রোধের আগুন জ্বালাইয়া দিতেন।

এইভাবে রেবতী কয়েকটি ছাত্র সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন এবং তাহাদের লইয়া একটি সমিতি স্থাপন করেন। ক্রমশ অন্যান্য শহরেও সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। যাহাতে বাঙলাদেশের বিপ্লবীরা প্রয়োজন হইলে পলাইয়া আসিয়া ভাগলপুরে আশ্রয় লইতে পারেন তাহার জন্য রেবতী একটি গোপন আশ্রয়স্থলও সংগ্রহ করেন। এই সময় অর্থাৎ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে রেবতীর সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বাঙলাদেশ হইতে একজন গোয়েন্দা-অফিসার ভাগলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলে রেবতী গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য পলায়ন করেন। ইহার কিছুদিন পর পুলিসের সহিত সহযোগিতার সন্দেহে রেবতী বিপ্লবীদের দ্বারা নিহত হন। রেবতীর পলায়নের কিছুদিন পরে ভাগলপুর-সমিতির সকল সভ্য পুলিসের হস্তে গ্রেপ্তার হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইহাদের বিচার হয়। বিচারে ইহাদের কয়েকজনকে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, আর কয়েকজনকে কিছুকাল নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। এইভাবে এই সময় বিহার প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টার অবসান ঘটে। এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টা কঠোর হস্তে দমনের উদ্দেশ্যে ভারত-সরকার কুখ্যাত 'রাউলাট কমিটি' বা 'সিডিসন কমিটি' গঠন করে।

[১] 'Sedition Committee Report,' p. 168.

নবম অধ্যায়

বঙ্গদেশের গণ-সংগ্রাম (১৯০৫-০৮)

বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িকতা

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ অর্থাৎ বঙ্গদেশকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া দুইটি প্রদেশে পরিণত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে সমগ্র বাঙলাদেশব্যাপী, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে এক প্রচণ্ড আন্দোলন দেখা দেয়। এই আন্দোলনই ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করিয়া ভারতের যুগান্তকারী 'স্বদেশী আন্দোলন'-এ পরিণত হয়।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বিহার এবং উড়িষ্যাও বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সময় এই সংযুক্ত বিশাল বাঙলার মোট লোকসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৮০ লক্ষ এবং ইহার মধ্যে বাঙালীদের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ১০ লক্ষ। মোটামুটি হিসাবে বাঙালীদের অর্ধেক ছিল মুসলমান আর বাকি অর্ধেক হিন্দু। হিন্দুদের প্রধান বাসস্থান পশ্চিমবঙ্গে, আর মুসলমানদের প্রধান বাসস্থান পূর্ববঙ্গে। বিহার এবং উড়িষ্যার অধিবাসীরাও প্রধানত হিন্দু।

প্রদেশ হিসাবে সংযুক্ত বঙ্গদেশের "আয়তন অতি বিশাল"—এই অজুহাতে বঙ্গদেশকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় এবং উত্তরবঙ্গসহ পূর্ববঙ্গের সহিত আসামকে সংযুক্ত করিয়া একটি এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার-উড়িষ্যা লইয়া আর একটি প্রদেশ গঠন করা হয়। প্রথমোক্ত প্রদেশটির রাজধানী হয় ঢাকা, আর অন্য প্রদেশটির রাজধানী কলিকাতাই থাকে। প্রথমোক্ত প্রদেশটির (পূর্ববঙ্গ ও আসামের) মোট লোকসংখ্যা হয় ৩ কোটি ১০ লক্ষ এবং ইহার দুই-তৃতীয়াংশ ছিল মুসলমান। সুতরাং প্রথমোক্ত প্রদেশটিকে একটি মুসলমান-প্রধান প্রদেশ রূপে গড়িয়া তোলা হয়।

তিনটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই শাসকগোষ্ঠী এইভাবে বাঙলাদেশকে দুই ভাগে ভাগ করে। প্রথমত, কর্নওয়ালিশের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর ত্রুটি সংশোধন: 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এ জমির খাজনা চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। সুতরাং পরে আর জমির খাজনা বৃদ্ধির কোন উপায় ছিল না। বঙ্গদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার ফলে আসামসহ নূতন পূর্ববঙ্গ প্রদেশে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর অবসান ঘটে। সুতরাং শাসকগোষ্ঠী এবার পূর্ববঙ্গ ও আসামের জমির খাজনা ইচ্ছামত বৃদ্ধি করিবার সুযোগ লাভ করে। দ্বিতীয়ত, কৃষক-আন্দোলন ধ্বংসের পরিকল্পনা: বঙ্গদেশের কৃষকদের নিকট হইতেই বৃটিশ শাসন সর্বাধিক বাধা পাইতেছিল এবং বঙ্গদেশের ক্রমবর্ধমান কৃষক-আন্দোলন বৃটিশ শাসনের সম্মুখে এক ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং বঙ্গদেশকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া, অর্থাৎ বঙ্গদেশের কৃষককে দুই টুকরা করিয়া শাসকগোষ্ঠী বঙ্গদেশের কৃষক-সংগ্রামকে ধ্বংস করিবার পরিকল্পনা করে। তৃতীয়ত, সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি: ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের

মহাবিদ্রোহ এবং ওয়াহাবী বিদ্রোহের পর বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী Divide and Rule এই রোমান নীতিকেই প্রধান অবলম্বন করিয়া লইয়াছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের পশ্চাতে বঙ্গদেশে সাম্প্রদায়িকতা, অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের বীজ বপন করা ছিল শাসকগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। তাহারা মুসলমান ভূস্বামিগোষ্ঠীকে এবং নবজাত অল্প সংখ্যক মুসলমান বুর্জোয়াদের বুঝাইল যে, নূতন পূর্ববঙ্গ প্রদেশটিই হইবে মুসলমানদের নিজস্ব প্রদেশ, এখানে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য বশত তাহারা হিন্দু ভূস্বামী ও হিন্দু বুর্জোয়াদের প্রতিযোগিতার বাধা এড়াইতে সক্ষম হইবে। শাসকগোষ্ঠী তাহাদিগকে আরও বুঝাইল যে. হিন্দু ভূস্বামিগোষ্ঠী এবং হিন্দু বুর্জোয়ারাই তাহাদের বিকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায়।

শাসকগোষ্ঠীর পরামর্শে ঢাকার নবাবের নেতৃত্বে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা বৃটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে।[১] কৃষক-বিদ্রোহের ভয়ে ভীত হইয়া শাসকগোষ্ঠী একসময় (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) নিজেদের উদ্যোগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, আজ আবার বঙ্গদেশের ক্রমবর্ধমান কৃষক-বিদ্রোহে বাধাদানের উদ্দেশ্যেই শাসকগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি ও মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা করিল। এইভাবে বঙ্গভঙ্গের দ্বারা বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বীজ বপন করা হইল। বঙ্গভঙ্গের ফলে কেবল বঙ্গদেশই বিভক্ত হইল না, বাঙলার কৃষক জনসাধারণও হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। এই সময় হিন্দুদের ধর্মীয় স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সাম্প্রদায়িকতার শিকড় সমাজের গভীরে প্রবেশ করিয়া সাম্প্রদায়িকতাকে চিরস্থায়ী করিয়া তুলিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হইলেও সাম্প্রদায়িকতার অবসান হইল না, বরং তাহা শাসকগোষ্ঠী ও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াশীল ভূস্বামীদের সমবেত চেষ্টায় ক্রমশ বাড়িয়াই চলে।

বঙ্গদেশে সাম্প্রদায়িকতার মূল ইতিহাসের গর্ভে নিহিত। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ সেই বীজ হইতে মহীরুহের সৃষ্টি করিয়াছে। বৃটিশ শাসনের আরম্ভকাল হইতে একশত বৎসর পর্যন্ত মুসলমানগণ প্রাণপণে বৃটিশ-শাসনের বিরোধিতা এবং হিন্দুরা বৃটিশ শাসনের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিয়াছিল। সুতরাং ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর মারফত হিন্দুরাই প্রায় সকল জমিদারি হস্তগত করিয়াছিল। বাঙলাদেশের জনসাধারণের অর্থাৎ কৃষকের দুই-তৃতীয়াংশই মুসলমান। সুতরাং জমিদারগোষ্ঠী হইল হিন্দু, আর মুসলমান চাষীরা তাহাদের অবাধ শোষণ-উৎপীড়নের শিকার হইয়া রহিয়াছে। বৃটিশ শাসনের প্রথম হইতেই শোষক হিন্দু-জমিদারগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মুসলমান চাষীকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চালনা করিয়াই জীবনধারণ করিতে হইয়াছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল রূপে শোষক হিন্দু-জমিদারগোষ্ঠীকে মুসলমান চাষীরা চিরকাল শত্রু রূপেই ভাবিয়া আসিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে

১। The Times, 2nd January, 1906. J. R. MacDonald: The Awakening of India, p, 283-84.

যে কৃষক-বিদ্রোহের ঝড় বহিয়াছে, তাহাকে বিপথগামী করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু-জমিদারগোষ্ঠী এবং মুসলমান মোল্লা মৌলভীরা অবাধে সাম্প্রদায়িকতার প্রচার করিয়া আসিয়াছে। তাহার ফলেও হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ক্রমশ উগ্র হইতে উগ্রতর হইয়াছে। প্রত্যেকটি কৃষক-বিদ্রোহকে একদিকে হিন্দু জমিদার ও তালুকদারগোষ্ঠী হিন্দুদের সহিত মুসলমানদের বিরোধ ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আক্রমণ বলিয়া এবং অন্যদিকে মোল্লা-মৌলভীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের আক্রমণ বলিয়া প্রচার করে। তাহার ফলে বঙ্গদেশ সাম্প্রদায়িকতার উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহার উপর ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ এই সাম্প্রদায়িকতাকে শত সহস্র গুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

বঙ্গভঙ্গের সময় পূর্ববঙ্গের নূতন প্রদেশের মুসলমান কৃষকদের বিভ্রান্ত করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে শাসকগোষ্ঠী এবং মুসলমান ভূস্বামী ও মোল্লা-মৌলভীরা প্রচার চালাইত যে, এই নূতন প্রদেশটি মুসলমানদের নিজস্ব প্রদেশ, এখানে মুসলমান চাষী হিন্দু জমিদার-তালুকদারদের শোষণ-উৎপীড়ণ হইতে মুক্তি লাভ করিবে; সুতরাং এই নূতন প্রদেশের সৃষ্টি তাহাদের মঙ্গলের জন্যই। এই সকল প্রচারে বিভ্রান্ত হইয়া বঙ্গদেশের, বিশেষত পূর্ববঙ্গের মুসলমান চাষীরা বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী 'স্বদেশী আন্দোলন' হইতে দূরে থাকিয়া পূর্ববঙ্গ প্রদেশের পক্ষে দণ্ডায়মান হয়। হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে, হিন্দু-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিরোধিতা প্রবল আকারে দেখা দেয়। এই পটভূমিকায় আরম্ভ হয় বঙ্গদেশের 'স্বদেশী আন্দোলন'।

বঙ্গভঙ্গ ও 'স্বদেশী আন্দোলন'

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে বঙ্গদেশব্যাপী 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর ঝড় বহিতে থাকে। বঙ্গদেশের নবজাত বুর্জোয়াশ্রেণী, বিক্ষুব্ধ হিন্দু জমিদার-তালুকদার-গোষ্ঠী আর তাহাদের মুখপাত্র রূপে শিক্ষিত শহুরে মধ্যশ্রেণী এই 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করে। ইহার পূর্ব হইতে শাসকগোষ্ঠী জমিদারদের নিকট হইতে নানাভাবে অধিক কর আদায়ের জন্য চাপ দিতেছিল। সুতরাং তাহাদের মধ্যেও বৃটিশ-বিরোধিতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষত বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষেই শিল্পের বিকাশের জন্য উন্মুখ নবজাত বুর্জোয়াশ্রেণী ও বিক্ষুব্ধ জমিদারগোষ্ঠীর স্বার্থ এক হইয়া দাঁড়ায়। তাহাদেরই মুখপাত্র রূপে শিক্ষিত শহুরে মধ্যশ্রেণী বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে 'স্বদেশী আন্দোলন' আরম্ভ করে। এই মধ্যশ্রেণীই তাহাদের সংগ্রামমুখিতার জন্য 'চরমপন্থী' বলিয়া পরিচিত হয়। 'চরমপন্থী'দের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চবিংশ অধিবেশন হইতে বৃটিশ পণ্যবর্জন 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর প্রধান কর্মপন্থা বলিয়া ঘোষিত হয়। এই 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর মধ্য দিয়াই—

"ভূস্বামিগোষ্ঠী, বুর্জোয়াশ্রেণী, ব্যবসায়িগোষ্ঠী, উকিল-ব্যারিস্টার এবং বুর্জোয়াপন্থী বুদ্ধিজীবিগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হইয়া একচেটিয়া বৃটিশ মূলধনের বিরুদ্ধে 'বৃটিশ পণ্যবর্জনরূপ' আর্থনীতিক অস্ত্র প্রয়োগ করে।"[১]

১। Joan Beauchamp; British Imperialism in India, p. 164.

হিন্দু বুর্জোয়াশ্রেণী ও হিন্দু ভূস্বামী-তালুকদারগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরূপে এই 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর পরিচালনা-ভার গ্রহণ করে বুর্জোয়াপন্থী শিক্ষিত শহুরে মধ্যশ্রেণী। বিভিন্ন কারণে ইহারা পূর্বেই ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী সভ্যতা-সংস্কৃতির উপর বীতশ্রদ্ধ ও ক্ষিপ্ত হইয়া প্রাচীন সনাতন হিন্দু ধর্মকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। তাহারা 'চরমপন্থী'রূপে 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিয়া এই আন্দোলনের সহিত সেই সনাতন হিন্দুধর্মের মিশ্রণ করে এবং ইহাকে "হিন্দু স্বদেশী আন্দোলন" রূপে গড়িয়া তোলে। এই 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর মধ্যে এইভাবে কালী-দুর্গা প্রভৃতি হিন্দুদের দেবতা, জাতিভেদ, গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণের বিরোধিতা, বাল্যবিবাহের সমর্থন প্রভৃতি সনাতন হিন্দুধর্মের যাবতীয় কুসংস্কার এবং সর্বপ্রকারের প্রতিক্রিয়াশীলতা আসর জমাইয়া ফেলে। 'চরমপন্থী' জাতীয় আন্দোলনের সহিত প্রাচীন কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীলতায় সমন্বয় সাধিত হয়, বাঙলা তথা ভারতের নূতন জাতীয়তাবাদ প্রাচীন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনমূলক "হিন্দু জাতীয়তাবাদ" রূপে দেখা দেয়।[১]

গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই হিন্দু জাতীয়তাবাদ এক চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করে। ইহার প্রতিক্রয়াশীল প্রভাবে নবজাগ্রত জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। বাঙলা তথা ভারতবর্ষের বিপুল সংখ্যক মুসলমান জনসাধারণ এই জাতীয় আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া যায়, কৃষক-সম্প্রদায়ও হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবার ফলে কৃষক-আন্দোলনেও চরম বিপর্যয় দেখা দেয়। কৃষক-আন্দোলনের এই বিপর্যয় জাতীয় সংগ্রামের অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত করে।

অন্যান্য প্রদেশের মত বঙ্গদেশেও নূতন 'স্বদেশী আন্দোলন' বা জাতীয় আন্দোলনের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করে 'চরমপন্থী' বলিয়া অভিহিত শিক্ষিত শহুরে মধ্যশ্রেণী। তাহাদের সহিত কৃষির সাক্ষাৎ সম্পর্ক না থাকিলেও তাহারা ছিল বুর্জোয়া-ভূস্বামিগোষ্ঠীরই প্রতিনিধি এবং শ্রেণীস্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন। তাই তাহারা 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর মধ্যে কৃষক সাধারণকে টানিবার চেষ্টাও করে নাই। বোম্বাই ও পাঞ্জাবে চরমপন্থী নায়কগণ 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর শক্তিবৃদ্ধির জন্য ইহার সহিত শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন, শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণের মধ্যে 'বৃটিশ পণ্যবর্জন আন্দোলন' বিস্তৃত করিয়া ইহাকে সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বাল গঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রের করবন্ধ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবে লালা লাজপৎ রায় ও অজিত সিং দোয়াব অঞ্চলে কৃষক-আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়া উহাকে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে উন্নীত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলন সম্পূর্ণ বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত যুক্ত হইয়াছিল।

১। একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা: ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিং জেলার জামালপুরে হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকের বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রধান নায়ক অরবিন্দ ঘোষ হিন্দুদের রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একদল যুবকের সহিত তিনটি বোমা পাঠাইয়াছিলেন। এই বোমা তিনটির নাম রাখা হইয়াছিল "কালী মায়ের বোমা"—ভূপেন দত্ত: ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতাস ংগ্রাম. পৃষ্ঠা ২০৫।

কিন্তু বঙ্গদেশে জাতীয় আন্দোলনের 'চরমপন্থী' নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থ দ্বারা চালিত হইয়াছিলেন বলিয়াই প্রথম হইতে কৃষক-আন্দোলনকে এড়াইয়া গিয়া 'স্বদেশী আন্দোলন' অর্থাৎ 'বৃটিশ পণ্য বর্জন'-আন্দোলনকে কেবল মধ্যশ্রেণীর, বিশেষত শহুরে মধ্যশ্রেণীর গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থ ও অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা চালিত হইয়া এমন কি জমিদার-মহাজনবিরোধী কৃষক-বিদ্রোহকেও হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের আক্রমণ বলিয়া প্রচার করিতে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিতেও ইতস্তত করেন নাই। ময়মনসিং জেলার জামালপুরে হিন্দু জমিদার-মহাজনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকদের বিদ্রোহকে (১৯০৭) তাহারা হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আক্রমণ রূপে প্রচার করিয়া সেই বিদ্রোহকে বোমা-রিভলভার দ্বারা রক্তবন্যায় ডুবাইয়া দিতে ছুটিয়াছিলেন।

মুসলমান জনসাধারণের—কৃষকের মধ্যে মুসলমান ভূস্বামী-মোল্লা-মৌলভীদের এবং শাসকগোষ্ঠীর হিন্দু-বিরোধী প্রচার সত্ত্বেও 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ যদি বঙ্গভঙ্গের পশ্চাতে নিহিত বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিতেন, বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বাণী ও স্বাধীনতার কথা, জমিদার-মহাজনগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা প্রচার করিতেন, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় ও অজিত সিংয়ের ন্যায় কৃষক-আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হইতেন, বঙ্গভঙ্গের মত এরূপ এক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সহিত কৃষকের সংগ্রাম-শক্তিকে যুক্ত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে মুসলমান কৃষককে সাম্প্রদায়িকতার কবল হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে বঙ্গদেশের 'স্বদেশী আন্দোলন' বা জাতীয় সংগ্রাম ভিন্নরূপ ধারণ করিত। কিন্তু এই বৈপ্লবিক পন্থা গ্রহণের পরিবর্তে 'চরমপন্থী'রা হিন্দু জমিদার-তালুকদারগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরূপে কৃষক-বিরোধিতার পন্থাই গ্রহণ করিলেন, মুসলমান ভূস্বামী-মোল্লা-মৌলভীদের আর বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর মতই সাম্প্রদায়িকতার বাহন হইয়া দাঁড়াইলেন।

জামালপুর কৃষক-বিদ্রোহ ও মধ্যশ্রেণীর বিপ্লববাদ

ঐক্যবদ্ধ জমিদার-মহাজন ও পুলিসের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ময়মনসিং জেলার জামালপুর মহকুমার কৃষকদের এই অভ্যুত্থানটি ঘটিয়াছিল ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে। জামালপুরের একটি গরুর 'মেলা' বা গরুর বাজারে প্রতি গরুর উপর ধার্য বিক্রয়করের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্বন্ধে মেলার কর্তৃপক্ষের সহিত গরু-বিক্রেতা ও ক্রেতা মুসলমান কৃষকদের বিরোধ হইতেই এই ঐতিহাসিক কৃষক-অভ্যুত্থানটি আরম্ভ হয়। ময়মনসিং জেলার 'গেজেটিয়ার'-এ এই মেলার নিম্নোক্ত ইতিহাসটি লিপিবদ্ধ আছে :

"১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় জমিদার, উকিল প্রভৃতিদের সহযোগিতায় জামালপুর মহকুমার তৎকালের ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক 'মেলা'টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 'মেলা' পরিচালনার জন্য মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটকে সভাপতি করিয়া এবং ১৪ জন সভ্য লইয়া

একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে জমিদার ও উকিলদের প্রতিনিধি লওয়া হয় ৮ জন, আর বাকি ৬ জন থাকে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। মেলাটি বেশ একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতি বিক্রাত গরুর উপর ১০ আনা আদায় করিয়া মোট লাভ হইয়াছিল ৯৩৪৫ টাকা। মেলাটি প্রকৃতপক্ষে একটি গরুর বাজার।"[১]

জামালপুরের কৃষকগণ প্রধানত মুসলমান। এই মেলাটি ক্রমশ কৃষকদের পক্ষে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গরুর বাজার হইয়া উঠে। এই মেলা হইতেই তাহারা প্রতি বৎসর চাষের বলদ সংগ্রহ করে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে যথারীতি মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটকে সভাপতি এবং জমিদার, মহাজন, সরকারী কর্মচারীদের ১৪ জনকে লইয়া মেলা-কমিটি গঠিত হয়। বলা বাহুল্য, সভাপতি এবং সভ্যদের সকলেই ছিলেন হিন্দু। এই সময় মেলাটি বসিত গৌরীপুর জমিদারির কাছারি বাড়ীর নিকটে।

প্রথমে নিয়ম ছিল, যে গরু বিক্রয় করা হইবে তাহার উপর এক আনা কর আদায় করা হইবে। ক্রমশ এই করের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বিক্রয়-কর দিলেই গরু-বিক্রেতা কৃষকের অব্যাহতি মিলিত না। গরু বিক্রয়ের টাকা হইতে তাহার জমিদার কিছু সেলামী এবং মহাজন ঋণের সুদ ও কিস্তি আদায় করিয়া লইত। কোন কৃষক ইহার প্রতিবাদ করিলে বা টাকা দিতে অস্বীকার করিলে তাহার জন্য বিপুল সংখ্যক পুলিস ও জমিদারদের গুণ্ডার ব্যবস্থা থাকিত। গরুর বিক্রয়-কর ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পরিমাণ হয় গরু প্রতি ১৪ আনা।

কৃষকদিগকে এতকাল শত প্রকারের উৎপীড়ন মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হইয়াছে। কেবল গরুর মেলার অত্যাচারই নয়, তাহাদিগকে আরও যেসকল অত্যাচার মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হইয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'ময়মনসিং জেলা গেজেটিয়ার'-এ লিপিবদ্ধ আছে ঃ

তাহাদের সহ্য করিতে হইত "কেবল ভীষণ প্রহারই নয়, জুতা দ্বারা প্রহার, কেবল উপবাস নয়, বলপূর্বক আটকের অপমান। তাহারা কাছারিতে খাজনা দিতে গেলে অনেক সময় একখানি বসিবার টুলও দেওয়া হইত না। এই সকল অত্যাচার-অপমানের ভয়েই তাহারা মাথা নত করিতে বাধ্য হইত।......তাহাদিগকে বাধ্য করা হইত কবুলিয়ত লিখিয়া দিতে। এই সকলের পিছনে জমিদার ও নায়েবদের হাত এরূপভাবে কাজ করিত যে, তাহা সকল সময় আইনের ধরাছোঁয়ার বাহিরেই থাকিত।" "১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের 'স্বদেশী আন্দোলন' হিন্দুদের (হিন্দু জমিদারদের—লেঃ) সম্বন্ধে পুরাতন দিনের ভীতি হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়াছিল।"[২]

১৯০৫-০৭ খ্রীষ্টাব্দের 'স্বদেশী আন্দোলন' কৃষকদিগকে জামালপুরের গরুর মেলার উৎপীড়নের পুরানো ভয় হইতেও মুক্তি দেয়, তাহারা মেলায় জমিদার-মহাজন ও পুলিসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার সাহস খুঁজিয়া পায়। গরুর

১। Mymensing District Gazetteer, p. 41.

২। Mymensing District Gazetteer, p. 42.

মেলায় আগত সকল কৃষক বর্ধিত করের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া কর দিতে অস্বীকার করে। পুলিস ও জমিদারদের গুণ্ডাদল কৃষকদের গরু আটক করিলে তাহাদের সহিত কৃষকদের সংঘর্ষ হয় এবং মেলা এই দিনের মত ভাঙিয়া যায়। জমিদার-মহাজনগোষ্ঠী এই ঘটনাটিকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আক্রমণ বলিয়া চারিদিকে প্রচার করিয়া দেয়। মেলায় কৃষকদের বাধা চূর্ণ করিবার জন্য বহু সংখ্যক পুলিস ও জমিদারী গুণ্ডা মেলার চারদিক ঘিরিয়া রাখে এবং কৃষকদের উপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। পরদিন আবার মেলা বসে।

এদিকে হিন্দু জনসাধারণের উপর, এমনকি হিন্দুনারী ও শিশুদের উপর আক্রমণের কথাও চারিদিকে প্রচারিত হয়। এই মিথ্যা কথা প্রচারিত হইলে ময়মনসিং জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী দলের, বিশেষত 'যুগান্তর' দলের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা 'স্বেচ্ছাসেবক' সাজিয়া হিন্দু জনসাধারণকে রক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বহু সংখ্যায় মেলায় উপস্থিত হন। তাঁহারা মেলার মধ্য দিয়া সামরিক কায়দায় 'মার্চ' করিয়া যান। তাঁহাদের উপস্থিতি ও কুচ্‌কাওয়াজ কৃষকদের মধ্যে তীব্র ক্রোধের সঞ্চার করে। কৃষকগণ "স্বেচ্ছাসেবক"দের বাধা দিলে প্রচণ্ড সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। কৃষকদের হস্তে প্রহারের ভয়ে মেলার কর্তৃপক্ষ ও "হিন্দু স্বেচ্ছাসেবকগণ" দৌড়িয়া গিয়া নিকটবর্তী গৌরীপুর জমিদারির কাছারি বাড়ীতে আশ্রয় লন।[১] 'ময়মনসিং জেলার গেজেটিয়ার'-এ এই ঘটনাটি নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে:

"১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মেলার হিন্দু পরিচালকদিগকে মুসলমান দাঙ্গাকারীদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার অজুহাতে স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবক-দল মেলার মধ্য দিয়া সামরিক কায়দায় মার্চ করিয়া যান। এই ঘটনা হইতেই কুখ্যাত 'জামালপুর হাঙ্গামা' আরম্ভ হয়। অবশেষে মুসলমান জনতা কর্তৃক গৌরীপুর জমিদারির কাছারি বাড়ী অবরুদ্ধ হয় এবং মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্টের উপর গুলি নিক্ষিপ্ত হয়।"[২]

জনতার একাংশ গৌরীপুর জমিদারির কাছারি বাড়ী অবরুদ্ধ করিয়া রাখে এবং অপর অংশ জমিদার-তালুকদারগোষ্ঠী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দেওয়ানগঞ্জ ও বক্‌সিগঞ্জ-এর বাজার দুইটি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে।[৩] কারণ এই দুইটি বাজারে যে সকল কৃষক আসিত তাহাদের উপর 'তোলা' ও বিভিন্ন প্রকারের বে-আইনী আদায়ের দ্বারা যথেচ্ছ শোষণ-উৎপীড়ন চলিত। এই বাজার দুইটি লুণ্ঠন করিয়া কৃষকগণ মেলার অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

ইতিমধ্যে জামালপুরের ঘটনার সংবাদ বিকৃত আকারে কলিকাতায় পৌঁছে। সম্ভবত 'যুগান্তর' দলের স্থানীয় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা কলিকাতা কেন্দ্রের নিকট "হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের আক্রমণ"-এর সংবাদ দিয়া সাহায্য পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই আবেদনে সাড়া দিয়া কলিকাতার 'যুগান্তর'-কেন্দ্রের প্রধান, স্বয়ং অরবিন্দ ঘোষ কলিকাতার কেন্দ্র হইতে ইন্দ্রনাথ নন্দী, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী,

---

১। Hugh Mcpherson: Communal Antagonism, article in Political India 1832-1932, edited by Cumming, p. 112.

২। Mymensing District Gazetteer, p. 41. ৩। Ibid.

খুলনার সুধীর সরকার প্রভৃতি ৬ জন যুবককে কয়েকটি বোমা ও পিস্তল বা রিভলভার দিয়া ময়মনসিংয়ের হিন্দুদের রক্ষা করিবার জন্য জামালপুরে পাঠাইয়াছিলেন।[১] এই ৬ জন বিপ্লবী যুবক গৌরীপুরের জমিদারির কাছারিতে উঠিয়া বোমা-রিভলভার দ্বারা হিন্দুদের রক্ষা করেন। এই সময়ই তাঁহারা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সাহেবের উপর গুলিবর্ষণ করিয়াছিলেন। বাঙলাদেশের 'যুগান্তর' দলের অন্যতম নায়ক ইন্দ্রনাথ নন্দী এই সম্বন্ধে পরে নিম্নোক্ত বিবৃতিটি দিয়াছিলেন :

"স্বদেশী যুগে বাঙলার সর্বত্র যে Riot হয়, সেই সময় অরবিন্দ ঘোষ ২০০ টাকা দিয়া আমাদিগকে পূর্ববঙ্গের লোকদের সাহায্যার্থে যাইবার ভাড়া দিলেন। ৬ জন লোক লইয়া আমি ময়মনসিংয়ের জামালপুরে যাই।.........আমরা Riot উপলক্ষে ধৃত হই। আমরা আত্মরক্ষার্থ ১৮টা গুলি দাগি।"[২]

'যুগান্তর' দলের অন্যতম নায়ক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন :

"১৯০৮ (১৯০৭—লেঃ) খ্রীষ্টাব্দে জামালপুর-হাঙ্গামা হয় এবং হিন্দুরা বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়। বারোয়ারী ঠাকুর ভাঙিয়া ফেলা হয়। তখন কলিকাতার আত্মোন্নতি সমিতির আখাড়া[৩] হইতে জনকতক যুবক জামালপুরে উপনীত হন এবং তথাকার কোন জমিদারের কাছারিতে (গৌরীপুরের) অবস্থান করেন। তাঁহারা রাস্তা দিয়া বেড়াইতে ছিলেন এমন সময় মুসলমান জনতা ভিড় করিয়া তাঁহাদের চতুর্দিক ঘিরিয়া ফেলে। তাঁহারা প্রাণরক্ষার জন্য রিভলভারের গুলি ছুঁড়িতে আরম্ভ করেন। তাহাতে জনতা ছত্রভঙ্গ হয় এবং তাঁহারাও বাসায় ফিরিয়া যান। পরে পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিতে আসেন।......পুলিস যখন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, শ্রীশ ঘোষ, ইন্দ্রনাথ নন্দী প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে তখন সঙ্গীদের পরামর্শে সুধীর সরকার কাছারির পশ্চাৎ দিক দিয়া পলায়ন করেন।"[৪]

জামালপুরের কৃষকদের এই জমিদার-মহাজন-বিরোধী অভ্যুত্থান এইভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হয়। জমিদার-মহাজনগোষ্ঠী ময়মনসিং ও কলিকাতার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সাহায্যে এই কৃষক অভ্যুত্থানটিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত করিতে সক্ষম হয়। এই ঘটনা সমগ্র পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ইন্ধন যোগায়। অন্তত কিছুকালের জন্য বাঙলাদেশের পূর্বাঞ্চলের জমিদার-মহাজন-বিরোধী কৃষক-সংগ্রাম ও জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সম্ভাবনা বিনষ্ট হইয়া যায়।

* * * * *

এই দাঙ্গার ফলে ১৯০৭ ও তাহার পরের বৎসর জামালপুরের মেলা আর বসে নাই। ইহার পর গরুর বিক্রয়-কর হ্রাস করিলে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে আবার মেলা বসে।

১। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম (ইন্দ্রনাথ নন্দীর বিবৃতি) পৃঃ ২০৪-০৫।
২। Idid, পৃঃ ২০৪-০৫। ৩। যুগান্তর দলের লাঠিখেলার আখড়া।
৪। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১০৮।

এই অভ্যুত্থানের মূল তথ্যসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে 'ময়মনসিং জেলা গেজেটিয়ার,' হিউ ম্যাক্‌ফার্সন-রচিত Communal Antagonism নামক প্রবন্ধ[১] এবং অধ্যাপক ক্যান্টোয়েল স্মিথ-এর Modern Islam in India নামক গ্রন্থ হইতে।

হিউ ম্যাক্‌ফার্সন তাঁহার প্রবন্ধে মূল ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া গরুর মেলার ঘটনাটির চরিত্র সম্বন্ধে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:

"১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংয়ের বিপজ্জনক হাঙ্গামা হইতে যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয় তাহা জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকদের সাধারণ অভ্যুত্থানের আকার ধারণ করিয়াছিল।"[২]

অধ্যাপক ক্যান্টোয়েল স্মিথ তাঁহার গ্রন্থে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পশ্চাতের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে জামালপুরের এই কৃষক-অভ্যুত্থানটির উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন:

"সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পশ্চাতের মূল কারণ ধর্মীয় নহে, অন্য কিছু। সকল সতর্ক পর্যবেক্ষক, এমন কি বৃটিশ এবং রক্ষণশীল ব্যক্তিরাও স্বীকার করেন যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূলে থাকে আর্থনীতিক কারণ। প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলি সাম্প্রদায়িকতার ছদ্মবেশে পরিচালিত শ্রেণী-সংগ্রামেরই বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত ভিন্ন অন্য কিছু নহে।"[৩]

অরবিন্দ ঘোষ হইতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্রনাথ নন্দী ও ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত পর্যন্ত বাঙলাদেশের সেকালের 'যুগান্তর' সমিতির সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নায়কগণ তাঁহাদের চিন্তাধারা ও আজন্মলালিত সংস্কার অনুযায়ী ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের জামালপুরের ঘটনার যে বিকৃত ব্যাখ্যাই করিয়া থাকুন না কেন, এই ঘটনাটিও শ্রেণী-সংগ্রামেরই একটি বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত ব্যতীত, জমিদার-মহাজন-বিরোধী কৃষক-সংগ্রাম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সেকালের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা বুঝিয়া বা না বুঝিয়া জমিদার-মহাজনদের দুষ্ট চক্রান্তের সহায়তা করিয়া বাঙলার 'বিপ্লববাদ'-এ চিরকালের জন্য কলঙ্ক লেপন করিয়া রাখিয়াছেন।

বাগেরহাটের কৃষক-সংগ্রাম (১৯০৭)

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে খুলনা জেলার বাগেরহাটের ভাগচাষীদের সংগ্রাম একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাগেরহাট অঞ্চলের এই ভাগচাষীরা নমশূদ্র, অতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চলে অনাবৃষ্টির ফলে ব্যাপক অজন্মা দেখা দেয়। অন্নাভাবে দরিদ্র চাষীদের ঘরে ঘরে হাহাকার উঠে। কিন্তু তাহাদের উপর তালুকদার-জোতদার মহাজন-গোষ্ঠীর অত্যাচার সমানভাবে চলিতে থাকে। জোতদার-তালুকদারগণ পূর্বে অর্ধেক ফসলের ভিত্তিতে ভাগচাষীদিগকে তাহাদের জমি চাষ করিতে দিত। এবার তাহারা অর্ধেক অপেক্ষাও অধিক ফসল দাবি করে। ভাগচাষীরা এই দাবি মানিয়া লইতে অস্বীকার করে।

১। Political India, 1832-1932, Edited by Cumming,
২। Hugh Mcpherson : Idid, p. 112.
৩। W. Cantwell Smith : Modern Islam in India, p. 206.

তাহারা নিজেরাই সভাসমিতি করিয়া স্থির করে, তালুকদার-জোতদারদের শর্তে তাহারা জমি চাষ করিবে না। সকল নমশূদ্র ভাগচাষীরা এইভাবে এক ধর্মঘট-সংগ্রাম আরম্ভ করে। দীর্ঘকাল ধর্মঘট চলিবার পর তালুকদার-জোতদারগোষ্ঠী ভাগচাষীদের এই দাবি মানিয়া লইলে এই ধর্মঘটের অবসান হয়।[১]

বঙ্গদেশের জমিদারগোষ্ঠী প্রথমে 'স্বদেশী আন্দোলন' সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব হইতেই বিভিন্ন স্থানে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক-আন্দোলনের ঝড় উঠিতে এবং কৃষকগণকে নিজেদেরই উদ্যোগে সভাসমিতি করিয়া সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে দেখিয়া তাহারা 'স্বদেশী আন্দোলন' হইতে ক্রমশ দূরে সরিয়া দাঁড়ায়। শাসকগোষ্ঠীও প্রথম হইতেই তাহাদিগকে আন্দোলন হইতে দূরে সরাইয়া লইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। এবার তাহারা জমিদারগোষ্ঠীর বিক্ষোভ দূর করিয়া তাহাদিগকে বৃটিশ শাসনের সমর্থক রূপে লাভ করিবার ব্যবস্থা করে। শাসকগোষ্ঠী ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বিক্ষুব্ধ জমিদারগোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন করে। ইহারা ফলে জমিদারগোষ্ঠী পূর্বের মত কৃষকদের নিকট হইতে ইচ্ছামত খাজনা ও বিভিন্ন কর আদায়ের ক্ষমতা লাভ করে। বঙ্গদেশের তৎকালীন আইন সভার (Legislative Council) বৃটিশ সদস্য বার্ট্রাম্ এই নূতন সংশোধনী আইনটিকে "সরকার পক্ষ হইতে জমিদারদের উৎকোচদান" বলিয়া বর্ণনা করেন।[২] এই উৎকোচদানের পরিবর্তে দ্বারভাঙ্গা, বর্ধমান, দিনাজপুর, ময়মনসিং ও কাশিমবাজারের মহারাজগণ, রাজা প্যারীমোহন মুখার্জি, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গদেশের ২০০ জন প্রধান জমিদার নিজেদের স্বাক্ষর যুক্ত একটি কৃতজ্ঞতাসূচক পত্রে বৃটিশ শাসনের প্রতি তাঁহাদের অকুণ্ঠ আনুগত্য জ্ঞাপন করেন।[৩]

চম্পারণে নীল-বিদ্রোহ (১৯০৮)

বঙ্গদেশে নীলের চাষ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে উঠিয়া গেলেও বিহারের চম্পারণ জেলায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত নীলের চাষ অব্যাহত ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নীলচাষীদের উপর বৃটিশ নীলকরদের শোষণ-উৎপীড়ন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। পূর্বের অভিজ্ঞতা দ্বারা চালিত হইয়া নীল চাষীরা নিজেদেরই উদ্যোগে সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং সভা-সমিতি করিয়া সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে প্রথমে নীলচাষীরা জমি চাষ করিতে এবং নীল বুনিতে অস্বীকার করে। নীলকরগণ ক্ষিপ্ত হইয়া অত্যাচার-উৎপীড়নের দ্বারা চাষীদের দিয়া জমি চাষ করাইতে চেষ্টা করে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে নীলচাষীদের অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়। বিভিন্ন স্থানে নীলকরদের গুণ্ডাদের সহিত চাষীদের সংঘর্ষ চলিতে থাকে। ইহার পর চাষীরা দলবদ্ধভাবে নীলকুঠি ও নীলকরদের বাঙলো আক্রমণ

১। Times of India, 31st October, 1908.

২। Times of India, 6th April, 1907.

৩। Ibid, 31st August, 1907.

করিয়া ভাঙিয়া চুরমার করিতে থাকে। বহু নীলকর প্রাণের ভয়ে নীলকুঠি ও বাঙলো ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। অবশেষে নীলকরদিগকে ও নীলকুঠিগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য চম্পারণে ২৫০ জন সশস্ত্র পুলিসের একটি বাহিনী আসিয়া নীলকুঠিগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করে। সশস্ত্র পুলিসদের সহিত নীলাচাষীদের বহু সংঘর্ষ হয়। নীলচাষীদের এই সংগ্রাম চলে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। অবশেষে নীলচাষীদের বিভিন্ন অভিযোগের আংশিক প্রতিকার এবং বিভিন্ন দাবি আংশিকভাবে পূরণ করা হইলে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে আবার চম্পারণে নীলের চাষ আরম্ভ হয়।[১]

বঙ্গদেশের শ্রমিক-সংগ্রাম (১৯০৫-০৮)

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ হইতে উদ্ভূত 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর প্রভাব শ্রমিক-শ্রেণীর অগ্রসর অংশের মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং তাহার ফলে বিদেশী মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকগণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার সাহস খুঁজিয়া পায়। 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর কয়েকজন প্রধান নায়ক যে বাল গঙ্গাধর তিলকের অনুসরণে শ্রমিকশ্রেণীকে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে টানিয়া নামাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেকালের 'টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া'র বিভিন্ন সংখ্যা হইতে তাহার সাক্ষ্য মিলে। 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের কেহ কেহ সুদূর আসামের চা-বাগিচার 'কুলি'দের (শ্রমিকদের) মধ্যেও আন্দোলন আরম্ভের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইঁহাদেরই উদ্যোগে চা-বাগিচার শ্রমিকদের উপর বাগিচার বৃটিশ মালিকগোষ্ঠীর বীভৎস শোষণ-উৎপীড়নের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া 'কুলি-কাহিনী' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করা হইয়াছিল। এই সময় যে সকল শ্রমিক-সংগ্রাম হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রধান সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ।

১. উড়িয়া কুলিদের ধর্মঘট (১৯০৬)

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের ২৫-২৬ তারিখে কলিকাতার নিকটবর্তী বিভিন্ন কারখানার দুই হাজার উড়িয়া কুলি মজুরিবৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করে। তাহারা দাবি আদায় করিতে সক্ষম হয়।

২. মুদ্রাযন্ত্রের শ্রমিক-ধর্মঘট

জুলাই মাসে কলিকাতার বিভিন্ন ছাপাখানার শ্রমিকগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে ধর্মঘট করিয়া মজুরিবৃদ্ধি করাইতে সক্ষম হয়।[২]

৩. ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের ধর্মঘট (১৯০৬)

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ'-এর বঙ্গদেশের অংশে এক ব্যাপক ধর্মঘট সংগ্রাম হয়। 'টাইম্‌স্' পত্রিকার মতে, এই ধর্মঘট "প্রত্যক্ষত ও

১। Times of India, 5th and 26th December, 1908.
২। Times of India, 8th August, 1906.

স্পষ্টত রাজনীতিক আন্দোলনেরই ফল।[১] এই ধর্মঘটে বাঙলা-বিভাগের প্রায় সকল শ্রমিকই অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। কয়েকদিন পর্যন্ত রেল-চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল এবং এক সপ্তাহ পর্যন্ত ধর্মঘট অব্যাহত ছিল। এই ধর্মঘটে—

"সকল দেশীয় শ্রমিক অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। হাওড়া হইতে বর্ধমান পর্যন্ত ছোট বড় সকল স্টেশন সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িয়াছিল। মালগাড়ীর চলাচলও সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল।"[২]

অসংখ্য সশস্ত্র পুলিস আসিয়া বিভিন্ন স্থান দখল করিয়া রাখিলেও, যাহাতে কেহ কাজে যোগদান না করিতে পারে তাহার জন্য সকল স্টেশনে দিবারাত্র শ্রমিকদের 'পিকেটিং' চলিত। এই ধর্মঘটে শ্রমিকদের প্রধান দাবি ছিল মজুরিবৃদ্ধি, দৈনিক কাজের সময় হ্রাস এবং বৃটিশ ও ভারতীয় শ্রমিকদের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা ও সমান ব্যবহার এবং তৎসঙ্গে অবজ্ঞাসূচক 'নেটিভ' (দেশীয়) কথাটির পরিবর্তে 'ইণ্ডিয়ান' (ভারতীয়) কথাটির ব্যবহার।

শাসকগোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত এই ধর্মঘট ভাঙিয়া ফেলিতে সক্ষম হয়। ধর্মঘটে যে সকল শ্রমিক নেতৃত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের কর্মচ্যুত করা হয়। এমনকি বিশ বা পঁচিশ বৎসরের পুরাতন শ্রমিকগণও সরকারের রোষ হইতে অব্যাহতি লাভ করেন নাই। এই ধর্মঘটের মধ্যেই 'ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ'-এর শ্রমিকদের 'ট্রেড য়ুনিয়ান' সর্বপ্রথম গঠিত হইয়াছিল।[৩]

এই বৎসরের আগস্ট মাসেই উক্ত ট্রেড য়ুনিয়ান জামালপুর রেল কারখানার ধর্মঘট পরিচালনা করিয়াছিল। এই ধর্মঘটে পুলিসের আক্রমণের বিরুদ্ধে উক্ত কারখানার শ্রমিকদের রক্তাক্ত সংগ্রাম চলিয়াছিল।[৪]

৪. ক্লাইভ জুটমিলের ধর্মঘট

এই সময় কলিকাতার নিকটবর্তী ক্লাইভ চটকলে দৈনিক ১৫ ঘণ্টা কাজ করিতে শ্রমিকদিগকে বাধ্য করা হইতেছিল এবং শ্রমিকদের উপর বৃটিশ কর্মচারীরা যথেচ্ছ অত্যাচার চালাইত। ইহার বিরুদ্ধে আগস্ট মাসে মিলের একহাজার শ্রমিক সঙ্ঘবদ্ধভাবে ধর্মঘট আরম্ভ করে। দীর্ঘকাল ধর্মঘটের পর মালিকগণ দৈনিক কাজের সময় হ্রাস করিতে বাধ্য হয় এবং বৃটিশ কর্মচারীদের অত্যাচার বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিলে ধর্মঘটের অবসান ঘটে।[৫] এই সময় এই চটকলের শ্রমিকদের একটি ট্রেড য়ুনিয়ান গঠিত হয়।

৫. কর্পোরেশন শ্রমিক ধর্মঘট

আগস্ট মাসেই কলিকাতা কর্পোরেশনের দুই হাজার ধাঙড় শ্রমিক মজুরিবৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করে। কর্পোরেশন-কর্তৃপক্ষ তাহাদের দাবি পূরণ করিতে বাধ্য হয়।[৬]

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে একটি কাপড়ের মিলে ধর্মঘট হয়।

১। The Times of India, 22nd Nov., 1907. ২। Times of India, 28th Sept., 1906.

৩। Times of India, 28th July & 1st Sept., 1906.

৪। এই ধর্মঘটের বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। ৫। Ibid, 1st Sept, 1906,

৬। Ibid, 25th Aug., 1906

৬. কাঁকিনাড়া জুটমিলের ধর্মঘট

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বৃটিশ মালিকানাধীন কাঁকিনাড়া চটকলের ৪ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘটের সময় মালিকদের গুণ্ডাদল ও দালাল শ্রমিকদের সহিত ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটে। ধর্মঘট এইরূপ জঙ্গী আকার ধারণ করে যে একদল সশস্ত্র পুলিস আসিয়া অবস্থা আয়ত্তে আনিতে সক্ষম হয়। 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার মতে, 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর নায়কদের "প্ররোচনার" ফলেই এই ধর্মঘট হইয়াছিল।[১]

৭. রেলশ্রমিকদের ধর্মঘট

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ'-এর বাঙলা বিভাগে এক ব্যাপক ধর্মঘট আরম্ভ হয় এবং এই ধর্মঘট কয়েক দিনের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে বিস্তার লাভ করে। প্রথমে ১৫০ জন ইঞ্জিন ড্রাইভার এই ধর্মঘট আরম্ভ করে এবং পরে ইহা 'ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ'-এর এবং 'অযোধ্যা-রোহিলখন্দ রেলপথ'-এর সকল শ্রমিকের সংগ্রামে পরিণত হয়। মজুরিবৃদ্ধি, কাজের সময় হ্রাস এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিকট হইতে মানবিক ব্যবহার প্রভৃতিই ছিল এই ধর্মঘটের প্রধান দাবি। এঙ্গেল্‌কেন্‌ নামক একজন বৃটিশ শ্রমিক ছিলেন এই ধর্মঘটের প্রধান পরিচালক। ধর্মঘট চলিয়াছিল ১০ দিন এবং এই ১০ দিনে হাওড়া হইতে একখানিও ট্রেন ছাড়ে নাই। পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল রেলকেন্দ্র হইতে একটি কেন্দ্রীয় স্ট্রাইক-কমিটি দ্বারা এই ধর্মঘট পরিচালিত হইয়াছিল এবং ৪৩ দফা দাবি কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হইয়াছিল। 'টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার মতে, "এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে যতগুলি ধর্মঘট হইয়াছে তাহার মধ্যে এই ধর্মঘটই সর্বাপেক্ষা সুশৃংখল ও সংগঠিত।"[২]

১০ দিন ধর্মঘট চলিবার পর কর্তৃপক্ষের সহিত দাবি সম্বন্ধে শ্রমিকদের একটি চুক্তি হইলে ধর্মঘটের অবসান হয়। কিন্তু ধর্মঘটের অবসানের পরেই ধর্মঘটের প্রধান পরিচালক বৃটিশ শ্রমিক (ইঞ্জিন-ড্রাইভার) এঙ্গেল্‌কেন্‌কে চাকরি হইতে বরখাস্ত করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হয়।

৮. হুগলি জুটমিলের শিশু শ্রমিকদের ধর্মঘট (১৯০৮)

হুগলি চটকলের ৪ হাজার শ্রমিকের মধ্যে প্রায় অর্ধেক ছিল ১০ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক বালক। চটকলে ইহারা ছিল সর্বাপেক্ষা শোষিত ও উৎপীড়িত। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ মালিক ও ফোরম্যানদের শোষণ-উৎপাড়ন সহ্যের সীমা অতিক্রম করিলে বালক শ্রমিকগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে ধর্মঘট করিয়া মিল অচল করিয়া দেয়। অবশেষে উৎপীড়ন বন্ধের প্রতিশ্রুতি পাইয়া ইহারা পুনরায় কাজে যোগদান করে।[৩]

১। Ibid, 25th Aug., 1906.
২। Times of India, 20th Nov., 1907. ৩। Ibid, 8th February, 1908.

৯. কাঁকিনাড়া জুটমিল ধর্মঘট

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ কাঁকিনাড়া চটকলের ৪ হাজার শ্রমিক আবার ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘট সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবরণটি 'টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় :

"শুক্রবার অপরাহ্নে (ধর্মঘট আরম্ভের ২ দিন পর) কাঁকিনাড়ায় এক গুরুতর দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছে। এখানে ধর্মঘটী কুলিরা কাঁকিনাড়া মিল আক্রমণ করিয়া বলপূর্বক মিলের ফটক বন্ধ করিবার চেষ্টা করে। মিল কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের উপর গুলি বর্ষণ করে। তাহাতে তিনজন শ্রমিক আহত হয়। ঘটনাস্থলে শান্তিরক্ষা করিবার জন্য একদল সশস্ত্র পুলিস প্রেরিত হইয়াছে।.........ধর্মঘটের সকল নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।......"[১]

দশম অধ্যায়

পাঞ্জাবে শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৯০৭)

সংগ্রামের পটভূমি

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব সমগ্র ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। সেই সময় একদিকে চলিতেছিল বুর্জোয়াশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণীর 'স্বদেশী আন্দোলন' অর্থাৎ বৃটিশ পণ্যের বর্জন-আন্দোলন এবং মধ্যশ্রেণীর চরমপন্থীদের সন্ত্রাস-বাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম, আর অপরদিকে শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম ভারতের বৃটিশ শাসনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল। কৃষক সম্প্রদায়ের, বিশেষত কৃষি-শ্রমিকের বৈপ্লবিক সংগ্রামই পাঞ্জাবের ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের সর্বপ্রধান ঘটনা।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পাঞ্জাবের কৃষি-শ্রমিকগণ জমিদার-তালুকদারগোষ্ঠীর বেগার খাটাইবার বিরুদ্ধে এক প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল। সেই আন্দোলন ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে চরম পর্যায়ে উঠিতে থাকে। এই সময় লাহোরের 'দি পাঞ্জাবী' নামক একখানি পত্রিকায় কৃষি-শ্রমিকদের বেগারপ্রথা-বিরোধী আন্দোলন সমর্থন করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিত হয়। একটি প্রবন্ধে জনৈক জমিদারের দ্বারা সমস্ত দিন বেগার খাটাইবার ফলে দুইজন কৃষি-শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করিয়া ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। পাঞ্জাব সরকার জমিদার-তালুকদারগোষ্ঠীর বেগার খাটাইবার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই কৃষি-শ্রমিকদের এই আন্দোলন দমনের চেষ্টা করিতে থাকে। পাঞ্জাব সরকার শেষোক্ত প্রবন্ধটির জন্য 'দি পাঞ্জাবী' পত্রিকার সম্পাদককে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে।[২] এই

১। Ibid, 14th March, 1908. ২। Times of India, 2nd March, 1907.

গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে লাহোরের উকিল, ছাত্রসম্প্রদায় ও জনসাধারণ বিভিন্ন স্থানে সভা ও শোভাযাত্রা করিয়া তীব্র প্রতিবাদ জানাইতে থাকে। এই প্রতিবাদ-আন্দোলন সমগ্র পাঞ্জাবে, এমনকি পাঞ্জাবের বাহিরেও বিভিন্ন শহরে বিস্তৃত হয়। মাদ্রাজ ও কলিকাতার ছাত্র, উকিল ও জনসাধারণ সভা করিয়া এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানায়।[১] ৬ই এপ্রিল যখন বন্দী সম্পাদককে লাহোরের আদালত হইতে জেলখানায় লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন পুলিসের সহিত ছাত্র ও জনসাধারণের প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটে। এই সংঘর্ষে বহু ব্যক্তি আহত ও গ্রেপ্তার হয়।

বেগারপ্রথা-বিরোধী আন্দোলন ব্যতীত কৃষকদের আরও দুইটি আন্দোলন এই সময় প্রবল হইয়া উঠে। এই নূতন আন্দোলন দুইটির একটি ছিল বর্ধিত ভূমিকরের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং অপরটি 'বড় দোয়াব'-এর খাল অঞ্চলে অত্যধিক জলকরের বিরুদ্ধে আন্দোলন।[২] ইহা ব্যতীত এই সময় পাঞ্জাবের কৃষকগণ জানিতে পারে যে, ভূ-সম্পত্তির উপর কৃষকদের স্বত্ব হরণ করিয়া নূতন আইন পাস করানো হইতেছে। এই আইনে ক্ষুদ্র জমিদারদেরও সম্পত্তি হারাইবার আশঙ্কা দেখা দেয়। এই আইন রচনার সংবাদে সাধারণ কৃষক এবং এমনকি ক্ষুদ্র জমিদারদের মধ্যেও প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিতে থাকে। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল এক অভাবনীয় দুর্ভিক্ষ এবং প্লেগরোগের মহামারী। গত ১৩ বৎসর ধরিয়া পাঞ্জাবে অজন্মা চলিতেছিল, সমগ্র পাঞ্জাবে, বিশেষত কৃষকের ঘরে ঘরে হাহাকার লাগিয়াই ছিল। এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের হাত ধরাধরি করিয়াই চলিতেছিল প্লেগ রোগের ধ্বংসলীলা। সরকারী হিসাব হইতেই জানা যায়, পাঞ্জাব প্রদেশে প্রতি সপ্তাহে ৬৫ হাজার লোকের মৃত্যু হইতেছিল। বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে কৃষকের মৃত্যুসংখ্যাই ছিল সর্বাধিক।[৩]

কৃষকের-সংগ্রাম

পাঞ্জাবের কৃষক এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে মরিয়া হইয়া সংগ্রাম আরম্ভ করে। প্রথমে বিভিন্ন স্থানে কৃষক জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সভা ও শোভাযাত্রা করিয়া তাহাদের দাবি জানাইতে আরম্ভ করে। কৃষকের সংগ্রাম-ধ্বনিতে সমগ্র পাঞ্জাব মুখরিত হইতে থাকে।

কৃষক-সংগ্রামের শক্তি ও ব্যাপকতা 'স্বদেশী আন্দোলনের' চরমপন্থী নায়কদিগকেও ইহার দিকে আকৃষ্ট করে। ইহা ছিল পাঞ্জাবের চরমপন্থী নায়কদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেবল পাঞ্জাব আর বোম্বাইয়ের চরমপন্থীরাই শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামের দিকে মুখ ফিরাইতে এবং উহার সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষকের পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন।

পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়, অজিত সিং প্রভৃতি চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ পাঞ্জাবের কৃষক জনসাধারণের এই সংগ্রামের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কৃষি-শ্রমিকদের সহিত তাঁহাদের যোগাযোগ হইল সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ।[৪] অজিত সিং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের

১। Ibid. ২। H. W. Nevinson : New Spirit in India, p. 17.
৩। Ibid, p. 301. ৪। Times of India, 25th May, 1907

ফেব্রুয়ারী মাসে 'ভারতীয় দেশভক্তদের সঙ্ঘ' (Indian Patriots' Association) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কৃষকদের, বিশেষত কৃষি-শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করিয়া সংগ্রামের পথে পরিচালিত করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।[১] লাজপৎ রায়, অজিত সিং প্রভৃতি চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ 'বয়কট' প্রভৃতি 'স্বদেশী আন্দোলন' পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে সেই আন্দোলনের সহিত কৃষক এবং শ্রমিক-আন্দোলনকেও যুক্ত করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবে সর্বপ্রথম তাঁহাদেরই উদ্যোগে কৃষক-আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল। মারি ও রাওয়ালপিণ্ডি জেলায় কৃষক-আন্দোলনে তাঁহারাই নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন। 'বড় দোয়াব' খালের জল চাষের কার্যে ব্যবহারের জন্য শাসকগোষ্ঠী যে অত্যধিক জলকর বসাইয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে কৃষকদের বিক্ষোভও সংগঠিত করিয়াছিলেন পাঞ্জাবের চরমপন্থীরাই। গণ-সংগ্রামের সহিত তাঁহাদের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্যই 'বিদেশী পণ্য বর্জন' (বয়কট)-আন্দোলনে মহারাষ্ট্রের মতই পাঞ্জাবেও শ্রমিক ও কৃষকেরা অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। চরমপন্থী নায়ক অজিত সিং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৃষকদের সংগঠিত করিতেন এবং অত্যধিক ভূমিকর আর জলকর হ্রাস ও জমির উপর হইতে কৃষকদের মালিকানা হরণ করিবার আইন রদের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম আরম্ভের জন্য প্রচারকার্য চালাইতেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবে প্লেগ-মহামারী দেখা দেয় এবং সপ্তাহে ৬৫ হাজার করিয়া মানুষ মরিতে থাকে। এই প্লেগ-মহামারীর কবল হইতে পাঞ্জাবের কৃষকদের রক্ষা করিবার জন্য চরমপন্থীরাই কৃষকদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই জন্য লাজপৎ রায় আর অজিত সিং "কৃষকের রক্ষক" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। লাজপৎ রায় আর অজিত সিংয়ের আহ্বানেই পাঞ্জাবের কৃষকগণ বৃটিশ পণ্য বর্জন এবং বৃটিশের সহিত সর্বক্ষেত্রে অসহযোগ-আন্দোলন ব্যাপক আকারে আরম্ভ করিয়াছিল। বিশেষত শ্রমিকদের বাধাদানের ফলে পাঞ্জাবে সৈন্য চলাচল বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছিল।[২] ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল অজিত সিং এক বিশাল জনসভা হইতে নিম্নোক্ত ভাষায় সংগ্রামের জন্য জনসাধারণকে বিশেষত কৃষকদের আহ্বান জানাইয়াছিলেন :

"হিন্দু ভাইসব, মুসলমান ভাইসব, জাঠ ভাইসব (জাঠগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রধান কৃষিজীবি-সম্প্রদায়), শ্রমিক ভাইসব, সিপাহি ভাইসব, আমরা সবাই এক। বৈদেশিক সরকার আমাদের নিকট ধূলিমুষ্টির ন্যায় তুচ্ছ। (১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের) ১৬ই এপ্রিল আমরা এই সরকারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়াছিলাম—ঠিক যেমন বাঙালী ভাইরা ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর মাথা তুলিয়াছিলেন।[৩] আমরা (১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের) ১৬ই এপ্রিল আবার মাথা তুলিয়াছিলাম।[৪] ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সময় শাসকগোষ্ঠী প্রাণের দায়ে কয়েকটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাহার একটিও কার্যে পরিণত করা হয় নাই। মনে রাখিবেন, শাসকগোষ্ঠী আমাদের হুকুমের দাস ব্যতীত আর কিছুই নয়। আপনাদের ভয় কি? আপনারা প্লেগে প্রাণ

১। Ibid. ২। Times of India, 15th June, 1907.

৩। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কার্জনের বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হয়।

৪। যখন বড়লাট লর্ড মিণ্টো পাঞ্জাবী কৃষকদের ভূমি-হস্তান্তর আইন ঘোষণা করিয়াছিলেন।

দিতেছেন, দেশের জন্য প্রাণ দিন। আমরা সংখ্যায় তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী সত্য বটে, তাহাদের কামান-বন্দুক আছে। কিন্তু আমাদেরও আছে মুষ্টি। আমরা চাবুক মারিয়া তাহাদের এদেশ হইতে তাড়াইব। আপনারা প্লেগ ও অন্যান্য ব্যাধিতে প্রাণ না দিয়া সেই প্রাণ দেশমাতৃকার জন্য উৎসর্গ করুন। ঐক্যের মধ্যেই আমাদের শক্তি নিহিত। বাঙলাদেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন।"[১]

সংগ্রাম আরম্ভ হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে। পাঞ্জাবের 'বড় দোয়াব'-এর খাল অঞ্চল হইতেই এই সংগ্রামের আরম্ভ। শাসকগোষ্ঠি দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের জলকর পূর্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ বর্ধিত করিয়াছিল। চরমপন্থী নায়কগণের আহ্বানে এই বর্ধিত জলকরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য ৭ই এপ্রিল লাহোর জেলার প্রায় ১২ হাজার কৃষক এক সভায় সমবেত হইয়া জলকর হ্রাসের দাবি জানায়। চরমপন্থা নায়কগণের বক্তৃতা শুনিবার জন্য কৃষকগণ ক্রমশ অধিক সংখ্যায় সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ হইতে থাকে। এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে লাহোরে চরমপন্থী নায়ক অজিত সিংয়ের দ্বারা আহুত এক সভায় প্রায় ৮ হাজার কৃষক লাঠি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া উপস্থিত হয়। ২১শে এপ্রিল রাওয়ালপিণ্ডি শহরে এক বিশাল কৃষক সমাবেশে অজিত সিং সংগ্রামের আহ্বান জানাইয়া বলেন:

"ভাইসব, আমরা সংখ্যায় ২৯ কোটি, আর তাহারা (বৃটিশ সৈন্য—লেঃ) সংখ্যায় মাত্র দেড়লক্ষ। সত্য বটে, তাহাদের কামান আছে। কিন্তু তাহাদের কামান আমাদের ২৯ কোটি ভারতবাসীর নিঃশ্বাসে উড়িয়া যাইবে—আর তাহাদের জন্য আছে আমাদের মুষ্টি। একবার আমার সঙ্গে এক রুশীয় ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি আমাকে বলেন: মাত্র দেড়লক্ষ শাসন করিতেছে ২৯ কোটিকে! এ এক অদ্ভুত ব্যাপার! বিদেশী শাসকগোষ্ঠী ভীষণ মিথ্যাবাদী, দুর্দান্ত অত্যাচারী। ইহাদের নিকট হইতে কোন সহানুভূতি আশা করিও না। অর্থ লুণ্ঠনই এই শাসকগোষ্ঠীর একমাত্র উদ্দেশ্য।"

ইহার পর, কিভাবে বিভিন্ন করের বোঝা ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে এবং জনসাধারণ কি ভয়ঙ্কর দুর্দশায় পড়িয়াছে তাহা তিনি বুঝাইয়া বলেন। অন্যান্য বক্তাগণও কৃষকদের দুঃখদুর্দশা ও তাহাদের ক্রমবর্ধমান করের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে সংগ্রাম প্রবলতর করিয়া তুলিবার আহ্বান জানান।[২]

পুলিশ সভাস্থলেই বক্তাদের গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিলে উপস্থিত কৃষক জনতা তাহাদের বাধা দেয় এবং প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যায়। পুলিসের কার্যের প্রতিবাদে তিন হাজার কৃষক লাঠি প্রভৃতি লইয়া রাওয়ালপিণ্ডি শহরে অভিযান করিলে তাহাদের সহিত পুলিসের এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আরম্ভ হয়। এই সংগ্রাম কয়েকদিন পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলে। এই সময়ই রাওয়ালপিণ্ডি শহরে আর একটি সংগ্রাম আরম্ভ হয় এবং দুই সংগ্রাম একত্রে মিলিয়া শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের আকার ধারণ করে।

১। Tilak & the Struggle for Indian Freedom by Soviet Writers, p. 641.

২। Times of India, 8th June, 1907.

শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রসম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান

"রাজদ্রোহমূলক" প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে 'দি পাঞ্জাবী' পত্রিকার সম্পাদকের যে বিচার চলিতেছিল তাহার রায় বাহির হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে। বিচারে সম্পাদক আড়াই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মামলাটি লাহোর হইতে রাওয়ালপিণ্ডিতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ঐ দিন সকাল হইতে প্রায় সাত হাজার ছাত্র ও শ্রমিক আদালত ঘেরাও করে। সম্পাদকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এবং তাঁহার মুক্তির দাবিতে রাওয়ালপিণ্ডির রেল-কারখানার তিন হাজার শ্রমিক সকাল হইতে ধর্মঘট করে এবং শোভাযাত্রা করিয়া আদালতে উপস্থিত হইয়া ছাত্রদের সহিত মিলিত হয়। তাহাদের দৃষ্টান্তে রাওয়ালপিণ্ডির অন্যান্য কারখানার শ্রমিকগণও একই দাবিতে ধর্মঘট করিয়া রেল-শ্রমিকদের শোভাযাত্রায় যোগদান করে। কর্তৃপক্ষ বিপদ বুঝিয়া সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়াই সম্পাদককে আড়াই বৎসরের কারাদণ্ড দান করিয়া গোপনে তাঁহাকে জেলখানায় প্রেরণ করে। এই সংবাদ শুনিবামাত্র সমবেত শ্রমিক ও ছাত্রগণ ক্রোধে ফাটিয়া পড়ে। তাহারা শোভাযাত্রা করিয়া রাজপথে বাহির হয়। এই সময় এক হাজার কৃষক লাঠি প্রভৃতি লইয়া আদালতে উপস্থিত হয় এবং শোভাযাত্রায় যোগদান করে।

শোভাযাত্রীরা রাজপথে কোন ইংরেজ দেখিবামাত্র তাহার দিকে ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করে। তাহাদের ইষ্টকের আঘাতে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর দুইজন কর্নেলও গুরুতররূপে আহত হয়। জনতা সকল সরকারী অফিস, বিদেশী খ্রীষ্টান মিশনারীদের কুঠি, ইংরেজ মালিকদের দোকান, কারখানা প্রভৃতির উপর আক্রমণ করে এবং সকলকিছু ভাঙিয়া তচ্‌নচ্‌ করিয়া ফেলে। এক বিশাল পুলিস বাহিনী আসিয়া জনতাকে বাধা দিলে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হয়। উভয় পক্ষে বহু হতাহত হয়। শ্রমিক-কৃষক ও ছাত্রগণ একত্রে পুলিসের সহিত "লুকোচুরির সংগ্রাম" অর্থাৎ গেরিলা-কৌশলে যুদ্ধ চালাইতে থাকে। এই যুদ্ধ সারাদিন চলিবার পরেও পুলিস বিদ্রোহী শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের দমন করিতে ব্যর্থ হয়।

অবশেষে পরদিন, ২রা মে পাঞ্জাব সরকার নিকটবর্তী ক্যান্টনমেন্ট হইতে একটি বৃটিশ সৈন্যবাহিনী আনিয়া উহার হস্তে শহরের ভার অর্পণ করে। ঐ দিন ৮ হাজার সশস্ত্র শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র এক শোভাযাত্রা করিয়া রাজপথে বাহির হইলে সৈন্যবাহিনী শোভাযাত্রীদের গতিরোধ করে। শোভাযাত্রীরা সৈন্যদের রাইফেলের গুলিবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়া লাঠি ও ইষ্টকখণ্ডের দ্বারা আক্রমণ করে। সৈন্যগণও রাইফেল হইতে বৃষ্টিধারার মত গুলিবর্ষণ করিয়া বিদ্রোহী শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রগণকে ছত্রভঙ্গ করিবার চেষ্টা করে। এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষে বহু হতাহত হয়। শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রগণ অবশেষে পশ্চাৎ অপসরণ করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।[১]

১। Ibid, 18th May, 1907 ; Sedition Committee Report, p 100.

এই সংগ্রামের ঢেউ লাহোর, অমৃতসর এবং অন্যান্য শহরেও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। এই সকল শহরের শ্রমিক, ছাত্র ও দরিদ্র জনসাধারণ রাওয়ালপিণ্ডির শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানাইয়া পুলিসের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। পুলিসের সহিত তাহাদের কয়েকদিন ধরিয়া সংগ্রাম চলে।

রাওয়ালপিণ্ডির অভ্যুত্থান ছিল এক নিতান্ত আকস্মিক ঘটনা। ইহার পশ্চাতে কোন পূর্ব পরিকল্পনা বা সুচিন্তিত লক্ষ্য ছিল না। তথাপি এই অভ্যুত্থান সমগ্র ভারতবর্ষকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল। একটি রিপোর্টে বলা হয়:

"পাঞ্জাবের এই অভ্যুত্থান ছিল চরিত্রের দিক হইতে বাঙলাদেশের বিক্ষোভ অপেক্ষাও বহুগুণ বিপজ্জনক। ......এই অভ্যুত্থান সমগ্র ভারতবর্ষকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল।"[১]

সৈন্যবিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

কৃষকদের সহিত যেমন নাড়ীর সম্পর্ক শ্রমিকদের, তেমনই নাড়ীর সম্পর্ক দেশীয় সৈন্যদের। পাঞ্জাবের কৃষকদের যে সংগ্রাম সমগ্র পাঞ্জাবকে তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল, শাসকগোষ্ঠীর মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল, সেই সংগ্রাম পাঞ্জাবী সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। কৃষকদের উপর জলকর প্রভৃতি বিভিন্ন করের বোঝা চাপানো এবং জমির উপর হইতে তাহাদের অধিকার হরণের চেষ্টার ফলে পাঞ্জাবী সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও প্রবল বিক্ষোভ জাগিয়া উঠে। কারণ, তাহারাও কৃষকের সন্তান। সুতরাং কৃষকদের এই ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে, বাঁচার সংগ্রামে তাহারা নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ না করিয়া এই সংগ্রামকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। সাধারণ পাঞ্জাবী সৈন্যরা তাহাদের পরিবারভুক্ত চাষীদিগকে সংগ্রাম করিতে দেখিয়া তাহারাও বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আঘাত দিবার জন্য গোপনে আয়োজন করিতে থাকে।[২]

পাঞ্জাবী সৈন্যবাহিনীর এই চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া এবং গোপনে তাহাদের বিদ্রোহে যোগদানের আয়োজন সম্বন্ধে সংবাদ জানিয়াশাসকগোষ্ঠী, বিশেষত তৎকালের ভারতের জঙ্গীলাট লর্ড কিচ্‌নার ভীষণ শঙ্কিত হইয়া উঠেন।[৩] ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে ছিল মহাবিদ্রোহের ৫০ বৎসর পূর্তির তারিখ।[৪] শাসকগোষ্ঠী গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিল যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অভ্যুত্থানের ৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ করিয়া ১০ই মে তারিখে পাঞ্জাবী সৈন্যরাও কৃষকদের বিদ্রোহে যোগদান করিবে, তাহাদের অভ্যুত্থান আরম্ভ হইবে।[৫] এই সংবাদ জানিবামাত্র শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠে বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য নহে, কৃষকদের দাবি

১। Quoted from Tilak & the Struggle for Indian Freedom, p. 642.

২। Times of India, 18th May, 1907; Sedition Committee Report, p. 100.

৩। সাম্রাজ্যবাদী লেখক V. Chirol-এর মতে, আর্যসমাজের সভ্যরাই পাঞ্জাবী সৈন্যদের মধ্যে শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। V. Chirol: Indian Unrest, p. 117.

৪। Times of India, 25th May, 1907. ৫। Times of India, 1st April, 1907.

অন্তত আংশিকভাবে পূর্ণ করিয়া তাহাদের বিদ্রোহের কারণ দূর করিবার জন্য। শাসকগোষ্ঠী কৃষকদিগকে কিছু সুবিধা দিতে বাধ্য হয়। কৃষি-ভূমির উপর কৃষকদের অধিকার হরণ করিবার জন্য পাঞ্জাব-সরকার যে আইন প্রস্তুত করিয়াছিল তাহাতে বড়লাট স্বাক্ষর না দিয়া উহা বাতিল করেন। এই আইন পাস না হওয়ায় কৃষকদের বিক্ষোভ আপতত দূর হয়, এমনকি ভূম্যধিকারিগণও সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় বৃটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। পাঞ্জাবী সৈন্যদের আসন্ন অভ্যুত্থানে বাধা দানের ব্যাপারে বড়লাট কর্তৃক নূতন ভূমিকর ও ভূমিসংক্রান্ত আইন নাকচ করার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করিয়া 'দি ইংলিশম্যান' পত্রিকায় লিখিত হয়:

"এই বৎসরের (১৯০৭) গোড়ার দিকে দেশীয় কর্মচারিগণ এই দাবি জানাইয়াছিল যে, বড় দোয়াবের খাল-অঞ্চলের উপনিবেশ সংক্রান্ত আইন নাকচ করা না হইলে পাঞ্জাবের দেশীয় সৈন্যবাহিনীর আনুগত্য সম্বন্ধে তাহারা কোন নিশ্চয়তা দিতে পারিবে না। দেশীয় সৈন্যবাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষগণ গোপনে প্রধান সেনাপতি (জঙ্গীলাট) লর্ড কিচ্‌নারকে বলিয়াছিলেন যে, খাল-অঞ্চলের (বড় দোয়াবের) উপনিবেশ সংক্রান্ত আইন নাকচ করা এবং লালা লাজপৎ রায় ও অজিত সিংকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা না হইলে তাঁহারা পাঞ্জাবের দেশীয় সৈন্যবাহিনীর আনুগত্য সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দিতে পারিবেন না।"[১]

সমগ্র ভারতবর্ষে এক অতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয়ে বড়লাট প্রথমে লালা লাজপৎ রায় ও অজিত সিংয়ের গ্রেপ্তারের দাবি মানিয়া লইতে এবং নূতন কৃষি-আইন নাকচ করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু জঙ্গীলাট লর্ড কিচ্‌নার পদত্যাগের হুমকি দিলে সৈন্যাধ্যক্ষগণের ও লর্ড কিচ্‌নারের দাবি মানিয়া লইতে বড়লাট বাধ্য হন।[২]

পাঞ্জাবের সৈন্যবাহিনীর "প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে" অর্থাৎ বিদ্রোহের সিদ্ধান্তে সে বারের মত ভূমির উপর কৃষকদের স্বত্ব বজায় থাকিলেও পাঞ্জাবের শাসকগোষ্ঠী ভবিষ্যতের সুযোগের অপেক্ষা করিতে থাকে।

এদিকে আর একটা "সিপাহী-বিদ্রোহের" আশঙ্কা উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবল আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এই সময় দিল্লী শহরের নাগরিকদের উপর এক বিপুল ট্যাক্‌সের বোঝা চাপাইবার আয়োজন চলিতেছিল। ইহার বিরুদ্ধে দিল্লীর সকল শ্রেণীর অধিবাসীরা ঐক্যবদ্ধ হইয়া এক কঠোর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। ইহাদের সহিত দিল্লী ক্যাণ্টনমেণ্টে অবস্থিত দেশীয় সৈন্যদলগুলিও অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হইতেছে শুনিয়া শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল। দিল্লী শহরের প্রত্যেকটি প্রবেশপথে শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের দ্বারা বিশেষ প্রহরার ব্যবস্থা এবং সন্ধ্যার পর কোন ভারতীয় নাগরিকের গৃহের বাহিরে যাওয়া বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছিল।[৩]

পাঞ্জাবের ঘটনায় বৃটিশ সরকারী মহল এতই ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়াছিল যে, তাহারা ও সামরিক অফিসারগণ তাহাদের স্ত্রী-পুত্র পাঞ্জাব হইতে বাহিরে প্রেরণ করিয়াছিল।

১। The Englishman, 14th October, 1907. ২। Ibid.
৩। J. Keir Hardie: India, Impressions and Suggestions, p. 67.

শাসকগোষ্ঠীর আক্রমণ

কৃষক-বিদ্রোহ ও সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহাত্মক ক্রিয়াকলাপে শাসকগণ বুঝিয়াছিল, কৃষিভূমির উপর কৃষকদের স্বত্ব হরণ করিলে এবং বর্ধিত কর আদায় আপাতত স্থগিত না রাখিলে পাঞ্জাবে কৃষক-বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহও অনিবার্য হইবে। তাই দিল্লীর শাসকগণ নূতন কৃষি-আইনের প্রবর্তন স্থগিত রাখিয়া কৃষক ও পাঞ্জাবী সৈন্যদের সন্তুষ্ট করিল। কিন্তু এবার তাহারা সৈন্যাধ্যক্ষগণ ও জঙ্গীলাটের দ্বিতীয় দাবি অনুযায়ী সমগ্র পাঞ্জাবে প্রচণ্ড দমননীতি প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। একমাত্র রাওয়ালপিণ্ডি শহরেই ৪৫ জন জননায়ককে গ্রেপ্তার করা হইল। লালা লাজপৎ রায়কে গ্রেপ্তার করিয়া বিনাবিচারে এবং অত্যন্ত গোপনে ব্রহ্মদেশে লইয়া গিয়া আটক করা হইল। এই সময় পাঞ্জাবের অন্যতম চরমপন্থী নায়ক অজিত সিং আত্মগোপন করিয়াছিলেন। প্রাণপণ চেষ্টায় পুলিস তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করে এবং অত্যন্ত গোপনে তাঁহাকেও ব্রহ্মদেশে লইয়া গিয়া আটক করিয়া রাখে। সমগ্র পাঞ্জাবে সভা ও শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এইভাবে নেতৃত্ব হইতে জনসাধারণকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এই দমননীতির প্রতিবাদে লাহোর, মাদ্রাজ, পুনা রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানের ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করিয়া হরতাল পালন করে।[১]

পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক সংগ্রামের চরিত্র বিশ্লেষণ

পাঞ্জাবের ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের বৈপ্লবিক সংগ্রাম অতি অল্পকাল স্থায়ী হইলেও তাহার তীব্রতা ছিল অসাধারণ। এই সংগ্রাম সমগ্র পাঞ্জাবে বিস্তৃত হইবার পূর্বেই বিপুল পুলিস ও সামরিক বাহিনীর আক্রমণে তাহা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই সংগ্রামের কোন পূর্ব-পরিকল্পনা বা কোন লক্ষ্যই ছিল না। সংগ্রামের কোন সংগঠন বা যোগ্য নেতৃত্বও ছিল না। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের বোম্বাইয়ের ৬ দিন ব্যাপী রাজনীতিক ধর্মঘট পরিচালনার জন্য যোগ্য শ্রমিক নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই সেই রক্তক্ষয়ী রাজনীতিক সংগ্রাম সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত ও আংশিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। কিন্তু পাঞ্জাবের শ্রমিক-শ্রেণী অত্যন্ত দুর্বল বলিয়া এবং সংগ্রামের অভিজ্ঞতা না থাকায় তাহাদের নিজস্ব কোন সংগঠন ও নেতৃত্ব গড়িয়া উঠে নাই। তাই নেতৃত্বের জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে মধ্যশ্রেণীর চরমপন্থীদের মুখাপেক্ষী হইয়াই থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু পাঞ্জাবের চরমপন্থীরা শ্রমিক ও কৃষককে সংগ্রামী শক্তি বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহাদের গণ-সংগ্রাম পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতা ছিল না। শ্রমিক সাধারণকে সংগ্রামের ক্ষেত্রে টানিয়া আনিবার জন্য শ্রমিকদের আর্থনীতিক দাবি তোলা একটি অপরিহার্য বিষয়। কিন্তু চরমপন্থী নায়কগণ তাহার গুরুত্ব কিছমাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। চরমপন্থীরা কৃষকদের মত শ্রমিকদের কোন সংগঠন গড়িয়া তোলেন নাই, এমনকি তাহাদের সংগ্রামে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান জানানও হয় নাই। শ্রমিকরাই উদ্যোগী হইয়া অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। পাঞ্জাবের শ্রমিক-কৃষককে সংগঠন ও নেতৃত্ববিহীন হইয়াই সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল।

১। Times of India, 18th May, and 25th May, 1907.

এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া শাসকগোষ্ঠী ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জমিদার ও শোষক-গোষ্ঠীকে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা দিয়া তাহাদের সহিত আপস স্থাপন করে এবং অপর দিকে প্রচণ্ড দমননীতি চালাইয়া কৃষক ও শ্রমিক-সংগ্রামকে স্তব্ধ করিয়া দেয়।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবে শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যশ্রেণী একযোগে রাজনীতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল—পাঞ্জাবের এই বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইহাই ছিল সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। লালা লাজপৎ রায়, অজিত সিং প্রভৃতি চরমপন্থী নায়কগণই ছিলেন এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের নায়ক।

পাঞ্জাবের অভ্যুত্থান বৃটিশ শাসনের সম্মুখে এক ভয়ঙ্কর বিপদের সৃষ্টি করিয়াছিল। দেশীয় সৈন্যবাহিনী ছিল ভারতবর্ষের বৃটিশ শাসনের অন্যতম প্রধান নির্ভর, আর পাঞ্জাবের কৃষকদের মধ্য হইতেই বহু সংখ্যক সৈন্য (শিখ ও জাঠ সৈন্য) সংগ্রহ করা হইত। কিন্তু পাঞ্জাবের কৃষক-বিদ্রোহের ফলে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণীর সহিত কৃষকগণ একযোগে বিদ্রোহ আরম্ভ করায় বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর সৈন্য সংগ্রহের একটি প্রধান উৎস অন্তত সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া যায়। কেবল তাহাই নয়, দোয়াব অঞ্চলের কৃষকগণের অধিকাংশই ছিল অবসর প্রাপ্ত সৈনিক। অবসরপ্রাপ্ত শিখ ও জাঠ সৈন্যদের লইয়াই 'দোয়াব কলোনি' গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। সুতরাং এই অবসর-প্রাপ্ত সৈনিকদের বিদ্রোহের ফলে সকল পাঞ্জাবী সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল। দোয়াবের খাল-অঞ্চলের কৃষকদের বিদ্রোহের সময় 'দশম জাঠ রেজিমেণ্ট'-এর অভ্যুত্থানের আয়োজনও শাসকগোষ্ঠীর সম্মুখে এক ভয়ঙ্কর বিপদের সম্ভাবনা লইয়া দেখা দিয়াছিল। শাসকগোষ্ঠী বিদ্রোহী কৃষকদের দাবি সাময়িকভাবে মিটাইয়া এই বিপদ এড়াইতে পারিয়াছিল।

পাঞ্জাবের এই অভ্যুত্থান কয়েকটি সর্বভারতীয় তাৎপর্য লইয়াই দেখা দিয়াছিল প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণ সংগ্রামের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব, সংগঠনের অভাব, আদর্শ ও লক্ষ্যের অভাব—কিছুই তাহাদিগকে সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। এমনকি শ্রমিকশ্রেণী যে সংগ্রামে যোগদানের আহ্বান ব্যতীতই স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি রাজনীতিক সংগ্রামে ('দি পাঞ্জাবী' পত্রিকার সম্পাদকের কারাদণ্ডের প্রতিবাদ-সংগ্রামে) যোগদান করিয়া-ছিল তাহার তাৎপর্য অসাধারণ। দ্বিতীয়ত, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রগণ সশস্ত্র সংগ্রামকেই প্রধান সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা সভা-শোভাযাত্রা ও শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকেই একমাত্র সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করে নাই এবং তাহাতে নিজেদের সংগ্রামকে সীমাবদ্ধ করিয়াও রাখে নাই। তাহাদের বিক্ষোভ, সভা-শোভাযাত্রা যখনই সাম্রাজ্যবাদের সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তখনই জনসাধারণের সংগ্রামও সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হইয়াছে। দীর্ঘস্থায়ী বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্য শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতির অভাব ছিল না, অভাব ছিল উপযুক্ত নেতৃত্বের, উপযুক্ত সংগঠনের, উপযুক্ত পরিকল্পনার। "প্রকৃতপক্ষে রাওয়ালপিণ্ডির অভ্যুত্থান

ব্যর্থ হইলেও তাহা ছিল এই শহরের বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধনের বীরত্বপূর্ণ প্রয়াস।"[১] এই প্রয়াস এমনকি বোম্বাইয়ের ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের রাজনীতিক শ্রমিক-সংগ্রামের মধ্যেও দেখা যায় নাই। তাই রাওয়ালপিণ্ডির অভ্যুত্থান ১৯০৫-০৮ খ্রীষ্টাব্দের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈপ্লবিক ঘটনারূপে চিরস্মরণীয়।

একাদশ অধ্যায়

ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম (১৯০৫-০৭)

১৯০৫-০৬ খ্রীষ্টাব্দের সংগ্রাম

বৃটিশ পণ্য বর্জনই ছিল 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর প্রধান অঙ্গ। এই সময় ভারতীয় কারিগরদের হস্তশিল্পের দ্বারা উৎপন্ন জিনিসপত্রে ভারতবর্ষের বাজার তলাইয়া যায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন কল-কারখানা স্থাপনের জন্যও বিশেষ উদ্যোগ আরম্ভ হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় মূলধন তখনও গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া নূতন নূতন ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপিত হইতে থাকে। এই ক্ষুদ্র শিল্পই স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগে মূলধন সঞ্চয় করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে বৃহৎ শিল্পে পরিণত হয়। ইহার পূর্বে যে সকল বৃহৎ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল উহাদের পক্ষে 'স্বদেশী আন্দোলন' ও বৃটিশ পণ্য বর্জন আরও বিকাশের মহাসুযোগ সৃষ্টি করে। এই আন্দোলনের ফলে বৃহৎ শিল্পের মালিকগণই লাভবান হয় অধিক। বাজারে বৃটিশ পণ্যের বিক্রয় বন্ধ হওয়ায় বৃহৎ শিল্পের মালিকগণ প্রায় একচেটিয়া বাজারের সুবিধা লাভ করে এবং তাহাদের পণ্যের ইচ্ছামত মূল্যবৃদ্ধি করিয়া প্রচুর মুনাফা লুণ্ঠন করিতে থাকে। অন্যদিকে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি হ্রাস পায় এবং অধিক উৎপাদনের জন্য মালিকগণ শ্রমিকদের দৈনিক কার্যকাল বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিয়া চলে। এই সময় কারখানা ও মিলে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হওয়ায় রাত্রিকালেও শ্রমিকদিগকে কাজ করিতে বাধ্য করা হয়। তাহার ফলে শ্রমিকদিগকে সকাল ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত কাজ করিতে হইত। কিন্তু তাহাদের মজুরিবৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় শ্রমিকদের আয় আরও হ্রাস পায়। এবার মজুরিবৃদ্ধি ও দৈনিক কাজের সময় হ্রাস করিবার দাবিতে চারিদিকে প্রবল বিক্ষোভ ও ধর্মঘট সংগ্রাম আরম্ভ হয়।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ'-এর ৪০০ জন গার্ড বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করে। দুই-এক দিনের মধ্যেই এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৯৫০ জনে পরিণত হয়। আংশিক দাবি পূরণের পর এই ধর্মঘটের অবসান হয়।[২] এই মাসের শেষ দিকে কলিকাতার সরকারী ছাপাখানার শ্রমিকগণ মজুরিবৃদ্ধি

১। Tilak and the Struggle for Indian Freedom, p. 644.

২। Times of India, 7th Oct, 1905; 14th Oct, 1905.

ও কার্যকাল হ্রাসের দাবি লইয়া ধর্মঘট করে। সরকার শ্রমিকদের দাবি পূরণ না করিয়া ছাপাখানায় 'লক-আউট' ঘোষণা করে।[১] নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ২০০ জন পিওন বেতন বৃদ্ধির দাবি লইয়া ধর্মঘট করে। তাহাদের ধর্মঘটের ফলে ডাক-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া যায়।[২]

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বোম্বাই শহরের ডাক-পিওনগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বেতন বৃদ্ধির দাবি লইয়া ধর্মঘট করে। কিন্তু তাহারা দাবি আদায় করিতে ব্যর্থ হয়। আবার তাহারা একই দাবি লইয়া ধর্মঘট করে আগস্ট মাসে। এবার তাদের সংখ্যা বাড়িয়া হয় ৫০০। কিন্তু দীর্ঘকাল ধর্মঘট চালাইয়াও তাহারা দাবি আদায় করিতে ব্যর্থ হয়।[৩] অক্টোবর মাসে বোম্বাইয়ের কোহিনূর ফ্যাক্টরির শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়া শতকরা ১০ টাকা হারে মজুরি বৃদ্ধি করিতে মালিকগণকে বাধ্য করে।[৪]

এই বৎসরের জুলাই মাসে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ'-এর শ্রমিকগণ মজুরিবৃদ্ধি, উৎকৃষ্ট পোশাক ও উন্নত বাসগৃহ (কোয়ার্টার) প্রভৃতির দাবি লইয়া ধর্মঘট আরম্ভ করে। কিন্তু তাহাদের ধর্মঘট কেবল এই সকল আর্থনীতিক দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। তাহাদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দাবি ছিল কর্তৃপক্ষের বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণের অবসান এবং অপমান সূচক 'নেটিভ' শব্দের পরিবর্তে 'ভারতীয়' শব্দের ব্যবহার। শ্রমিকগণ তাহাদের দাবি আদায়ের জন্য সাধারণ ধর্মঘটের আয়োজন করিতে থাকে। কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবি আংশিকভাবে পূরণ করিলে এই ধর্মঘটের অবসান হয়।[৫] এই ধর্মঘটে বিপিনচন্দ্র পাল এবং আরও কয়েকজন চরমপন্থী নায়ক শ্রমিকদিগকে সহায়তা দান করিয়াছিলেন।

'ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ'-এর শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ ক্রমাগতভাবে বাড়িয়াই চলিয়াছিল। আগস্ট মাসের শেষভাগে এই বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। শ্রমিকগণ কর্তৃপক্ষের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ধর্মঘট ঘোষণা করে। জামালপুর রেল-কারখানার শ্রমিকদের সহিত উচ্চপদস্থ বৃটিশ কর্মচারীদের এক প্রচণ্ড দাঙ্গায় কর্মচারিগণ তাহাদের রিভলভার দিয়া শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণ করে। ইহার ফলে বহু শ্রমিক আহত হয়। কারখানা দীর্ঘকাল পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়। ইহার পর শ্রমিকদের দাবি আংশিকভাবে পূরণ করা হইলে ধর্মঘটের অবসান হয়। এই সময় 'বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ'-এর খড়্গপুর স্টেশনে শ্রমিকগণ ধর্মঘট করে।[৬]

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের শ্রমিক সংগ্রাম

১৯০৫-০৮ খ্রীষ্টাব্দের বৃটিশ পণ্য বর্জন আন্দোলনের ফলে এই সময় নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শ্রমিকদের বেতনবৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা হয় নাই। উপরন্তু তাহাদের কার্যকাল বৃদ্ধি করা হয় এবং নানাবিধ উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থার ফলে শ্রমিকদের বেতন হ্রাস পায়। তাহাদের বিভিন্ন সুবিধা-

১। Ibid, 28 Oct., 1905.
২। Ibid, 11 Nov., 1905,
৩। Ibid, 8 August ; 25 August, 1906
৪। Ibid, 28 Oct., 1906,
৫। Times of India, 28 July, 1906.
৬। Ibid, 15 September, 1906

শ্রমিকদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিলে ২৮শে নভেম্বর রেল-শ্রমিকগণ সর্বত্র ধর্মঘট প্রত্যাহার করিয়া কাজে যোগদান করে।[১]

রেল-ধর্মঘটের তাৎপর্য

এই ভারতব্যাপী রেল-ধর্মঘট ১৮ই নভেম্বর হইতে ২৭শে নভেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। এই দশ দিন বৃটিশ বড়লাটের কলিকাতা কেন্দ্রের সহিত ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের রেল-যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই ধর্মঘট ভারতের বৃটিশ শাসনের মর্যাদা ও বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর গর্বোদ্ধত শির ধূলায় লুটাইয়া দিয়াছিল।

এই ধর্মঘট কেবল এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিন-চালক আর গার্ডদের আর্থিক দাবির সংগ্রাম হইলেও ইহা সেই সময়ের ভারতব্যাপী 'স্বদেশী আন্দেলন'-এর অনিবার্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল এবং সকল ভারতীয় শ্রমিক ও 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর নায়কগণের সক্রিয় সমর্থন লাভ করিয়া ইহা দেশব্যাপী 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হইয়াছিল। সেই 'স্বদেশী আন্দোলন' ও তাঁহার পূর্ব হইতে পরিচালিত ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর আপসহীন, বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে উৎসাহিত হইয়াই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শ্রমিকগণও বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

৩. 'ইস্টার্ন বেঙ্গল রেল' ধর্মঘট

রেল-শ্রমিকদের ধর্মঘট সংগ্রাম আরও বিস্তার লাভ করে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। এই সময় 'ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলপথ'-এর ভারতীয় রেল ইঞ্জিন-চালক, ফায়ারম্যান ও ব্রেকম্যানগণ মজুরিবৃদ্ধির দাবি লইয়া ধর্মঘট আরম্ভ করে।[২] এই ধর্মঘটের ফলে এই রেলপথের সকল মালগাড়ী চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। কর্তৃপক্ষ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কর্মীদের ধর্মঘট মিটাইলেও ভারতীয় শ্রমিকদের এই সংগ্রাম বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত ছিল না। তাহারা শ্রমিকদিগকে ভয় দেখাইয়া ও উৎপীড়ন করিয়া ধর্মঘট ভাঙিবার উদ্দেশ্যে বিপুল সংখ্যক সৈন্য আমদানি করে, তাহাদিগকে ও সশস্ত্র পুলিস বাহিনীকে শ্রমিকদের উপর লেলাইয়া দেয়। বৃটিশ সৈন্যরা আসিয়া ধর্মঘটের কেন্দ্রগুলি অধিকার করিয়া ট্রেন চালাইবার ভার গ্রহণ করে। ধর্মঘটী শ্রমিকদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া ৬০০ জনকে বরখাস্ত করা হয় এবং সকল শ্রমিকের উপর বিভিন্ন প্রকারের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ইহার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে গভীর হতাশা দেখা দেয়। এই হতাশার ফলে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহেই ধর্মঘটের অবসান ঘটে।[৩]

৪. ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের সংগ্রাম

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট হয় মহীশূর রাজ্যে অবস্থিত কোলার স্বর্ণখনিতে। খনিটি ছিল বৃটিশ সরকারের পরিচালনাধীন।

১। Ibid, Nov. 30, 1907. ২। Times of India, Dec, 28, 1907.
৩। Ibid, January, 4, 1908.

স্বর্ণখনির দেড় হাজার শ্রমিক নিজেদের উদ্যোগে একটি ট্রেড য়ুনিয়ন গঠন করে। বেতনবৃদ্ধি, দৈনিক কাজের সময় হ্রাস, মানবিক ব্যবহার ও অন্যান্য দাবি লইয়া শ্রমিকদের ধর্মঘট আরম্ভ হয়। ধর্মঘট চলে ১৫ দিন। পুলিসের সহিত শ্রমিকদের বহু সংঘর্ষ হয়। সশস্ত্র পুলিশ খনি দখল করে এবং কয়েকটি রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর ধর্মঘট ভাঙিয়া যায়। 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া'র সংবাদে প্রকাশ, প্রায় ৫০ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদের মধ্যে ২৭ জন বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদের কারাদণ্ড লাভ করে।[১]

* * * * *

ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান সংগ্রাম এবং বৃটেনের ল্যাঙ্কাশায়ারের মালিক-গোষ্ঠীর চাপে ভারত সরকার ভারতের শ্রমিক-সমস্যাটি বুঝিবার জন্য তৎপর হইয়া উঠে। ইহার ফলেই ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বস্ত্রশিল্পের সমস্যা বুঝিবার জন্য 'টেক্সটাইল ফ্যাক্টরি লেবার কমিটি' নামে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন এই কমিটির রিপোর্ট বাহির হয়। এই রিপোর্টে শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় হ্রাস করিয়া ১২ ঘণ্টা এবং সপ্তাহের কাজের সময় ৭২ ঘণ্টা করিবার প্রস্তাব করা হয়। ইহা ব্যতীত এই রিপোর্টে শ্রমিকদের অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশা এবং তাহাদের চরম গৃহসমস্যার প্রতি মিল-মালিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু এই অনুসন্ধান-কমিটির সুপারিশের ফল হইল না কিছুই। বৃটিশ ও ভারতীয় মালিকগণ মিলিত হইয়া ইহার বিরোধিতা করায় শ্রমিকদের দাবি পূরণের কোন ব্যবস্থাই হইল না।

১৯০৬ এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতব্যাপী ধর্মঘট সংগ্রামের ফলে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বস্ত্রশিল্প ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য 'ফ্যাক্টরি লেবার কমিশন' গঠিত হয়। কিন্তু ইহাতেও কোন সুফল ফলে নাই।

'ফ্যাক্টরি লেবার কমিশন'-এর নিকট সাক্ষ্যদানকালে ভারতীয় মিল-মালিকগোষ্ঠী সঙ্ঘবদ্ধভাবে শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় হ্রাস ও অন্যান্য দাবির তীব্র বিরোধিতা করিয়া শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাহাদের শ্রেণী-সংহতি প্রদর্শন করে। বিশেষত শ্রমিকদের কাজের সময় হ্রাস করিবার সুপারিশের বিরুদ্ধে তাহাদের বিরোধিতা শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে 'জেহাদ'-এর রূপ নেয়।

শ্রমিকদের দাবিদাওয়া ও কাজের ঘণ্টা হ্রাস করিবার সুপারিশের বিরুদ্ধে ভারতের য়ুরোপীয় মালিকগোষ্ঠীর 'জেহাদ'ও সমান তালে চলে। য়ুরোপীয় 'জুটমিল এ্যাসোসিয়েশন' শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা হ্রাস করিবার তীব্র বিরোধিতা করে।[২] আগ্রার একজন বৃটিশ মিল-মালিক ঘোষণা করেন যে, যদিও গ্রেট ব্রিটেনে শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা নির্দিষ্ট করিবার ব্যাপারে ট্রেড ইউনিয়নের মত গৃহীত হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতবর্ষে তিনি সেই ব্যবস্থা কিছুতেই সহ্য করিবেন না।[৩]

এই সকল ক্রিয়াকলাপ হইতে দেখা যায়, শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণের প্রশ্নে ভারতীয় বুর্জোয়াগোষ্ঠী আর য়ুরোপীয় বুর্জোয়াগোষ্ঠী উভয়ে বরাবর একমত ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াই

১। Ibid, 2 February, 1908. ২। Times of India. vol 1, p. 75-79.
৩। Ibid, vol-II, p. 244.

চলিয়াছে, শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে এবং এইভাবে বৃটিশ ও ভারতীয় মূলধনী শ্রেণীর সংহতি গড়িয়া তুলিয়াছে।

অন্যদিকে এই ঐক্যবদ্ধ মূলধনী মালিকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই ক্রমশ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ভারতের শ্রমিকশ্রেণী চালাইয়া গিয়াছে তাহাদের নিজস্ব সংগ্রাম। এই সংগ্রাম বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কেবল আর্থনীতিক দাবি আদায়ের সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও তাহাও বৈপ্লবিক তাৎপর্য লইয়াই দেখা দিয়াছিল। কারণ, এই আর্থনীতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়াই একদিকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর লৌহদৃঢ় সংগ্রামী ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছিল এবং অপর দিকে শ্রমিকশ্রেণী সকল শিল্পে কাজের সময় হ্রাস ও মজুরি বৃদ্ধির সংগ্রাম অব্যাহতভাবে চালনা করিয়া মূলধনী মালিকগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান মুনাফায় ভাগ বসাইতে সক্ষম হইয়াছিল। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাহাদের শ্রেণীসংগ্রাম চালাইতে শিখিয়াছিল।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রধানত দুইটি দাবি লইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে শ্রমিক-শ্রেণী সংগ্রাম চালনা করিয়াছিল। এই দুইটি দাবির একটি ছিল সকল মিল ও কারখানায় ১২ ঘণ্টার কাজের দিন এবং অপরটি ছিল ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মজুরিবৃদ্ধি।

এই সময় বুর্জোয়াশ্রেণী আর শ্রমিকের শ্রেণী-সংগ্রামের মূল চিত্রটি ছিল এইরূপ: একদিকে বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিকের কাজের সময় বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং অপর দিকে শ্রমিকশ্রেণী তাহার কাজের সময় হ্রাস করিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ফ্যাক্টরি লেবার কমিশন'ও উভয় পক্ষের এই সংগ্রামের কথা স্বীকার করিয়াছেন। সেই সময় সমগ্র ভারতের শ্রমিকশ্রেণী মিল-কারখানায় দৈনিক কাজের সময় হ্রাস করিয়া ১২ ঘণ্টা করিবার জন্যই দাবি তুলিয়াছিল এবং সেই দাবি পূরণের জন্য আপসহীন সংগ্রাম চালনা করিয়াছিল।

শ্রমিকশ্রেণীর এই সংগ্রাম ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়াগোষ্ঠীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, শ্রমিকশ্রেণীর এই সংগ্রাম জয়যুক্ত হইলে তাহাদের শোষণের পথ বন্ধ হইবে এবং ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক শীঘ্রই তাহাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখা দিবে। তাই তাহারা নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য একদিকে বৃটিশ বুর্জোয়াগোষ্ঠীর সহিত আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে এবং অপর দিকে তাহাদের মুখপাত্র কংগ্রেসের 'নরমপন্থী'দের মারফত কংগ্রেসকে শ্রমিক-সংগ্রাম হইতে দূরে রাখিবার জন্য সচেষ্ট হয়। কিন্তু মধ্যশ্রেণীর 'চরমপন্থী'রা বুর্জোয়াশ্রেণীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ছিল না বলিয়াই তিলক প্রভৃতি তাঁহাদের অনেকে শ্রমিকশ্রেণীকে একটি সংগ্রামী শক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া উহাকে তাঁহাদের নেতৃত্বে জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে টানিয়া আনিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী যে এই যুগের সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী শ্রেণী সেই সম্বন্ধে এবং উহার সংগ্রামী ভূমিকা ও তাহার তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ধারণা না থাকায় তাঁহারা শ্রমিকশ্রেণীকে কেবল নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার কথাই চিন্তা করিয়াছিলেন। শ্রমিক-সংগ্রাম

সমর্থন করিলে বুর্জোয়াশ্রেণী রুষ্ট হইবে—এই ভয়ে তাঁহারা শ্রমিকশ্রেণীর দেশব্যাপী সংগ্রামে সক্রিয় সমর্থন জানাইতে পারেন নাই, কেবল দূর হইতে ইহার তারিফ করিয়াই কর্তব্য শেষ করিয়াছেন[১]।

মাদ্রাজের বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৯০৮)
জাতীয় বুর্জোয়া-নেতৃত্বে 'স্বদেশী আন্দোলন'

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে মাদ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় গণ-সংগ্রাম বৈপ্লবিক রূপ ধারণ করে। মাদ্রাজ প্রদেশেও 'চরমপন্থী'রাই 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহু পূর্ব হইতেই জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং বিভিন্ন সমাজ-সংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাপের ফলে প্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে, বিশেষত টিনেভেলি ও তিউতিকোরিন শহরে জনসাধারণ ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে 'চরমপন্থী'দের প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

মাদ্রাজের 'চরমপন্থী'দের শ্রেষ্ঠ নায়ক ছিলেন চিদম্বরম্ পিলে। চিদম্বরম্ পিলে ছিলেন মাদ্রাজের জাগরণশীল জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি। 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর সুযোগে পিলে মূলধন সংগ্রহ করিয়া 'স্বদেশী ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানি' নামে একটি জাহাজ কোম্পানি গঠন করেন। এই কোম্পানির জাহাজ তিউতিকোরিন হইতে কলম্বো পর্যন্ত যাতায়াত করিত। পূর্বে বৃটিশ মালিকানাধীন 'বৃটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানি'র জাহাজই কেবল এই পথে চলাচল করিত। সিংহলের পথে জাহাজের ব্যবসা ছিল তাহাদের একচেটিয়া। সুতরাং নবগঠিত 'স্বদেশী ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানি'র সহিত ইহাদের প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। শীঘ্রই ব্যবসাগত দ্বন্দ্ব রাজনীতিক দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। একদিকে স্থানীয় 'চরমপন্থী'রা স্বদেশী গ্রহণ ও স্বরাজ লাভ এবং তাহার উপায় হিসাবে বৃটিশ পণ্যবর্জনের আন্দোলন ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর করিয়া তুলিতেছিলেন এবং স্থানীয় জনসাধারণ ও জাতীয় বুর্জোয়াদেরও আন্দোলনে টানিয়া আনিতেছিলেন, আর অপর দিকে স্থানীয় বৃটিশ ব্যবসায়ী মহল বর্জন-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, বিশেষত চিদম্বরম্ পিলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সরকারের উপর চাপ দিতেছিল।

টিনেভেলি ও তিউতিকোরিনের জনসাধারণ বৃটিশ বাসিন্দাদের সকল প্রকারে বয়কট করিয়া রাখে, এমনকি ঘরের বাহির হওয়াই তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তাহাদের নিকট জিনিসপত্র বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেয়। সে সময় তাহাদের পক্ষে এমনকি খাদ্য সংগ্রহ করাও অসম্ভব হইত। তাহারা সিংহল হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া উপবাসের হস্ত হইতে রক্ষা পাইত। ভারতীয় গৃহ-ভৃত্যগণও বৃটিশ সাহেবদের বাড়ীর কার্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তাহারা রাজপথে বাহির হইলে ক্রুদ্ধ জনতা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ধরিয়া 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে বাধ্য করিত।[২]

১। 'Bande Mataram' Quoted in Times of India, Sept. 21, 1907, p. 8.

২। Times of India, 11 April, 1908.

চিদম্বরম্ পিলের নেতৃত্বে 'চরমপন্থী'রা শ্রমিকদেরও সংগঠিত এবং স্বদেশীর মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী তিউতিকোরিণের কোরান মিলের শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়া 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে শহর পরিভ্রমণ করে। 'চরমপন্থী-রা চাঁদা তুলিয়া শ্রমিকদিগকে খাদ্য সরবরাহ করেন। শ্রমিকদের সংগ্রাম 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়।

বয়কটের ফলে বৃটিশ ব্যবসা বন্ধ হইয়া যায় এবং ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বাজার দখল করিয়া বসে। এইভাবে জাতীয় বুর্জোয়াগোষ্ঠী বাজার দখল করিবার জন্য জনসাধারণের সাহায্য গ্রহণ করে এবং তাহাদিগকে 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর নামে সংগ্রামের মধ্যে টানিয়া আনে।

বৃটিশ বাসিন্দাদের চাপে অবশেষে মাদ্রাজে সরকার প্রচণ্ড দমননীতি চালাইয়া এই 'স্বদেশী আন্দোলন' বন্ধ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। পুলিস চিদম্বরম্ পিলে এবং আরও দুইজন 'চরমপন্থী' নায়ককে 'রাজদ্রোহ'-এর অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। ইহার পূর্ব হইতে বাঙলাদেশের 'চরমপন্থী' নায়ক বিপিনচন্দ্র পাল মাদ্রাজে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন। এই সময় তাঁহার মুক্তিলাভের কথা ছিল। টিনেভেলির জনসাধারণ এই উপলক্ষে এক গণ-উৎসবের আয়োজন করিয়াছিল। টিনেভেলির ম্যাজিস্ট্রেট এক বিশেষ আদেশে এই উৎসব বন্ধ করিয়া দেন। টিনেভেলি ও তিউতিকোরিনে সকল সভা ও শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। টিনেভেলি শহরের বৃটিশ ম্যাজিস্ট্রেট ১৫ বৎসরের একটি বালককে 'বৃটিশ পণ্যবর্জন আন্দোলন'-এ অংশ গ্রহণ করিবার জন্য বেত্রদণ্ড দান করেন।[১] এই অমানুষিক শাস্তিদানের ফলে টিনেভেলির জনসাধারণ ক্রোধে ফাটিয়া পড়ে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ হইতে জনসাধারণের প্রতিবাদ-সংগ্রাম আরম্ভ হয়।

রাজপথে জনতার যুদ্ধ

১৪ই মার্চ টিনেভেলি ও তিউতিকোরিনের ব্যবসায়িগণ তাহাদের সমস্ত দোকান-পাট ও ব্যবসা বন্ধ রাখে। ছাত্র ও অফিসের কর্মচারীবৃন্দ ধর্মঘট পালন করে। তিউতিকোরিনের ব্যবসায়ী-ছাত্র-কেরানী-শ্রমিক জনসাধারণ কয়েকখানি ট্রেনে চড়িয়া টিনেভেলি শহরে সমবেত হয়। ইহার পর কয়েক হাজার মানুষের এক বিশাল শোভাযাত্রা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া বিভিন্ন রাজপথ ভ্রমণ করে। শোভাযাত্রী জনতা টিনেভেলির 'টাউন হল', থানা ও আদালত-গৃহ আক্রমণ করিয়া অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করে। পুলিসবাহিনী জনতার উপর রাইফেল হইতে গুলিবর্ষণ করিলে জনতা লাঠি ও ইষ্টক খণ্ডের দ্বারা পুলিস বাহিনীকে বিতাড়িত করে। তাহার পর তাহারা বৃটিশ ব্যবসায়ীদের সকল দোকানপাট এবং কলকারখানা-অফিস প্রভৃতি অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করে। তিউতিকোরিণের কোরাল মিলের শ্রমিকগণ 'চরমপন্থী'দের গ্রেপ্তার ও দমনমূলক ক্রিয়াকলাপের প্রতিবাদে ধর্মঘট করিয়া টিনেভেলি শহরে উপস্থিত হয় এবং শহরের রাজপথে শোভাযাত্রা করিয়া জনতার সহিত মিলিত হয়।

১। Ibid, 13 June, 1908

জনতার সহিত সংঘর্ষে পরাজিত হইয়া পুলিস বাহিনী পলায়ন করিলে কিছুক্ষণের জন্য জনতা শহর দখল করে। ইহার পর কর্তৃপক্ষের নির্দেশে একদল বৃটিশ সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। সৈন্যদল জনতার সম্মুখীন হইলে রাজপথে প্রচণ্ড সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। সৈন্যদের গুলিবর্ষণে বহু ব্যক্তি হতাহত হয়। অবশেষে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। সৈন্যগণ বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

ইহার পর ধৃত ব্যক্তিদের লইয়া রাজদ্রোহের অভিযোগে এক মামলা আরম্ভ হয়। মামলার একপক্ষীয় বিচারে ২৮ জন বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড লাভ করে। আর চিদম্বরম্ পিলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

টিনেভেলি ও তিউতিকোরিনের সংগ্রামে উৎসাহিত হইয়া মাদ্রাজ প্রদেশের অন্যান্য শহরেও সংগ্রাম প্রবল হইয়া উঠে এবং বিভিন্ন স্থানে পুলিস ও সৈন্যদলের সহিত জনতার প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলিতে থাকে। মাদ্রাজের তামিল ভাষাভাষী জেলাগুলির সংগ্রাম ক্রমশ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রূপ গ্রহণ করে। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দক্ষিণ অংশে জনতার সংগ্রাম সবাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। এই রাজ্যের রাজধানী ত্রিভানদ্রাম শহর হইতে এই সংগ্রাম আরম্ভ হয়।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন একদল পুলিস ত্রিভানদ্রামের বাজারে প্রবেশ করিয়া গরুর গাড়ীর একজন গাড়োয়ানকে প্রহার করিয়া তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলিয়া যায়। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া ত্রিভানদ্রাম শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সংগ্রামের আগুন জ্বলিয়া উঠে। পুলিসের এই অত্যাচারের প্রতিবাদে শহরের সকল দোকান এবং স্কুল-কলেজ বন্ধ হইয়া যায়, শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়া রাজপথে বাহির হয়। অল্প সময়ের মধ্যে পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে বহু কৃষক ও সাধারণ মানুষ শহরে আসিয়া উপস্থিত হয়। ত্রিভানদ্রাম শহর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের এক বিশাল জন-সমুদ্রে পরিণত হয়।

পুলিসের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি সহ এক আবেদনপত্র লইয়া জনতা শোভাযাত্রা করিয়া ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজের নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু মহারাজ তাহাদের আবেদন অগ্রাহ্য করেন। জনতা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান আরম্ভ করে। ক্রুদ্ধ জনতা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ত্রিভানদ্রামের দুর্গ আক্রমণ করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করে এবং দুর্গের অভ্যন্তরস্থ শহরের থানা আক্রমণ করিয়া পুলিসদের তাড়াইয়া দেয়। ইহার পর তাহারা জেলখানা আক্রমণ করে এবং জেলের ফটক ভাঙিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া বন্দীদের মুক্ত করে। জনতা শহর অধিকার করিয়া থাকে।

পরদিন ত্রিবাঙ্কুরের রাজার অনুরোধে নিকটবর্তী সামরিক ঘাঁটি হইতে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী আসিয়া উপস্থিত হয়। সৈন্যদের সহিত জনতার কয়েকটি সংঘর্ষ ঘটে। এই সকল সংঘর্ষে বহু প্রাণহানির পর জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। সৈন্যবাহিনী পুনরায় শহর দখল করে। ১৩ই জুন 'টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় এই অভ্যুত্থান সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয় :

"শহরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ ছিল। দুর্গের অভ্যন্তরস্থিত থানা লুণ্ঠন করিয়া অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করা হয়। প্রহারের ফলে পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আহত হন। জনতা রাজপ্রাসাদ হইতে ফিরিবার পথে দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিয়া থানা হইতে কনেস্টবলদের বিতাড়িত করে। তাহারা হাজতের বন্দীদের মুক্ত করিয়া দেয় এবং সমস্ত দলিলপত্র পোড়াইয়া থানা গৃহে অগ্নিসংযোগ করে।[১]

গুণ্টুর শহরেও এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান আরম্ভ হইলে সৈন্যবাহিনী আসিয়া সেই বিদ্রোহ দমন করে। কিন্তু পুলিসের সহিত জনতার সংঘর্ষ আরও কয়েক বার ঘটিয়াছিল। প্রায় এক বৎসর পরে গুণ্টুরে আর একটি অভ্যুত্থান হইয়াছিল।[২]

দ্বাদশ অধ্যায়

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের

বোম্বাই শ্রমিকের রাজনীতিক সংগ্রাম[৩]

শ্রমিক-সংগ্রামের প্রথম স্তর

বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতিক ধর্মঘটকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাজনীতিক ধর্মঘট বলিয়া উল্লেখ করা হইলেও শোলাপুর ও নাগপুরের শ্রমিকগণই তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে প্রথম ধর্মঘট করিয়াছিল। কিন্তু সেই ধর্মঘট মাত্র একদিনই চলিয়াছিল বলিয়া ইহার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না।

বাল গঙ্গাধর তিলকের ৬ বৎসরের নির্বাসন-দণ্ড উপলক্ষে বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের রাজনীতিক ধর্মঘট ভারতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ও যুগান্তকারী ঘটনা। এই ধর্মঘট ভারতের ইতিহাসের ভবিষ্যৎ গতিপথেরও নির্দেশ দিয়াছে এবং ইহা হইতেই পাওয়া গিয়াছে সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতিক জাগরণের ইঙ্গিত। কেবল শ্রমিকশ্রেণীই যে সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে স্বাধীনতা লাভ এবং শোষণ-উৎপীড়ন হইতে মুক্তিলাভের পথ দেখাইতে পারে তাহারও ইঙ্গিত বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর এই রাজনীতিক ধর্মঘট ও আপসহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তাই লেনিন এই ধর্মঘট লক্ষ্য করিয়া এবং ইহার বিপুল তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া লিখিয়াছিলেন :

"ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী ইতিমধ্যেই শ্রেণী-সচেতন রাজনীতিক গণ-সংগ্রাম

১। Times of India, 13 June, 1908. ২। Valentine Chirol : Ibid, p. 114.

৩। এই অংশের তথ্যসমূহের উৎস : Tilak & the Struggle for National Freedom (The Chapter on Social and Economic Condition of Bombay Workers etc. by L. A. Gordon) and other books and articles.

চালনার জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষে রুশীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত বৃটিশ শাসনের খেলা এবার শেষ হইতে চলিয়াছে।"[১]

বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী উহার এই শ্রেণী-সচেতন রাজনীতিক চেতনা একদিনে বা আকস্মিকভাবে লাভ করে নাই। বোম্বাইয়ের এবং সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর দীর্ঘকালের ধর্মঘট-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা হইতেই তাহারা উহা আয়ত্ত করিয়াছিল। বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর এই রাজনীতিক সংগ্রাম সচেতন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা এবং গণতান্ত্রিক ভাবধারারই পরিচায়ক। শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব শ্রেণী-সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সহিত যুক্ত হইয়াছিল বাহিরের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও গণতান্ত্রিক ভাবধারা। তৎকালের মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়, বাঙলা-দেশের বিপিনচন্দ্র পাল, মাদ্রাজের চিদম্বরম্ পিলে প্রভৃতি 'চরমপন্থী' নায়কদের দ্বারা পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী 'স্বদেশী আন্দোলন' হইতেই যে সর্বপ্রথম ভারতের, বিশেষত বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক চেতনা লাভ করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীর আর্থনীতিক সংগ্রামের সহিত বৈপ্লবিক, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের আদর্শ যুক্ত হইয়াই বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের রাজনীতিক ধর্মঘট সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল।

* * * *

ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী উহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ ও ভারতীয় উভয় মালিকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই দৈনিক ১৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ১২ ঘণ্টার কাজ, জীবন ধারণের উপযুক্ত মজুরি এবং অমানুষিক জীবনযাত্রার পরিবর্তনের দাবি লইয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল। শ্রমিকশ্রেণীকে উহার সংগ্রামী জীবনের প্রারম্ভেই বৈদেশিক শাসনের পুলিস ও সামরিক শক্তি, সাম্রাজ্যবাদীদের আইন-আদালত প্রভৃতি উৎপীড়ন-যন্ত্রের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। প্রথম হইতেই শ্রমিকশ্রেণীকে কেবল ব্যক্তিগত মিল মালিকদের বিরুদ্ধেই নহে, মিল-মালিকগোষ্ঠীর সমবেত শক্তি এবং ভারতের বৃটিশ রাষ্ট্র-যন্ত্রের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। তাহার ফলেই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বৈপ্লবিক ভাবধারার বীজ উপ্ত হইয়াছিল, এই ভাবধারাই শ্রমিক-শ্রেণীকে সমগ্র ভারতবাসীর জীবনের দুঃখ-দুর্দশা এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন—এই উভয়ের সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে সাহায্য করিয়াছিল। এইভাবেই ভারতীয় সমাজে এক প্রকৃত বৈপ্লবিক শক্তির আবির্ভাবের পথ প্রস্তুত হইয়াছিল।

বোম্বাই শহরে শিল্প-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিকশ্রেণীর এই সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী প্রথম ধর্মঘট করিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে। সেই ধর্মঘটগুলি ছিল অসংগঠিত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। সেই সকল সংগ্রামে অতি অল্প সংখ্যক শ্রমিকই অংশ গ্রহণ করিত। এমন কি এই সকল সংগ্রামে শ্রমিকদের কোন স্পষ্ট দাবিও থাকিত না। তবে প্রায় সকল সংগ্রামেই

১। V. I. Lenin: The National Liberation Movement in the East, Moscow (1957), p. 15.

মজুরি বৃদ্ধির দাবিটি তোলা হইত, আর থাকিত মিল-কারখানার অসহনীয় অবস্থার প্রতিকারের দাবি। এইভাবেই ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর মুখে সর্বপ্রথম শোষণ-উৎপীড়ন ও অমানুষিক অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়, সংগ্রামের পথের সহিত শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম পরিচয় ঘটে। প্রথম যুগে ইহার তাৎপর্য ছিল অসাধারণ।

বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রথম চেষ্টা হয় উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে। সেই চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন কয়েকজন উদারপন্থী, মানব-প্রেমিক ব্যক্তি। তাঁহাদের মধ্যে এন. এম. লোকহাণ্ডের নাম সর্বাগ্রগণ্য। তিনিই প্রথম ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন এবং বোম্বাইয়ের জনসাধারণকে শ্রমিকদের দাবির প্রতি সমর্থন জানাইতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই শ্রমিক-সম্মেলন হইতেই ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের 'ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট'-এর পরিবর্তন, সপ্তাহে একদিনের বেতনসহ ছুটি, যান্ত্রিক দুর্ঘটনার জন্য শ্রমিকদের ক্ষতি-পূরণদান প্রভৃতি লইয়া আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। শ্রমিকদের মধ্যে এই সকল দাবি প্রচারের জন্য শ্রমিকদের বহু সভাও হইয়াছিল। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বহু শ্রমিকের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি দাবিপত্র বড়লাটের নিকট পেশ করিয়া নিম্নোক্ত দাবি জানানো হইয়াছিল: (১) প্রতি সপ্তাহের রবিবার বেতনসহ ছুটি, (২) দ্বিপ্রহরে অর্ধ ঘণ্টার কর্ম-বিরতি, (৩) মিল-কারখানার কাজের সময় হইবে সকাল ৬টা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত, (৪) শ্রমিকদিগকে মাস হিসাবে মজুরি দিবার ব্যবস্থা করিতে এবং মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পূর্ব মাসের মজুরি দিতে হইবে, (৫) অসুস্থতা ও দুর্ঘটনাবশত সাময়িক অকর্মণ্যতার জন্য মজুরি দিতে হইবে, (৬) কারখানায় কাজের সময় দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটিলে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বোম্বাইয়ের একটি সভায় ১০ হাজার শ্রমিক উপস্থিত হইয়া এই সকল দাবি সমর্থন করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত সমগ্র শ্রমিক অঞ্চলে আরও বহু সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।[১] বোম্বাই তথা ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ইহা এক অভূতপূর্ব ঘটনা। কারণ, ইহাই ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর ট্রেড য়ুনিয়ন আন্দোলনের অগ্রগতির সূচনা করিয়াছিল।

কিন্তু লোকহাণ্ডে প্রভৃতি উদারপন্থী, মানবপ্রেমী শ্রমিকনায়কগণ কখনও মালিক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ ও জঙ্গী সংগ্রাম সমর্থন করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, শ্রমিকের শ্রেণী-সংগ্রামকে তাঁহারা অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখিতেন এবং প্রাণপণে বাধা দিতেন। সুতরাং মিলের কাজের অসহনীয় অবস্থা ও মালিকশ্রেণীর উৎপীড়নের বিরুদ্ধে শ্রমিকদিগকে নিজেদের উদ্যোগে ও দায়িত্বেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইত এবং প্রথমে অসংগঠিত অবস্থায়ই তাহারা সংগ্রাম করিত। এইভাবে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে স্ত্রী ও শিশু-শ্রমিক সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের জুবিলি মিলের স্ত্রী-শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়া কিছু সুবিধা-সুযোগ আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছিল।[২] এই যুগে

১। A. Mukhtar : Trade Unionism and Labour Disputes in India, p. 11.

২। L. A. Gordon : Ibid, p. 534.

ধর্মঘট-সংগ্রাম ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও আকস্মিকভাবেই দেখা দিত এবং সামান্য সুবিধা-সুযোগ আদায় করিয়াই শেষ হইত।

উদারপন্থী, মানবপ্রেমী শ্রমিক নায়কগণ শ্রমিকদের জঙ্গী ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া সকল সময়ই চেষ্টা করিতেন শ্রমিক-সংগ্রামকে কর্তৃপক্ষের নিকট দাবিপত্র পেশ করিবার আন্দোলন, সেই দাবিপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহের আন্দোলন এবং শান্তিপূর্ণ সভাসমিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী শীঘ্রই এই উদারপন্থী নায়কগণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া নিজেরাই নিজেদের উদ্যোগে সংগ্রামের পথে পদার্পণ করিতে আরম্ভ করে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই শ্রমিকশ্রেণী উদারপন্থী নায়কদের শত চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। ইহার ফলে উদারপন্থীদের পূর্বোক্ত শান্তিবাদী শ্রমিক সম্মেলনের সংগঠনটি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পে সংকট ঘনাইয়া আসে। এই সময় জাপানের বস্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্প পশ্চাৎ অপসরণ করিতে বাধ্য হয় এবং উহার দূর প্রাচ্যের বাজার সংকুচিত হইয়া পড়ে। মালিকগোষ্ঠী শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস করিয়া এই সংকট এড়াইবার চেষ্টা করে। মালিকগোষ্ঠীর এই আক্রমণের বিরুদ্ধেই আরম্ভ হয় শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘট সংগ্রাম।[১]

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বোম্বাইয়ের 'হীরামানেক কোম্পানি'র বিভিন্ন মিলে মজুরি হ্রাসের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলে ইহার প্রতিবাদে ৩ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করে। ইহার তিনদিন পর পার্শ্ববর্তী 'ওরিয়েন্টাল মিলের' তাঁতবিভাগের শ্রমিকগণ ধর্মঘট আরম্ভ করে এবং অন্যান্য মিলের শ্রমিকগণও ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত হয়। অবশেষে মালিকপক্ষ বিপদ বুঝিয়া মজুরি কাটা বন্ধ করে।[২]

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই শ্রমিকশ্রেণীর আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম ক্রমশ আক্রমণাত্মক সংগ্রামে পরিণত হইতে থাকে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে প্লেগ মহামারী দেখা দিলে শ্রমিকগণ দলে দলে কারখানা ত্যাগ করিয়া গ্রামাঞ্চলে পলায়ন করিতে থাকে। ইহার ফলে বোম্বাইয়ের শিল্পসমূহে শ্রমিকের অভাব দেখা দেয়। যাহারা পলায়ন করে নাই তাহারা এই সুযোগে কয়েকটি ধর্মঘট করিয়া তাহাদের মজুরি শতকরা দশটাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে এবং দৈনিক মজুরি দিবার প্রথা প্রবর্তন করিতে সক্ষম হয়। প্লেগ মহামারীর শ্রমিকগণ কাজে ফিরিয়া আসিলে পর মালিকগোষ্ঠী আবার মজুরি হ্রাসের চেষ্টা করে কিন্তু শ্রমিকগণ আবার ধর্মঘট সংগ্রামের মারফত মালিকদের সেই চেষ্টা ব্যাহত করে।

শ্রমিক-সংগ্রামের নূতন স্তর

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলপথ'-এর বোম্বাই-শাখার শ্রমিক ধর্মঘট বোম্বাই তথা ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে নূতন অগ্রগতির সূচনা করে। কতিপয় আর্থনীতিক দাবি লইয়া এই ধর্মঘট আরম্ভ হইয়াছিল। এই

১। S. D. Mehta : Cotton Mills of India. p. 82 ২। Ibid.

ধর্মঘটের ফলে বোম্বাই শহরের সহিত সকল রেল-যোগাযোগ-ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে এবং এই অবস্থা তিনদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই রেলপথের বোম্বাই শাখার সকল শ্রমিক এবং সকল কুলি ও গাড়োয়ান একযোগে ধর্মঘট করিয়া বোম্বাই শহরকে অচল করিয়া দেয়। ইহাই ভারতবর্ষের একই শিল্পের সকল শ্রমিকের প্রথম ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘট।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘট-সংগ্রামের ব্যাপকতা বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মালিকগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হইয়া টাকাপ্রতি দুই আনা মজুরি হ্রাসের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। দুইটি মিলে শ্রমিকগণকে সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অল্প মজুরি দিলে ২ হাজার শ্রমিক মজুরি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া ধর্মঘট করে। অন্যান্য মিলেও মজুরি হ্রাস করিলে ১০ দিনের মধ্যে মোট প্রায় ২০ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট আরম্ভ হয়।

বিভিন্ন মিলের শ্রমিকগণ একত্রিত হইয়া একটি ধর্মঘট-কমিটি গঠন করে এবং ধর্মঘটের ব্যয় নির্বাহের জন্য শ্রমিকদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া একটি তহবিল গঠন করে। ইহা শ্রমিকশ্রেণীর উন্নত সাংগঠনিক চেতনার পরিচায়ক। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই শ্রমিকশ্রেণী উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় যে, তাহাদের সংগ্রাম তাহাদিগকেই চালাইতে হইবে এবং সেই সংগ্রামের সংগঠন তাহাদিগকেই গড়িয়া তুলিতে হইবে।

কিন্তু তাহাদের চেতনার তখনও পূর্ণ বিকাশ ঘটে নাই। তখনও তাহারা বৃটিশ শাসনের পুলিসকে নিরপেক্ষ বলিয়া মনে করিত। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ধর্মঘটের সময় শ্রমিকগণ পুলিসকে নিরপেক্ষ মনে করিয়া তাহাদের দাবি মানিয়া লইতে মালিক-গোষ্ঠীকে বাধ্য করিবার জন্য পুলিসকে মালিকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ জানাইয়াছিল। পুলিস একদিকে মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অস্বীকার করে, আর অপর দিকে শ্রমিক অঞ্চলগুলিতে শক্তিশালী পুলিস পাহারার ব্যবস্থা করে এবং শ্রমিকদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করিতে থাকে। ধর্মঘটী শ্রমিকগণ তাহাতেও ভীত না হইয়া ধর্মঘট চালাইয়া যায়। মালিকগোষ্ঠী বহু চেষ্টা করিয়াও ধর্মঘট ভাঙিতে না পারিয়া শেষপর্যন্ত মজুরি কাটা বন্ধ করে।[১] শ্রমিক-শ্রেণী যে বাহিরের সাহায্য ব্যতীত নিজেরাই ঐক্যবদ্ধভাবে বৃহদাকারের ধর্মঘট চালাইতে এবং তাহাতে জয়লাভ করিতে পারে, ২০ হাজার শ্রমিকের এই ধর্মঘট তাহার প্রথম প্রমাণ। এই ধর্মঘটের পর শ্রমিকশ্রেণী একটি দুর্ধর্ষ সংগ্রামী শক্তি বলিয়া গণ্য হইতে থাকে এবং বোম্বাইয়ের 'চরমপন্থী' জাতীয়তাবাদী নায়কগণ শ্রমিকশ্রেণীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে আরম্ভ করেন।

'স্বদেশী আন্দোলন' ও শ্রমিক-সংগ্রাম

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'স্বদেশী আন্দোলন' দেশীয় বস্ত্রশিল্পের মালিকদের পক্ষে "স্বর্ণযুগ" বলিয়া কথিত হয়। এই আন্দোলনের প্রধান বিষয় ছিল বৃটিশ পণ্যের, বিশেষত

১। Times of India, 15th June & 22nd June, 1901

বৃটিশ বস্ত্রের 'বয়কট'। এই আন্দোলনের ফলে ভারতের বাজারে বৃটিশ বস্ত্রের বিক্রয় বিশেষভাবে হ্রাস পায় এবং ভারতীয় বস্ত্রের বিক্রয় বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের মালিকগণ ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া আশাতীত মুনাফা লুণ্ঠন করিতে থাকে। তাহারা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নূতন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিতে না পারিয়া শ্রমিকের কাজের সময় বৃদ্ধি করে। ইহার পূর্বেই (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে) মিল-কারখানায় ইলেক্‌ট্রিক আলোর ব্যবস্থা হওয়ায় রাত্রিকালেও মিলের কাজ চালাইবার সুবিধা হয়।[১] এইভাবে শ্রমিকদিগকে রাত্রিকালেও মিলে কাজ করিতে বাধ্য করা হয়। সকাল ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত মিল-কারখানায় অবিশ্রাম কাজ চলিতে থাকে, শ্রমিকদিগকে দিনে ১৫-১৬ ঘণ্টা কাজ করিতে বাধ্য করা হয়। মালিকগণ নামমাত্র মজুরি বৃদ্ধি করিয়া শ্রমিকদিগকে শান্ত রাখিবার প্রয়াস পায়।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগেই শ্রমিকদের ভুল ভাঙিয়া যায়। তাহারা দৈনিক কাজের সময় হ্রাস এবং মজুরি বৃদ্ধির দাবি লইয়া নূতন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এই দাবি লইয়া এক মিল হইতে আর এক মিলে ধর্মঘট দ্রুত বিস্তার লাভ করিতে থাকে। কয়েকটি ক্ষেত্রে অনেকগুলি মিলের শ্রমিকগণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া একযোগে ধর্মঘট আরম্ভ করে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, প্রত্যেকটি ধর্মঘটই জঙ্গীরূপ ধারণ করে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মিলের প্রহরীদের সহিত শ্রমিকদের দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়, এক মিলের শ্রমিক অন্য মিল আক্রমণ করে, মিলের দরজা-জানালা ভাঙিয়া চুরমার করে। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুলিসের সহিত শ্রমিকদের সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পুলিস বাহিনী মিল-মালিকের পক্ষ হইয়া শ্রমিকদের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ইহার ফলে পুলিসের ভূমিকা সম্বন্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সকল ভুল ধারণা দূর হইয়া যায় এবং এই ধর্মঘট-সংগ্রামের মধ্য দিয়া বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী বিপুল রাজনীতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম বিদ্রোহ

শ্রমিকশ্রেণীর আপসহীন সংগ্রামের ফলে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের মধ্যভাগেই বোম্বাই শহরের সকল মিলে শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় হ্রাস করিয়া ১২ ঘণ্টা করা হয়। কিন্তু 'ফোনিক্স মিলের' কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবি মানিয়া লইতে এবং শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় হ্রাস করিয়া ১২ ঘণ্টা করিতে অস্বীকার করে। তাহার ফলে এই মিলে সকাল ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত অবিশ্রাম কাজ করিতে শ্রমিকদিগকে বাধ্য করা হয়। পার্শ্ববর্তী সকল মিলের শ্রমিকগণ 'ফোনিক্স মিল'-কর্তৃপক্ষের এই ঔদ্ধত্যকে বোম্বাইয়ের সকল মিলের শ্রমিকদের অপমান বলিয়া মনে করিয়া সমবেতভাবে ইহার প্রতিকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

একদিন বিভিন্ন মিলের তিন হাজার শ্রমিক সন্ধ্যা ৬টার সময় যথারীতি নিজ নিজ মিলের কাজ শেষ করিয়া 'ফোনিক্স মিলের' সম্মুখে সমবেত হয়। এই তিন হাজার

১। Ibid, 16th Sept., 1905.

শ্রমিকের সহিত বোম্বাইয়ের বহু দরিদ্র মানুষ আসিয়া যোগদান করে। ইহার পর তাহারা মিলের জানালা লক্ষ্য করিয়া ইষ্টকখণ্ড ছুঁড়িতে আরম্ভ করে এবং অবিলম্বে মিলের কাজ বন্ধ করিয়া শ্রমিকদিগকে ছুটি দিবার দাবি জানাইতে থাকে। মিল-কর্তৃপক্ষ ভীত হইয়া বোম্বাইয়ের পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে টেলিফোনে ডাকিয়া পাঠায়। পুলিস সাহেব আসিয়া মিলের সশস্ত্র প্রহরীদের সাহায্যে কয়েকজন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করেন এবং শ্রমিকদের অবিলম্বে স্থানত্যাগ করিবার আদেশ দেন। শ্রমিকগণ পুলিস সাহেবের ধৃষ্টতায় ক্রুদ্ধ হইয়া চারিদিকে আক্রমণ চালাইতে থাকে। তাহারা মিলের সকল দরজা ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয় এবং মিলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সকল গ্রেপ্তার করা শ্রমিকদের মুক্ত করে। তাহাদের নির্দেশে 'ফোনিক্স মিলের' শ্রমিকগণ মিলের কাজ বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়। ইহার পর বিদ্রোহী শ্রমিকগণ পুলিস সাহেবকে শাস্তি দিবার জন্য তাঁহার দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু তিনি মিলরক্ষীদের সাহায্যে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হন এবং পুলিস কমিশনার সহ এক বিরাট অশ্বারোহী পুলিস বাহিনী লইয়া উপস্থিত হন। পুলিস কমিশনারের আদেশে বোম্বাই শহরের প্রায় সকল সশস্ত্র পুলিশ 'ফোনিক্স মিলের' সম্মুখে সমবেত হয়। পুলিস কমিশনারের বিশেষ অনুরোধে একদল বৃটিশ সৈন্যও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই বিপুল সামরিক শক্তির সহিত বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ করা অসম্ভব বুঝিয়া শ্রমিকগণ পশ্চাৎ অপসরণ করে। অশ্বারোহী পুলিশ ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে। কয়েকদিন পর পুলিশের নির্দেশে তাহাদিগকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[১]

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ধর্মঘট-সংগ্রামের তাৎপর্য অতি বিপুল। প্রথমত, প্রায় সকল মিলে একই প্রকারের দাবি লইয়া এই ধর্মঘট-সংগ্রাম চলিয়াছিল এবং ইহার মাধ্যমে বোম্বাইয়ের সকল শ্রমিকের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, শ্রমিকশ্রেণী তাহাদের এই ধর্মঘট-সংগ্রামের দ্বারা বোম্বাই শহরের জনসাধারণকে, বিশেষত উহার দরিদ্র অংশকে তাহাদের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল করিয়া তুলিতে এবং এমনকি তাহাদের সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করাইতেও সক্ষম হইয়াছিল। 'ফোনিক্স মিলের' ঘটনাই তাহার সাক্ষ্য দেয়। বিভিন্ন মিলের শ্রমিকগণ সমবেতভাবে যখন 'ফোনিক্স মিলের' উপর আক্রমণ করিতেছিল তখন তাহাদের সহিত প্রায় এক হাজার শহরবাসী দরিদ্র মানুষ যোগদান করিয়াছিল। ইহাও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তৃতীয়ত, এই ধর্মঘটে মালিকদের পক্ষে পুলিসের হস্তক্ষেপ এবং পুলিসের সহিত সংঘর্ষের মধ্য দিয়া শ্রমিকশ্রেণী পুলিসের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই সংঘর্ষের মধ্য দিয়া শ্রমিকশ্রেণী এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ রাজনীতিক শিক্ষাও গ্রহণ করিয়াছিল। চতুর্থত, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের এই ধর্মঘট-সংগ্রাম বোম্বাইয়ের শ্রমিক-শ্রেণীর সাধারণ ধর্মঘটেরই এক ক্ষুদ্র সংস্করণ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কারণ,

১। Times of India 14th Oct. & 21st Oct. 1905

বিভিন্ন মিলের শ্রমিকেরা বিভিন্ন সময় ধর্মঘট আরম্ভ করিলেও তাহাদের দাবি ছিল এক এবং ধ্বনি ছিল অভিন্ন। তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কত গভীর ছিল, 'ফোনিক্স মিলের' ঘটনা তাহার স্পষ্ট প্রমাণ। এই সকল দিক হইতে বিচার করিলে বলা চলে, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ধর্মঘট-সংগ্রাম ছিল ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের রাজনীতিক ধর্মঘটেরই অগ্রদূত এবং প্রথম মহড়া।

সরকারী ও বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের সংগ্রাম

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকগণ সংগ্রামের যে পথ ও আদর্শ দেখাইল তাহা বোম্বাইয়ের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদেরও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। একে একে অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের সংগ্রামের জোয়ার বহিতে থাকে এবং এই সংগ্রাম ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ ধর্মঘট পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ ধর্মঘট এই সকল সংগ্রামেরই চরম ও পরিণত রূপ।

১৯০৫ হইতে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বোম্বাই শহরের উপর দিয়া শ্রমিক-সংগ্রামের জোয়ার বহিয়া যায়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মালিকগোষ্ঠী বাধ্য হইয়া শ্রমিকের দৈনিক কাজের সময় হ্রাস করিলেও তাহারা সকল সময়ই কাজের সময় বৃদ্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট ছিল। যখনই মিল ও কারখানার মালিকগণ দৈনিক কাজের সময় ১২ ঘণ্টা হইতে বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছে অথবা মজুরি হ্রাসের প্রয়াস পাইয়াছে তখনই শ্রমিক-সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ বোম্বাই শহরকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। এমনকি শ্রমিকদের চিরাচরিত সামান্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইলেও বিভিন্ন স্থানে ধর্মঘট আরম্ভ হইত। সর্বত্রই শ্রমিকগণ কাজের ফাঁকে ফাঁকে ধূমপান করিত। কয়েকটি মিলে ইহা বন্ধ করিবার চেষ্টা হইবা মাত্র ধর্মঘট আরম্ভ হইয়াছিল। স্ত্রী-শ্রমিকগণ মধ্যাহ্নের কর্মবিরতির সময় বাড়ী গিয়া তাহাদের শিশু সন্তানকে দেখিয়া আসিত। তাহাদের এই অধিকার বন্ধ করিবার চেষ্টা হইবা মাত্র কয়েকটি মিলে স্ত্রী-পুরুষ সকল শ্রমিক ধর্মঘট করিয়া সেই চেষ্টা বন্ধ করিয়াছিল।

এই যুগের এই ধর্মঘট-সংগ্রামে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে বিভিন্ন সরকারী ও বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বোম্বাইয়ের সকল ডাক-পিওন ও অন্যান্য ডাক-কর্মচারী ধর্মঘট করিয়া বোম্বাইয়ের ডাক-বিভাগকে অচল করিয়া দেয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বোম্বাইয়ের সকল রেল-কারখানা-গুলির শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়া রেল-কারখানাগুলির সকল কাজ বন্ধ করে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সমগ্র ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে টেলিগ্রাফ শ্রমিকদের যে সাধারণ ধর্মঘট হইয়াছিল তাহারও উদ্যোগ ও নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল টেলিগ্রাফ-বিভাগের বোম্বাই শাখার শ্রমিক ও কর্মচারিগণ। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসেই বৃটিশ মালিকানাধীন 'হারগ্রীভস্ কটন কোম্পানী' দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন কাপড়ের মিলের শ্রমিকগণ দীর্ঘকাল ধর্মঘট করিয়া সকল মিলের কাজ বন্ধ করিয়া দেয়। এই ধর্মঘটে শ্রমিকগণ যে দৃঢ়তা, যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল তাহা শ্রমিক সংগ্রামের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। কর্তৃপক্ষ বহু বৃটিশ সৈন্য ও বিপুল পুলিস বাহিনী দ্বারা শ্রমিকদের উপর

বীভৎস অত্যাচার-উৎপীড়ন করিয়াও এই ধর্মঘট ভাঙিতে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত এই ধর্মঘট-সংগ্রাম জয়লাভ করে।[১]

* * * * *

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, জঙ্গী ধর্মঘট সংগ্রামের প্রবল জোয়ার ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম সত্ত্বেও এবং এই সংগ্রামের মধ্য দিয়া বোম্বাইয়ের সকল শ্রমিকদের মধ্যে গভীর ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন গড়িয়া উঠিলেও তখনও পর্যন্ত কোন রীতিমত ট্রেড য়ুনিয়ন গড়িয়া উঠে নাই। তাই 'ফ্যাক্টরি লেবার কমিশন' উহার ১৯০৭-০৮ খ্রীষ্টাব্দের বিবরণীতে নিম্নোক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :

"বোম্বাই ও অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাসে স্পষ্টভাবেই দেখা যায় যে, শ্রমিকগণ স্থানীয় ধর্মঘটের কার্যকরিতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিলেও এবং তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে মালিকদিগকে তাহাদের দাবি পূরণে বাধ্য করিলেও তাহারা এখনও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দ্বারা সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে নাই।"[২]

এই মৌলিক দুর্বলতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের, বিশেষত বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের মধ্যে এক প্রবল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল। বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের অন্যান্য শ্রেণীর জনসাধারণের মতই শ্রমিকশ্রেণীর জীবনের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, এই শাসন ও শোষণের অনিবার্য ফল স্বরূপ তাহাদের জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, বৃটিশ শাসনের পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর সন্ত্রাস ও অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং সর্বোপরি সমসাময়িক কালের জাতীয় সংগ্রামই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের শ্রমিক জীবনে কল-কারখানার অমানুষিক ব্যবস্থা, কল-কারখানায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ দৈনিক ১৫ ঘণ্টা কাজ করিয়াও সপরিবারে উপবাসক্লিষ্ট জীবনযাপন, কল-কারখানায় ঘুষ আর বাহিরে মহাজনের শোষণ ও উৎপীড়ন প্রভৃতি তাহাদের সম্মুখে সাম্রাজ্যবাদী-ধনতান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থার বীভৎস রূপ স্পষ্ট ও সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল। ভারতের, বিশেষত বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিল যে, ভারতের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও উহার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাই উহার অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ এবং কল-কারখানার মালিকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে এই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইবে। শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রামের মূল্য উত্তমরূপেই বুঝিয়াছে, সংগ্রাম ব্যতীত তাহাদের দুঃখময় জীবনের পরিবর্তন ঘটিবে না—ইহা তাহাদের প্রাত্যহিক জীবনেরই অভিজ্ঞতা। নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের দ্বারাই তাহারা তাহাদের ১৫ ঘণ্টা কাজের সময় ১২ ঘণ্টায় পরিণত করিয়াছে, মজুরি বৃদ্ধি করিতে মালিকদের বাধ্য করিয়াছে। এই জয়ের ফল তাহাদের সংগ্রামের দ্বারাই রক্ষা করিতে হইতেছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে সংগ্রামের দ্বারাই যে পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে—ইহাও তাহাদের জীবনেরই উপলব্ধি।

১। L. A. Gordon : Ibid, p. 541. ২। Ibid, p. 542.

আর্থনীতিক সংগ্রামের দ্বারা কল-কারখানার মালিকগোষ্ঠীকে মজুরি বৃদ্ধি করিতে অথবা দৈনিক কাজের সময় হ্রাস করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করা যায় না। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম রাজনৈতিক সংগ্রাম। তাহার জন্য প্রয়োজন রাজনীতিক নেতৃত্ব। কিন্তু রাজনীতিক নেতৃত্ব তখনও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য হইতে দেখা দেয় নাই। তখনকার মতো সেই নেতৃত্ব আসে বাহির হইতে—বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে পরিচালিত 'চরমপন্থী' জাতীয়তাবাদীদের নিকট হইতে। 'চরমপন্থী' জাতীয়তাবাদীদের, বিশেষত তিলকের অগ্নিবর্ষী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রচার-কার্যের ফলে বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী তিলকের দিকে আকৃষ্ট হয়। শ্রমিকগণ দলে দলে তিলক ও তাঁহার সহকর্মীদের আহূত সভা-সমিতিতে যোগদান করিয়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভাবধারায় দীক্ষা লাভ করে। শ্রমিকশ্রেণী ও গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যেও তিলকের প্রভাব দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। ইহার পূর্বেই গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে তিলকের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে কৃষকদের যে করবন্ধ-আন্দোলন চলিয়াছিল তাহার সংগঠক ও পরিচালক ছিলেন স্বয়ং বাল গঙ্গাধর তিলক। এই সংগ্রামের পরিচালনা তিলকের জীবনের অন্যতম প্রধান কীর্তি।[১] তিলকের প্রভাব দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করিতে দেখিয়া শাসকগোষ্ঠী ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তৎকালের বোম্বাই প্রদেশের গভর্নর লর্ড সিডেনহ্যাম তাঁহার স্মৃতিকথায় তিলকের প্রভাব ও তাঁহার গ্রেপ্তারের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন:

"ব্যারিস্টার, উকিল, স্কুল-শিক্ষক, অধ্যাপক, সরকারী অফিসের কেরানী প্রভৃতি সকলেরই তিলকের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ছিল, সকলেই ছিলেন তিলকের দ্বারা প্রভাবান্বিত। তিলকের প্রচার ও প্রভাব কেবল শহরের শ্রমিক-কুলিদের মধ্যেই নহে, এমনকি গ্রামাঞ্চলের কৃষক, অন্তত গ্রামের মাতব্বরদের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতেছিল। আমি এই সবই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছিলাম। কিন্তু তিলকের বিভিন্ন প্রকারের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে বাধাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। এই অবস্থায় বিপদের সম্ভাবনা এই যে, বিচার ব্যর্থ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির (তিলকের—লেঃ) প্রভাব আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং তাঁহার সমর্থকদের বিক্ষোভ প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হইবে। ইহাও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করিতে হইবে। আমি এবং আমার সহকর্মিগণ সিদ্ধান্ত করিলাম যে এই বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করাই উচিত। সুতরাং তিলককে গ্রেপ্তার করা হইল।"[২]

* * * *

তিলকের নিজস্ব 'কেশরী' পত্রিকায় কয়েকটি রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ লিখিবার অভিযোগে তাঁহাকে প্রথমে বোম্বাইয়ের প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে, এবং

১। K. S. Shelvankar: The Problem of India, p. 220.

২। Quoted by T. V. Pravate in his book, 'Bal Gangadhar Tilak,' p. 223-24.

পরে হাইকোর্টে অভিযুক্ত করা হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন তিলককে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে শোলাপুর, নাগপুর, পুনা ও বোম্বাই শহরে এবং পরে ক্রমশ সমগ্র ভারতবর্ষে সক্রিয় প্রতিবাদের ঝড় বহিতে থাকে। ২৫শে জুন পুনা ও বোম্বাই শহরের দোকান-পাট ও স্কুল-কলেজ বন্ধ করিয়া হরতাল পালন করা হয়। পরে মাদ্রাজ, কলিকাতা, লাহোর প্রভৃতি সকল প্রধান শহরে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সভা ও শোভাযাত্রা করা হয় এবং একদিন দোকান-পাট বন্ধ রাখা হয়। মাদ্রাজের বিভিন্ন জনসভায় প্রকাশ্যে "বিদ্রোহ ও হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ" আরম্ভের আহ্বান জানানো হয়।[১]

তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সর্বাপেক্ষা বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম আরম্ভ হয় বোম্বাই শহরে। তিলকের মামলার শুনানী আরম্ভ হয় ২৯শে জুন। ঐ দিন প্রায় সকল শ্রেণীর ১০ হাজার নরনারী আদালতের চতুর্দিকে সমবেত হইয়া 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত ও "তিলক মহারাজ কি জয়" ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া তোলে। এক বিপুল অশ্বারোহী বাহিনী আসিয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিলে পুলিসের সহিত জনতার দুই ঘণ্টা কাল যুদ্ধ হয়। জনতা রাজপথে য়ুরোপীয় সাহেব দেখিবা মাত্র তাহাদিগকে ইষ্টকখণ্ড দ্বারা আক্রমণ করে। ইহার পর আরও বহু সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিস আসিয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ ও বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

জনসমাবেশে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে সমগ্র শহরে ১৪৪ ধারা জারি করিয়া রাজপথে সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিসের চৌকি বসান হয়। বোম্বাই শহর যুদ্ধকালীন রূপ ধারণ করে। এই সকল সংঘর্ষে শ্রমিকগণকে অংশগ্রহণ করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে সংগ্রাম হইতে দূরে রাখিবার উদ্দেশ্যে সমগ্র শ্রমিক অঞ্চলে সৈন্য ও পুলিসের চৌকি বসান হয়।

শ্রমিকশ্রেণী তিলকের গ্রেপ্তারে ক্রুদ্ধ হইয়া গোপনে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। তাহারা শাসকগোষ্ঠীর সামরিক শক্তির আস্ফালন অগ্রাহ্য করিয়া নির্ভয়ে সংগ্রাম আরম্ভ করে। লেনিনের কথায়, জনসাধারণ তাহাদের লেখক ও রাজনীতিক নায়কদের সমর্থনে দণ্ডায়মান হয়। ১৩ই জুলাই প্রাতঃকালে 'গ্রীভ্‌স্‌ কটন কোম্পানি'র অধীন মিলসমূহের শ্রমিকগণ প্রথম ধর্মঘট করে। শ্রমিকগণ মিলের সম্মুখে সমবেত হইলে সৈন্যবাহিনী আসিয়া তাহাদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। শ্রমিকগণ সৈন্যদের প্রতি ইষ্টকখণ্ড বর্ষণ করিতে করিতে পশ্চাৎ অপসরণ করিয়া রাজপথে শোভাযাত্রা বাহির করে।

শ্রমিক-অভ্যুত্থানের ভয়ে ভীত হইয়া বোম্বাই সরকার বোম্বাই শহরের উত্তরভাগের শ্রমিক অঞ্চলটিকে শহর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে উত্তর-অঞ্চলটিকে সৈন্যবাহিনী দ্বারা ঘিরিয়া রাখে। ইহার পর প্রায় প্রত্যহই শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণ একত্রে শহরের বিভিন্ন রাজপথে শোভাযাত্রা বাহির করিতে থাকে এবং প্রত্যহই সৈন্য ও পুলিস বাহিনীর সহিত প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটিতে থাকে। এইভাবে

১। Times of India, 25 July, 1908.

রাজপথের শোভাযাত্রাই শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতিক শিক্ষার "স্কুল" হইয়া দাঁড়ায়। রাজপথের শোভাযাত্রায় শ্রমিকশ্রেণী একদিকে সৈন্য ও পুলিস বাহিনীর মুখোমুখী দাঁড়াইয়া সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তেমনি অপর দিকে এই শোভাযাত্রার মারফত শহরের দরিদ্র শ্রমজীবী ও মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণকেও সংগ্রামের ক্ষেত্রে আকর্ষণ করে।

১৭ই জুলাই ১৫টি মিলের শ্রমিকগণ দ্বিপ্রহরে নিজ নিজ মিলের কাজ বন্ধ করে এবং ধর্মঘট করিয়া রাজপথে বাহির হয়।[১] প্রথম ধর্মঘট করিয়াছিল বৃটিশ মালিকানাধীন 'গ্রীভস্ কটন কোম্পানি'র মিলসমূহের শ্রমিকগণ। তাহার পর দেশীয় মালিকানাধীন মিলগুলির শ্রমিকগণও প্রতিবাদ-ধর্মঘটে যোগদান করে। এবার ২০ হাজার ধর্মঘটী শ্রমিক পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন মিলে উপস্থিত হইয়া অবিলম্বে মিল বন্ধ করিতে বলে। তাহাদের দাবি উপেক্ষিত হইলে ধর্মঘটী ২০ হাজার শ্রমিক ইষ্টক বর্ষণ করিয়া মিলের দরজা, জানালা প্রভৃতি ভাঙিয়া চুরমার করে। ইহার পর আক্রান্ত মিলগুলির কাজ বন্ধ করা হইলে ঐ সকল মিলের শ্রমিকগণও বাহিরে আসিয়া ধর্মঘটী-দের সহিত যোগদান করে। এবার শ্রমিকগণ এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করিয়া শহরের বিভিন্ন রাজপথ ভ্রমণ করে।[২]

১৮ই জুলাই প্যারেল অঞ্চলের ২২টি মিলের ২৫ হাজার শ্রমিক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ধর্মঘট করে এবং বাহিরে আসিয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করে। এইদিক শ্রমিকগণ ধর্মঘট বিস্তারের জন্য অভিযান করিলে সশস্ত্র পুলিস বাহিনী ও সৈন্যগণ শ্রমিকদের উপর গুলি বর্ষণ করে। শ্রমিকগণ ইষ্টক বর্ষণ করিয়া প্রায় ২ ঘণ্টাকাল যুদ্ধ চালায়। এই গুলি বর্ষণের ফলে অন্ততপক্ষে ২০০ শ্রমিক নিহত এবং ৫০০ শ্রমিক আহত হয়।[৩] বোম্বাইয়ের শ্রমিক দুইশত প্রাণের বিনিময়ে রাজপথের যুদ্ধ সম্বন্ধে মূল্যবান শিক্ষা লাভ করে, তাহাদের রাজনীতিক শিক্ষা ও সংগ্রামী দৃঢ়তা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তাহারা ঐতিহাসিক সাধারণ ধর্মঘটের দিকে বহু দূর অগ্রসর হইয়া যায়। এই হত্যাকাণ্ড উপলক্ষেই লেনিন লিখিয়াছিলেন:

"জনগণ যখন দাসত্ব-লুণ্ঠন আর ধ্বংসকারী মূলধন ও ধনতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান আরম্ভ করিতেছে, তখনই স্বদেশে শ্রমিক-আন্দোলনের অগ্রগতিতে ক্রুদ্ধ এবং ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক সংগ্রামে ভীত-সন্ত্রস্ত উদারপন্থী বৃটিশ বুর্জোয়ারা, সর্বোচ্চ স্তরের নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়া আসিলেও, সর্বাপেক্ষা 'সভ্য' য়ুরোপীয় রাষ্ট্রনায়কগণ কিরূপ বীভৎস বর্বরতার অনুষ্ঠান করিতে পারে তাহা ক্রমশ তাহারা অধিক ঘন ঘন, ক্রমশ স্পষ্টতর এবং ক্রমশ লক্ষণীয়ভাবে জাহির করিতেছে।"[৪]

১৯শে জুলাই আরও অধিক সংখ্যায় শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়া মিল হইতে বাহির হইয়া আসে। 'টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া'র মতে, প্যারেল অঞ্চলে ১৭টি মিলের ২০ হাজার

১। Times of India, 25 July, 1908. ২। Ibid. ৩। Tilak's Trial etc, by A. I. Chicherov (Tilak and the Struggle for Political Freedom), p. 601. ৪। Lenin: The National-Liberation Movement in the East, p. 12-13.

শ্রমিক এবং বহির অঞ্চলের ৪০টি মিলের ৪৫ হাজার শ্রমিক এই ধর্মঘটে যোগদান করে। বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী সাধারণ ধর্মঘটের দিকে আরও একধাপ অগ্রসর হইয়া যায়। এই দিনের ধর্মঘটে ৬০টি মিলের ৬৫ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করিয়া বোম্বাই শহরের সংগ্রামকে এক নূতন স্তরে উন্নীত করে।[১]

এইভাবে প্রত্যহই শ্রমিকদের ধর্মঘট-সংগ্রাম বিস্তার লাভ করিতে থাকে। প্রতিদিন নূতন নূতন মিলের শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়া মিল হইতে বাহির হইয়া আসে। ২০শে জুলাই বৃটিশ মালিকানাধীন 'জ্যাকব স্যাসুন মিল'-এর শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়া বাহিরে আসিলে পুলিসের সহিত তাহাদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। পুলিসের গুলি চালনার ফলে একজন শ্রমিক নিহত এবং প্রায় ২৫জন আহত হয়। এইদিন ব্যবসা-কেন্দ্রগুলিতেও ধর্মঘট বিস্তৃত হয়। ২১শে জুলাইয়ের সংগ্রামে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল বোম্বাই বন্দরের ডক শ্রমিকদের ধর্মঘট। বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান ধর্মঘটে উৎসাহিত হইয়া ডকের শ্রমিকগণও ধর্মঘট করিয়া ডক অচল করিয়া দেয়। ডকের একহাজার শ্রমিক রাজপথে বাহির হয় এবং মালবোঝাই গরুর গাড়ীগুলি উল্টাইয়া ফেলিয়া ও গরুগুলিকে তাড়াইয়া বন্দরের প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া রাখে।[২]

২২শে জুলাই ধৃত শ্রমিকদের বিচারের রায় বাহির হয়। এই বিচারে বহু শ্রমিক বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড লাভ করে এবং বালকদিগকে বেত্রদণ্ড দান করা হয়। বেত্রাঘাতে বালকদের পৃষ্ঠ ক্ষতবিক্ষত করিয়া সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী আনন্দে উন্মাদ হইয়া উঠে। এই দণ্ডদান সম্বন্ধেই লেনিনের তীক্ষ্ণ সমালোচনা খড়্গের মত ঝলসিয়া উঠে:

"রুশীয় ও অরুশীয় নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রীদের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলিয়া কথিত স্বাধীন বৃটেনের জন্ মর্লের মত সর্বাপেক্ষা উদারপন্থী ও প্রগতিশীল মুখপাত্রগণ, সাংবাদিক কুলের 'প্রগতিশীল' জ্যোতিষ্কগণ (প্রকৃতপক্ষে মূলধনের দাস) যখন ভারত শাসনের কার্যে নিযুক্ত হয়, তখন তাহারা পূর্ণমাত্রায় চেঙ্গিজ খাঁর মূর্তি ধারণ করে এবং জনসাধারণকে 'ঠাণ্ডা' করিবার জন্য রাজনীতিক প্রতিবাদকারীদের উপর বেত্রাঘাত হইতে সকল প্রকারের আক্রমণাত্মক ক্রিয়া-কলাপ চালাইয়া থাকে।"[৩]

১। Times of India, 25 July, 1908. ২। Ibid. ৩। Lenin: Ibid, p. 14.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বোম্বাই তথা ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাজনীতিক সংগ্রাম[1] (১৯০৮)

দীর্ঘকাল বিচারের পর ২২শে জুলাই রাত্রি ১১টার সময় তিলকের বিচারের রায় দান করা হয়। শ্বেতাঙ্গ বিচারকমণ্ডলী কর্তৃক তিলক ৬ বৎসরের নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হন। মামলার রায় প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাইয়ের জনসাধারণ ক্রোধে ফাটিয়া পড়ে।

ঐ দিন সকাল হইতেই বোম্বাই শহরে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। সেই ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া শহরের হাজার হাজার মানুষ আদালতের নিকট সমবেত হয়। আদালতের চতুর্দিক অশ্বারোহী পুলিস বেষ্টন করে। অশ্বারোহী পুলিসবাহিনী বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য বার বার আক্রমণ চালাইতে থাকে।

তিলকের উপর যে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে তাহা সন্ধ্যা ৭টার সময়ই জানা গিয়াছিল। সুতরাং সন্ধ্যা ৭টা হইতেই আদালতের নিকট ভিড় বাড়িয়া যায়। কিন্তু শাস্তির বিরুদ্ধে কিভাবে আন্দোলন করিতে হইবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া জনসাধারণ দিশাহারা হইয়া পড়ে। রাত্রি ১১টার সময় রায় দানের পরই তিলককে আদালত হইতে জেলখানায় অপসারিত করা হয়। কর্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া জনসাধারণ রাত্রির মত গৃহে ফিরিয়া যায়।

বোম্বাই শহরের বিমূঢ় জনসাধারণকে পথ দেখাইবার জন্য শ্রমিকশ্রেণী নূতনভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ভারতের সর্বজনমান্য 'চরমপন্থী' নায়কের উপর বৃটিশ শাসক-গোষ্ঠীর প্রতিহিংসামূলক শাস্তি দানের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী গর্জিয়া উঠে। তাহারা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি লইয়া আক্রমণ আরম্ভ করে।

২৩শে জুলাইয়ের ধর্মঘট

প্রথম দিন, ২৩শে জুলাই, বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী মিলের কাজ বন্ধ করিয়া পূর্ণ হরতাল পালন করে এবং শ্রমিকশ্রেণীর আহ্বানে সমগ্র শহরে হরতাল পালিত হয়। শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হইয়া বোম্বাইয়ের জাতীয় বুর্জোয়ারাও দুইদিন শেয়ার বাজার বন্ধ রাখিয়া ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু বৃটিশ বুর্জোয়াদের সহিত সম্পর্কযুক্ত বোম্বাইয়ের বৃহৎ-বুর্জোয়ারা "নিরপেক্ষতা" বজায় রাখিয়া নিষ্ক্রিয়

১। যে সকল প্রবন্ধ ও গ্রন্থ হইতে এই সংগ্রামের তথ্যসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে: D. H. Home; Bombay Worker's First Political Strike (New Age, June, No. 6, 1953): Ram Gopal: Lokamanya Tilak; D. V. Tamankar: Lokamanya Tilak—Father of Indian Unrest & Maker of Modern India; Times of India, July to August, 1908; Tilak & The Struggle for Indian Freedom by Soviet Writers.

সহানুভূতি প্রকাশ করে।[১] সর্বাত্মক ধর্মঘট সত্বেও সর্বত্র শান্তি বিরাজ করে। কিন্তু জনসাধারণ শান্তিপূর্ণ থাকিলেও শহর একটা থমথমে ভাব ধারণ করিয়াছিল, বাতাসে যেন বারুদের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল।—যেন একটা "ভয়ঙ্কর কিছু" আসন্ন।[২] পরদিন, ২৪শে জুলাই সেই "ভয়ঙ্কর কিছু" নগ্নমূর্তিতে দেখা দিল। বৃটিশরাজ ধ্বংসকারী মূর্তিতে জনসাধারণের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। বৃটিশরাজের সেই ধ্বংসকারী মূর্তি দেখিয়া শহরের সকল মানুষ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু ভয় পাইল না কেবল শ্রমিকশ্রেণী। বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকগণ স্থির-সংকল্প হইয়া পাণ্টা আঘাত হানিবার জন্য রুখিয়া দাঁড়াইল। হাজার হাজার শ্রমিক সমবেতভাবে বৃটিশরাজের পশুশক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রাণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইল। আরম্ভ হইল বোম্বাইয়ের রাজপথে ভারতের ইতিহাসের যুগান্তকারী এক রক্তক্ষয়ী শ্রমিক-সংগ্রাম। ২৩শে জুলাই ৮০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করিয়া সেই সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

২৪শে জুলাইয়ের সংগ্রাম রাজপথের যুদ্ধ

২৪শে জুলাই সশস্ত্র পুলিসবাহিনীর সহিত শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। ঘটনাস্থল বোম্বাইয়ের কালাচৌকি। ২৪শে জুলাই প্রাতঃকাল হইতেই শ্রমিকগণ শহরের বিভিন্ন শ্রমিক মহল্লায় সমবেত হইতে থাকে। চিঞ্চ্‌পোকলি-কালাচৌকি শ্রমিক অঞ্চলেও বহুসংখ্যক শ্রমিক সমবেত হয়। অল্পকালের মধ্যেই তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া হয় প্রায় ৫ হাজার। এই ৫ হাজার শ্রমিক শোভাযাত্রা করিয়া আর একটি শ্রমিক-সমাবেশের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে ঘোরাপ্‌দেও নামক স্থানের দিকে অগ্রসর হয়। তাহারা বিভিন্ন ধ্বনি দিতে দিতে যাত্রা করে। তাহাদের এই সকল ধ্বনিকে জনসাধারণ গ্রহণ করে বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান রূপে।

ইতঃপূর্বে কেবলমাত্র কোন রাজনীতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া কেহ কখনও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করে নাই। এতদিন বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী মিলের মধ্যে কেবল আর্থনীতিক দাবি লইয়া সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছিল। এতদিন শ্রমিকশ্রেণী যেন বাহিরের অর্থাৎ মধ্যশ্রেণী ও উদারনীতিবাদী বুর্জোয়াদের সংগ্রাম লক্ষ্য করিয়া তাহা হইতে রাজনীতিক শিক্ষা গ্রহণ করিতেছিল এবং মিলের মধ্যে নিজেদের দাবি-দাওয়ার সংগ্রাম হইতে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করিতেছিল। কিন্তু তাহারা তাহাদের মিলের অভ্যন্তরের সংগ্রাম হইতেই শিক্ষা লাভ করিয়াছিল যে, মিল-মালিকগোষ্ঠীই তাহাদের প্রধান শত্রু নহে, পরাধীন ভারতের সর্বপ্রধান শত্রু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। এই সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে থাকিয়াই মিল-মালিকগোষ্ঠী তাহাদের শোষণ করে, তাহারা মিল-মালিকদের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলে এই সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর পুলিস আর সৈন্যবাহিনীই মালিকদের পক্ষ হইয়া শ্রমিকদের সংগ্রামকে রক্তবন্যায় ডুবাইয়া দেয়। শ্রমিকশ্রেণী এতদিনে

১। Times of India, 1st Aug. 1908. ২। Ibid, 28 July, 1908.

ইহাও শিখিয়াছিল যে, তাহাদের সংগ্রামের সমর্থনে জনসাধারণকে টানিয়া আনিতে হইবে; আর তাহাদের টানিয়া আনিতে হইলে প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। তাই এখন তিলকের উপর বর্বরসুলভ শাস্তিদান উপলক্ষে বোম্বাইয়ের বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া শ্রমিকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

শাসকগোষ্ঠী কোনদিন শ্রমিকশ্রেণীকে কোন রাজনীতিক সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিতে না দেখিয়া শ্রমিকশ্রেণীকে একটি রাজনীতিক শক্তি বলিয়াই মনে করে নাই। এই জন্যই ২৪শে জুলাই শ্রমিকশ্রেণীকে বিপুল সংখ্যায় রাজপথে সমবেত হইতে এবং শোভাযাত্রা করিতে দেখিয়া শাসকগণ ইহার উপর প্রথমে কোন গুরুত্ব আরোপ করে নাই। তাহারা প্রথমে মনে করিয়াছিল যে, কয়েকজন য়ুরোপীয় পুলিস কর্মচারী দেখিলেই শ্রমিকরা পলায়ন করিবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বৃটিশ পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অপর দুইজন শ্বেতকার পুলিস কর্মচারী সঙ্গে লইয়া রাজপথে টহল দিতে বাহির হইলেন। পথে শ্রমিকদের শোভাযাত্রার সহিত পুলিসকর্তাদের সাক্ষাৎ ঘটিল। পুলিসকর্তারা শ্রমিকদের উপর অবিলম্বে শোভাযাত্রা ভাঙিয়া দিবার হুকুম জারি করিলেন।

পুলিসকর্তারা ভাবিতেও পারেন নাই যে, তাঁহারা যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহার বিপরীত ঘটনা ঘটিবে। তাহারা কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, শ্রমিকশ্রেণী আর সেই নিরীহ মানুষ নয় যে, পুলিস অথবা শ্বেতকায় কর্মচারী দেখিলেই ভয়ে তাহাদের পায়ে লুটাইয়া পড়িবে। শ্রমিকশ্রেণী এখন রাজনীতিক চেতনা লাভ করিয়া নূতন মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, এখন তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্য আর শক্তি সম্বন্ধে সচেতন, সংগ্রামে দৃঢ় সংকল্প। তাহারা পুলিসকর্তাদের হুকুম অমান্য করিল, তাহাদিগকে বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করিয়া তুলিল। শ্বেতকায় পুলিসকর্তারা কৃষ্ণকায় 'নেটিভ' শ্রমিকদের ঔদ্ধত্যে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তাহাদের রিভলভার বাহির করিয়া ইতস্তত: গুলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পুলিসকর্তাদের এই স্পর্ধা দেখিয়া শ্রমিকগণও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। পুলিস-কর্তাদের উচিত শিক্ষা দিবার জন্য তাহারা পুলিসদের দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, তাই তাহাদের কয়েকজন নিহত ও আহত হইল। শ্রমিকগণ বুঝিল, নিরস্ত্র অবস্থায় অস্ত্রের সহিত সংগ্রাম করা চলে না। এই অভিজ্ঞতা তাহাদের চোখ খুলিয়া দিল। শ্রমিক নায়কগণ পরামর্শ করিয়া এক পরিকল্পনা স্থির করিলেন। সমবেত ৬ হাজার শ্রমিক দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া দুই রাস্তায় ভাগ হইয়া গেল এবং পুলিসদের লক্ষ্য করিয়া ইষ্টক বর্ষণ করিতে লাগিল। এইভাবে চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া পুলিসকর্তারা স্থির করিতে পারিলেন না কোনদিক সামলাইবেন। ইতিমধ্যে তাঁহারা সকলেই ইষ্টক বর্ষণে ভীষণ আহত হইয়াছিলেন। তাহাদের সর্বাঙ্গ হইতে রক্তধারা ঝরিতেছিল।

ইতিমধ্যে গুলি বর্ষণের সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল

হইতে দলে দলে শ্রমিকগণ ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। এইভাবে শ্রমিকদের সংখ্যা দাঁড়াইল প্রায় ১২ হাজার। এবার পুলিসকর্তারা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া, দৌড়িয়া গিয়া পার্শ্ববর্তী ফায়ার ব্রিগেডের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। ক্রুদ্ধ শ্রমিকগণ ফায়ার ব্রিগেডের বাড়ির উপর বৃষ্টিধারার মত ইষ্টক বর্ষণ করিতে লাগিল।

এই সময় নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া ঘটনাস্থলে একদল সৈন্য উপস্থিত হইল। সৈন্যদলকে দেখিয়া শ্রমিকগণ প্রথমে কর্তব্য স্থির করিতে পারিল না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কর্তব্য স্থির করিয়া 'তাহারা নির্ভয়ে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিল। ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম যুদ্ধ। আরম্ভ হইল রীতিমত যুদ্ধ—ইষ্টক খণ্ডের দ্বারা রাইফেল-রিভলভারের সহিত যুদ্ধ।

প্রায় এক ঘণ্টা যুদ্ধ চলিল। সৈন্যবাহিনীর অজস্র গুলিবর্ষণে বহু শ্রমিক নিহত ও আহত হইল। এই ভাবে অধিক সময় যুদ্ধ করা সম্ভব নয় বুঝিয়া তাহারা সেদিনের মত পশ্চাৎ অপসরণ করিল। এই যুদ্ধেই বোম্বাইয়ের বিখ্যাত শ্রমিক নায়ক গণপত গোবিন্দ নিহত হন। তাঁহার সহিত ১৬ বৎসরের একটি বালকও রাইফেলের গুলিতে নিহত হইয়াছিল। এই বীর বালকের নাম কোনদিনই জানা যায় নাই। কিন্তু তাহার স্মৃতি বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর অন্তরে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী পুলিস-ইন্‌স্‌পেক্টর ফিনান্‌ বোম্বাইয়ের করোনারের আদালতে সাক্ষ্যদান-কালে গণপত ও এই বালক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতিটি দিয়াছিলেন :

"সংঘর্ষ আরম্ভ হইবার সময় আমি দেখিলাম, গণপত পুলিস চৌকির নিকট দাঁড়াইয়া জনতাকে আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করিতেছেন। আমি দেখিলাম, গুলি-বর্ষণে দুই-তিন জন লোক মাটিতে পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় মৃতব্যক্তি (অর্থাৎ অজ্ঞাত পরিচয় বালকটি) জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। সেও সৈন্য ও পুলিসদের উপর আক্রমণ করিবার জন্য জনতাকে উত্তেজিত করিতেছিল। সেও ছিল একজন পরিচালক।"[১]

ইন্‌স্‌পেক্টর ফিনান্‌ তাঁহার বিবৃতিতে আরও জানাইয়াছিলেন যে, কোন ভারতীয় পুলিসকেই এই সংঘর্ষে নিয়োগ করা হয় নাই।[২] ফিনান্‌ ইহার কারণটি না বলিলেও ইহা স্পষ্ট যে, শাসকগোষ্ঠী ভারতীয় পুলিসকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। পাছে তাহারা শ্রমিকদের পক্ষ অবলম্বন করে—এই ভয়েই ভারতীয় পুলিসকে দূরে রাখা হইয়াছিল।

চিক্‌পোক্‌লির এই সংঘর্ষ বেলা ১১টার মধ্যেই শেষ হইয়া যায় এবং ইহার পর সমগ্র অঞ্চলে একটা গম্ভীর ও থমথমে ভাব বিরাজ করিতে থাকে। কিন্তু সেই সময় অন্য অঞ্চলে শ্রমিকগণ সমবেত হয়। তাহারা ইতিমধ্যে সংবাদ পাইয়াছিল যে,

১। The Times of India, 25th July, 1908. ২। Statement of Inspector Finan, Ibid.

কোলাবা অঞ্চলের দুইটি মিলে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই সংবাদে শ্রমিকগণ ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠে। এই সময় মিলের য়ুরোপীয় ম্যানেজার মিলের বাহিরে আসিয়া শ্রমিকদের উপর প্রভুত্ব খাটাইবার চেষ্টা করিলে উত্তেজিত শ্রমিকগণ ম্যানেজারকে উচিত শিক্ষা দিবার জন্ম তাহার দিকে ধাবিত হয়। ম্যানেজার প্রাণের ভয়ে পলাইয়া আসিয়া মিলের ভিতর হইতে পুলিসকে সংবাদ দেয়। অবিলম্বে একদল সশস্ত্র পুলিস আসিয়া উপস্থিত হয়। পুলিশ ও শ্রমিকগণ যখন পরস্পরকে আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিল তখনই ম্যানেজার ভয় পাইয়া মিলের কাজ বন্ধ করিয়া দেয়। এই অভাবনীয় জয়লাভে শ্রমিকগণ উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে। তাহারা "তিলক মহারাজ কি জয়" ধ্বনি দিতে দিতে স্থান ত্যাগ করে।

এই প্রকারের ঘটনা ঘটে বহু স্থানে। ইহাদের মধ্যে মহিম অঞ্চলের ঘটনাটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এখানে সৈন্যবাহিনীর সহিত শ্রমিকদের এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। মহিম অঞ্চলের এক য়ুরোপীয় কোম্পানির একটি পশমের মিল ছিল সংঘর্ষের ক্ষেত্র। চিঞ্চ্‌পোক্‌লির সংঘর্ষের সংবাদ পাইয়া এই পশম মিলের শ্রমিকগণ কাজ করিতে অস্বীকার করে। মিলের মালিকগণ শ্রমিকদের উপর বলপ্রয়োগের চেষ্টা করিলে শ্রমিকগণও মালিকদের আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। তাহাদের প্রহারের ফলে মিলের য়ুরোপীয় ম্যানেজার ভীষণ আহত হয়। মালিকগণ ভয় পাইয়া সৈন্যবাহিনীকে আহ্বান করে। এই সংবাদ পাইবামাত্র কাপড়ের মিলের ধর্মঘটী শ্রমিকগণ হাজারে হাজারে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার পরই আরম্ভ হয় শ্রমিকদের সহিত সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষ। শ্রমিকগণ চারিদিক হইতে ইষ্টক বর্ষণ করিয়া সৈন্যদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, আর সৈন্যরা উন্মত্তের মত গুলি বর্ষণ করিতে থাকে। গুলির আঘাতে কয়েকজন শ্রমিক নিহত এবং বহু শ্রমিক গুরুতররূপে আহত হয়।

এই সংঘর্ষ এখানেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র বোম্বাই শহরে বিস্তার লাভ করে। সমগ্র বোম্বাই শহর একটি বিশাল রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। বোম্বাই শহরের সমস্ত কর্মচাঞ্চল্য থামিয়া যায়। শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান-পাট, যানবাহন বন্ধ হইয়া যায়। সমগ্র জাহাজ-ঘাঁট নির্জন হইয়া পড়ে। বন্দরের শ্রমিক, কুলি প্রভৃতিরা ধর্মঘট করিয়া চলিয়া যায়। সর্বত্র একটা ভীষণ উত্তেজনা বিরাজ করিতে থাকে।

পরবর্তী সংঘর্ষ ঘটে বেলা দুইটার সময়। এই সময় কয়েকজন ইংরেজ সাহেব 'কারিরোড স্টেশন'-এর দিকে যাইতেছিল। পূর্বের হত্যাকাণ্ডের ফলে উত্তেজিত শ্রমিকগণ দেখিবামাত্র তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। তাহারা প্রাণের ভয়ে দৌড়াইয়া গিয়া স্টেশনের মধ্যে আশ্রয় লইলে শ্রমিকগণও স্টেশন ঘিরিয়া ফেলে। এই সময় স্টেশনে একদল ইংরেজ সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। রেল কর্তৃপক্ষও 'ভিক্টোরিয়া টারমিনাস্' হইতে বহু সশস্ত্র রেল পুলিস আমদানি করে। সৈন্য ও পুলিসদল শ্রমিকদের উপর গুলি বর্ষণ করিলে তাহাদের সহিত শ্রমিকদের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়।

এবার শ্রমিকগণ এক উন্নত যুদ্ধ-কৌশল অবলম্বন করে। রাইফেলধারী সৈন্যদের

উপর সম্মুখভাগ হইতে আক্রমণ না করিয়া শ্রমিকগণ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং পাকা বাড়ী, গাছ প্রভৃতির আড়ালে আত্মগোপন করিয়া ইষ্টক প্রভৃতির সাহায্যে সৈন্য ও পুলিসদের উপর আক্রমণ চালাইতে থাকে। তাহাদের ইষ্টক বর্ষণে বহু সৈন্য ও পুলিস আহত হয় এবং স্টেশনের দালানের জানালা ও অন্যান্য বহু সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। অল্প সময়ের মধ্যে আরও বহু শ্রমিক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহারা সম্মুখভাগ হইতেই পুলিস ও সৈন্যদের আক্রমণ করে। সৈন্য ও পুলিসবাহিনীও বৃষ্টিধারার মত গুলি বর্ষণ করে এবং তাহার ফলে বহু শ্রমিক নিহত ও আহত হয়। সৈন্য ও পুলিসবাহিনীর গুলি বর্ষণের ফলে বহু শ্রমিক-নায়কও নিহত ও আহত হন। নিহত শ্রমিক নায়কদের মধ্যে ছিলেন মধু রঘুনাথ (বয়স ৫৫ বৎসর), সীতারাম সাভনি (২২), নন্দু সোমু (২৫), জিন্না বাবু (২৫) এবং ১৭ বৎসর বয়স্ক এক কিশোর।

কেবলমাত্র ইষ্টক বর্ষণ করিয়া সৈন্য ও রেল-পুলিসদের রাইফেলের বিরুদ্ধে অধিক সময় যুদ্ধ করা অসম্ভব বুঝিয়া শ্রমিকগণ ইষ্টক বর্ষণ করিতে করিতে রেলপথ ধরিয়া পশ্চাৎ অপসরণ করে। এই সময় পুনা মেল-ট্রেনখানি আরও সৈন্য লইয়া আসিতেছিল। শ্রমিকগণ ইষ্টক বর্ষণ করিয়া ট্রেনের গতিরোধ করে।

সংগ্রামের ক্ষেত্রে নূতন শক্তির আবির্ভাব

ইহার পর দুই দিন, অর্থাৎ ২৫শে ও ২৬শে জুলাই, বোম্বাই শহরে বিশেষ কোন ঘটনা না ঘটিলেও সমগ্র শহরে একটা থমথমে ভাব, একটা চাপা উত্তেজনা বজায় থাকে। এই দুই দিন বোম্বাইয়ের সকল মিল ও কারখানা বন্ধ থাকে এবং সকল শ্রমিক-অঞ্চলগুলিকে সৈন্যবাহিনী ঘিরিয়া রাখে। ২৫শে জুলাই সন্ধ্যাকালে বোম্বাইয়ের পুলিস কমিশনার মিল-মালিকদের নিকট মিলগুলি খুলিবার আবেদন করেন। কিন্তু পরদিন মিল-মালিকগণ মিলগুলি খোলা রাখিলেও কোন শ্রমিকই কাজে যোগদান করে নাই। ইংরেজদের সংবাদ-পত্রগুলি কঠোর দমননীতি চালাইবার দাবি জানায়। কিন্তু সকল হুমকি ও রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করিয়া শ্রমিকগণ সংগ্রামে অটল থাকে। তাহাদের অনমনীয় মনোভাব ও উত্তেজনা দেখিয়া শাসকগোষ্ঠী আশঙ্কা করিতেছিল, শীঘ্রই আবার ঝড় উঠিবে।

শাসকগোষ্ঠীর আশঙ্কা শীঘ্রই সত্যে পরিণত হইল, ২৭শে জুলাই আবার নূতন করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এবার এক নূতন শক্তি আসিয়া শ্রমিকদের সহিত সংগ্রামে যোগদান করিল। শহরের দরিদ্র ব্যবসায়িশ্রেণী হইল সেই সংগ্রামী শক্তি। তাহাদের মধ্যেও প্রথম হইতেই সর্বজনপ্রিয় তিলকের গ্রেপ্তারে ভীষণ উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল এবং তাহারাও সক্রিয় প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ শাসকশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার কোন পথ তাহারা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী তাহাদিগকে পথের সন্ধান দিবার পর তাহারাও সংগ্রামের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

২৭ তারিখের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ ঘটে শেখ মেনন স্ট্রীটে। এই রাস্তাটি ছিল সেই সময়ের সর্বাপেক্ষা কর্মচঞ্চল ব্যবসা-কেন্দ্র। এই রাস্তায়ই তিনটি সবচেয়ে বড় কাপড়ের বাজার। দরিদ্র ব্যবসায়ীরা প্রথমে তিলকের ছবিসহ গুজরাটী ভাষায় একটি ইস্তাহার ছাপাইয়া উহা হাজারে হাজারে বিতরণ করে। এই ইস্তাহারে "তিলক মহারাজ কি জয়" ধ্বনি লিখিয়া বলা হয়:

"তিলকই দেশের অন্তরাত্মা। দেশের এই অন্তরাত্মাটিকে ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছে। সুতরাং দেশের শরীর অর্থাৎ জাতি কি করিয়া বাঁচিবে!"

ইস্তাহারটিতে দেশবাসীদের স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে, তিলকই স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাই ভারতের সমৃদ্ধির দ্বার খুলিয়া গিয়াছে। ইস্তাহারটিতে শ্রমিকদের সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয় এবং সর্বশেষে ধ্বনি দেওয়া হয়:

"স্বদেশী আন্দোলন সফল হউক।"[১]

অল্প সময়ের মধ্যেই হাজার হাজার মানুষ শেখ মেনন স্ট্রীটে সমবেত হয়। বেলা ১১টার সময় জনতার উত্তেজনা চরমে উঠে এবং অবিলম্বে এক বিরাট সশস্ত্র পুলিসবাহিনী আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু জনতার উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া পুলিসবাহিনী ভয়ে দূরে চলিয়া যায়। কিছুক্ষণ পরেই এক শ্বেতাঙ্গ সৈন্য বাহিনী আসিয়া পুলিসের শক্তি বৃদ্ধি করে। এই বিপুল সামরিক আয়োজন দেখিয়াও জনতার মধ্যে ভয়ের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না, তাহারা আক্রমণ আরম্ভ করিল। পুলিস ও সৈন্যদের উপর তাহারা চারিদিক হইতে বৃষ্টি ধারার মত ইষ্টক বর্ষণ করিতে লাগিল। অপর দিক হইতে পুলিস এবং সৈন্যরাও উন্মত্তের মত জনতার উপর গুলিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। শেখ মেনন স্ট্রীটের, বিশেষত এই রাস্তার 'মুলজি জেথা' বাজারের সংঘর্ষের নিম্নোক্ত বর্ণনাটি 'টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল:

"পুলিস ও সামরিক বাহিনীর উপর ইষ্টকখণ্ড দ্বারা এবং অন্যান্য উপায়ে বারংবার এরূপ ভীষণ আক্রমণ চলে যে তাহা মিল-অঞ্চলেও দেখা যায় নাই। আইন-শৃঙ্খলার হৃতভাগ্য প্রতিনিধিদের (পুলিস ও সামরিক বাহিনীর—লেঃ) উপর বৃষ্টি ধারার মত ইষ্টকখণ্ড বর্ষিত হয়।...সৈন্যরা গুলি ছুঁড়িবার জন্য হাঁটু গাড়িয়া বসিলে অবিশ্রান্ত ইষ্টক বর্ষণে তাহারা বাধা প্রাপ্ত হয়।"[২]

পুলিস ও সামরিক বাহিনীর রাইফেলের সহিত জনতার প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলিতে থাকে। ছত্রভঙ্গ হওয়া দূরের কথা, বহু ব্যক্তি হতাহত হইলেও তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া কখনও সম্মুখ হইতে, কখনও বাড়ীঘরের আড়াল হইতে জনতা প্রবল বিক্রমে ইষ্টক বর্ষণ করিতে থাকে। জনতার একাংশ সম্মুখ ভাগ হইতে এবং অপর অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ হইয়া বিভিন্ন অলিগলি আর দালানের ছাদ হইতে ইষ্টক বর্ষণ করিয়া পুলিস ও সামরিক বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে।

১। D. C. Homes: Ibid. ২। Times of India, 28 July, 1908.

জনতার নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণের ফলে সৈন্য ও পুলিসদের পক্ষে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গুলি ছোঁড়াও আসম্ভব হইয়া উঠে। এইভাবে বেলা ১১টা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সংগ্রাম চলে অব্যাহতভাবে। সন্ধ্যার পর বিপুল সংখ্যক পুলিস ও সৈন্য আসিয়া শেখ মেনন স্ট্রীটের ব্যবসা-কেন্দ্রটিকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া রাখে।

শেখ মেনন স্ট্রীটের এই সংগ্রামে বহু ব্যক্তি নিহত ও আহত হইয়াছিল। এই সংগ্রামের প্রধান নায়ক ছিলেন ২৫ বৎসর বয়স্ক গুজরাটী ব্যবসায়ী কেশবলাল কাঞ্জি। ইনি সমস্ত দিনের সংগ্রামের পর অপরাহ্নে সৈন্যদের রাইফেলের গুলিতে নিহত হন। তাঁহার দেহ বহু গুলির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইলেও তিনি সংগ্রামকারী জনতার পার্শ্ব ত্যাগ করেন নাই, অথবা ইষ্টক বর্ষণ ক্ষান্ত করেন নাই। তাঁহার দক্ষ পরিচালনার জন্যই সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল এবং বহু পুলিস ও সৈন্য গুরুতর-রূপে আহত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছিল। তাঁহার দক্ষ পরিচালনার গুণে, দীর্ঘস্থায়ী দুঃসাহসিক সংগ্রামের তুলনায় সংগ্রামকারী জনতার মধ্যে নিহত ও আহতের সংখ্যা অধিক হয় নাই। সৈন্য ও পুলিসদল সমস্ত দিনের চেষ্টার পর এই দুঃসাহসী ও দক্ষ নায়ককে হত্যা করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

শ্রমিকগণও এইদিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে নাই। তাহারা পুলিস ও সৈন্য বাহিনীর বেষ্টনী এড়াইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে বাহির হইয়া পড়ে এবং প্যারেল অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত ইষ্টক প্রভৃতি দ্বারা সংগ্রাম চালায়।

গৃহভৃত্যদের সংগ্রাম—২৮শে জুলাই

২৮শে জুলাই একটি সম্পূর্ণ নূতন ও অপ্রত্যাশিত শক্তি আসিয়া এই সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী রাজনীতিক সংগ্রামে যোগদান করে। ইহাই বোম্বাই শহরের গিরগাঁও অঞ্চলের গৃহভৃত্যের দল। শ্রেণী হিসাবে ইহারা দরিদ্র বা ভূমিহীন চাষী। বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি অঞ্চল হইতে ইহারা বোম্বাই শহরে আসে গৃহভৃত্যের কাজ করিয়া মুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করিতে। সেকালে, এমনকি এখনও তাহারা শত শত সংখ্যায় আসিয়া গিরগাঁও অঞ্চলের বিভিন্ন পরিবারে গৃহভৃত্যের কর্ম গ্রহণ করে। এই অঞ্চলটিই ছিল ২৮শে জুলাইয়ের রণক্ষেত্র। শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র ব্যবসায়ীদের এই কয়দিনের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হইয়া ২৮শে জুলাই ইহারা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

ঐদিন কয়েকশত গৃহভৃত্য সকাল বেলা হইতে বিভিন্ন বাড়ীর ছাদে ও গৃহের মধ্যে বহু ইষ্টকখণ্ড সংগ্রহ করিয়া সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়। বেলা ১০টা হইতে তাহাদের সংগ্রাম আরম্ভ হয়। যে সকল পুলিস ও সৈন্যদল পূর্বদিন হইতে গিরগাঁওয়ের ব্যবসায়ী অঞ্চলটি ঘিরিয়া রাখিয়াছিল তাহাদের উপর গৃহভৃত্যগণ বিভিন্ন স্থান হইতে আক্রমণ আরম্ভ করে। তাহাদের আক্রমণে বহু পুলিস ও সৈন্য এবং বোম্বাইয়ের একজন ম্যাজিস্ট্রেট গুরুতররূপে আহত হয়। এই অভূতপূর্ব সংগ্রাম সকাল ১০টা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত আরও বহু পুলিস আসিয়া বহু কষ্টে অবস্থা আয়ত্তে আনিতে সক্ষম হয়। পুলিস ও সৈন্যগণ বাড়ী

বাড়ী ঢুকিয়া কয়েকশত ভৃত্যাকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয়। পুলিস ও সৈন্যদের গুলি বর্ষণের ফলে ইহাদের দেড়শত জন হত ও আহত হয়। তাহাদের প্রধান নায়ক, বাবু নোরোবা গুলির আঘাতে নিহত হন।

এইদিন বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের সংগ্রাম চলে সিউরি অঞ্চলে। সকালবেলা সংবাদ রটিয়া যায় যে, দাদার অঞ্চলের একটি মিলে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিবামাত্র হাজার হাজার শ্রমিক সিউরি অঞ্চলে সমবেত হয়। সিউরি হইতে এক বিশাল শোভাযাত্রা দাদার অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। পথে বহুসংখ্যক পুলিস ও সৈন্য আসিয়া শোভাযাত্রার গতিরোধ করিলে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যায়। শ্রমিকগণ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া ইষ্টক প্রভৃতি দ্বারা চারিঘণ্টা কাল সংগ্রাম করে। তাহাদের ইষ্টকের আঘাতে বহু পুলিস ও সৈন্য ভীষণ আহত হয়। বহুক্ষণ সংগ্রামের পর শ্রমিকগণ পশ্চাৎ অপসরণ করে।

শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাজনীতিক সংগ্রামের তাৎপর্য

তিলকের কারাদণ্ডের প্রতিবাদে বোম্বাইয়ের 'চরমপন্থী'রা ছয় দিনের সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের শ্রমজীবী দরিদ্র জনসাধারণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সহিত একত্রে সেই আবেদনে সাড়া দিয়া শ্রমিকশ্রেণী এক ঐতিহাসিক সংগ্রামের দ্বারা তিলকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔদ্ধত্যের সমুচিত উত্তর দেয়। এইভাবে বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী এক উন্নত রাজনীতিক সংগ্রামের দ্বারা ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক নূতন গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। শ্রমিকশ্রেণীর এই সচেতন রাজনীতিক সংগ্রামের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। তিলকের বিচারের তীব্র সমালোচনা এবং ইহার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া লেনিন লিখিয়াছেন:

"ভারতবর্ষের জনসাধারণ তাহাদের লেখক ও রাজনীতিক নেতৃবৃন্দকে রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতের গণতান্ত্রিক নায়ক তিলকের বিরুদ্ধে বৃটিশ শৃগালের দল দণ্ডাদেশ ঘোষণা করিয়াছে দীর্ঘকালের নির্বাসন-দণ্ড। বৃটিশ 'হাউস অব কমনস্'-এ প্রশ্নোত্তরে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ভারতীয় জুরিরা তাঁহার মুক্তির জন্যই সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সংখ্যাধিক বৃটিশ জুরিদের ভোটের জোরেই এই দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। একজন গণতান্ত্রিক নায়কের বিরুদ্ধে অর্থপিশাচ মূলধনীদের পদলেহী কুকুরদের এই প্রতিহিংসামূলক দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের রাজপথে প্রতিবাদ-অভিযান এবং ধর্মঘটের ঝড় বহিতেছে।

"ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী ইতিমধ্যেই শ্রেণীসচেতন রাজনীতিক গণ-সংগ্রাম চালনার জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষে রুশীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত বৃটিশ শাসনের শয়তানী খেলা এবার শেষ হইতে চলিয়াছে।"[১]

লেনিন স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন, সচেতনভাবে রাজনীতিক সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর যোগদান ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের এক নূতন স্তরের এবং ভারতবর্ষের

১। Lenin: The National Liberation Movement in the East (Moscow, 1957 ed. p. 15.

সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের সূচনা করিয়াছে।[১] ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর এই সংগ্রামই আরও বিকশিতরূপে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের গণ-সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ-শীর্ষে আরোহণ করিয়া বহুগুণ উন্নত এক নূতন স্তরের সংগ্রাম—'প্যারী কমিউন'-এর অনুরূপ রাষ্ট্র-ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার (শোলাপুরে ও পেশোয়ারে) সংগ্রাম রূপে দেখা দিয়াছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিকশ্রেণীর এই প্রথম সচেতন রাজনীতিক সংগ্রাম ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের সেই বহুগুণ উন্নততর সংগ্রামেরই আরম্ভ মাত্র।

সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকগণ এবং ভারতের মধ্যশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদঘেষা ইতিহাস লেখকগণ ভারতের ইতিহাসের এই যুগান্তকারী ঘটনাটিকে সুপরিকল্পিতভাবে চাপা দিয়া রাখিয়াছেন। কারণ, "তাঁহারা সম্পত্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ।"[২]—তাই তাঁহারা শ্রমিকশ্রেণীর এই প্রথম রাজনীতিক সংগ্রামে ভীত হইয়া ইহাই প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে, ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর কোন রাজনীতিক ভূমিকা নাই। শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন শ্রেণী-সংগ্রামের ভয়ে ভীত সাম্রাজ্যবাদীদের মতই ভারতের মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণও তাই এতকাল বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকশ্রেণীর এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের প্রতি চক্ষু বুজিয়া ইহাকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাই তাঁহারা বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর পাশে না দাঁড়াইয়া সেদিন সন্ত্রাসবাদের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু বোম্বাইয়ের শ্রমিক-শ্রেণী তাহাদের সেই বিপুল তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটিকে কোনদিন ভুলিয়া যায় নাই, তাহারা ইহাকে আজও পর্যন্ত সযত্নে অন্তরের মণিকোঠায় রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

১। Lenin : Ibid, p. 160-62. ২। D. H. Home : Ibid.

● চতুর্থ ভাগ ●

ভারতের দ্বিতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টা

(১৯১৫-১৮)

প্রথম অধ্যায়

'গদর পার্টি'র ইতিহাস[১]

'ভারতীয় স্বাধীনতা-সংঘ'

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্নিয়ার প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হইয়া 'ভারতীয় স্বাধীনতা-সংঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে[২], খগেন্দ্রনাথ দাস, তারকনাথ দাস, অধরচন্দ্র লস্কর এবং আরও কয়েকজন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকায় বসবাসকারী শিখদের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার বাণী ও বৈপ্লবিক সংগ্রামের আদর্শ প্রচার করা।

এই সংঘের সিদ্ধান্তক্রমে পাণ্ডুরঙ্গ ও অধরচন্দ্র সামরিক শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে কালিফোর্নিয়ার এক সামরিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এই সংঘের বাণী ভারতবর্ষেও প্রচারের সিদ্ধান্ত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সংঘের কর্মকর্তারা সংঘের বৈপ্লবিক ঘোষণা-পত্রখানি বহু সংখ্যায় পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডি শহরে 'চরমপন্থী' নায়ক লালা পিণ্ডিদাসের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে পিণ্ডিদাসের গৃহ খানাতল্লাসীর সময় এই ঘোষণা-পত্রখানি পুলিসের হস্তগত হয় এবং ইহার জন্য পিণ্ডিদাস ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কালিফোর্নিয়ার সাক্রামেণ্টো এবং ওরিগন রাজ্যের পোর্টল্যাণ্ড শহরেও সংঘের প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে কালিফোর্নিয়া, ওরিগন, ওয়াশিংটন এবং কানাডায়ও সংঘের বৈপ্লবিক প্রচারকার্য পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে। ক্রমশ পোর্টল্যাণ্ডের কর্মকেন্দ্রই প্রধান হইয়া উঠে। এই কেন্দ্র হইতেই বিভিন্ন প্রচার-পুস্তিকা ছাপাইয়া চারিদিকে পাঠান হইত। কাশীরাম নামক এক বিপ্লবী সোহন সিং গ্রন্থীলের সাহায্যে এই কেন্দ্রের কার্য পরিচালনা করিতেন।

'গদর পার্টি'র প্রতিষ্ঠা

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব হইতে পলায়ন করিয়া হরদয়াল ও ভাই পরমানন্দ কালিফোর্নিয়ায় উপস্থিত হন। হরদয়াল 'স্বাধীনতা-সংঘ'-এ যোগদান করেন এবং সংঘের নাম পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব করেন। তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী 'ভারতীয় স্বাধীনতা-সংঘ'-এর নাম পরিবর্তন করিয়া রাখা হয় 'গদর পার্টি'। 'গদর' শব্দের অর্থ 'বিপ্লব'। বিপ্লব দ্বারা ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাই ছিল ইঁহাদের

১। এই অধ্যায়ের তথ্যসমূহ আমেরিকায় প্রবাসী ভারতীয় অধ্যাপক পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে লিখিত বিবরণ হইতে গৃহীত। ইনি ছিলেন আমেরিকায় প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সংগঠন 'গদর সমিতি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নায়ক। এই বিবরণটি ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-রচিত 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস' হইতে সংগৃহীত।

২। ইনি নাগপুরের অধিবাসী এবং মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক সমিতির সভ্য ছিলেন।

উদ্দেশ্য। এই জন্যই হরদয়াল এই নামকরণের প্রস্তাব করেন। হরদয়ালের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

'গদর পার্টি'র দুইটি বিভাগ ছিল: একটি প্রচার-বিভাগ এবং অপরটি সামরিক বিভাগ। হরদয়াল প্রচার-বিভাগের আর পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে সামরিক বিভাগের কর্মসচিব নিযুক্ত হন। এই সময় বহু ভারতীয় মুসলমানও আমেরিকায় বাস করিত। তাহাদের মধ্যে প্রচারকার্য চালনার জন্য একজন মুসলমান কর্মীর প্রয়োজন দেখা দেয়। এই কার্যের জন্য জাপান হইতে অধ্যাপক বরকতুল্লাকে আমেরিকায় আহ্বান করা হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আমেরিকায় উপস্থিত হন। এই সময় পণ্ডিত রামচন্দ্র ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিয়া আমেরিকার সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো নগরীতে আগমন করিয়া 'গদর পার্টি'তে যোগদান করেন। ইহার অল্প কয়েকদিন পরেই পিঙ্‌লে নামক এক মহারাষ্ট্রীয় যুবক পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজের নামে একখানি পত্র লইয়া ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকায় উপস্থিত হন। পিঙ্‌লে ছিলেন মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির সভ্য। সম্ভবত মহারাষ্ট্রের সংগঠনের সহিত 'গদর পার্টি'র সংযোগ স্থাপনই ছিল তাঁহার আমেরিকায় আগমনের উদ্দেশ্য। প্রায় একই সময় বাঙলাদেশ হইতে আসেন সত্যেন্দ্রনাথ সেন নামক একজন বিপ্লবী। পিঙ্‌লে এবং সত্যেন সেন উভয়েই 'গদর পার্টি'তে যোগদান করেন। সত্যেন্দ্রনাথই ছিলেন 'গদর পার্টি'তে একমাত্র বাঙলা ভাষা-ভাষী সভ্য। 'গদর পার্টি' প্রতিষ্ঠার পূর্বেই তারকনাথ দাস বাঙলাদেশ হইতে পলায়ন করিয়া আমেরিকায় পৌছিয়াছিলেন এবং 'ভারমণ্ট সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়'-এ ভর্তি হইয়াছিলেন। তিনিও সেখানে থাকিয়াই 'গদর পার্টি'র সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন।

'গদর পার্টি' পাঞ্জাবী, উর্দু, মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী এবং ইংরেজী ভাষায় 'গদর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করিত। এই পত্রিকায় বৈপ্লবিক প্রবন্ধ, কবিতা ও গান প্রকাশিত হইত। পার্টির সভ্যদিগকে পাঞ্জাবী ও হিন্দী ভাষায় বৈপ্লবিক গান শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহা ব্যতীত পার্টির কর্মকর্তাগণ বাছিয়া বাছিয়া পার্টিসভ্য সংগ্রহ করিতেন। সামরিক বিভাগে সামরিক কুচকাওয়াজ, বোমা প্রস্তুত করিবার প্রণালী, রিভলভার-পিস্তল ছোঁড়া, রাইফেল ছোঁড়া ও রাইফেল লইয়া ড্রিল প্রভৃতি শিক্ষাদান করা হইত।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন গভর্নমেণ্ট হরদয়ালকে 'এ্যানার্কিস্ট' আখ্যা দিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা আরম্ভ করে। হরদয়াল আমেরিকা হইতে পলায়ন করিয়া প্রথমে সুইজারল্যাণ্ডে এবং পরে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনে আসিয়া সেখানে ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হন।

হরদয়ালের আমেরিকা ত্যাগের পর বরকতুল্লা, রামচন্দ্র এবং কাশীরাম 'গদর পার্টি'র প্রচার-বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। এই সময় (১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম অঞ্চলে কয়েক হাজার ভারতীয় শিখ বাস করিত। তাহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্বে ছিল সৈনিক। 'গদর পার্টি'র প্রচারকদল তাহাদের মধ্যে ছায়াচিত্র

যোগে বিপ্লবের দ্বারা (অর্থাৎ ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের কথা প্রচার করিতেন।

এই সময় য়ুরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। 'গদর পার্টি' এই মহাযুদ্ধকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে একটি মহাসুযোগ বলিয়া গ্রহণ করে। এই সময় 'গদর পার্টি'র নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষে ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিবার উদ্দেশে ভারতীয় কৃষকদের লইয়া একটি বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য করিবার জন্য পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজেকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত হয়। খানখোজে ভারতবর্ষের পথে নিউইয়র্কে উপস্থিত হন। তিনি বিষণ দাস কোছার নামক এক বিপ্লবী যুবককে সঙ্গী করেন। নিউইয়র্ক নগরীতে আগাসে ওরফে 'মহম্মদ আলি'র সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয় এবং তিনিও তাঁহাদের সহিত ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করেন। আগাসে ছিলেন মহারাষ্ট্রের গুপ্ত সমিতির একজন সভ্য। সামরিক বিদ্যা শিক্ষার জন্য তাঁহাকে পারস্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তিনি পারস্যে 'মহম্মদ আলি' নামে পরিচিত হইয়া সামরিক অফিসার রূপে পারস্যের সৈন্যবাহিনীতে চাকরি করিতেন। ইহার পর তিনজনে একটি গ্রীক জাহাজে ভারতবর্ষের পথে গ্রীসের পিরিউস বন্দরে উপনীত হন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে 'গদর পার্টি' বার্লিনের 'ভারতীয় স্বাধীনতা কমিটি'র সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়াই কার্য পরিচালনা করিত। আমেরিকার 'গদর পার্টি' 'বার্লিন কমিটি'র নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য পাইত এবং সেই অর্থ-সাহায্য দ্বারাই 'গদর পার্টি' উহার কার্য পরিচালনা করিত। কারণ, সেই সময় বেশীর ভাগ ভারতীয় শিখ সংগ্রামে যোগদানের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করিয়াছিল বলিয়া পার্টির লোকবল ও অর্থবল বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছিল। ভাই সন্তোখ সিং নামক একজন পাঞ্জাবী কৃষক তাঁহার সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ পার্টিকে দান করেন এবং কৃষিজীবিকা ত্যাগ করিয়া পার্টির সভ্য হন। ইনিই পার্টির কর্মসচিব নিযুক্ত হইয়া কার্য পরিচালনা করিতেন। এই সময় বিখ্যাত বিপ্লবী সুরেন্দ্রনাথ কর বাঙলাদেশ হইতে পলায়ন করিয়া আমেরিকায় উপস্থিত হন। 'গদর পার্টি' তাঁহাকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য নির্বাচিত করে।

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে যোগদান

আমেরিকা হইতে পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে, বিষণ দাস এবং আগাসে ওরফে 'মহম্মদ আলি' গ্রীক জাহাজে গ্রীসের পিরিউস বন্দরে উপস্থিত হন। সেখান হইতে বিষণ দাস ভারতবর্ষে আসেন। ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কোন এক জনমানবহীন স্থানে অন্তরীণ করা হয়।

ইহার পর পাণ্ডুরঙ্গ ও আগাসে তুরস্কের স্মার্না শহর হইয়া কন্‌স্তান্তিনোপ্‌ল নগরীতে উপনীত হন। সেই স্থানে তাঁহারা ভারতের বিখ্যাত বিপ্লবী আবু সৈয়দ এবং প্রমথনাথ দত্ত ওরফে 'দাউদ আলি'র সহিত মিলিত হন। আবু সৈয়দ ছিলেন পাঞ্জাবের অধিবাসী। ইনি তুরস্কে থাকিয়া 'জাহান-ই-ইস্‌লাম' নামে আরবী ভাষায়

একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তাহাতে বৃটিশ-বিরোধী বৈপ্লবিক মতবাদ প্রচার করিতেন। প্রমথনাথ দত্ত কন্স্তান্তিনোপ্‌ল-এ 'দাউদ আলি' নাম গ্রহণ করিয়া ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচারকার্য চালাইতেন এবং সংগঠন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন।

প্রমথনাথ ও আবু সৈয়দের সহিত পাণ্ডুরঙ্গ তুরস্ক সরকারের বৈদেশিক বিভাগের মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন :

"আমরা ভূতপূর্ব সামরিক লোকদের লইয়া গঠিত 'গদর পার্টি'র সভ্য। এই পার্টির সামরিক বাহিনীর পরিচালকরূপে আমি (পাণ্ডুরঙ্গ) জানাইতেছি যে, আমরা মহামারা বা বসরাতে এই দলকে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করি। আমরা এই দলকে দিয়া ভারত আক্রমণের বন্দোবস্ত করিব।"[১]

তুরস্ক সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া 'গদর পার্টি'র সভ্যদের আনয়ন করিবার অনুমতি দান করেন। ইহার পর পাণ্ডুরঙ্গ আমেরিকায় 'গদর পার্টি'র কর্মকর্তাদের নিকট এই সিদ্ধান্ত জানাইয়া একটি ঘোষণা-পত্র প্রেরণ করেন। ঘোষণা-পত্রটির নাম ছিল "গদর কি সিপাইয়োঁ কো নোটিশ" ('গদর' সৈন্যবাহিনীর প্রতি ঘোষণা)। ঘোষণায় বলা হয় : "রাস্তা পরিষ্কার হইয়াছে, সৈন্যদলকে প্রেরণ কর।" এই ঘোষণা-পত্রটি তুর্কি ও জার্মান দূতাবাস মারফত ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রেরণ করা হয়। ইহার পর পাণ্ডুরঙ্গ, আগাসে ও প্রমথ দত্ত কন্স্তান্তিনোপ্‌ল হইতে বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়া বাগদাদ নগরীতে উপস্থিত হন। পরবর্তী ক্রিয়াকলাপের বিবরণ পাণ্ডুরঙ্গের নিজের ভাষায় নিম্নরূপ :

"এই সময় জার্মানদের দ্বারা একটি অভিযান করানো হয়। উদ্দেশ্য ছিল, বৈপ্লবিক মত প্রচার এবং ভারতীয় বৈপ্লবিকদের কর্মে সাহায্য প্রদান করা। বাগদাদে আসিয়া আমরা পারস্যের সীমানার দিকে একটি বড় অভিযান প্রস্তুত করি এবং আমাদের উদ্দেশ্যমূলক পুস্তক প্রকাশ করিতে থাকি। এই পুস্তক লইয়া আমরা পারস্যের বুসারা নগরে যাই। তথায় ইংরেজরা এই ভারতীয় দলটিকে ধরিবার চেষ্টা করে। বুসারা হইতে আমরা সিরাজ-এ পলায়ন করি। তথায় আমরা সুফী অম্বাপ্রসাদের সাক্ষাৎ লাভ করি। তথায় তিনি 'সুফী সাহেব' নামে পরিচিত ছিলেন এবং একটি পারস্য বিদ্যালয়ের অধিকর্তারূপে অবস্থান করিতেছিলেন। আমরা তাঁহাকে সেখানকার 'গদর পার্টি'র প্রতিনিধিরূপে বরণ করি। তাহার পর আমরা নেহারিজ এবং কেরমান অভিমুখে যাত্রা করি এবং এখানেই আমরা আমাদের শেষ পল্টন গঠন করি। এই পল্টনে পারস্যবাসী এবং ভারতীয়দেরই গ্রহণ করা হয়।"[২]

বালুচিস্থানে স্বাধীন সরকার গঠন

পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে, প্রমথ দত্ত ও আগাসে পারস্যের কেরমান শহর ত্যাগ করিয়া বালুচিস্থানের সীমান্তের দিকে অগ্রসর হন। কিছু দূর যাইবার পর প্রমথনাথ দত্ত

১। পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজের বিবৃতি (ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস, ২৩৪ পৃষ্ঠা।) ২। পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজের বিবৃতি (ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস পৃঃ ২৩৫-৩৬)।

বালুচিস্থানের সীমান্ত খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্ত একাকী যাত্রা করেন। পথে তিনি একটি ইংরেজ সৈন্তদলের নিক্ষিপ্ত গুলিতে আহত হন। প্রমথ ও আগাসে কেরমানে ফিরিয়া যান, আর পাণ্ডুরঙ্গ বালুচিস্থানের সীমান্তবর্তী 'বাম' নামক স্থানে উপস্থিত হন।

পাণ্ডুরঙ্গ বাম-এ থাকিয়া জীহন খাঁ নামক একজন বালুচ সর্দারকে বুঝাইয়া স্বপক্ষে আনয়ন করেন এবং তাহার মারফত এক হাজার বালুচ কৃষককে লইয়া একটি সৈন্তবাহিনী গঠন করেন। ইহার পর উপযুক্ত সামরিক আয়োজন করিয়া পাণ্ডুরঙ্গ তাঁহার বাহিনী লইয়া বাম প্রদেশটি আক্রমণ করেন। এই সময় বাম-এ সামান্ত সংখ্যক ইংরেজ সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। তাহার এই আক্রমণে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে এবং পাণ্ডুরঙ্গ তাঁহার বাহিনী লইয়া প্রদেশটি অধিকার করেন। তাহার পর সেই স্থানে একটি 'স্বাধীন সরকার' গঠন করিয়া তাঁহারা পারস্তে ফিরিয়া যান। ইতিমধ্যে ইংরেজরা পারস্তের অন্তর্ভুক্ত বালুচিস্থানের আমীরকে হাত করিয়া তাঁহার সাহায্যে বাম আক্রমণ করেন। পাণ্ডুরঙ্গ পলায়ন করেন, কিন্তু তাঁহার বাহিনী পরাজিত ও ধ্বংস হয়।

এদিকে প্রমথ দত্ত, আগাসে এবং কিছু জার্মান সৈন্য ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হন। পাণ্ডুরঙ্গ কয়েকজন সঙ্গীসহ ঐ স্থানে আসিয়া ইংরেজ সৈন্যদের বেড়াজালে পড়িয়া যান। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর পাণ্ডুরঙ্গ আহত হইয়া ইংরেজদের হস্তে বন্দী হন। বন্দী শিবিরে তাঁহার সহিত প্রমথ দত্ত ও আগাসের সাক্ষাৎ হয় এবং তিনজনে পলায়ন করেন। ইহার পর পাণ্ডুরঙ্গ পারস্তের সৈন্যবাহিনীতে থাকিয়া কিছুদিন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্তু পাণ্ডুরঙ্গের সত্য পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িলে পারসিকগণ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে ইংরেজদের হস্তে সমর্পণ করেন। পাণ্ডুরঙ্গ এবারেও ইংরেজ বন্দী-শিবির হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হন।

ইহার পর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দেই পাণ্ডুরঙ্গ গোপনে বোম্বাই শহরে উপনীত হন এবং বাল গঙ্গাধর তিলক ও অন্যান্য পুরাতন বিপ্লবীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই তখন সন্ত্রাসমূলক বিপ্লববাদে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং এ্যানি বেশান্ত, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রভৃতিদের 'হোমরুল আন্দোলন'-এ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা বিপ্লবী পাণ্ডুরঙ্গকে আশ্রয় দান করিতে অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে সাহায্যের জন্য সোভিয়েত রুশিয়ায় গমন করিবার পরামর্শ দেন। পাণ্ডুরঙ্গ ভারতে আশ্রয় না পাইয়া য়ুরোপেই ফিরিয়া যান এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির সহিত একত্রে মস্কো গমন করেন। মস্কো আসিয়া তাঁহারা সোভিয়েত বৈদেশিক বিভাগের সাহায্যে প্রমথনাথ দত্তকে পারস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া মস্কো লইয়া আসেন। প্রমথনাথ লেনিনগ্রাড বিশ্ববিত্যালয়ের ওরিয়েণ্টাল-সেমিনারী বিভাগে অধ্যাপনার কার্যে নিযুক্ত হন।

পাণ্ডুরঙ্গ, ভূপেন্দ্রনাথ ও বীরেন্দ্রনাথ তিনমাস পরে বার্লিন নগরীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভারতবর্ষের সংবাদ য়ুরোপে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে Indian News and Information Bureau নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ইহরে পর ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্ডুরঙ্গ মেক্‌সিকো গমন করেন এবং সেখানে হেরম্বলাল গুপ্ত প্রভৃতি পুরাতন বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হন। এই সময় 'গদর পার্টি'র পুরাতন বিপ্লবীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ হইতে পলায়ন করিয়া মেক্‌সিকোতে সমবেত হইয়াছিলেন এবং সেই স্থানে একটি পার্টিকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। পাণ্ডুরঙ্গ মেক্‌সিকোতে কৃষি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

'গদর পার্টি'র সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ-সঙ্গীত

'গদর পার্টি'র সৈন্যবাহিনীর স্বদেশভক্তিমূলক 'যুদ্ধ-সঙ্গীত' সম্বন্ধে পাণ্ডুরঙ্গ লিখিয়াছেন :

"আজকাল I. N. A.[১] সৈন্যদের দ্বারা সৃষ্ট অভিবাদন-ধ্বনি 'জয়-হিন্দ' বিশেষভাবে জনপ্রিয় হইয়াছে। কিন্তু ইহা অনুধাবনের বস্তু যে, পারস্যে এবং অন্যান্য স্থানে আমাদের 'গদর দল'-এর সৈন্যেরা নিম্নলিখিত গান গাহিয়া যুদ্ধযাত্রা করিত। তাহাতে 'জয় হিন্দ্' শব্দটি ছিল :

জয় জয় জয়জী হিন্দ্।
তোকোঁ বন্দুক হাতিয়ারোঁ সে,
আজাদ করোজী হিন্দ্।।
হিন্দ্ হামারা জান হ্যায়,
আউর হিন্দ্ হামারা প্রাণ,
ভগৎ বনে হাম হিন্দ্‌কী,
আউর হিন্দ্‌কে কোরবাণ।।

১। Indian National Army. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে সকল ভারতীয় সৈন্য জাপানীদের হস্তে বন্দী হয় সুভাষচন্দ্র বসু জাপানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের লইয়া এই নামে একটি সৈন্য-বাহিনী গঠন করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জার্মান সাহায্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা[১]

জার্মেনীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদানের প্রস্তাব

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাস হইতে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই মহাযুদ্ধে য়ুরোপ ও এশিয়ার বৃহৎ শক্তিগুলি দুইভাগে ভাগ হইয়া যায়। একদিকে থাকে গ্রেটবৃটেন, ফরাসীদেশ, রুশিয়া ও জাপান এবং অপর দিকে থাকে জার্মেনী, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও তুরস্ক। গ্রেটবৃটেন জার্মেনীর বিরুদ্ধপক্ষ হওয়ায় প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মেনীর সাহায্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে সক্রিয় হইয়া উঠেন।

প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের পক্ষ হইতে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, খানচাঁদ বর্মা এবং আরও কয়েকজন জার্মান সরকারের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থিত প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রস্তাব করেন যে,—

"তাঁহারা ভারতীয়দের লইয়া গঠিত একটি স্বেচ্ছাসেবক সৈনিকের পল্টন ভারতবাসীদের ইংরেজ-বিদ্বেষ ও ইংরেজের শত্রু জার্মানদের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার জন্য জার্মেনীতে পাঠাইতে চাহেন। বৈপ্লবিকেরা সৈন্য, ডাক্তার ও এ্যাম্বুলান্সের লোক নিজেরাই দিবেন, আর সব ভার জার্মান গভর্নমেণ্টের।"[২]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূত বিপ্লবীদের এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করিয়া ভারতীয় বাহিনীকে জার্মেনীতে পৌঁছাইয়া দিবার এবং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করিবার ভার গ্রহণ করেন। ইহার পর ক্যালিফোর্নিয়ার 'গদর পার্টির' নায়ক পণ্ডিত রামচন্দ্রকে 'গদর পার্টি'র শিখদের লইয়া স্বেচ্ছা-সৈনিকদল গঠনের জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু রামচন্দ্র এই প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইয়া উত্তর দিলেন—

"য়ুরোপে স্বেচ্ছাসৈন্য পাঠাইয়া লাভ নাই। সাদা সিপাহীর সহিত সাদা সিপাহীরা লড়াই করিবে, কালো সিপাহীর সহিত কালো সিপাহীর লড়াই হইবে। সকলে যেন দেশে ফিরিয়া যায়, তাহাদের কার্য সেখানেই।"[৩]

'গদর পার্টি'র নায়কগণ য়ুরোপে গিয়া জার্মেনীর পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করা অপেক্ষা ভারতবর্ষে গিয়া বৈপ্লবিক সংগ্রামের দ্বারা বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টার পক্ষপাতী ছিলেন। সেই সময় তাঁহারা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্যে শিখদিগকে যত অধিক সংখ্যায় সম্ভব ভারতবর্ষে পাঠাইতেছিলেন। সুতরাং তাঁহারা জার্মেনীর পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। ইহার ফলে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতিদের প্রস্তাবটি নাকচ হইয়া যায়।

১। নিম্নোক্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হইতে এই অংশের তথ্যসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে: ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস; ডঃ অবিনাশ ভট্টাচার্য: বার্লিনের ভারতীয় বিপ্লবী কমিটির কথা (প্রবন্ধ—'যুগান্তর' পত্রিকা, ৩০শে মার্চ); Sedition Committee Report. ২। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩ পৃষ্ঠা। ৩। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৪ পৃষ্ঠা।

এই সময় ভারতীয় বিপ্লববাদী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বার্লিনে অবস্থান করিতেছিলেন। ইনি পূর্বে ব্যারিস্টারী পড়িবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে গমন করেন এবং সাভারকারের সংস্পর্শে আসিয়া সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক মতবাদে দীক্ষিত হন। ইংলণ্ডে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের অভিযোগে ইনি এবং রাও নামক আর একজন বিপ্লববাদী বিতাড়িত হন।[১]

'ভারতীয় বৈপ্লবিক কমিটি' (বার্লিন কমিটি) প্রতিষ্ঠা

বীরেন্দ্রনাথ বার্লিনে বসিয়া Japan, the Enemy of Asia (জাপান এশিয়ার শত্রু) নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকাখানি জার্মান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাহার ফলে তাঁহাকে জার্মান সরকারের বৈদেশিক বিভাগে ডাকিয়া পাঠানো হয়। বৈদেশিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁহাকে জানাইয়া দেন যে জার্মান সরকার ভারতীয় বিপ্লবীদের বৃটিশ-বিরোধী বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

এই অপ্রত্যাশিত সাহায্যের আশ্বাসে বিপ্লবীরা উল্লাসে মাতিয়া উঠেন এবং নূতন উৎসাহে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁহারা কিন্তু বিনাশর্তে জার্মান সরকারের সাহায্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তাই তাঁহারা জার্মান সরকারের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলি উপস্থিত করেন :

"১. বিপ্লবীরা জার্মান গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে একটা 'জাতীয় ঋণ' (National Loan) গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা এক দলিলে দস্তখত করিয়া দেন যে, বিপ্লবীরা কৃতকার্য হইলে স্বাধীন ভারতের গভর্নমেণ্ট এই ঋণ পরিশোধ করিবে।

"২. জার্মান সরকার অস্ত্রশস্ত্রাদি সরবরাহ করিবে এবং তাহাদের দেশ-বিদেশে যত প্রতিনিধি (Consuls) আছে সকলে বিপ্লবীদের কর্মের সহায়তা করিবে।

"৩. তুর্কি গভর্নমেণ্ট—যাহা তখন নব্য তুর্কদের দ্বারাই সংগঠিত হইয়াছিল তাহা—তখনও নিরপেক্ষ থাকিলেও, জার্মানদের পক্ষ হইয়া মিত্রশক্তির বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে এবং সুলতান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করিবেন। এই ধর্মযুদ্ধ (জেহাদ) ঘোষণার ফলে ভারতীয় মুসলমানেরা ইংরেজের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবে এবং তাহাতে ভারতে বিপ্লব-প্রচেষ্টার সুবিধাই হইবে।"[২]

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এই সকল শর্ত উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :

"নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, এই সময় বৈপ্লবিকদের অবস্থা স্বাধীনতা সমরের অনুকূল ছিল। বিপ্লবের সব উপকরণ জার্মানদের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে, উপাদান দেশেই আছে, যথা বৈপ্লবিক

১। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সরোজিনী নাইডুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বীরেন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের সংবাদ শুনিবার পর ভীত হইয়া সরোজিনী নাইডু ভারত সরকারকে এক পত্রযোগে জানাইয়া দেন, 'বীরেন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিবারের কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহারা তাঁহাকে অনেকদিন পূর্বেই অর্থ-সাহায্য পাঠানো বন্ধ করিয়াছেন।" ইনি আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক মহলে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। (ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১৬৯-৭০ পৃঃ) ২। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৫ পৃষ্ঠা।

দলসমূহ অস্ত্র পাইলে বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে, মুসলমানেরা 'জেহাদ'-এর আহ্বানে ইংরেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে, এবং স্বাধীনতা লাভের আশায় রাজার দলও সশস্ত্র অভ্যুত্থান করিবেন ও পরে অন্যান্য প্রকারের রাজনীতিক সুবিধারও সংযোগ হইতে পারে। তদ্ব্যতীত, প্রত্যেক বৈপ্লবিকের তখনকার মনের ভাব ছিল—একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক, যাহা হয় তাহাই হইবে; বিপ্লব-কর্ম কতকটা তো অগ্রসর হইবেই। এই মানসিক ও রাজনীতিক অবস্থার সমবায়ের ফলে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ভারতীয় বিপ্লবের পতাকা উড্ডীন করা হয় এবং বার্লিনে 'ভারতীয় বৈপ্লবিক কমিটি' (সরকারী নাম—Indian Independence Committee) সংস্থাপিত হয়।"[১]

যাঁহাদের লইয়া 'ভারতীয় বৈপ্লবিক কমিটি' (সংক্ষেপে 'বার্লিন কমিটি') গঠিত হইয়াছিল তাঁহাদের প্রায় সকলেই ছিলেন বয়স্ক ব্যক্তি। ইঁহাদের অনেকেই ছিলেন অধ্যাপক। বাঙালীদের মধ্যে ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র সেন, সতীশচন্দ্র রায়, ডঃ অবিনাশ ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্রনাথ সরকার। প্রথমে ডঃ মনসুর নামক একজন মুসলমান বিপ্লবীকে কমিটির সভাপতি করা হইয়াছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে কমিটির এক নূতন গঠনতন্ত্র রচিত হয়। সেই গঠনতন্ত্র অনুসারে সভাপতির পদ লোপ করা হয়। ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ১৯১৬-১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদক পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

এই 'ভারতীয় বৈপ্লবিক কমিটি' বা সংক্ষেপে 'বার্লিন কমিটি' বাদে বহু পদস্থ জার্মান ও ভারতীয় বিপ্লবীদের কয়েকজনকে লইয়া 'ভারতবন্ধু জার্মান সমিতি' নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। এই সমিতির কাজ ছিল 'বার্লিন কমিটি'র সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া জার্মান সরকারের নিকট হইতে বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে সাহায্য ও সামরিক দ্রব্যাদির সরবরাহ লাভের ব্যবস্থা করা। এই 'ভারতবন্ধু জার্মান সমিতি'র সাহায্যে বিপ্লবীরা কার্য আরম্ভ করেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন:

"আমরা কার্য আরম্ভ করার দুইদিন পর হইতে প্রত্যহ ট্যাক্সিযোগে বার্লিনের সন্নিকটে অবস্থিত স্পাণ্ডাও শিবিরস্থ বিস্ফোরকের কারখানায় যাইয়া বিস্ফোরক প্রস্তুত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করি এবং বোমা, হাত-বোমা, টাইম-বোমা, ল্যাণ্ড-মাইন (ভুঁই-বোমা) প্রভৃতি আমাদের রাসায়নিকগণ সত্বরই স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিলেন। বার্লিন অস্ত্রাগারে নিয়া সদস্যগণকে বিভিন্ন প্রকারের (তৎকালের) আধুনিকতম অস্ত্র-শস্ত্র দেখাইবার ব্যবস্থা হয়। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কেরসাস্প[২] প্রাচ্য-ভাষাবিদ সদস্যগণকে লইয়া মধ্যপ্রাচ্য হইতে আগত (ফরাসী

১। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৬ পৃষ্ঠা। ২। দাদা চানজী কেরসাস্প—ইনি পার্শী সম্প্রদায়ভুক্ত। যুদ্ধের শেষভাগে ইনি পারস্যে গমনের জন্য কয়েকজন সঙ্গীসহ পারস্য-সীমান্তে উপস্থিত হইলে সঙ্গীদের সহিত তিনি ইংরেজ সৈন্যদের হস্তে পতিত হন। পরে ইংরেজ সেনাগণ তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গীদের হত্যা করে। সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় বিপ্লবী বসন্তসিংহ ও কেদার। ইঁহারা সকলেই ছিলেন 'বার্লিন কমিটি'র সভ্য (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৮ পৃষ্ঠা)।

ও ইংরেজ পক্ষের) বন্দী মুসলমান সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিবার জন্য বিভিন্ন বন্দী-শিবিরে প্রচারকার্য চালাইতে থাকেন। এইভাবে নানাদিকেই কার্য চলিতে থাকে এবং ব্যারন ('ভারতবন্ধু জার্মান সমিতি'র সহকারী সভাপতি, ব্যারন ওপেনহাইম) এবং মুলার (ঐ সমিতির সম্পাদক ডক্টর মুলার) প্রভৃতি হিতৈষিগণ ভারত উপকূলে কিভাবে অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করিবেন তাহা লইয়া লুদ্‌ভিগ ফিসার নামক একজন নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত বিস্তৃত মানচিত্র প্রভৃতি নিয়া গবেষণা করিতেন, আমরাও মাঝে মাঝে বার্লিনের ভবনে আলোচনায় যোগ দিতে আহূত হইতাম। প্রত্যুষ হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত আমাদের বিশ্রাম ছিল না।"[১]

ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ও মারাঠে 'বার্লিন কমিটি'র নির্দেশে ওয়াশিংটন গমন করেন। তাঁহারা তথা হইতে জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, হরদয়াল, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, তারকনাথ দাস প্রভৃতিকে বার্লিনে এবং কেদারেশ্বর গুহ, বীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি প্রভৃতিকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। ইহা ব্যতীত তাঁহারা আমেরিকার 'গদর পার্টির' সহিত বার্লিনের যোগাযোগও স্থাপন করেন।[২]

" 'বার্লিন কমিটি'র সর্বপ্রথম কাজ হইল দেশ ও বিদেশস্থিত বৈপ্লবিকদের সংবাদ দান করা এবং কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য আমন্ত্রণ করা। এই আহ্বান ভারতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই আহ্বানে দেশ ও বিদেশে বৈপ্লবিকদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। এ আহ্বান সেই প্রাচীন খ্রীষ্টীয় আহ্বানের অনুরূপ ছিল, যাহা থেসালোনিকার নব্যপ্রতিষ্ঠিত খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী ইপিসাস্‌-এর মণ্ডলীকে লিখিয়াছিল, 'ম্যাসিডোনিয়ায় আসিয়া আমাদের সাহায্য কর'।"[৩]

'বার্লিন কমিটি'র গুরুত্ব বিশ্লেষণ করিয়া ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন:

"যদি বার্লিনের 'ভারতীয় বৈপ্লবিক কমিটি' প্রতিষ্ঠিত না হইত তাহা হইলে ভারতে ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দের বৈপ্লবিক চেষ্টা হইত না, বিশেষত বঙ্গপ্রদেশে কোন প্রচেষ্টাই হইত না।"[৪]

'বার্লিন কমিটি'র আহ্বানে বিভিন্ন দেশ হইতে বৈপ্লবিক মতবাদে বিশ্বাসী বহু প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র ভারতবর্ষে ফিরিয়া যায়। 'বার্লিন কমিটি' ভারতবর্ষের সকল জাতীয়তাবাদী ও পুরাতন বিপ্লবী নায়কদের নিকট সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করিবার জন্য আবেদন জানায়। 'বার্লিন কমিটি' স্থাপিত হইবার পর হইতে ইহা ভারতের সকল বিপ্লবপন্থী গুপ্ত সমিতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাহা কেবল আংশিকভাবে সফল হইয়াছিল। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কয়েকটি গুপ্ত সমিতি ঐক্যবদ্ধ হইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই সময় আমেরিকার 'গদর পার্টি' 'বার্লিন কমিটি'র সহিত সম্মিলিতভাবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করিতে থাকায় বিপ্লবীরা ভারত জোড়া সশস্ত্র

১। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৯ পৃষ্ঠা। ২। ডঃ অবিনাশ ভট্টাচার্য: 'বার্লিনের ভারতীয় বিপ্লবী কমিটির কথা' (প্রবন্ধ, যুগান্তর, ৩০শে মার্চ, ১৯৫২) ৩। পারসিকদের অধিকার হইতে গ্রীসকে মুক্ত করিতে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১৫ পৃষ্ঠা)। ৪। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১৬-১৭ পৃষ্ঠা। দত্ত মহাশয় এই কথাটি দ্বারা কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা স্পষ্ট নহে।

অভ্যুত্থানের সাফল্যের জন্য বিশেষ আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। 'গদর পার্টি'র নায়কদের নির্দেশে পূর্বেই কয়েক হাজার শিখ ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করিয়াছিল। এই সময় বিপ্লবীদের মধ্যে যে আশা-উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্ম-চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন :

"সে এক সময় গিয়াছে। তখন বৈপ্লবিকদের হৃদয়াকাশে আশার অরুণ কিরণ উদায়মান হইয়াছিল। কত কল্পনা, কত জল্পনাই না তাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল! তখন তাঁহাদের হৃদয়ে কি উৎসাহ, কি সাহসই না ছিল! বাঙলার বিপ্লববাদের বর্ণনা করিতে গিয়া কোন কোন লেখক বঙ্গীয় কবির শিখবীর্যের চরিত্রাঙ্কন বঙ্গভাষী বৈপ্লবিকদেরই প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু এই চরিত্রাঙ্কন এ সময়ের নিখিল ভারতীয় বৈপ্লবিকদের প্রতিও প্রযোজ্য হয়। তাই বলি, সে এক দিন গিয়াছে। যিনি তাহা স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই জানেন সে কি উৎসাহ, আশা ও ভরসার দিন গিয়াছে। 'লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে, না রাখে কাহারো ঋণ'—বৈপ্লবিকদের পক্ষে এ আখ্যান সত্যই ছিল। সাহসে ভর করিয়া দেশ-বিদেশে তাঁহারা ছুটিয়া গিয়াছেন। বিনা পাশপোর্টে ছদ্মবেশে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছেন; জিব্রলটারের পথ দিয়া য়ুরোপে আসিয়াছেন। সে পথ বন্ধ হইলে বৃটেনের মাথা বেড়িয়া বার্লিনে উপস্থিত হইয়াছেন ও প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। কুছ্ পরোয়া নাই, ইহাই মনের ভাব। কমিটি যে স্থানে যাইতে বলিয়াছে, নিঃশঙ্ক হৃদয়ে যুবকের দল তথায় গমন করিয়াছেন। আর মৃত্যুভয়? সত্যই তাঁহাদের ছিল "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন"। স্নয়েজখাল রাত্রে সন্তরণ করিয়া মিশরে ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে, তৎক্ষণাৎ এক বাঙালী ও এক মাদ্রাজী দুই তরুণ যুবক জলে ঝম্পপ্রদান করিতে উদ্যত হইল![1] মেদিনায় হাজীদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে হইবে, তৎক্ষণাৎ এক হিন্দু বাঙালী তরুণ যুবক যাইতে প্রস্তুত হইলেন।[2] সুদূর প্রাচ্যে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের উপকূলস্থিত দেশসমূহে গিয়া অস্ত্র আমদানির ব্যবস্থা করিতে হইবে, অমনি বঙ্গভাষী ও পাঞ্জাবী ভাষী যুবকদের দল লাগিয়া গেল! ইরাণ (পারস্য) ও বালুচিস্থানের মরুভূমি পার হইয়া ভারতে অস্ত্র পাঠাইবার জন্য যুবকের দল দৌড়িয়া গেল! কাজে আগে ঝাঁপাইয়া পড়ি, তাহার পর ভবিষ্যতে দেখা যাইবে কি হয়। মরিব কি বাঁচিব তাহা পরে দেখা যাইবে, ইহাই ছিল সেই সময়ের বৈপ্লবিক যুবকদের মনস্তত্ত্বের অবস্থা।

"এই মানসিক শক্তি লইয়া বৈপ্লবিক যুবকের দল কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।... ভারতের সর্বদিকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে লোক পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু যে-কোন কারণবশত হউক, পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশে বৈপ্লবিকদের সাড়া পাওয়া যায় নায় এবং উক্ত দুই প্রদেশের বৈপ্লবিকদের কর্মসংক্রান্ত জায়গা ব্যতীত আর কোন স্থানে বৈপ্লবিক সঙ্কেত পাওয়া যায় নাই।"[3]

১। প্রথম জন ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং দ্বিতীয় জন ত্রিমূল আচারিয়া (পূর্ণনাম—মাণ্ডেয়ম প্রতিবাদী ভয়ঙ্করম্ ত্রিমূল আচারিয়া)। ২। এই যুবকটি ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।
৩। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১৬-১৭ পৃষ্ঠা।

বাঙলাদেশে 'বার্লিন কমিটি' গঠনের সংবাদ আমেরিকা হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। বাঙলাদেশের বিপ্লবীদের আরও সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে জার্মান সরকারের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া যাইবে। 'বার্লিন কমিটি' বাঙলাদেশের বিপ্লবীদের জন্য প্রচুর অর্থও প্রেরণ করিয়াছিল। বাঙলাদেশে এই সংবাদ পৌছিলে সকল দলের বিপ্লবীদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া যায় এবং বিভিন্ন দলের বিপ্লবীরা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বাঙলাদেশের অভ্যুত্থানের জন্য 'বার্লিন কমিটি' অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের একটি পরিকল্পনা তৈরি করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী উড়িষ্যা প্রদেশের বালেশ্বর নামক স্থানে জাহাজ হইতে অস্ত্রশস্ত্র নামাইয়া দিবার কথা ছিল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অস্ত্র-সরবরাহ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে বাঙলাদেশের বিপ্লবীরা 'হ্যারি এণ্ড সন্স' নামে একটি কোম্পানী তৈরি করিয়া বালেশ্বরে 'য়ুনিভার্সাল এম্পোরিয়াম'—এই নামে একটি দোকান খুলিয়াছিলেন। পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ভার 'গদর পার্টি'ই গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার সহিত 'বার্লিন কমিটি'র কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না।

তৃতীয় অধ্যায়

'বার্লিন কমিটি'র নেতৃত্বে দূর-প্রাচ্যে বৈপ্লবিক কার্য

অস্ত্র সরবরাহের প্রচেষ্টা

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বার্লিন কমিটি' দূর-প্রাচ্যের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়া ভিন্সেণ্ট্ ক্রাফট্ নামক একজন জার্মানকে জাভার রাজধানী বাটাভিয়ার প্রেরণ করে। প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের লইয়া যুদ্ধ-জাহাজ দ্বারা আন্দামান দ্বীপ আক্রমণ এবং সেখানকার জেলখানা হইতে শাস্তিপ্রাপ্ত ভারতীয় বিপ্লবীদের মুক্ত করিয়া নিকটবর্তী কোন নিরপেক্ষ দেশে তাঁহাদের পৌছাইয়া দেওয়া, আর ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করাই ছিল এই জার্মান লোকটিকে বাটাভিয়ায় প্রেরণের উদ্দেশ্য।

ভিন্সেণ্ট্ ক্রাফট্ যথাসময়ে বাটাভিয়া পৌছিয়া এবং প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া 'বার্লিন কমিটি'কে জানাইয়া দেন যে বাটাভিয়া হইতে একটি যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া আন্দামান দ্বীপ আক্রমণ করা সম্ভব এবং সেই চেষ্টাই তিনি করিতেছেন। এই সময় ক্রাফট্-এর সহিত যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে 'যুগান্তর সমিতি'র প্রধান নায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাঙলাদেশ হইতে ফণীভূষণ চক্রবর্তী, ভূপতি মজুমদার এবং নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে (পরবর্তী কালের এম. এন. রায়) বাটাভিয়ায় প্রেরণ করিয়াছিলেন।[১] ইঁহাদের সহিত ভিন্সেণ্ট্ ক্রাফট্-এর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহারা চারজনে মিলিয়াই কার্য করিতেছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পর ক্রাফট্ আন্দামান

১। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১৯ পৃষ্ঠা।

আক্রমণের ব্যবস্থাদির জন্য বৃটিশ-অধিকৃত সিঙ্গাপুরে গেলে তিনি বৃটিশ সামরিক গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়িয়া যান। সুতরাং আন্দামান আক্রমণের পরিকল্পনা বান্‌চাল হইয়া যায়।

'বার্লিন কমিটি'র সর্বপ্রধান কার্য ছিল অভ্যুত্থানের জন্য ভারতবর্ষে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করা। এই উদ্দেশ্যে জার্মান গভর্নমেণ্ট একজন নৌ-সেনাপতিকে পিকিংয়ে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূতকে ভারতের জন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি ক্রয়ের আদেশ দেয়। আমেরিকা হইতে ভারতে অস্ত্র আমদানির পথ পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে বহু বিপ্লবী যুবককে চীন, শ্যাম (বর্তমান তাইল্যাণ্ড) প্রভৃতি দেশে পাঠানো হয়।

'আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' গঠন

এই সময় অস্ত্র আমদানির সাহায্যের জন্য প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী দেশসমূহে ভারতীয় বিপ্লবীরা আসিতে থাকেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন:

"পূর্ব-এশিয়ায় তখন ভারত-বিপ্লব-উদ্যোগের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। তৎকালে জাপান, চীন, ফিলিপাইন, শ্যাম, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে বৈপ্লবিকদের কার্যের জন্য ঘাঁটি বসিয়াছে। জাপানে বৈপ্লবিকেরা কাউণ্ট ওকুমা প্রভৃতি অনেক ক্ষমতাসম্পন্ন বন্ধু পাইয়াছিলেন। তাঁহারা বৈপ্লবিকদের আশা দিয়াছিলেন যে, ভারতে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত হইলে, জাপানী বাহিনী যাহাতে তাহা দমনার্থে না যায় তাহার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিবেন। এই সময় তাঁহারা চীনের বৈপ্লবিক নেতা সুনিয়াৎ সেন-এরও সাহায্য পাইয়াছিলেন। এই সব অনুকূল অবস্থার সমবায়ের ফলে বৈপ্লবিকেরা ভারতীয় বিপ্লব চালাইবার জন্য এক 'আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' গঠন করেন। এই 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী'তে অনেক জাপানী অভিজাত বংশীয় যুবক ভর্তি হইয়াছিল।"[১]

ব্রহ্মদেশ ও ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা

এই সময় দূর প্রাচ্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করিবার উদ্দেশ্যে ভগবান সিং নামে 'গদর পার্টি'র একজন বিশিষ্ট কর্মী আমেরিকা হইতে ফিলিপাইন দ্বীপে আসেন। কিন্তু স্থানীয় সরকার তাঁহাকে দ্বীপ হইতে বিতাড়িত করায় তিনি সেই স্থান হইতে জাপানে উপস্থিত হন এবং সেই স্থান হইতে চীনে গিয়া রাসবিহারী বসুর সহিত মিলিত হন। পরে ব্রহ্মদেশ আক্রমণের পরিকল্পনা লইয়া তিনি শ্যামদেশের রাজধানী ব্যাঙ্কক-এ আগমন করেন। সেই স্থানে শিখ ইঞ্জিনিয়ার অমর সিংকে কেন্দ্র করিয়া একটি বৈপ্লবিক সংগঠন স্থাপিত হয়।

পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির হয়, শ্যামদেশের জার্মানরা ভারতীয়দের সহিত মিলিত হইয়া মৌলমিন-এর পথে ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিবে, আর চীন দেশে সমবেত জার্মানরা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া একদল শ্যামের দলের সহিত যোগদান করিবে, আর অন্যদল

১। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২২ পৃষ্ঠা।

ব্রহ্মের নির্বাসিত রাজবংশের উত্তরাধিকারীকে সম্মুখে রাখিয়া ভামোর পথে উত্তর-ব্রহ্ম আক্রমণ করিবে। ইহাও স্থির হইয়াছিল যে, তিনখানি সশস্ত্র জাহাজ এই অঞ্চলে উপস্থিত হইবে। এই জাহাজগুলির একখানিতে থাকিবে পাঁচ শত জার্মান সামরিক অফিসার আর এক হাজার সৈন্য। এই সৈন্যবাহী জাহাজখানি আন্দামান দ্বীপ আক্রমণ করিয়া সেই স্থানের জেলখানা হইতে নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবীদের মুক্ত করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইবে। আর অপর দুইখানি জাহাজের একখানি বাঙলাদেশের একস্থানে এবং অপর জাহাজখানি পশ্চিম-ভারতের কাম্বে নামক স্থানে গিয়া ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করিবে।

এদিকে ব্রহ্মদেশের উপর আক্রমণ আরম্ভ হইলে ভারতবর্ষের পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশে একই সময় অভ্যুত্থান আরম্ভ হইবে এবং সেই সঙ্গে আফগানিস্থান ও বালুচিস্থানের দিক দিয়া ভারতবর্ষের উপর আক্রমণ চলিবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে পরিকল্পনা অনুযায়ী অভ্যুত্থান ও আক্রমণ সম্ভব হয় নাই। ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন :

"এই মানসিক পরিকল্পনা (Theoretical Plan) বৈপ্লবিকরা এবং জার্মানরা সম্মিলিতভাবে এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে গড়িয়াছিলেন। কিন্তু ফলে ইহা কার্যকরী হয় নাই। ভারতবাসীরা ক্রমে ক্রমে অনেকেই ধরা পড়েন, আর জার্মানরা 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' করিয়া পলায়ন করে। কোন কোন ভারতবাসী বলেন যে, এই উপলক্ষে জার্মানদের অনেকেই বিলক্ষণ ধনী হইয়াছিল।"[১]

সিঙ্গাপুরে শিখ-বিদ্রোহ

অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা অনুযায়ী সিঙ্গাপুরে অবস্থিত শিখ-সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ আরম্ভ করে। শিখ-সৈন্যগণ বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়া সাত দিন পর্যন্ত সিঙ্গাপুর শহর অধিকার করিয়া রাখে এবং সিঙ্গাপুরে অন্তরীণাবদ্ধ জার্মানদের মুক্ত করিয়া দেয়। জার্মানদের মধ্যে বহু সামরিক অফিসার ছিল। শিখ-সৈন্যগণ তাহাদিগকে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানায় এবং কামান ও মেসিনগান চালনা শিক্ষা দিতে বলে। কিন্তু জার্মানরা শিখ-সৈন্যদের সেই অনুরোধ অগ্রাহ্য করে। তাহারা শিখ-সৈন্যদের জানাইয়া দেয় যে, তাহারা অস্ত্রধারণ করিবে না বলিয়া ইংরেজদের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ; সুতরাং তাহারা শিখদিগকে সাহায্য করিতে অপারগ।

নেতৃত্ববিহীন হইয়া শিখরা বেশীদিন যুদ্ধ চালাইতে পারে নাই। ইতিমধ্যে এই বিদ্রোহের সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইলে সাত দিনের মধ্যে এক বিরাট বৃটিশ ও জাপানী যুদ্ধ-জাহাজের বহর সিঙ্গাপুরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং প্রচণ্ড গোলা-বর্ষণের দ্বারা শিখ-বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়া শহর অধিকার করে।

* * * *

বৃটিশ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত এই শিখ-সৈন্যদলের সকলেই ছিল 'গদর পার্টি'র সভ্য। এই শিখ-সৈন্যদের সাহায্যে সিঙ্গাপুরের নৌঘাঁটি অধিকার করিয়া এই অঞ্চল হইতে

১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২১

বৃটিশ শক্তিকে বিতাড়িত করাই ছিল 'গদর পার্টি'র পরিকল্পনা। শিখ-সৈন্যদের এই অভ্যুত্থান সংঘটিত করিবার জন্য বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার কিছুদিন পূর্বে 'গদর পার্টি'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগঠক মূলচাঁদ গোপনে সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া অন্তরীণাবদ্ধ জার্মানদের সহিত এই শর্ত করেন যে, শিখ-সৈন্যরা বিদ্রোহ করিয়া প্রথমেই জার্মানদের মুক্ত করিবে, পরে উভয়ে মিলিয়া মালয় উপদ্বীপ অধিকার করিয়া টিংচাউস্থিত জার্মান যুদ্ধ-জাহাজের বহরটিকে সিঙ্গাপুরে স্থাপন করিবে। এইভাবে সিঙ্গাপুরে জার্মান নৌ-ঘাঁটি স্থাপনার পর পূর্ব-এশিয়া হইতে বৃটিশ শক্তিকে বিতাড়িত করা হইবে এবং তাহার পর জার্মান বাহিনী আসিয়া ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজদের বিতাড়িত করিতে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করিবে। এই পরিকল্পনার ভিত্তিতেই সিঙ্গাপুরে শিখ-সৈন্যগণ বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়াছিল।

"সেই সময় সিঙ্গাপুরে কোন বৃটিশ সৈন্য ছিল না। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ জাপানী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করিয়া ৭ দিন পর সিঙ্গাপুর পুনরাধিকার করিতে সক্ষম হয়। জার্মানরা পূর্বেই, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিবামাত্র সুমাত্রা দ্বীপে পলায়ন করে। বেগতিক দেখিয়া অভ্যুত্থানের নায়ক স্বয়ং মুলচাঁদও চীনে পলাইয়া গেলেন, আর বেচারা অজ্ঞ সিপাহিদল মাঠে মারা গেল।"[১]

বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি

ইন্দোনেশিয়ার জাভাদ্বীপের রাজধানী বাটাভিয়ায় ভারতীয়দের একটি বিপ্লব-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল এবং বাটাভিয়া হইতে আন্দামান দ্বীপের উপর আক্রমণের একটি পরিকল্পনাও প্রস্তুত হইয়াছিল। ভিন্সেন্ট্ ক্রাফট্-এর গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিকল্পনা যে বান্‌চাল হইয়া গিয়াছিল তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। কিন্তু ইহার পরেও বাটাভিয়ার কেন্দ্রটি অক্ষত ছিল। বাটাভিয়ায় জার্মানদের সহিত সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাঙলাদেশ হইতে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জনৈক উকিলকে টাকা দিয়া বাটাভিয়ায় প্রেরণ করিয়াছিলন। এই উকিল ব্রহ্মদেশে ওকালতি করিতেন। এই উকিলটি নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য হেতু সিঙ্গাপুরে আসিয়া বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট সকল সংবাদ ফাঁস করিয়া দেয়। সে এই অঞ্চলের সমস্ত পরিকল্পনা জানিত। কোন্ জাহাজ অস্ত্র বোঝাই হইয়া বিপ্লবীদের অস্ত্র সরবরাহ করিতে যাইতেছে, কোন্ জাহাজে শ্যামের জার্মান কন্সাল যাইতেছিলেন তাহাও উকিলটি বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট বলিয়া দেয়। বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ তাহার নিকট হইতে সকল সংবাদ জানিয়া সকল পরিকল্পনা বান্‌চাল করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। বৃটিশ রণতরী এইচ. এম. এস. কর্ণওয়াল অস্ত্র বোঝাই জার্মান জাহাজখানিকে আন্দামান দ্বীপের নিকট ডুবাইয়া দেয় এবং অপর একখানি জাহাজ আটক করিয়া শ্যামের জার্মান কন্সালকে অন্তরীণ করিয়া রাখে। এইভাবে বিপ্লবীদের নিকট অস্ত্র-সরবরাহের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায়।

১। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২৪ পৃষ্ঠা।

করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। কেরসাম্পই প্রথম পার্শী যিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য শহীদ হইয়াছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য সরকার বৃটিশ প্রভুদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য পাঞ্জাবের বিখ্যাত বিপ্লবী, বৃদ্ধ সুফী অম্বাপ্রসাদকে বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ফাঁসি দিয়া হত্যা করে।

সুফী অম্বাপ্রসাদ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব হইতে সর্দার অজিত সিং, ঋষিকেশ লাট্টু প্রভৃতি বিপ্লবীদের সহিত পলায়ন করিয়া পারস্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সর্দার অজিত সিং পরে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী হইতে দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রাজিল রাজ্যে গমন করেন। এই সময় প্রমথ দত্ত 'দাউদ আলি' নাম গ্রহণ করিয়া পারস্যে এক পাহাড়ী জাতির মধ্যে লুকাইয়া ছিলেন। এইভাবে তিনি সেই স্থানে ১৯০৬ হইতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিলেন। পরে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি বিপ্লবীরা জার্মেনী হইতে মস্কো নগরীতে উপস্থিত হইয়া সোভিয়েত সরকারের সাহায্যে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে মস্কো নগরীতে আনয়ন করেন। এইভাবে পশ্চিম-এশিয়ার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার অবসান ঘটে।

তুরস্কে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা

ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রয়োজনে তুরস্কে বৈপ্লবিক ঘাঁটি স্থাপন এবং বৃটিশ-বিরোধী তুরস্ক সরকারের সাহায্যে তুরস্কবাসী ভারতীয়দের লইয়া একটি স্বেচ্ছাসৈন্য-দল গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে ভারতীয় বিপ্লবীদের একটি দল তুরস্কের স্তাম্বুল নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই দলে ছিলেন অধ্যাপক বরকতুল্লা, কেরসাম্প, তারকনাথ দাস এবং আরও কয়েকজন।

তুরস্ক সরকার এই বিপ্লবীদের সাহায্য করিবার জন্য একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীকে নিযুক্ত করেন। বিপ্লবীদের কয়েকজন বাগদাদ গমন করিয়া মেসোপোটেমিয়া আক্রমণকারী ভারতীয় সৈন্যদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হন। তাঁহারা বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা, ঘোষণাপত্র প্রভৃতি ছাপিয়া বৃটিশ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করিতেন। ইহার ফলে অনেক সিপাহী সৈন্যদল হইতে পলায়ন করে। এইভাবে পলাতক ১০০ জন সিপাহী একত্র করিয়া বিপ্লবীরা 'ভারতীয় বৈপ্লবিক স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী' নাম দিয়া একটি বাহিনী গঠন করেন। কিন্তু তুরস্কের জনসাধারণের একাংশ এবং মোল্লাদের হিন্দু (কাফের)-বিদ্বেষের ফলে অধিক সংখ্যক সৈন্য পলায়ন করিতে পারে নাই। মোল্লাদের উস্কানির ফলে আরবরা পলাতক হিন্দুসৈন্যদের 'কাফের' বলিয়া হত্যা করিত। পরে এই সকল কারণে এবং সামরিক কর্মচারীদের একাংশের ধর্মান্ধতা ও অকর্মণ্যতার ফলে এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীটি ভাঙিয়া দিতে হইয়াছিল।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মেসোপোটেমিয়ার বৃটিশ ঘাঁটি কুতালামারার পতন হইলে জার্মান সামরিক কর্মচারীদের সহায়তায় সেই স্থানে অবরুদ্ধ ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিয়া তাহাদের লইয়া একটি 'বৈপ্লবিক স্বেচ্ছাসৈন্য-বাহিনী' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। তুরস্ক সরকারও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া এই বাহিনীর জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ সরবরাহ করিতে সম্মত হয়।

ভারতীয় বিপ্লবীদের ধারণা ছিল, ভারতে একটি 'বৈপ্লবিক স্বেচ্ছাসৈন্য-বাহিনী' প্রেরণ করিতে পারিলে ভারতবর্ষে একটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটিবে, হাজার হাজার মানুষ তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া অস্ত্র হাতে লইয়া বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিবে। এই ধারণা লইয়াই বিপ্লবীরা বারংবার বিভিন্নস্থানে বিভিন্নভাবে 'বৈপ্লবিক স্বেচ্ছাসৈন্য-বাহিনী' গঠনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কূতালামারায় অবরুদ্ধ ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া এরূপ একটি বাহিনী গঠনের সম্ভাবনা যখন উজ্জ্বল হইয়া উঠে তখনই কয়েকজন উচ্চপদস্থ জার্মান সামরিক কর্মচারী এবং তুরস্কের কতিপয় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর ভিন্ন পরিকল্পনার ফলে বিপ্লবীদের এই প্রচেষ্টাও বানচাল হইয়া যায়।

সেই সময় যুদ্ধের এক সংকটকাল চলিতেছিল। যুদ্ধে অত্যধিক লোকক্ষয় হেতু জার্মানী এবং তুরস্কের সৈন্যের অভাব দেখা দেয়। তাই উভয় দেশই বিপ্লবীদের সাহায্যে ভারতীয় সৈন্যদের বুঝাইয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ পক্ষে যুদ্ধে ব্যবহার করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। বিপ্লবীরা ইহাতে সম্মত না হওয়ায় জার্মানী ও তুরস্ক উভয় দেশই বিপ্লবীদের সাহায্য দান বন্ধ করে। সুতরাং ভারতীয় বিপ্লবীরা এই স্থানে একটি 'বৈপ্লবিক স্বেচ্ছাসৈন্য-বাহিনী' গঠনের পরিকল্পনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং তাঁহারা ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে বার্লিনে ফিরিয়া যান।

পঞ্চম অধ্যায়

আমেরিকায় 'বার্লিন কমিটি'র কার্য

বৈপ্লবিক কেন্দ্র স্থাপন

প্রথম হইতেই 'গদর পার্টি' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৈপ্লবিক আয়োজনের ভার গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু 'গদর পার্টি'র ক্রিয়াকলাপ কেবল প্রবাসী শিখদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই বহু যুবক 'গদর পার্টি'তে যোগদান না করিয়া বাহিরে থাকিয়া বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সকল বিপ্লবপন্থী যুবককে সংগঠনের মধ্যে আনয়ন করিয়া ইঁহাদের পরিচালনা করিবার জন্য 'বার্লিন কমিটি' সচেষ্ট হয়।

'বার্লিন কমিটি'র প্রতিনিধি ছিলেন হেরম্বলাল গুপ্ত। তিনি ভারতবর্ষ হইতে জাপানে এবং জাপান হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। তিনিই 'বার্লিন কমিটি'র প্রতিনিধি হিসাবে বৈপ্লবিক সংগঠন স্থাপন করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পণ্ডিত রামচন্দ্র ব্যতীত 'গদর পার্টি'র অন্য কোন যোগ্য নায়ক ছিলেন না। 'গদর পার্টি'র অন্যতম প্রধান নায়ক হরদয়াল ইহার পূর্বেই গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে পলায়ন করিয়া প্রথমে সুইজারল্যাণ্ডে এবং পরে বার্লিনে পৌঁছিয়াছিলেন।[১]

১। ইহার পর হরদয়াল বৈপ্লবিক মতবাদ ত্যাগ করিয়া বিপ্লব-বিরোধী ক্রিয়াকলাপে আত্মনিয়োগ করায় তাঁহাকে 'বার্লিন কমিটি'র সকল সভ্যের সম্মতিক্রমে 'কমিটি' হইতে বহিষ্কৃত করা হয়।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতন বিপ্লবী চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী বার্লিনে উপস্থিত হইলে তাঁহাকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'বার্লিন কমিটি'র প্রতিনিধিরূপে বৈপ্লবিক সংগঠন পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। তাঁহাকে বলা হয়, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া পণ্ডিত রামচন্দ্র, হেরম্ব গুপ্ত ও অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত পরামর্শ করিয়া একটি কার্যনির্বাহক কমিটি গঠন করিবেন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দেই ৫ জন সভ্য লইয়া যুক্তরাষ্ট্রে কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হয়। 'গদর পার্টি'র নায়কগণ তাঁহাদের পার্টির পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখিবার সিদ্ধান্ত করায় এই কমিটিতে পণ্ডিত রামচন্দ্র যোগদান করেন নাই। তবে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়াই কার্যনির্বাহক কমিটি সকল কার্য সম্পাদন করিত। কার্যনির্বাহক কমিটি বহু পুস্তিকা ছাপাইয়া মার্কিন জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে। এই সকল পুস্তিকায় বৃটিশ শাসকদের অত্যাচারের বহু দৃষ্টান্ত দিয়া ভারতবর্ষের বৃটিশ শাসনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হইয়াছিল। এই সকল পুস্তিকা প্রচারিত হইবার পর বৃটিশ সরকারও তাহার উত্তর হিসাবে একখানি পুস্তিকা বিতরণ করে। বৃটিশ সরকারের এই পুস্তিকার উত্তরে বিপ্লবীরা আর একখানি পুস্তিকা প্রচার করে।

এই সময় ভারতীয় বিপ্লবীরা আমেরিকাবাসী আয়ার্ল্যাণ্ড ও চীনদেশীয় বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। চীনদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের একটি কেন্দ্র স্থাপন করিবার প্রাথমিক ব্যবস্থাদি করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা এক চীনা যুবককে চীনদেশে প্রেরণ করেন। কাজ কিছু অগ্রসর হইলে পর, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে 'বার্লিন কমিটি'র নির্দেশে তারকনাথ দাস চীনের রাজধানী পিকিং নগরীতে গমন করিয়া সেই স্থানের প্রবাসী ভারতীয়দের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। জাপানেও একটি বৈপ্লবিক ঘাঁটি স্থাপনের জন্য তারকনাথ জাপানেও ঘুরিয়া আসেন। কিন্তু চীন বা জাপানে কোন কেন্দ্র স্থাপন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।[১]

'হিন্দু ষড়যন্ত্রের মামলা'

ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইহার পরই ভারতীয় বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার আরম্ভ হয়। গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য কয়েকজন বিপ্লবী মেক্সিকো শহরে পলাইয়া যান। কিন্তু ৪০ জন বিপ্লবী মার্কিন পুলিসের হস্তে গ্রেপ্তার হন। এই ৪০ জনের বিরুদ্ধে আমেরিকার নিরপেক্ষতা ভঙ্গকরণ এবং একটি মিত্র দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে একটি মামলা আরম্ভ করা হয়। ইংরেজ পক্ষে এই মামলার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে গোয়েন্দা পুলিসের ডেন্হাম্ নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লইয়া আসা হয়। মার্কিন সরকার এই মামলাটিকে 'হিন্দু ষড়যন্ত্রের মামলা' নামে অভিহিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থিত যে সকল বিদেশী ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিত তাহাদেরও গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হয়। মার্কিন পুলিস জার্মান দূতাবাসের কয়েকজন কর্মচারীকেও গ্রেপ্তার করিয়া এই মামলায় জড়িত করিবার চেষ্টা করে।

১। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৬৫ পৃষ্ঠা।

সান্‌ফ্রান্সিস্কো শহরে এই মামলার বিচার হয়। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন সরকার ও বৃটিশ সরকার উভয়ে একত্র হইয়াই মামলাটি পরিচালনা করিয়াছিল। ভারতীয় বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য ব্যাংকক হইতে ধৃত যোধ সিংকে সান্‌ফ্রান্সিস্কো শহরে আনয়ন করা হয়। সাক্ষ্যদানের জন্য কুমুদ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তিকে লইয়া আসা হয় দক্ষিণ-এশিয়া হইতে। এই ব্যক্তি পূর্বেই একটি ষড়যন্ত্র-মামলায় রাজসাক্ষী হইয়াছিল। যোধ সিং 'লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা'রও রাজসাক্ষী হইয়াছিল। কিন্তু সান্‌ফ্রান্সিস্কো শহরে আসিয়া সে বিবেকের দংশন অনুভব করে এবং বিচারালয়ে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করে যে,—

"পুলিসের নির্যাতনে ভারতে সে স্বদেশবাসীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু আমেরিকায় সে এই দেশের আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। সে তাহার স্বজাতির বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে না।"[১]

এই অস্বীকৃতির ফলে মার্কিন পুলিস তাহার উপর এরূপ ভয়ঙ্কর দৈহিক নির্যাতন করে যে সে সম্পূর্ণ উন্মাদ হইয়া যায়। অবশেষে পুলিস তাহাকে এক উন্মাদ-আগারে পাঠাইয়া দেয়।

এইভাবে মার্কিন আদালতে যখন ভারতীয় বিপ্লবীদের বিচারকার্য চলিতেছিল, সেই সময় সান্‌ফ্রান্সিস্কোর এই আদালতের মধ্যেই 'গদর পার্টি'র প্রধান নায়ক এবং এই মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্রকে জনৈক শিখ গুলি করিয়া হত্যা করে। হত্যাকারী শিখটিকে আদালতের একজন 'বেলিফ' উত্তেজিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে। রামচন্দ্রের এই হত্যার কারণ আজও পর্যন্ত অজ্ঞাত রহিয়াছে। অনেকের ধারণা, বৃটিশ সরকারের গোয়েন্দা-বিভাগই এই শিখটি দ্বারা রামচন্দ্রকে হত্যা করাইয়াছিল।[২]

পণ্ডিত রামচন্দ্রের শোচনীয় মৃত্যুর ফলে ভারতবর্ষের সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রামের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। রামচন্দ্র কেবল আমেরিকার 'গদর পার্টি'র নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের কালে পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রামেরও নায়ক। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় তাঁহার দান ছিল সর্বাধিক।

এই মামলার বিচারে বিপ্লবীদের অনেকেই দুই হইতে চার বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করিয়াছিলেন। এই শাস্তিদানের ফলে 'বার্লিন কমিটি'র নেতৃত্বে আমেরিকায় বিপ্লব-প্রচেষ্টার অবসান হয়।

'ভারতের অস্থায়ী শাসন-পরিষদ'

তারকনাথ দাস এবং শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ উভয়েই বাঙলাদেশ হইতে পলায়ন করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়া বৈপ্লবিক কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা 'বার্লিন কমিটি'র সহযোগিতায়ই কার্য করিতেন। তারকনাথ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

১। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৬৬ পৃষ্ঠা। ২। ঐ, ৬৭ পৃষ্ঠা।

আসিয়াছিলেন ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে। আর শৈলেন ঘোষ কলিকাতা হইতে পলাইয়া আসেন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া 'ভারতের অস্থায়ী শাসন-পরিষদ' (India's Provisional Government) নামে ভারতবর্ষের একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করেন এবং এই 'অস্থায়ী শাসন-পরিষদ'-এর নামে বিভিন্ন দেশের সরকারের নিকট ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাহায্য করিবার জন্য আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন।

বৃটিশ সরকারের প্ররোচনায় মার্কিন সরকার এই 'অপরাধ'-এর অভিযোগে তারকনাথ ও শৈলেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এক মামলা আরম্ভ করে। এই মামলা আরম্ভ হইবার পূর্বেই শৈলেন্দ্রনাথ কয়েকজন সহকর্মীর সহিত মেক্সিকো শহরে পলায়ন করিয়াছিলেন, আর তারকনাথ ছিলেন তখন জাপানে। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতেই এই মামলা আরম্ভ হয়। তারকনাথ এই মামলা সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। তিনি জাপান হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া একাকী তাঁহার বিরুদ্ধেই মামলা চালানো হয়। তিনি এই মামলায় চার বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

মেক্সিকোতে বৈপ্লবিক কেন্দ্র স্থাপন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে পলায়ন করিয়া বহু বিপ্লবী মেক্সিকো শহরে সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে 'বার্লিন কমিটি' এই শহরে ভারতীয় বিপ্লবীদের একটি কর্মকেন্দ্র স্থাপন করে। এই সময় জার্মান সামরিক কর্মচারী ভিন্সেণ্ট ক্রাপ্ট্ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেক্সিকো শহরে উপস্থিত হন এবং এই কর্মকেন্দ্রে যোগদান করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জার্মান সমর বিভাগের নির্দেশে ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের অস্ত্র সরবরাহ এবং আন্দামান দ্বীপ আক্রমণের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার সময় সিঙ্গাপুরে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন।

মেক্সিকোর কেন্দ্র হইতে বিপ্লবীরা চীন ও জাপানে ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্মক্ষেত্রের বিস্তার সাধনের জন্য সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা হিদেও নাকাও নামক একজন জাপানী ভদ্রলোককে নিযুক্ত করেন। ইনি মেক্সিকো হইতে পূর্ব-এশিয়ায় উপস্থিত হইলে বৃটিশ পুলিস তাঁহাকে পথে গ্রেপ্তার করিয়া সিঙ্গাপুরে লইয়া আসে। কিন্তু জাপান সরকারের প্রতিবাদের ফলে বৃটিশ পুলিস তাঁহাকে মুক্তিদান করিতে বাধ্য হয়। এই জাপানী ভদ্রলোকের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, চীনে পৌঁছিয়া তিনি তারকনাথ দাসের সহিত মিলিত হইয়া চীনে ও জাপানে বৈপ্লবিক কেন্দ্র স্থাপন করিবেন এবং জাপানী সৈন্যবাহিনীর সহিত ভারতীয় বিপ্লবীদের সংযোগ স্থাপন করিয়া দিবেন। কিন্তু একদিকে ইনি গ্রেপ্তার হওয়ায় এবং অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তারকনাথ দাসের কারাদণ্ড হওয়ায় সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহার পর আমেরিকার ভারতীয় বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার অবসান ঘটে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারত-জার্মান মিশন

আফগান মিশন

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ভারতের অযোধ্যা প্রদেশের দেশীয় রাজ্য হাতরাস-এর কুমার মহেন্দ্রপ্রতাপ সিংহ সুইজারল্যাণ্ড ঘুরিয়া জার্মেনীর রাজধানী বার্লিনে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনিও 'বার্লিন কমিটি'র সভ্য হইয়া বৈপ্লবিক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

এই সময় 'বার্লিন কমিটি' আফগানিস্থানের আমীরের নিকট একটি রাজনীতিক 'মিশন' প্রেরণের পরিকল্পনা করিতেছিল। এই 'মিশন' প্রেরণের পশ্চাতে এক গভীর উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, আফগানিস্থানের আমীরকে তুরস্ক-জার্মান যুদ্ধজোটে যোগদান করিতে এবং বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে সম্মত করানো। 'বার্লিন কমিটি' ভাবিয়াছিল, আফগানিস্থান তুরস্ক-জার্মান যুদ্ধ-জোটে যোগদান করিয়া বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে ভারতে অবস্থিত বৃটিশ সৈন্যবাহিনী ভারতের পশ্চিম সীমান্তে অর্থাৎ ভারত-আফগান সীমান্ত রক্ষার কার্যে ব্যস্ত থাকিবে এবং তাহার ফলে ভারতীয় বিপ্লবীদের অভ্যুত্থানের পক্ষে সুযোগ উপস্থিত হইবে। দ্বিতীয়ত, আফগানিস্থান ও ভারতের সীমান্ত এক, সুতরাং আমীর তুরস্ক-জার্মান যুদ্ধজোটে যোগদান করিলে তিনি ভারতীয় বিপ্লবীদের সহায়তা করিবেন এবং তাহার ফলে আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া ভারতে অস্ত্র-শস্ত্র প্রেরণের সুবিধা হইবে।

এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া 'বার্লিন কমিটি' আফগানিস্থানে একটি রাজনীতিক 'মিশন' প্রেরণের সিদ্ধান্ত করেন। আফগানিস্থানকে তুরস্ক-জার্মান যুদ্ধজোটে আনয়ন করা জার্মেনী ও তুরস্কের স্বার্থের অনুকূল হওয়ায় জার্মান সরকার 'বার্লিন কমিটি'র এই উদ্যোগ বিশেষভাবে সমর্থন করে। কুমার মহেন্দ্রপ্রতাপও এই উদ্দেশ্য লইয়াই বার্লিনে আসিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব হইতেই আফগানিস্থানকে তুরস্ক-জার্মান যুদ্ধ-জোটে আনয়নের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। সুতরাং 'বার্লিন কমিটি' কুমার মহেন্দ্রপ্রতাপের উপরেই আফগানিস্থানে 'মিশন' পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। মহেন্দ্রপ্রতাপ এই 'মিশন' পরিচালনা করিবেন জানিয়া জার্মান কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিশেষ আদর-আপ্যায়ন করে, এমনকি স্বয়ং জার্মান সম্রাট কাইজারের সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। জার্মান সরকারের অনুরোধে এই 'মিশন'-এ জার্মান সরকারের একজন প্রতিনিধি এবং একজন জার্মান ডাক্তারকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহাদের ব্যতীত মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে অধ্যাপক বরকতুল্লা এবং কয়েকজন যুদ্ধবন্দী পাঠান সিপাহী আর আমেরিকা হইতে আগত দুইজন আফ্রিদিও আফগানিস্থান যাত্রা করেন। এই 'মিশন'-এরই নাম দেওয়া হয় 'ভারত-জার্মান মিশন' (ইন্দো-জার্মান মিশন)।[১]

১। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৭২-৭৩ পৃষ্ঠা

উত্তর ভারতের কোন দেশীয় রাজ্যের রাজা নাকি মহেন্দ্রপ্রতাপকে বলিয়াছিলেন যে,—

"যদি তাঁহাদের পৃষ্ঠদেশ (অর্থাৎ আফগানিস্থানের দিক) সুরক্ষিত থাকে তাহা হইলে তাঁহারা ইংরেজের বিপক্ষে সম্মুখরণ করিতে সাহস করেন।"[১]

এই আশ্বাস মনে রাখিয়াই সম্ভবত মহেন্দ্রপ্রতাপ আফগানিস্থানকে বৃটিশ-বিরোধী তুরস্ক-জার্মান যুদ্ধজোটে ভিড়াইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি জার্মান সম্রাট কাইজারকে দিয়া আফগানিস্থানের আমীরের নিকট, আর জার্মেনীর প্রধানমন্ত্রীকে দিয়া ভারতের বিভিন্ন স্বাধীন, অর্ধ-স্বাধীন ও করদ নৃপতিদের এবং নেপালের মহারাজের নামেও পত্র লিখাইয়াছিলেন।[২] মহেন্দ্রপ্রতাপই এই সকল পত্র বহন করিয়া আফগানিস্থানে লইয়া গিয়াছিলেন। জার্মেনীর প্রধানমন্ত্রী ভারতের দেশীয় নৃপতি ও নেপালের মহারাজের নিকট যে সকল পত্র দেন তাহার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ :

"তাঁহাদের (দেশীয় নৃপতিদের—সু. রা.) মিত্রতা-সূত্র ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। তাঁহারা ইংরেজের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিলে জার্মান গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইবেন ইহা পত্রে আভাস দেওয়া হয় এবং ইহাতে জার্মান গভর্ণমেণ্ট নেপালের মহারাজকে 'স্বাধীন নৃপতি' বলিয়া সম্বোধন করেন।"[৩]

এই সকল পত্র লইয়া মহেন্দ্রপ্রতাপের নেতৃত্বে 'ভারত-জার্মান মিশন' আফগানিস্থানের পথে তুরস্কের রাজধানী স্তাম্বুল-এ আসিয়া পেঁীছে। তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী এই 'মিশন'কে সাদরে গ্রহণ করেন এবং আফগানিস্থানের আমীরের নামে স্বহস্তে একখানি পত্র লিখিয়া মহেন্দ্রপ্রতাপের হাতে দেন। তুরস্ক সরকারের নির্দেশে উহার একজন প্রতিনিধিও 'মিশন'-এর সঙ্গী হন। অধ্যাপক বরকতুল্লা তুরস্কের মুসলিম ধর্মের প্রধান শেখ-উল-ইসলামের নিকট হইতে ভারতের মুসলমানদের উদ্দেশ্যে লিখিত একখানি পত্র (ফতোয়া) গ্রহণ করেন। এই পত্রে বা ফতোয়ায় ভারতের মুসলমানদিগকে হিন্দুদের সহিত একযোগে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিবার নির্দেশ দান করা হয়।

পথে বহু বাধাবিঘ্ন কাটাইয়া একমাস পরে মিশন তুরস্কের পূর্ব-সীমান্ত হইতে ইরানের দিকে যাত্রা করে। বৃটিশ সামরিক বিভাগ 'মিশন'-এর সংবাদ পূর্বেই পাইয়াছিল। সুতরাং বৃটিশ গোয়েন্দারা আফগানিস্থানে পৌঁছিবার পূর্বেই 'মিশন'কে আটক করিবার চেষ্টা করে। 'মিশন'-এর সমস্ত দলিল-পত্রাদি হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ গোয়েন্দারা একদল ইরানী ডাকাতকে নিযুক্ত করে। পথে একস্থানে ইরানী ডাকাতদল 'মিশন'-এর উপর হানা দিয়া তাঁহাদের সমস্ত জিনিসপত্র এবং ভারতীয় রাজাদের নামে লিখিত চিঠিপত্র লুণ্ঠন করে। কিন্তু বিশেষ জরুরী চিঠিপত্র মহেন্দ্রপ্রতাপের পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে ছিল বলিয়া 'মিশন'-এর বিশেষ ক্ষতি হয় নাই।[৪]

১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৭২ পৃষ্ঠা। ২। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৭৩ পৃষ্ঠা। ৩। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৭৩ পৃষ্ঠা।
৪। ঐ, ৭৩ পৃষ্ঠা

অবশেষে 'মিশন' আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুলে উপস্থিত হয়। কাবুলে আমীর 'মিশন'কে সাদরে গ্রহণ করেন। 'মিশন'-এর কাবুলে অবস্থান কালে এই 'মিশন'কে আফগানিস্থান হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষ প্রবলভাবে চাপ দেওয়া সত্ত্বেও আমীর 'মিশন'কে বহিষ্কৃত করেন নাই।

রুশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ মথুরানাথ সিংহ এবং একজন মুসলমান ভদ্রলোক ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিয়া কাবুলে উপস্থিত হন। 'মিশন'-এর নির্দেশে মথুরা সিংহ ও এই মুসলমান ভদ্রলোকের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র বার্লিনে আসিয়া পৌঁছায়। এই পত্রে কাবুলে 'মিশন'-এর ক্রিয়াকলাপের সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। মহেন্দ্রপ্রতাপ রুশিয়ার সম্রাট জার-এর নিকট ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া মথুরা সিংহ ও মুসলমান ভদ্রলোকটির মারফত একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পত্র লইয়া তুরস্কের মধ্য দিয়া রুশিয়ায় উপস্থিত হন। কিন্তু রুশ সরকার ইঁহাদিগকে ইংরেজদের হস্তে সমর্পণ করে। ইংরেজরা ইঁহাদের দুইজনকে ভারতবর্ষের লাহোর শহরে লইয়া আসে। পরে এক বিচারের প্রহসন করিয়া মথুরা সিংহকে প্রাণদণ্ড এবং মুসলমানটিকে দীর্ঘ কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মথুরা সিংহ লাহোর জেলখানায় ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দেন।

মিশনের ব্যর্থতা

'মিশন' আফগানিস্থানকে তুরস্ক-জার্মান যুদ্ধজোটে ভিড়াইতে ব্যর্থ হয়। আফগান সর্দারগণ বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিতে প্রস্তুত থাকিলেও আমীর হবিবুল্লা সিংহাসন হারাইবার ভয়ে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করাই উচিত বলিয়া মনে করেন। আমীর হবিবুল্লার তুরস্ক-বিরোধী মনোভাবও তাঁহার তুরস্ক-জার্মান যুদ্ধজোটে যোগদান না করিবার অন্যতম কারণ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

'মিশন'-এর ব্যর্থতার পর জার্মান প্রতিনিধিগণ চীন ও আমেরিকা ঘুরিয়া বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু মহেন্দ্রপ্রতাপের পক্ষে বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করা কঠিন হইয়া পড়ে। তিনি বিভিন্নভাবে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন। ইহার পর তিনি রুশিয়ার মধ্য দিয়া বার্লিনে পৌঁছিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রুশ সরকারের বিরোধিতায় তাহাও সম্ভব হয় নাই। সুতরাং তিনি কাবুলেই অবস্থান করিতে বাধ্য হন। অবশেষে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশিয়ার শ্রমিক-বিপ্লব ও বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পর পুনরায় তিনি বার্লিনে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করেন। বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রুশিয়ায় প্রবেশের অনুমতি দেয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে মহেন্দ্রপ্রতাপ রুশিয়া হইতে বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করেন।

এইভাবে ভারতীয় বিপ্লবীরা অর্থাৎ 'বার্লিন কমিটি', জার্মান সরকার এবং তুরস্ক সরকার সমবেতভাবে চেষ্টা করিয়াও আফগানিস্থানের আমীরকে জার্মান-তুরস্ক

যুদ্ধজোটে ভিড়াইতে পারে নাই। ইহার কারণ, আমীর জার্মেনী ও তুরস্কের সামরিক শক্তির উপর ভরসা রাখিতে পারেন নাই। তিনি সকল সময়ই বৃটিশ শক্তির ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতেন এবং বৃটিশ-বিরোধী পক্ষে যোগদান করিলে আফগানিস্থানের পরাজয় ও তাঁহার সিংহাসন হারাইবার ভয়েই তিনি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ যাহাতে তাঁহার উপর কোন কারণে অসন্তুষ্ট না হয়, তাহার জন্য তিনি সর্বদা সতর্ক থাকিতেন। এই জন্যই তুরস্কের বৃটিশ-বিরোধী জেহাদে যোগদান করিবার জন্য ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মৌলভী ওবেইদুল্লা সিন্ধী আঞ্জুমান-ই-ইস্‌লামিয়ার ৪০ জন ছাত্রসহ তুরস্কের পথে আফগানিস্থান পৌঁছিলে আমীর তাঁহাদের তুরস্কে যাইতে না দিয়া আফগানিস্থানের মধ্যেই নজরবন্দী করিয়া রাখেন। অবশ্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আমীর তুরস্কের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন এবং মুসলিম জগতে প্রভাব বিস্তারের দিক হইতে আমীর নিজেকে তুরস্কের সুলতানের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করিতেন বলিয়াই সম্ভবত মৌলভী ওবেইদুল্লা এবং তাঁহার ৪০ জন ছাত্র-সঙ্গীকে তুরস্কে যাইতে দেন নাই।

যাহাই হউক, ভারতীয় বিপ্লবীরা আফগানিস্থানকে বৃটিশ-বিরোধী যুদ্ধজোটে ভিড়াইবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, আফগানিস্থান যুদ্ধে যোগদান করিলে ভারতে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পক্ষে এক মহাসুযোগ উপস্থিত হইত এবং সমগ্র উত্তর-ভারত ব্যাপিয়া এক প্রচণ্ড বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান আরম্ভ করা সম্ভব হইত। তৎকালের 'বার্লিন কমিটি'র সম্পাদক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত নিম্নোক্ত ভাষায় সেই সম্ভাবনা ও সেই ব্যাপক অভ্যুত্থানের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন:

"আমীর যদি জার্মান-তুর্কির দিকে মিশিয়া ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেন তাহা হইলে সেই যুদ্ধের পরিণাম কি হইত আজ তাহার জল্পনা-কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু ইহা ধ্রুব ছিল যে, সেই সময় ভারতের উত্তর খণ্ডে এক তুমুল বিপ্লবের সৃষ্টি হইত, তাহা 'লাহোর ষড়যন্ত্রের' মামলার ন্যায় মোকদ্দমা করিয়া নির্বাপিত করিবার চেষ্টা বৃথা হইত, এবং সেই বিপ্লবের তেজে সমস্ত উত্তর-ভারত টলমলায়মান হইত।"[১]

এই বিপ্লব-প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ

বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও বিপ্লব সম্বন্ধে মধ্যশ্রেণীর সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের এই ধারণার সহিত প্রকৃত বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও বিপ্লবের কোন মিল বা সম্পর্ক নাই। শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণই প্রকৃত বিপ্লবী শক্তি। অথচ এই বিপ্লবী শক্তির সহিত কোনদিন তাঁহাদের সম্পর্ক ছিল না, এমনকি জনসাধারণকে তাঁহারা প্রথম হইতেই এড়াইয়া চলিয়াছেন। তথাপি তাঁহারা অন্য একটি দেশের (পারস্যের) একজন নৃপতি এবং ভারতের সামন্ত রাজন্যবর্গের সহায়তায় "উত্তর-ভারতব্যাপী এক তুমুল বিপ্লব"-এর দিবাস্বপ্ন দেখিতেন। তাই তাঁহারা মনে করিতেন, আফগানিস্থানের আমীরের সাহায্যে ঐ

১। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৭৯ পৃষ্ঠা।

রাজ্যের ভিতর দিয়া কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও স্বেচ্ছাসৈন্য প্রেরণ করিলেই উত্তর-ভারতের জনসাধারণ সেই স্বেচ্ছাসৈন্য দলে যোগদান করিয়া "তুমুল বিপ্লব" আরম্ভ করিবে।

এইভাবে দিবাস্বপ্ন দেখিয়াই মধ্যশ্রেণীর সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা ১৮৯৮ হইতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৬ বৎসর ধরিয়া অসংখ্য বৃটিশ-বিরোধী গোপন ষড়যন্ত্রে নিমগ্ন ছিলেন, দলে দলে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন এবং অজস্র ধারায় বুকের রক্ত ঢালিয়াছেন। কিন্তু এই ৩৬ বৎসরে তাঁহাদের চক্ষের উপর যে অসংখ্য বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে তাহার দিকে তাঁহারা একবারও ফিরিয়া তাকান নাই। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তই তাঁহার গ্রন্থের একস্থানে তাঁহাদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে সখেদে লিখিয়াছেন:

"বিপ্লববাদ জনসাধারণের হৃদয়ে ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে নাই।......শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহ লিখিয়াছেন, 'বিপ্লববাদীরা কোথাও বড় সহানুভূতি পায় নাই' এবং শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল লিখিয়াছেন, 'ভারতের বিপ্লবদল ভারতবাসীর নিকট চির-উপেক্ষিত হইয়াছে। এই উপেক্ষা ভারতীয় বিপ্লবদলের বুকের উপর যেন জগদ্দল পাথরের মত নিরন্তর নিষ্ঠুরভাবে নিষ্পেষণ করিত। এত অবজ্ঞা তাঁহারা আর কাহারও নিকট হইতে পান নাই।' এই উভয় উক্তিই ঐতিহাসিক সত্যের সাক্ষ্য দিতেছে।"[১]

ইহার পরই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহাদের বিপ্লববাদের ব্যর্থতার দায়িত্ব ভারতবর্ষের জনসাধারণের উপর চাপাইয়া দিয়া এবং তাহাদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া লিখিয়াছেন:

"আসল কথা এই, আমাদের দেশ মনুষ্যত্ব হিসাবে যত অধঃপতিত, পৃথিবীর সভ্যপদবাচ্য কোন দেশে এই প্রকার হয় নাই। পৃথিবীর অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়া ইহাই উপলব্ধি করিয়াছি যে, ভারতবাসীরা যত মনুষ্যত্ববিহীন হইয়াছে অন্যান্য দেশ তদ্রূপ হয় নাই।"[২]

এইভাবে খেদ ও ক্রোধ প্রকাশের পর দত্ত মহাশয় যেন সংবিত ফিরিয়া পাইয়াছেন এবং 'বিপ্লববাদের' ব্যর্থতার প্রকৃত কারণ খুঁজিয়া পাইয়া লিখিয়াছেন:

"১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ইতিহাস হইতে আমরা কি কিছু শিক্ষা লাভ করিব না? ভারতের রাজনীতির আদর্শ—স্বাধীনতা।......কিন্তু স্বাধীনতার জন্য মূল্য প্রদান করিতে হয়।.....এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে হইলে আমাদের নূতন আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। এবং সেই পন্থানুযায়ী কার্য করিতে হইবে। ভারতের মুক্তি চেষ্টার শেষ আশ্রয় ভারতের গণশ্রেণী।......ভারতের এই নির্বাক, নিরক্ষর, শোষিত, প্রপীড়িত তথাকথিত নিম্নশ্রেণীদের জাগাইতে হইবে। তাহাদের অধিকারের কথা বলিতে হইবে, তাহাদের সামাজিক ও আর্থনীতিক দাবি পূরণ করিতে হইবে, তাহাদের শ্রেণীজ্ঞানে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে, বুঝাইতে হইবে যে স্বরাজ তাহাদেরই জন্য।

১। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস, ১০৮ পৃষ্ঠা। ২। উক্ত গ্রন্থ, ১০৮ পৃষ্ঠা।

"গণশ্রেণী বাবুদের জন্ত প্রাণ দিবে না।······গণশ্রেণীর সহানুভূতি পাইতে হইলে তাহাদের স্বার্থ দেখিতে হইবে।"

"ভারতের স্বাধীনতাবাদের অর্থ ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরেজের ঝগড়া, আর তাহাদের কোন প্রকারে জাহাজে চাপাইয়া দেওয়া! কিন্তু এই অর্থ ভুলিয়া যাইতে হইবে। বিংশ শতাব্দীর সমস্যা হইতেছে, শোষক ও শোষিতের ঝগড়ার মীমাংসা করা। ভারতের বেশীর ভাগ শোষিত; ইংরেজ বুর্জোয়ারা তাহাদের শোষণ করে। এই শোষণকার্যে দেশীয় অভিজাত ও বুর্জোয়াশ্রেণীরাও ক্রমশ মিলিত হইবে; এই শোষণের জাল ছিন্ন করিয়া কি প্রকারে ভারতবাসীর মুক্তি হইবে, ইহাই আমাদের সমস্যা।"[১]

কিন্তু ইহাই যখন ভারতীয় জনসাধারণের সমস্যা এবং সেই সমস্যার সমাধানের জন্য বৈপ্লবিক কর্তব্য, তখন মধ্যশ্রেণীর সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা কি করিয়াছেন, কোন্ পথে গিয়াছেন?

গণশ্রেণী "বৈপ্লবিকদের কর্মে সহায়তা করে নাই। কারণ অতি সোজা কথায় —বৈপ্লবিকরা তাহাদের কখনও চাহেন নাই। বৈপ্লবিকরা চিরকাল বাবুর দলকেই ভজাইয়াছেন। গণশ্রেণী অর্থাৎ তথাকথিত কুলি, মজুর, চাষার দলকে বাবু বৈপ্লবিকেরা কখনও ডাকেন নাই, কখনও চাহেনও নাই। অতএব তাহারাও আসে নাই।"

"ইহাই হইল ১৯১৫ হইতে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব-প্রচেষ্টার মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ। বাহির হইতে অস্ত্রাদি আসিতে পারে নাই বলিয়াই বিপ্লব-চেষ্টা নিষ্ফল হইল, ইহা ঐতিহাসিক কারণ হইতে পারে বটে, কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক কারণ নহে। আসল কারণ, দেশের জনসাধারণ এই বিষয়ে নিরপেক্ষ ছিল, এই বিপ্লব-প্রচেষ্টা তাহাদের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়াছিল।"[২]

মধ্যশ্রেণীর সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা যে অকুতোভয়ে মৃত্যুবরণ এবং বৈপ্লবিক নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের দ্বারা অন্তত মধ্যশ্রেণীকে পূর্ণস্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে সত্য। ইহা মধ্যশ্রেণী কোনদিনই ভুলিয়া যায় নাই। কিন্তু শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণ প্রকৃত বিপ্লব সম্বন্ধে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের 'দিবাস্বপ্ন'কে মধ্যশ্রেণীর গণবিপ্লব-বিরোধী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলিয়াই উপেক্ষা করিয়াছে।

১। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১১৫-১৬ পৃষ্ঠা। ২। উক্ত গ্রন্থ, ১১০ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়

বঙ্গদেশে দ্বিতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টা

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ

যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় হইতেই যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর যুগান্তর সমিতির প্রধান পরিচালকের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত হয়। এই দায়িত্ব পালন করিয়া যতীন্দ্রনাথ বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছেন।

যতীন্দ্রনাথের জন্ম নদীয়া জেলার কয়া নামক গ্রামে। যখন কলিকাতায় অনুশীলন সমিতি নামে প্রথম বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন হইতেই তিনি ইহার সংস্পর্শে আসেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেসের সময় যখন 'নিখিল বঙ্গ বৈপ্লবিক সম্মেলন' হইয়াছিল, তখন তিনি সেই সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কেবলমাত্র দৈহিক শক্তিদ্বারা এক ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া উহাকে হত্যা করায় তিনি সহকর্মীদের নিকট হইতে "বাঘা যতীন" আখ্যা লাভ করেন। আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলায় অরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতির গ্রেপ্তারের পর যুগান্তর সমিতির প্রধান পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন উক্ত সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অবিনাশ চক্রবর্তী।[১] তিনি যতীন্দ্রনাথকে তাঁহার সহকারীরূপে গ্রহণ করিয়া সমিতির কার্য পরিচালনা করিতেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর যখন বাঙলাদেশে বৈপ্লবিক সংগ্রামের এক নূতন জোয়ার দেখা দেয়, তখন অবিনাশ চক্রবর্তী মহাশয় যুগান্তর সমিতির সকল প্রধান কর্মীদের আহ্বান করিয়া বলেন, "তোমাদের মধ্যে যতীনই best man (সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক), সে-ই নেতৃত্ব গ্রহণ করুক।"[২]

ইহার পূর্বেই যতীন্দ্রনাথ এই গুরু দায়িত্ব বহনের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়াছিলেন। তাই তাঁহার নেতৃত্ব সকলে এক বাক্যে মানিয়া লয়। সমিতির মধ্যে, এমনকি কলিকাতার অনুশীলন সমিতির মধ্যেও, দলীয় বিবাদ-বিসংবাদ যতই থাকুক না কেন, যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব মানিয়া লইতে কাহারও আপত্তি ছিল না। এবার যতীন্দ্রনাথ দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হইলেন।

প্রথমেই যতীন্দ্রনাথ বিচ্ছিন্ন কর্মীদের ও সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ও পুনর্গঠিত করিতে আরম্ভ করেন। 'আলিপুর মামলা'র পর যুগান্তর সমিতি বহু অংশে ভাগ হইয়া গিয়াছিল, যতীন্দ্রনাথের চেষ্টায় সেই অংশগুলির মধ্যে যাহাতে অন্তত কার্যক্ষেত্রে সহযোগিতা চলে, তাহার ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থানুসারে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি, অনুকূল মুখার্জি প্রভৃতির দলগুলি সাংগঠনিক স্বাধীনতা বজায় রাখিলেও কার্যক্ষেত্রে

১। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: "দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম" পৃঃ ১৩৩।

২। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: "দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম" পৃঃ ১১৬।

যতীন্দ্রনাথের পরিচালিত যুগান্তরের মূল অংশের সহিত সহযোগিতা করিত। এই সময় যতীন্দ্রনাথের অন্যতম কার্য হইল বৈপ্লবিক সংগঠনগুলিকে বিভিন্ন ত্রুটি হইতে মুক্ত করা। একার্যে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ[১] তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন এবং তাঁহার সহায়তায় যতীন্দ্রনাথ একার্যেও বিশেষ সাফল্য লাভ করেন।

'হাওড়া ষড়যন্ত্র-মামলা' হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর যতীন্দ্রনাথ সরকারী চাকরি হইতে পদচ্যুত হন। ইহার পর তিনি বিভিন্ন প্রধান দলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন। তাঁহার চেষ্টায় ঢাকা অনুশীলন সমিতি ও উহার অন্তর্ভুক্ত দলগুলি ব্যতীত অন্য সকল দলের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দেই কলিকাতার অনুশীলন সমিতি, পশ্চিম-বঙ্গের যুগান্তর সমিতির বিভিন্ন অংশ, পূর্ণ দাসের পরিচালিত মাদারীপুর-সমিতি, ময়মনসিংহের যুগান্তর-শাখা, উত্তর-বঙ্গের যুগান্তর ও অনুশীলন-শাখা প্রভৃতি তাঁহার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়। এই সময় তিনি যে-সকল সহকর্মীদের সহযোগিতা লাভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে ময়মনসিংহের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ; মাদারীপুরের পূর্ণ দাস; বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, নরেন ঘোষ; উত্তর-বঙ্গের যতীন রায়, যোগেন দে-সরকার; খুলনার সতীশ চক্রবর্তী; যশোহরের বিজয় রায়; কলিকাতা ও চব্বিশ পরগনার নরেন ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়), যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী; ফরিদপুরের নিখিল গুহরায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যতীন্দ্রনাথ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর বালেশ্বরে অপর চারিজন সঙ্গীসহ ইংরেজদের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন।[২]

ঢাকা অনুশীলন সমিতি

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের 'ঢাকা-ষড়যন্ত্রমামলা' ও ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের 'বরিশাল-ষড়যন্ত্রমামলা'র পর পূর্ব-বঙ্গের অনুশীলন সমিতি বিশেষভাবে দুর্বল হইয়া পড়ে। সমিতির প্রধান পরিচালক পুলিনবিহারী পূর্বেই সাত বৎসরের দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কারান্তরালে চলিয়া গিয়াছেন। তখন এই সমিতির ঘোর দুর্দিন চলিতেছিল। কিন্তু মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-বঙ্গের অনুশীলন সমিতিও নবোদ্যমে কাজ আরম্ভ করে। পুলিনবিহারীর গ্রেপ্তারের পর প্রধান পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন গিরিজাবাবু। ইঁহার প্রকৃত নাম 'নরেন্দ্রনাথ দত্ত', ইনি শ্রীহট্টের লোক। গিরিজাবাবুর চেষ্টায় সমিতি পুনর্গঠিত হইয়া বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এই সমিতি কেবলমাত্র পূর্ব-বঙ্গের সীমার মধ্যেই নিজ কর্ম-প্রচেষ্টা নিবদ্ধ রাখে নাই, ইহার পরিচালকগণ এক সর্ব-ভারতীয় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে এক নূতন পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ভারত-

১। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—ইঁহার পূর্বনাম দেবব্রত বসু, ইনি ছিলেন যুগান্তর সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। ২। যতীন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের পূর্ণ বিবরণ 'বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা' শীর্ষক পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

ব্যাপী একটা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আয়োজনের উদ্দেশ্য লইয়া সমিতির প্রায় দুইশত শ্রেষ্ঠ কর্মী বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়াইয়া পড়েন। অনুশীলন সমিতির কর্মীরা বিহার, আসাম, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব প্রদেশে নূতন গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিপ্লবের আয়োজন আরম্ভ করিয়া দেন।

ডাকাতি

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা অভূতপূর্বরূপে বৃদ্ধি পাইবার ফলে বিপ্লবীদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। ডাকাতি ব্যতীত এই অর্থ সংগ্রহের অন্য কোন উপায় ছিল না। পরিচালকগণ ডাকাতিদ্বারা দেশের ধনীদের অর্থ কাড়িয়া লইয়া তাহাদ্বারা স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই জন্য এই বৎসর অসংখ্য রাজনৈতিক ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয় এবং এই উপায়ে বিপ্লবীরা এই বৎসর মোট একলক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। এই সময়ে অনুষ্ঠিত কয়েকটি ডাকাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতার যুগান্তর সমিতি গার্ডেনরিচ্-এ 'বার্ড-কোম্পানি'র গাড়ী হইতে ১৮ হাজার টাকা লুণ্ঠন করে। এই ডাকাতি সম্পর্কে একজনের সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ২২শে ফেব্রুয়ারী উক্ত সমিতি বেলিয়া-ঘাটায় এক চাউল-ব্যবসায়ীর অফিসে ডাকাতি করিয়া পায় ২২ হাজার টাকা। এই ডাকাতিতে একজন ট্যাকসি-চালক বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। এই সমিতি আর একটি বড় ডাকাতি করে ২রা ডিসেম্বর। কলিকাতার কর্পোরেশন স্ট্রীটে এই ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহাতে ২৫ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। এই সম্পর্কে একজনের তের বৎসর, একজনের দুই বৎসর ও আর একজনের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এই তিনটি ডাকাতিই অনুষ্ঠিত হয় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও পরিচালনায়। প্রথম দুইটিতে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর পরিচালনায় ৬ই এপ্রিল আড়িয়াদহে ও ২রা আগস্ট আগরপাড়ায় দুইটি ডাকাতি হয়। দ্বিতীয়টিতে বিপিনবিহারী স্বয়ং একটি রিভলভারসহ গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব-বঙ্গে যে সকল ডাকাতি হয় তাহার মধ্যে চারিটি ডাকাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৫ই জুন বাখরগঞ্জের গাজীপুর নামক স্থানে ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা ১৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। ১৪ই আগস্ট ত্রিপুরা জেলার হরিপুর গ্রামের ডাকাতিতে তাঁহারা ১৮ হাজার টাকা লাভ করেন। ৭ই সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ জেলার চন্দ্রকোনা নামক স্থানের ডাকাতিতে ২১ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয় এবং ২৯শে ডিসেম্বর ত্রিপুরা জেলার কারতলা নামক স্থানের ডাকাতিদ্বারা ১৫ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। এই চারিটি ডাকাতিতেই বিপ্লবীদের গুলিতে একজন বা দুজন করিয়া লোক নিহত হয়।

গুপ্তহত্যা

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পাথুরিয়াঘাটার এক বাড়ীতে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী নিরোদ হালদার নামক এক গোয়েন্দা অকস্মাৎ

যতীন্দ্রনাথের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকে। সে এমন ভাব দেখায় যেন সে যতীন্দ্রনাথকে চিনিতে পারিয়াছে এবং তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে। গোয়েন্দাটি সত্যই যতীন্দ্রনাথকে এবং তাঁহার সঙ্গীদের চিনিতে পারিয়াছিল। সুতরাং ইহাকে ছাড়িয়া দিলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া যতীন্দ্রনাথ নিজেই তাহাকে গুলি করেন। বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্রনাথের গুলিতে দুঃসাহসী গোয়েন্দা নিরোদ হালদারের গোয়েন্দা-লীলার অবসান হয়।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কন্‌ভোকেশন' উপলক্ষে বড়লাট সাহেবের আসিবার কথা ছিল। বড়লাট সাহেবের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবার ভার পড়ে পুলিস ইনস্‌পেক্‌টর সুরেশ মুখার্জির উপর। সুরেশ মুখার্জি ইতিপূর্বে বিপ্লবীদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিপ্লবীরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। 'কনভোকেশন'-উৎসবে সুরেশ মুখার্জি যখন পুলিসি ব্যবস্থা দেখাশুনা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় যতীন্দ্রনাথের সহকর্মী ও পূর্বে এক গুপ্তচর-হত্যার জন্য ফেরারী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী অকস্মাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়াই ইনস্‌পেক্‌টর-সাহেবের ফেরারী আসামী ধরিবার উৎসাহ জাগিয়া উঠে। সুরেশ মুখার্জি চিত্তপ্রিয়কে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইবামাত্র চিত্তপ্রিয় তাহাকে গুলি করেন। নিকটেই আরও চারি জন বিপ্লবী অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারাও আসিয়া চিত্তপ্রিয়ের সহিত রিভলভার হস্তে যোগ দেন। চারিটি বুলেটে ক্ষত-বিক্ষত সুরেশ মুখার্জির প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। বিপ্লবীরা নিরাপদে পলায়ন করিতে সক্ষম হন।

কুমিল্লা জেলা-স্কুলের হেড মাস্টার শরৎকুমার বসু ও তাঁহার ভৃত্য বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুলিসকে সাহায্য করিবার অপরাধে ৩রা মার্চ তারিখে নিহত হন। ২৫শে আগস্ট চব্বিশ পরগনার মুরারীমোহন মিত্র নামক এক ব্যক্তি বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ দেয়। এই ব্যক্তি চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন ডাকাতি সম্বন্ধে পুলিসকে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে সংবাদ দিয়াছিল। ১৯শে অক্‌টোবর ময়মনসিংহের ডেপুটি পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বিপ্লবীদের হস্তে নিহত হন।

২১শে অক্‌টোবর রাত্রি সাড়েদশ ঘটিকার সময় মসজিদবাড়ী স্ট্রীটের এক ঘরে বসিয়া পুলিস-ইনস্‌পেক্‌টর সতীশ ব্যানার্জি দুইজন দারোগার সহিত বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পরামর্শ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ সেই ঘরের দরজায় একজন বিপ্লবী যুবক উপস্থিত হইয়া পিস্তল হইতে গুলি ছুঁড়িতে থাকেন। তাঁহারা সকলে প্রাণের ভয়ে বারান্দায় দৌড়িয়া যান। পিস্তলধারী যুবকের সহিত আরও কয়েকজন আসিয়া যোগদান করেন এবং তাঁহারাও গুলি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে পুলিস কর্মচারীদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। এই গুলি চালনার ফলে একজন দারোগা নিহত ও একজন আহত হয়। ইনস্‌পেক্‌টর সতীশ ব্যানার্জি বাঁচিয়া যান।

৩০শে নভেম্বর সারপেন্টাইন লেনে একজন কনস্টেবল ও অপর এক ব্যক্তিকে বিপ্লবীরা হত্যা করেন। ১৯শে ডিসেম্বর ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস নামক এক ব্যক্তি বিপ্লবীদের

গুলিতে নিহত হয়। এই ব্যক্তি পূর্বে ছিল বাজিতপুরের গুপ্ত-সমিতির একজন সভ্য, সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পুলিসকে সাহায্য করিত।

উত্তর-বঙ্গে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী পঁচিশ জন যুবক মশার পিস্তল ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রংপুর জেলার কুর্ণ্ল নামক স্থানে এক ধনী ব্যবসায়ীর গৃহে প্রবেশ করিয়া ৫০ হাজার টাকা লুণ্ঠন করেন। বিপ্লবীরা তাঁহাদের পরিচয় গোপন করিবার জন্য মুখোস ধারণ করিয়াছিলেন।

এই ডাকাতি সম্পর্কে তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে বাঙলাদেশের পুলিসের ডেপুটি ইনস্পেক্টর-জেনারেল, রংপুর জেলার পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁহার সহকারী রংপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাকালে তাঁহারা সকলে একত্রে পরামর্শ করিতেছিলেন, এমন সময় চারিজন বিপ্লবী যুবক মশার পিস্তল ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া তাহাদের ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হন। তাঁহাদের দুইজন ঘরে ঢুকিয়াই সহকারী সুপারকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করেন। তিনি কোন প্রকারে পলাইয়া যান, কিন্তু তাঁহার ভৃত্যটি নিহত হয়।

২০শে ফেব্রুয়ারী প্রায় চল্লিশ জন মুখোসধারী যুবক রিভলভার, পিস্তল প্রভৃতি লইয়া রংপুরে এক দুশ্চরিত্র মহাজনের গৃহে প্রবেশ করিয়া ৫ হাজার টাকা লুণ্ঠন করেন। উপরোক্ত প্রত্যেকটি ঘটনায় বিপ্লবীরা মশার পিস্তল ব্যবহার করিয়াছিলেন, কারণ প্রত্যেকটি ঘটনাস্থলেই ঐ পিস্তলের খালি কার্তুজ প'ড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। পুলিসের অনুমান, এই সকল কর্ম উত্তর-বঙ্গের অনুশীলন সমিতি দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ

বৈপ্লবিক সংগ্রাম—ডাকাতি

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর চারিদিকে বহু মামলা আরম্ভ হওয়ায় অর্থের প্রয়োজনও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং যুগান্তর সমিতি অর্থের জন্য কয়েকটি বড় বড় ডাকাতি করিতে বাধ্য হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী কলিকাতার যুগান্তর সমিতির পুলীন মুখার্জি ও অতুল ঘোষের[১] নেতৃত্বে বিপ্লবীরা হাওড়ায় একটি ডাকাতি করিয়া ৬ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। এই সময় তাঁহারা আর একটি ডাকাতি করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসেন। বিপিন গাঙ্গুলীর দলের সভ্যগণ হাওড়া জেলার একটি গ্রামে এক ডাকাতি করিয়া দুই হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। এই ডাকাতির সূত্র ধরিয়া পুলিস বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাসী করে এবং তার ফলে বিপিন গাঙ্গুলীর দল ও বরিশালের যুগান্তর-শাখার বহু সভ্য গ্রেপ্তার হইয়া 'ভারতরক্ষা-

---

১। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর বালেশ্বরে যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু হইলে পুলীন মুখার্জি ও অতুল ঘোষ একত্রে যুগান্তর সমিতির পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আইন'-এ আবদ্ধ হন। এই সময় যুগান্তর সমিতি একটি বড় রকমের ডাকাতি করে কলিকাতার গোপী রায় লেনে। ২৬শে জুন কয়েকজন যুবক এক ধনী ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করিয়া নগদে ও অলংকারে ১১৫০০ টাকা লুণ্ঠন করেন। এই ডাকাতির পর যুগান্তরের অন্যতম পরিচালক পুলীন মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার ও আটক হন। ইহার পর পুলিস যুগান্তর দলের অন্যতম পরিচালক অতুল ঘোষকেও গ্রেপ্তার করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকে। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার উদ্দেশ্যে পুলিস সালথিয়ার এক বাড়ীতে হানা দিয়া কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু অতুল ঘোষ সেখান হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হন। ইহার পর যুগান্তর সমিতির চরম দুর্দিন আরম্ভ হয়।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর দমননীতির আঘাতে পশ্চিম-বঙ্গের যুগান্তর সমিতি দুর্বল হইয়া পড়িলেও পূর্ব-বঙ্গের অনুশীলন সমিতির শক্তি প্রায় অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সমিতি উহার বৈপ্লাবিক প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবেই চালাইয়া যায়। সমিতি উহার পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। সুতরাং অর্থের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য উহার সভ্যগণ পূর্ব-বঙ্গে কয়েকটি বড় বড় ডাকাতি করেন।

সমিতির সভ্যগণ ত্রিপুরা জেলার গণ্ডোরা গ্রামে ডাকাতি করিয়া ১৪৭০০ টাকা সংগ্রহ করেন। এখানে বিপ্লবীদের গুলিতে এক ব্যক্তি আহত হয়। এই সম্পর্কে পুলিস কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া এক মামলা আরম্ভ করে এবং মামলার বিচারে এক যুবকের চারি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ৩০শে এপ্রিল আর একটি ডাকাতি হয় ত্রিপুরা জেলার নাটঘর গ্রামে। এই ডাকাতিতে ১৭৫০০ টাকা বিপ্লবীদের হস্তগত হয়। পুলিস এই ডাকাতি সম্পর্কে বহু লোককে গ্রেপ্তার করে। তাহাদের মধ্যে ছয় জন পুলিসের নিকট স্বীকারোক্তি করে। ৯ই জুন বিপ্লবীরা ফরিদপুর জেলার ধামুকাঠি গ্রামে ডাকাতি করিয়া ৪৩ হাজার টাকার হুণ্ডি লইয়া যান। ২রা সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা জেলার সাহাপদুয়া নামক এক গ্রামের ডাকাতিতে ৩৩৭০ টাকা লুণ্ঠিত হয়। এই বৎসরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ডাকাতি হয় ময়মনসিংহ জেলার সাহিদেও নামক স্থানে। ১৭ই অক্টোবর রাত্রিকালে বিপ্লবীরা মশার পিস্তল, বন্দুক প্রভৃতি লইয়া এক মুসলমান-ব্যবসায়ীর গৃহ আক্রমণ করিয়া ৮০ হাজার টাকা লুণ্ঠন করেন। মুসলমান-ব্যবসায়ীটি বাধা দিতে গিয়া বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। ইহা ব্যতীত ফরিদপুর ও ত্রিপুরা জেলায় আরও কয়েকটি বড় বড় ডাকাতি হয়। ফরিদপুরের একটি ডাকাতিতে সাত জন স্কুলের ছাত্র ধরা পড়িয়া দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই সময় উত্তর-বঙ্গেও কয়েকটি ডাকাতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

গুপ্তহত্যা

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী কলিকাতায় কলেজ স্কোয়ারের মধ্যে সকাল দশটার সময় মধুসূদন ভট্টাচার্য নামক পুলিসের এক দারোগা বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। এই সময় কলেজ স্কোয়ারের মধ্যে বহু লোক বেড়াইতেছিল। সেই ভিড়ের মধ্যে থাকিয়া দুই জন যুবক মশার পিস্তল ও একটি রিভলভার হইতে তিনটি গুলি

বর্ষণ করেন। বিপ্লবীরা কার্য শেষ করিয়া পলায়ন করিবার সময় বহু লোক তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলে তাঁহারা বৃষ্টিধারার মত গুলি বর্ষণ করিয়া ধুম্রজালের আড়ালে পলায়ন করেন। বহু অনুসন্ধানের পর পুলিস পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া 'ভারতরক্ষা-আইন'এ আটক করে। এই সম্পর্কে আর একজন যুবক একটি মশার পিস্তলসহ গ্রেপ্তার হন। 'সিডিসন কমিটি'র রিপোর্টে এই যুবককে বরিশাল দলের পরিচালক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৯শে জানুয়ারী ময়মনসিংহ জেলার বাজিৎপুর নামক স্থানে শশিভূষণ চক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তি বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুলিসকে সাহায্য করিবার অপরাধে নিহত হয়। জুন মাসে ঢাকা অনুশীলন সমিতির একদল সভ্য কলিকাতায় আসিয়া কয়েকজন অত্যাচারী পুলিস কর্মচারীকে হত্যা করিবার পরিকল্পনা করেন। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত নামক এক দারোগা বিশেষত অনুশীলন সমিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান-কার্যে নিযুক্ত ছিল। জুন মাসের প্রথম দিকে এই দারোগাকে হত্যা করিবার জন্য সমিতির তিনজন সভ্যকে নিযুক্ত করা হয়। দুইবার এই দারোগাকে হত্যা করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ৩০শে জুন কলিকাতার সি-আই-ডি পুলিসের কুখ্যাত ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়কে বিপ্লবীরা গুলি করিয়া হত্যা করেন। এই পুলিস কর্মচারীকে হত্যা করিবার জন্য প্রায় সকল দলই দীর্ঘকাল ধরিয়া চেষ্টা করিতেছিল। ঢাকা অনুশীলন সমিতির যে সভ্যগণ কলিকাতায় আসিয়া বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করিয়াছিলেন, অবশেষে তাঁহারাই এই কার্যে সফলতা লাভ করেন।

৩০শে জুন সন্ধ্যার পূর্বে বসন্ত চট্টোপাধ্যায় একজন আর্দালি সঙ্গে লইয়া সাইকেলে চড়িয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। তিনি কোন্ পথে প্রত্যহ যাতায়াত করিতেন তাহা বিপ্লবীরা লক্ষ্য করিয়া পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। পাঁচজন যুবক দুইটি মশার পিস্তল ও তিনটি রিভলভার লইয়া ভবানীপুরের প্রেসিডেন্সী হাসপাতালের নিকট অপেক্ষা করিতেছিলেন। বসন্ত হাসপাতালের নিকটবর্তী হইবামাত্র বিপ্লবীদের তিনজন অপর দুইজনকে ইঙ্গিত করিয়া সরিয়া পড়েন। বসন্ত ঐ স্থানে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই অপর দুইজন যুবক বসন্ত ও তাহার আর্দালিকে গুলি করেন। উভয়েই সাইকেল হইতে পড়িয়া যায়। বসন্তের উপর নয়টি গুলি ছোঁড়া হইয়াছিল। আর্দালিটিও সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া পরে হাসপাতালে মারা যায়।

বিপ্লবীরা তাঁহাদের কর্তব্য নিঃসন্দেহে শেষ করিয়া পূর্ব দিকে পলায়ন করেন। পথে একটি কনেস্টবল তাঁহাদের পথ রোধ করিয়া গুলি ছোঁড়ে। কিন্তু তাঁহারা ভিন্নপথে ভবানীপুরের বাঙালী লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া সরিয়া পড়েন। পুলিস বহু অনুসন্ধান করিয়াও কোন লোককে এই হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের সূত্র ধরিয়া বহু লোককে গ্রেপ্তার করে এবং তাহার ফলে অনুশীলন সমিতির কলিকাতা-শাখা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি কলিকাতার যুগান্তর সমিতির শেষ পরিচালক অতুল ঘোষের এক আত্মীয়কে পুলিসের গুপ্তচর সন্দেহে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ একটি

বাক্সে পুরিয়া ট্রেনের কামরায় ফেলিয়া রাখা হয়। এই বৎসরের শেষ দিকে ঢাকা শহরে দুইজন গুপ্তচর—তাহাদের একজন এক স্কুলের হেড মাস্টার ও দুইজন কনেস্টবল —বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। গুপ্তচর দুইজন পুলিসের নিকট নিয়মিতভাবে বিপ্লবীদের সংবাদ দিত এবং কনস্টেবল দুইজন দিবারাত্র বিপ্লবীদের অনুসন্ধানে ঘুরিত। ইহাই এই বৎসরের শেষ গুপ্তহত্যা।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ

ডাকাতি

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সারা বাঙলাদেশে মোট ছয়টি ডাকাতি হয় এবং এই সকল ডাকাতিতে মোট ১২২১৪২ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৫ই এপ্রিল রাজসাহী জেলার জামনগর গ্রামে এক ভীষণ ডাকাতি হয়। প্রায় বিশজন যুবক মুখোস ও আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রথমেই টেলিগ্রাফ-লাইন কাটিয়া দেন, পরে এক ধনী গৃহস্থ-বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ২৬৫৬৭ টাকা লুণ্ঠন করেন। এই ডাকাতির অভিযোগে চারিজনের এক বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ৭ই মে তারিখে কলিকাতার আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীটে এক অলংকারের দোকান লুট করিয়া বিপ্লবীরা ৫৪৫৯ টাকার অলংকার হস্তগত করেন। বিপ্লবীদের গুলিতে দোকানের দুইজন মালিক নিহত ও দুইজন কর্মচারী আহত হয়। ২০শে জুন রংপুর জেলার রাখালক্রুজ গ্রামে এক ডাকাতি করিয়া ঢাকার অনুশীলন সমিতি নগদে ও অলংকারে ৩১ হাজার টাকা সংগ্রহ করে। কিন্তু বিপ্লবীদের দুইজনকে লুণ্ঠিত সকল অলংকার ও একটি মশার পিস্তলসহ ঢাকা শহরে গ্রেপ্তার করা হয়। ২৭শে অক্টোবর ঢাকা জেলার আবদুল্লাপুর নামক স্থানে একটি ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা নগদ ও অলংকারে ২৪৮৩০ টাকা লাভ করেন। ৩রা নভেম্বর ত্রিপুরা জেলার মাঝিয়ারা গ্রামের এক বাড়ীর দুই ঘরে ডাকাতিতে নগদ ও অলংকারে ৩৩ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়।

গুপ্তহত্যা

জ্ঞান ভৌমিক নামক এক ব্যক্তি গুপ্ত-সমিতির সভ্য ছিল। সভ্য থাকিয়াই সে পুলিসের গুপ্তচর হিসাবে বিপ্লবীদের সংবাদ পুলিসকে জানাইয়া দিত। এইভাবে সে বহু বিপ্লবীকে পুলিসের নিকট ধরাইয়া দেয়। আটক বিপ্লবীরা জেল হইতে বাহিরে সংবাদ দেন, জ্ঞান পুলিসের গুপ্তচর। বাহিরের বিপ্লবীরা তাহাকে হত্যার চেষ্টা করেন, কিন্তু গুপ্তচর জ্ঞান ব্যাপার বুঝিয়া সতর্ক হইয়া যায়। জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে সিরাজগঞ্জে রেবতী নাগ নামে গুপ্ত-সমিতির এক সভ্যকে পার্টির নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে হত্যা করা হয়। ২৩শে জুলাই বিপ্লবীরা ঢাকা শহরে এক অত্যাচারী পুলিস কর্মচারীকে হত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

গৌহাটি পাহাড়ের যুদ্ধ

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গৌহাটি পাহাড়ে পুলিসের সহিত বিপ্লবীদের যুদ্ধ 'বুড়ী বালামের যুদ্ধ'-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকেই সরকারী দমননীতির প্রচণ্ড আঘাতে 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'র সংগঠন ভাঙিয়া পড়ে। বিপ্লবীরা দলে দলে পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হইতে থাকেন। সমিতির পরিচালকদের পক্ষে ঢাকায় গুপ্তভাবে থাকিয়া সমিতির কার্য পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং তাঁহারা স্থির করেন, পুলিসের নাগাল হইতে দূরে কোথাও যাইয়া সেখান হইতে সমিতির কার্য পরিচালনা করিবেন। এই সময় আসামে বিশেষ কোন বৈপ্লবিক সংগঠন বা বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ ছিল না। কাজেই আসামের উপর পুলিসের নজর নাই মনে করিয়া সমিতির নেতৃবৃন্দ আসামের গৌহাটি শহরে সমিতির কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং সমিতির তৎকালীন পরিচালক সতীশ পাকড়াশী, নলিনী বাগচী প্রভৃতি কয়েক জন ঢাকা হইতে পলাইয়া গৌহাটিতে আশ্রয় লন। ইঁহারা সেখান হইতেই সমিতির বাঙলাদেশ-জোড়া সংগঠন পরিচালনা করিতে থাকেন। বিপ্লবীরা দুইটি বাড়ীতে ভাগ হইয়া থাকিতেন।

ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে একদিন শেষ রাত্রিতে বহু সশস্ত্র পুলিসসহ গোয়েন্দা অফিসারগণ বিপ্লবীদের দুইটি বাড়ীই ঘিরিয়া ফেলে। বিপ্লবীরা কোন প্রকারে পলাইয়া পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুলিস পাহাড়ের নিকটবর্তী হইবামাত্র লুক্কায়িত সাতজন বিপ্লবী তাঁহাদের রিভলভার ও পিস্তল হইতে গুলিবর্ষণ আরম্ভ করেন। পুলিস ভয় পাইয়া পশ্চাৎ অপসরণ করে। কিন্তু পুলিসের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, বিপ্লবীদের হাতে কেবল রিভলভার ও পিস্তল প্রভৃতি ছোট অস্ত্র, রাইফেল নাই এবং বিপ্লবীদের গুলি-গোলাও সামান্য। আর অন্যদিকে তাহাদের হাতে রহিয়াছে দূর পাল্লার রাইফেল এবং গুলিও যথেষ্ট। সুতরাং সশস্ত্র পুলিসদল নিঃশব্দে অন্ধকারের আড়ালে পাহাড় ঘিরিয়া ফেলে। এদিকে মরিয়া হইয়া গুলি ছুঁড়িবার ফলে বিপ্লবীদের গুলি নিঃশেষ হইয়া আসে। পুলিসদল তাহা বুঝিতে পারিয়া বিপ্লবীদের বেষ্টন করিয়া তাঁহাদের নিকটবর্তী হয়। সেই স্থানে পাঁচজন বিপ্লবী পুলিসের হাতে ধরা পড়েন।

পুলিসের দল যখন বিপ্লবীদের ঘিরিয়া ফেলিয়া উল্লাসে চিৎকার করিতে করিতে তাঁহাদের নিকটবর্তী হইতেছিল, তখন অপর দুইজন বিপ্লবী—সতীশ পাকড়াশী ও নলিনী বাগচী—সকলের অলক্ষ্যে সরিয়া পড়েন। দুইজন বিপ্লবী দুই দিক দিয়া হাঁটাপথে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। গাড়ীতে উঠিলে পাছে ধরা পড়িয়া যান এই ভয়ে তাঁহারা অরণ্য-পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করেন। সতীশ পাকড়াশী কলিকাতায় পেঁছিবার কয়েকদিন পর একদিন ভোরবেলা একজন বিপ্লবী কর্মী নলিনীকে অচেতন অবস্থায় কলিকাতার ময়দানে পড়িয়া থাকিতে দেখেন। তখন নলিনীর সর্বাঙ্গে বসন্ত ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, ভয়ংকর জ্বরে তিনি অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন। কর্মীটি নলিনীকে লইয়া কোন প্রকারে তাঁহার গৃহে পৌঁছেন।

তাঁহার ও অপর কয়েকজন কর্মীর আপ্রাণ সেবায় ও যত্নে নলিনী সে যাত্রা বাঁচিয়া উঠেন।

নলিনী বাগচীর যুদ্ধ

নলিনী কিছুটা সুস্থ হইবামাত্র ঢাকার সমিতির দুরবস্থার সংবাদ শুনিয়া অবিলম্বে ঢাকা যাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠেন। তখন সতীশ পাক্‌ড়াশী মহাশয়ও বাহিরে ছিলেন না। তিনি দীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল আত্মগোপন করিয়া থাকিবার পর ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। কাজেই অসুস্থতা সত্ত্বেও নলিনী নিজেই পলাইয়া ঢাকায় উপস্থিত হন এবং ঢাকার ফল্‌তাবাজারের এক বাড়ীতে গোপনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঢাকার পুলিস কোন প্রকারে এই সংবাদ অবগত হয়। একদিন শেষরাত্রিতে পুলিস সেই বাড়ীটি ঘিরিয়া ফেলে। নলিনী ও তাঁহার সঙ্গী তারিণী মজুমদার বুঝিলেন, বাড়ীর মধ্যে বসিয়া থাকিলে গ্রেপ্তার এড়ানো অসম্ভব। কাজেই তাঁহারা পলায়নের শেষ চেষ্টা করিবার সিদ্ধান্ত করেন। ভোর হইলে দরজা খুলিয়া বাহির হইবামাত্র তাঁহারা একটি হাবিলদারের দিকে গুলি ছুঁড়িয়া দ্রুত পলায়নের চেষ্টা করেন। হাবিলদার ধরাশায়ী হয়, কিন্তু অসংখ্য পুলিস রাইফেল হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষণ করিতে থাকে। তারিণীর গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। পলায়ন অসম্ভব বুঝিয়া নলিনী ঘরে ফিরিয়া যান এবং জানালা দিয়া গোয়েন্দা-ইনস্‌পেকটরকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করেন, ইনস্‌পেকটর ধরাশায়ী হয়। এই সময় ঘরের মধ্যে থাকিয়া নলিনী পুলিসের সহিত কিছুক্ষণ যুদ্ধ চালান। অবশেষে পুলিসদল রাইফেল হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়িয়া কাঠের দরজা ভাঙিয়া ফেলে এবং গুলি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে ঘরে প্রবেশ করে। তখন নলিনীর সর্বাঙ্গ গুলিবিদ্ধ, প্রচুর রক্তপাতের ফলে তাঁহার দেহ অবশ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার হাতের মুঠার মধ্যে মশার পিস্তল, কিন্তু উহা চালাইবার শক্তি নাই। পুলিস তাঁহাকে প্রায় মূর্ছিত অবস্থায় ধরাধরি করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া নেয়। হাসপাতালে যখন অর্ধচেতন অবস্থায় নলিনী জীবনের শেষ মুহূর্তে আসিয়া পৌঁছিতেছিলেন, তখন গোয়েন্দারা অসংখ্য প্রশ্নবাণে তাঁহাকে জর্জরিত করিতেছিল। নলিনী জীবনের শেষ মুহূর্তেও অখ্যাত, অজ্ঞাত থাকিতে বদ্ধপরিকর। মৃত্যুপথযাত্রী নলিনীর এক উত্তর—"Let me die peacefully" (আমাকে শান্তিতে মরিতে দাও)। কয়েক মুহূর্ত পরেই নলিনী ভারতের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে অম্লান স্বাক্ষর রাখিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।[১]

বিপ্লবীদের অস্ত্র সরবরাহ

বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন তথ্য ও অনুসন্ধানের ফলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব পর্যন্ত বাঙলাদেশের সন্ত্রাসবাদী

১। সতীশ পাক্‌ড়াশীর 'অগ্নিদিনের কথা' নামক পুস্তক হইতে তথ্যসমূহ সংগৃহীত, পৃঃ ৭৮।

বিপ্লবীরা তাঁহাদের প্রয়োজনীয় আগ্নেয়াস্ত্রের সরবরাহের জন্য ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগরের উপর নির্ভর করিতেন। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর অস্ত্র সরবরাহের এই প্রধান ঘাঁটি বন্ধ হইয়া যায়।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলাদেশে প্রথম গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই বিপ্লবীরা যথেষ্ট সংখ্যায় আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। তাঁহারা পার্শ্ববর্তী ফরাসী উপনিবেশকেই অস্ত্র সংগ্রহের প্রধান ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিবার সিদ্ধান্ত করেন। ইহার কারণ ছিল এই যে, প্রথমত, ফরাসী দেশে তখন আগ্নেয়াস্ত্রের উপর কোন বাধা-নিষেধ ছিল না এবং সেখান হইতে ঐ দেশের উপনিবেশসমূহে অবাধে অস্ত্র আমদানি করা সম্ভব হইত; দ্বিতীয়ত, চন্দননগরের ফরাসী শাসনকর্তারা ভারতের বৃটিশ শাসনকর্তাদের মত এই বিষয়ে প্রথম দিকে তেমন সতর্ক ছিল না।

যতদূর জানা যায়, কলিকাতার যুগান্তর সমিতির বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দই সর্বপ্রথম চন্দননগরকে আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহের ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। যুগান্তর সমিতির বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও অবিনাশ ভট্টাচার্য উভয়ে মিলিয়া চন্দননগর-নিবাসী কিশোরীমোহন সাঁপুই নামক এক ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করেন। কিশোরী ছিলেন বারীন্দ্র ও অবিনাশের বন্ধু এবং এক উকিলের মুহুরী। কিশোরী বারীন্দ্র ও অবিনাশের পরামর্শে ফরাসীদেশ হইতে রিভলভার প্রভৃতি অস্ত্র আমদানি করিয়া তাহা বারীন্দ্র ও অবিনাশের হস্তে অর্পণ করিতেন। এই সময় চন্দননগরে কোন অস্ত্র-আইন ছিল না। এইভাবে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য সময় পর্যন্ত অস্ত্র সংগ্রহের কাজ চলিতে থাকে। কিন্তু এই সময় কোন কারণে এই অস্ত্র সরবরাহের সংবাদ বাঙলাদেশের পুলিস জানিয়া ফেলে এবং এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য একজন পুলিস কর্মচারীকে নিযুক্ত করে। উক্ত পুলিস কর্মচারীটি চন্দননগরের ফরাসী সরকারের সাহায্যে অনুসন্ধান করিয়া যে সকল তথ্য সংগ্রহ করে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:

"১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কেবলমাত্র দুইটি বন্দুক ও ছয়টি রিভলভার চন্দননগরের অধিবাসীদের দ্বারা আমদানি করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধেই 'সেণ্ট এতিন' নামক ফরাসীদেশের সরকারী অস্ত্র-কারখানা হইতে চৌত্রিশটি রেজেষ্ট্রি-করা পার্শেল আসে। এই পার্শেলগুলির মধ্যে সম্ভবত কেবল রিভলভারই ছিল। ইহাদের মধ্যে বাইশটি পার্শেল আসে কিশোরীমোহন সাঁপুই নামক এক ব্যক্তির নামে। কিশোরী ষোলটি পার্শেল লইয়া যায়, কিন্তু এই সময় চন্দননগরেও অস্ত্র-আইন প্রয়োগ করা সম্পর্কে কথাবার্তা চলিতেছিল বলিয়াই সম্ভবত বাকী ছয়টি পার্শেল সে লইতে আসে নাই। সুতরাং ঐ ছয়টি পার্শেল ফরাসীদেশে প্রেরকের নিকট ফেরৎ দেওয়া হয়। কিছুদিন পর কিশোরীমোহনের নামেই আরও পার্শেল আসে। উক্ত পুলিস কর্মচারীটি তাহার মধ্যে উনিশটি পার্শেল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে যে, পার্শেলগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই রিভলভার রহিয়াছে।......

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরের শাসনকর্তা কিশোরীকে ডাকিয়া জানিতে চাহেন, ঐ রিভলভারগুলি কেন তিনি আমদানি করিয়াছেন আর কাহাকেই বা উহা দিয়াছেন। প্রথমে তিনি রিভলভারের কথা অস্বীকার করিয়া বলেন যে, ঐ পার্শেলগুলির মধ্যে কেবলমাত্র কতকগুলি ঘড়ি ছিল। কিন্তু যখন কালেকটর সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি স্বীকার করেন যে, পার্শেলগুলির মধ্যে পনেরটি রিভলভার ছিল এবং সেগুলি তিনি তাঁহার বন্ধুদের দিয়াছেন। কিন্তু তিনি কাহারও নাম প্রকাশ করেন নাই। আমরা আরও তদন্ত করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, তিনি শেষবারের রিভলভারগুলি হইতে চারিটি মানিকতলা বাগানের (যুগান্তর সমিতির) বারীন্দ্র ঘোষ ও অবিনাশ ভট্টাচার্যের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এক বন্ধু বনবিহারী মণ্ডলের মারফতই তিনি উহা তাঁহাদের দিয়াছিলেন। এই সময় বারীন্দ্র ও অবিনাশ প্রায়ই চন্দননগর আসিতেন।"[১]

বলা বাহুল্য, কেবল যুগান্তর সমিতিই নহে, অনুশীলন প্রভৃতি অন্যান্য সমিতিও কিশোরীমোহনের মত গোপন দালালদের নিকট হইতে প্রচুর সংখ্যায় অস্ত্র সংগ্রহ করিত এবং চন্দননগরই ছিল এই দালালদের অস্ত্র সংগ্রহের প্রধান ঘাঁটি। এই সকল তথ্য জানিতে পারিয়া ভারত সরকারের প্ররোচনায় চন্দননগর সরকার চন্দননগরে অস্ত্র ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি অস্ত্র-আইন প্রয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু এই আইনকে চন্দননগরের অধিবাসীদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ মনে করিয়া ফরাসী সরকার ইহা সমর্থন করে নাই। সুতরাং ফরাসীদেশ হইতে চন্দননগরে অস্ত্র আমদানি অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে এবং বিপ্লবীরাও দালালদের নিকট হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করিতে থাকেন। অস্ত্র সরবরাহের এই ঘাঁটি মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র বন্ধ হইয়া যায়।

বিপ্লবীদের পক্ষে এইভাবে অধিকসংখ্যায় অস্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হইত না, কারণ এক একটি রিভলবারের জন্য দালালদিগকে প্রচুর অর্থ দিতে হইত। এইভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া একটা ব্যাপক অভ্যুত্থান আরম্ভ করা অসম্ভব ছিল। এইজন্য বিপ্লবীরা প্রথমত ও প্রধানত গুপ্তহত্যার উপরেই বেশী জোর দিতেন। দ্বিতীয়ত, তাঁহারা কলিকাতার অস্ত্রের দোকান ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত লোকদের বাড়ী চুরি-ডাকাতি করিয়া অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করিতেন। কলিকাতার 'রডা' কোম্পানি হইতে মশার পিস্তল ও ছেচল্লিশ হাজার কার্তুজ চুরি এই প্রচেষ্টারই ফল।

অস্ত্রের অভাবে বিপ্লবীরা প্রধানত ডাকাতি ও গুপ্তহত্যার মধ্যে তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ রাখিলেও ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থানই ছিল তাহাদের চরম লক্ষ্য। এই চরম লক্ষ্য সাধনের উপায় হিসাবে তাঁহারা কোন কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের নিকট হইতে অস্ত্র-সাহায্য লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরেই বিদেশ হইতে প্রচুর অস্ত্র-সাহায্য লাভের চেষ্টা বিশেষভাবে আরম্ভ হয় এবং সেই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাও রচিত

১। 'Sedition Committee Report, p. 91.

হয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জার্মান সরকারের নিকট হইতে অস্ত্র-সাহায্য লাভ ও ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রচেষ্টাই ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে "ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র" নামে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। এই প্রচেষ্টায় বাঙলাদেশের বিপ্লবীরাই প্রধান অংশ গ্রহণ করিলেও ইহা ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রচেষ্টা পৃথকভাবে পরবর্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইল।

অষ্টম অধ্যায়

বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্লব প্রচেষ্টা

"ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র"

প্রথম পর্ব

ষড়যন্ত্রের সূচনা

প্রথম হইতেই ভারতের মধ্যশ্রেণীর বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা, বিপ্লবীদের অতুলনীয় সাহস ও বুদ্ধি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। বিপ্লবীরা তাঁহাদের সাহস ও আত্ম-ত্যাগের জন্য পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের শ্রদ্ধা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা আলিপুর জেলের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোস্বামীর হত্যার সংবাদ শুনিয়া ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরীর তৎকালীন সোস্যালিস্ট দলের মুখপত্র 'হিউমানিতে' (Humanite) পত্রিকা নাকি বাঙলার বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া লিখিয়াছিল, "ভারতীয় বিপ্লবীরা যে প্রকারে শত্রুপুরীর ভিতর থাকিয়াও রক্ষিবেষ্টিত বিশ্বাসঘাতক স্বজাতিদ্রোহীকে শাস্তি দিয়াছে, তাহা জগতের বৈপ্লবিক ইতিহাসে প্রথম।"[১]

ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্মপ্রচেষ্টা বৃটিশ-বিরোধী জার্মানদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহারা তখন বৃটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত। জার্মান-সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহস ও বুদ্ধিতে মুগ্ধ হইয়া বৃটিশশক্তিকে চূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদের ব্যবহার করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান-গ্রন্থকার বার্ণহার্ডি-রচিত 'জার্মানী ও পরবর্তী যুদ্ধ' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বার্ণহার্ডি—

"এই আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, স্পষ্ট বৈপ্লবিক ও জাতীয়তাবাদী মনোভাব-সম্পন্ন বাঙালী হিন্দু-জনসাধারণ সারা ভারতের মুসলমান-জনসাধারণের সহিত মিলিত হইতে পারে এবং ইহাদের সহযোগিতায় এমন একটা ভয়ংকর বিপদ সৃষ্টি হইবে যাহা ইংলণ্ডের বিশ্বব্যাপী প্রভাবের মূল পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিবে।"[২]

১। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃঃ ৬০।

২। 'Sedition Committee Report', p. 119.

জার্মান-সাম্রাজ্যবাদীরা বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ করিয়া সমগ্র বিশ্বে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই যে ভারতের জনগণের বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতীয় বিপ্লবীরা তাহা বুঝিয়াও জার্মানদের সাহায্যে ভারতের বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য আয়োজন আরম্ভ করে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব হইতেই ভারতীয় বিপ্লবীদের সেই আয়োজন আরম্ভ হইয়াছিল। য়ুরোপ-প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে জার্মেনীর যুদ্ধ আসন্ন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে হরদয়াল নামক একজন পাঞ্জাবী ছাত্র ইংলণ্ডে পড়িতে যাইয়া প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহাদের নিকট বিপ্লববাদে দীক্ষা লাভ করেন। বৈদেশিক সাহায্যে ভারতে বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্য লইয়া হরদয়াল ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগমন করেন এবং প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সহযোগিতায় আমেরিকায় 'গদর সমিতি' নামে একটি বৈপ্লবিক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ই তিনি জার্মানদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় জার্মেনীর সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার বৃটিশ-বিরোধী বৈপ্লবিক প্রচারের জন্য মার্কিন সরকারের রোষ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়া আমেরিকা হইতে পলায়ন করেন এবং জার্মেনীর রাজধানী বার্লিন নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হন।[১]

ইতিপূর্বে সুইজারল্যাণ্ডেও 'আন্তর্জাতিক ভারত-কমিটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল। চম্পকরমন পিল্লাই নামক এক মাদ্রাজী যুবক ছিলেন উহার সভাপতি। জার্মেনীতে যাইয়া বৃটিশ-বিরোধী প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি বার্লিনে উপস্থিত হন এবং হরদয়াল, তারকনাথ দাস, বরকতুল্লা, চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী ও হেরম্বলাল গুপ্ত—এই পাঁচ জন প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীর সহযোগিতায় বার্লিনে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পরে আসিয়া ইহাদের সহিত যোগদান করেন। এই প্রতিষ্ঠান জার্মান সামরিক দপ্তরের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া কার্য পরিচালনা করিতে থাকে।

'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি'র সভ্যগণ প্রথম দিকে কেবলমাত্র বৃটিশ-বিরোধী সাহিত্য ও পত্রিকা ছাপাইয়া চারিদিকে প্রচার করিতেন। তাহার পর যুদ্ধ যতই জোরালো হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপও ততই বাড়িয়া যায়। এই সময় জার্মান-বাহিনী যে সকল বৃটিশ সৈন্য বন্দী করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বহু ভারতীয় সৈন্যও ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রচার-কার্য চালাইবার ভার পড়ে বরকতুল্লার উপর। ভারতের নিকটবর্তী শ্যামদেশের রাজধানী ব্যাঙ্কক শহরে একটি বৈপ্লবিক কেন্দ্র স্থাপন এবং

১। হরদয়াল ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গদর সমিতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শ্যাম-ব্রহ্ম-সীমান্ত দিয়া ভারতবর্ষে যুদ্ধের সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিবার ভার গ্রহণ করেন পিল্লাই স্বয়ং। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক ব্যক্তিকে আমেরিকার পথে ব্যাঙ্কক শহরে প্রেরণ করেন। হেরম্বলাল গুপ্ত গেলেন আমেরিকায়। সেখানে যাইয়া তিনি বোয়েন নামক এক জার্মান সামরিক কর্মচারীর সহিত ব্যবস্থা করেন যে, বোয়েন ব্যাঙ্কক শহরে যাইয়া সামরিক শিক্ষা দিয়া একটি সৈন্যদল তৈরি করিবেন, তারপর সেই সৈন্যদল লইয়া তিনি ব্রহ্মদেশের উপর আক্রমণ করিবেন। এই ব্যবস্থা করিয়া হেরম্ব অন্য কাজে চলিয়া গেলে চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী তাঁহার স্থান গ্রহণ করেন।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা

জার্মান সামরিক বিভাগের সহযোগিতায় ভারতীয় বিপ্লবীদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সাংগঠনিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া তুলিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে ভারতের বাহিরে পূর্ব-এশিয়ায় দুইটি সংগঠন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় শ্যামদেশের রাজধানী ব্যাঙ্কক শহরে, অপর কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্দোনেশিয়ার বাটাভিয়া শহরে। ব্যাঙ্কক হইতে আমেরিকার গদর সমিতির সহিত এবং বাটাভিয়া হইতে বাঙলাদেশের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা হয়। চীনের সাংহাই নগরীতে অবস্থিত জার্মান-দূতাবাসের সহিত উভয় কেন্দ্রের বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। সাংহাইয়ের জার্মান দূত আমেরিকার ওয়াশিংটন নগরীর জার্মান-দূতের মারফত বার্লিনের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে থাকেন। প্রবাসী বিপ্লবীরা এইভাবে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া এবার ভারতের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে অগ্রসর হন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিষ্ণুগণেশ পিংলে নামক এক মারাঠী যুবক ও সত্যেন্দ্রনাথ সেন নামক একজন বাঙালী যুবক আমেরিকা হইতে জাহাজযোগে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। পশ্চিম-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে পিংলে যান পশ্চিম-ভারতে, আর সত্যেন্দ্রনাথ বাঙলার বিপ্লবীদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। সত্যেন্দ্রনাথ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পূর্ব-এশিয়ায় ঘাঁটি স্থাপন ও ভারতীয়দের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় জার্মান-সাহায্য লাভের সংবাদ যতীন্দ্রনাথকে জ্ঞাপন করেন।

এইভাবে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা যখন ভারতের বাহিরে সাংগঠনিক আয়োজন শেষ করিয়া ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, তাহার পূর্ব হইতেই বাঙলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লবীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা লইয়া ব্যাপকভাবে কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা খোঁজ লইলেন, কোন্ জেলায় কত বন্দুক-রিভলভার আছে, কোথায় কোথায় সরকারী ট্রেজারী ও অস্ত্রাগার আছে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কত সৈন্য বিপ্লবীদের সহায়তা করিবে, কোথায় পুল উড়াইয়া দিয়া সৈন্যচলাচল-ব্যবস্থা

বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতে হইবে, ইত্যাদি। ঢাকার বিপ্লবীরা পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের সাহায্যে ঢাকায় অবস্থিত শিখ সৈন্যদের সাহায্য লাভের চেষ্টা করিতে থাকেন। ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও ফরিদপুর জেলার বিপ্লবী যুবকেরা গোপনে দ্রুত সামরিক শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন, জেলায় জেলায় বন্দুক-রিভলভার চুরি হইতে থাকে। ঠিক এই সময়, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে, 'রডা' কোম্পানীর ৫০টি মশার পিস্তল ও ৪৬ হাজার কার্তুজ চুরি হয়। এই সময় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে ও নেতৃত্বে পশ্চিম-বঙ্গের যুগান্তর সমিতির নেতৃবৃন্দ ব্যাপকভাবে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় দুইটি "ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান" স্থাপন করেন। ইহাদের একটি হইল 'শ্রমজীবী সমবায়' নামে একটি কাপড়ের দোকান ও অপরটি হইল 'হ্যারি এণ্ড সন্‌স্' নামে বিবিধ পণ্য-সরবরাহের প্রতিষ্ঠান। প্রথমটি পরিচালনা করিতেন রামচন্দ্র মজুমদার ও অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অপরটির নাম পশ্চিম-বঙ্গের বিখ্যাত বিপ্লবী ও যতীন্দ্রনাথের সহকর্মী হরিকুমার চক্রবর্তীর নাম অনুসারে 'হ্যারি এণ্ড সন্‌স্' রাখা হইয়াছিল এবং তিনিই ইহার কার্য পরিচালনা করিতেন। বালেশ্বরে 'যুনিভার্সাল এম্পোরিয়াম' নামে 'হ্যারি এণ্ড সন্‌স্'-এর একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতার উক্ত দুইটি "ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান" ও বালেশ্বরের 'যুনিভার্সাল এম্পোরিয়াম' ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

এদিকে ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা ও জার্মান-সাহায্য লাভের সম্ভাবনার সংবাদ পাইয়া উল্লসিত হইয়া উঠেন এবং বাহিরের প্রচেষ্টার সহিত নিজেদের প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন করিয়া জার্মান-অস্ত্রের সাহায্যে অবিলম্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহারা বৈদেশিক সাহায্যের পরিকল্পনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখেন। তাঁহাদের মনে এই সন্দেহ দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, হয়ত জার্মানদের এই অস্ত্র-সাহায্যের পিছনে তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত আছে। তাই তাঁহারা বিশেষ সতর্কতার সহিত জার্মান-সাহায্যের শর্তসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখেন। এই সকল শর্ত সম্পর্কে 'সিডিসন কমিটি'র রিপোর্টে কোন উল্লেখ না থাকিলেও তাঁহারা ইহা অনুমান করেন যে, প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা যখন বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদ করিবার জন্য জার্মেনীর নিকট হইতে অস্ত্র-সাহায্য গ্রহণে সম্মতি দেন, তখন তাঁহারা নিশ্চয়ই কোন শর্ত আরোপ করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহারা জানিতেন যে, সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য লইয়াই জার্মানরা ভারতীয়-বিপ্লবীদের অস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতেছে। 'সিডিসন কমিটি' প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের জার্মান-গুপ্তচর বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মেনীর সাম্রাজ্য-বিস্তারের যন্ত্র হিসাবে চালিত হন নাই, তাঁহারা জার্মানদের নিকট হইতে অস্ত্র-সাহায্য লইয়া বৈপ্লবিক উপায়ে ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্যই পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

তৎকালীন বিপ্লব-প্রচেষ্টা ও "ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র"-এর অন্যতম নায়ক ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকাসংবলিত 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যুদ্ধের

ইতিহাস' নামক গ্রন্থে শ্রীসুকুমার রায় জার্মেনীর অস্ত্র-সাহায্য গ্রহণের এই সকল শর্ত উল্লেখ করিয়াছেন :

"বিপ্লবীরা জার্মান-গভর্নমেন্টের নিকট হইতে একটি জাতীয় ঋণ গ্রহণ করিবে। শর্তথাক্তে বলা হয় যে, ভারত স্বাধীন হইলে তাহা পরিশোধ করা হইবে। জার্মান সামরিক শক্তির ভারতে প্রবেশাধিকার থাকিবে না। স্বাধীন ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতেই থাকিবে।" "কোন জার্মান-বাহিনী ভারতে আসিবে না বলিয়া শর্তাবলীর মধ্যে উল্লেখ ছিল। কেবল অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া এবং বাঙলার বিপ্লবীদের শিক্ষার জন্য জার্মান সমর-বিশেষজ্ঞ দিয়া জার্মেনী ভারতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবে।"[১]

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে পশ্চিম-বঙ্গের বিপ্লবীদের এক পরামর্শ-বৈঠক বসে। এই বৈঠকেই জার্মেনীর অস্ত্র-সাহায্যের উপর ভিত্তি করিয়া ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়। জার্মেনীর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ককের বিপ্লবীদের সহিত সম্পর্ক স্থাপনেরও ব্যবস্থা হয়। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অবিলম্বে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই বিপ্লবীরা জার্মেনী হইতে অর্থ-সাহায্য আসিয়া পৌঁছিবার অপেক্ষায় না থাকিয়া নিজেরাই ডাকাতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে ১১ই জানুয়ারী বেলিয়াঘাটায় ও ২২শে ফেব্রুয়ারী গার্ডেনরিচ-এ ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা মোট ৪০ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন।

অভ্যুত্থানের আয়োজন

উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুসারে ব্যাঙ্ককের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে ব্যাঙ্কক-এ প্রেরণ করা হয়। মার্চ মাসে জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ি নামক এক ব্যক্তি সংবাদ লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন যে, জার্মানরা বাটাভিয়ার পথে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, কাজেই বাঙলার বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা কর্তব্য। এই সংবাদে যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিপ্লবীরা পরামর্শ করিয়া বাটাভিয়া গিয়া জার্মানদের সহিত ব্যবস্থা করিবার জন্য নরেন ভট্টাচার্যকে[২] প্রেরণ করেন। নরেন্দ্রনাথ 'সি. মার্টিন' নাম গ্রহণ করিয়া এপ্রিল মাসে বাটাভিয়া যাত্রা করেন। এই সম্পর্কে ঐ মাসেই অবনী মুখার্জিকেও জাপানে প্রেরণ করা হয়। এই সময় বেলিয়াঘাটা ও গার্ডেনরিচ-এর ডাকাতি সম্পর্কে যতীন মুখার্জিকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিস সারা বাঙলাদেশ তোলপাড় করিয়া তোলে। এই অবস্থায় বাঙলাদেশে থাকা নিরাপদ নয় মনে করিয়া যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরে গিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকেন। বাঙলার বিপ্লবীরা যখন তাঁহাদের পরিকল্পনা

১। সুকুমার রায় : ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস, ১১২-১৩ পৃঃ।
২। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—ইনি পরবর্তীকালে 'এম. এন. রায়' নাম গ্রহণ করেন।

কার্যে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা আরম্ভ করেন, তখন অপর দিকে আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যের 'সান পেড্রো' নামক বন্দর হইতে 'এস. এস. ম্যাভারিক' নামক একখানি জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বাঙলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

এদিকে 'মার্টিন নামধারী নরেন্দ্রনাথ বাটাভিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হন। বাটাভিয়ার জার্মান-কন্সাল তাঁহাকে থিয়োডোর হেল্‌ফেরিখ্‌ নামক একজন জার্মানের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। হেল্‌ফেরিখ্‌ তাঁহাকে সংবাদ দেন যে, ভারতবর্ষের বিপ্লবে সাহায্য করিবার জন্য একটি জাহাজ অস্ত্র ও গোলাবারুদ লইয়া করাচীর দিকে আসিতেছে। এই অস্ত্র-বোঝাই জাহাজখানি যাহাতে করাচী না গিয়া বাঙলাদেশে আসে তাহার জন্য 'মার্টিন' চেষ্টা করেন। অবশেষে সাংহাই-এর জার্মান-কন্সাল সম্মতি দিলে জাহাজখানিকে বাঙলাদেশে প্রেরণ করাই স্থির হয়। 'মার্টিন'-এর অনুরোধে স্থির হয় যে, জাহাজখানি সুন্দরবন অঞ্চলের রায়মঙ্গল নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং সেইস্থান হইতে বিপ্লবীরা জাহাজ হইতে অস্ত্র ও গোলা-গুলি নামাইয়া লইবে। 'মার্টিন' অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত কলিকাতায় 'হ্যারি এণ্ড সনস্‌' কোম্পানির নিকট টেলিগ্রাম করিয়া এই ভাষায় জানাইয়া দেন, "ব্যবসায়ের সংবাদ খুবই সন্তোষজনক।" ইহার উত্তরে জুন মাসের প্রথম দিকে হ্যারি এণ্ড সনস্‌ হইতে 'মার্টিন'কে অবিলম্বে টাকার ব্যবস্থা করিবার জন্য টেলিগ্রাম করা হয়। ইহার পর বাটাভিয়ার হেল্‌ফেরিখ্‌-এর নিকট হইতে জুন ও আগস্ট মাসের মধ্যে 'হ্যারি এণ্ড সনস্‌'-এর নামে মোট ৪৫ হাজার টাকা পাঠান হয়। ইহার মধ্যে মোট ৩৩ হাজার টাকা বিপ্লবীদের হস্তগত হয় এবং বাকী টাকা পুলিস সন্দেহবশে আটক করে।

এই সকল ব্যবস্থা করিয়া 'মার্টিন' জুন মাসের মাঝামাঝি বাঙলাদেশে ফিরিয়া আসেন। 'মার্টিন' ফিরিয়া আসিবার পর অস্ত্র প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়া যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা অভ্যুত্থানের সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার জন্য এক বৈঠকে মিলিত হন। এই ঐতিহাসিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ('মার্টিন'), ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ও অতুল ঘোষ। এই বৈঠকে 'ম্যাভারিক' জাহাজ হইতে অস্ত্র ও গোলা-গুলি নামাইয়া লইবার পরিকল্পনা তৈরী হয়। 'ম্যাভারিক' জাহাজে আসিবার কথা ছিল ৩০ হাজার রাইফেল, প্রত্যেক রাইফেলের জন্য ৪ শত রাউণ্ড করিয়া কার্তুজ (মোট এক লক্ষ বিশ হাজার কার্তুজ) এবং ২ লক্ষ টাকা। এই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলা-গুলি গোপনে জাহাজ হইতে নামাইয়া লওয়া অতি কঠিন কাজ, সুতরাং ইহার জন্য ভাল ব্যবস্থা চাই। এই কঠিন কাজটির ভার পড়ে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ও অতুল ঘোষের উপর। তাঁহারা অস্ত্র ও গোলা-গুলি জাহাজ হইতে নামাইয়া নিম্নোক্ত কেন্দ্রগুলিতে ভাগ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করেন :

(১) নোয়াখালির দক্ষিণে হাতিয়া (সন্দীপ)—এখানে বরিশালের বিপ্লবীরা এই অস্ত্র-গুলি বুঝিয়া লইবেন এবং পূর্ব-বঙ্গের সকল জেলার বিপ্লবীদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবেন।

(২) কলিকাতা,

(৩) বালেশ্বর।

যতীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য বিপ্লবী নায়কগণ পরামর্শ করিয়া এইভাবে অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি তৈরি করিলেন :

বাঙলাদেশে সরকারের সৈন্যবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বেশী নহে, সুতরাং সরকারের সামরিক শক্তি উচ্ছেদ করিবার পক্ষে বিপ্লবীদের শক্তিই যথেষ্ট। কিন্তু অভ্যুত্থান আরম্ভ হইবামাত্র বাঙলার বাহির হইতে ইংরেজেরা নিশ্চয়ই আরও সৈন্য পাঠাইবে। এই আশঙ্কা করিয়াই বিপ্লবের নায়কগণ সৈন্য-চলাচলের পথ বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে বাঙলাদেশের তিনটি প্রধান রেলপথ বন্ধ করা প্রয়োজন, রেলপথের উপর বড় বড় পুলগুলি উড়াইয়া দিলেই রেলপথগুলি অচল হইয়া যাইবে। স্থির হইল, স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া 'মাদ্রাজ রেলপথ' অচল করিয়া দিবেন ; চক্রধরপুরে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ বন্ধ করিবেন ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, আর সতীশ চক্রবর্তী 'অজয়' নামক স্থানে গিয়া 'ইস্ট-ইণ্ডিয়া-রেলপথ'-এর প্রধান পুলটি উড়াইয়া দিবেন। নরেন্দ্র চৌধুরী ও ফণীন্দ্র চক্রবর্তী হাতিয়ায় গিয়া একটি বাহিনী তৈরি করিবেন, সেই বাহিনী প্রথমে পূর্ব-বঙ্গের জেলাগুলিকে মুক্ত করিবে এবং পরে তাঁহারা সেই বাহিনী লইয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইবেন। কলিকাতার বিপ্লবীদের নেতৃত্ব করিবেন নরেন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। তাঁহারা প্রথমে কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী স্থানের অস্ত্রশস্ত্র ও অস্ত্রাগারগুলি দখল করিয়া পরে 'ফোর্ট উইলিয়াম' দুর্গটি দখল করিবেন, তাহার পর কলিকাতা অধিকার করিবেন। আর 'ম্যাভারিক' জাহাজে যে সকল উচ্চপদস্থ জার্মান সামরিক কর্মচারী আসিতেছেন তাঁহারা পূর্ব-বঙ্গে থাকিবেন এবং একটি সৈন্যবাহিনী তৈরি করিয়া তাহাদের সামরিক শিক্ষা দিবেন।

ইতিমধ্যে 'ম্যাভারিক' জাহাজ হইতে অস্ত্র নামানো সম্পর্কে পূর্ব-পরিকল্পনার কিছু পরিবর্তন করা হয়। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় অন্য কাজে চলিয়া যান এবং এই কাজের ভার পড়ে যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উপর। তিনি রায়মঙ্গলের এক জমিদারের সাহায্যলাভের ব্যবস্থা করেন। এই জমিদার এই উদ্দেশ্যে লোকজন ও আলোর ব্যবস্থা করিতে স্বীকৃত হন। 'ম্যাভারিক' জাহাজটির রাত্রিকালে রায়মঙ্গল পৌঁছিয়া আলোর সংকেত করিবার কথা ছিল। ইহা স্থির হইয়াছিল যে, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে অস্ত্রগুলি বিলি করা আরম্ভ হইবে। জাহাজ জুন মাসের শেষ সপ্তাহে আসিয়া পৌঁছিবার কথা। সুতরাং অতুল ঘোষের নেতৃত্বে একদল লোক রায়মঙ্গল হইতে নৌকায় করিয়া সমুদ্রের দিকে আগাইয়া যায়। তাহারা সেখানে দশ দিন অপেক্ষা করে, কিন্তু জাহাজ আসিল না। জুন মাস শেষ হইয়া গেল, কিন্তু 'ম্যাভারিক' জাহাজের কোন সন্ধান মিলিল না, এমন কি এই বিলম্বের জন্য বাটাভিয়া হইতেও কোন সংবাদ আসিল না।

'ম্যাভারিক' জাহাজ আসিল না, কিন্তু ৩রা জুলাই ব্যাঙ্কক হইতে এক বাঙালী যুবক

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই বাঙালী যুবকটি ব্যাঙ্ককের আত্মারাম নামক এক পাঞ্জাবী বিপ্লবীর নিকট হইতে সংবাদ লইয়া আসেন যে, শ্যামের জার্মান কনসাল নৌকায় করিয়া ৫ হাজার রাইফেল ও উহার কার্তুজ এবং এক লক্ষ টাকা রায়মঙ্গলে পাঠাইতেছেন। কলিকাতার বিপ্লবীরা ভাবিলেন যে, 'ম্যাভারিক' জাহাজের পরিবর্তেই এই ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহারা ঐ বাঙালী যুবকটির মারফত ব্যাঙ্কক-এ সংবাদ দেন যে, মূল পরিকল্পনার যেন পরিবর্তন করা না হয় এবং 'ম্যাভারিক' জাহাজের অবশিষ্ট অস্ত্র যেন রায়মঙ্গলের পরিবর্তে বঙ্গোপসাগরের সন্দ্বীপের হাতিয়া ও বালেশ্বরে অথবা ভারতের পশ্চিম উপকূলের গোকর্ণী নামক স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু অকস্মাৎ পুলিস রায়মঙ্গলে অস্ত্র আসিবার সংবাদ জানিয়া ফেলে।

জুলাই মাসে পুলিস জানিয়া ফেলে যে, বিদেশ হইতে বহু অস্ত্র রায়মঙ্গলে আসিয়া পৌঁছিতেছে। তাহারা অবিলম্বে রায়মঙ্গল অঞ্চলে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে এবং ঐ সংবাদের সূত্র ধরিয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করে। ৭ই আগস্ট পুলিস 'হ্যারি এণ্ড সন্‌স্'-এর দোকানে খানাতল্লাস করিয়া কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে এবং কয়েকটি মূল্যবান গোপন সংবাদ জানিয়া ফেলে। এই দুর্ঘটনায় বিপ্লবীরাও সতর্ক হইয়া যান। কলিকাতা হইতে বাটাভিয়ায় সংবাদ প্রেরণ করা বিপজ্জনক বুঝিয়া এক ব্যক্তি বোম্বাই গিয়া ১৩ই আগস্ট সেখান হইতে বাটাভিয়ায় টেলিগ্রাম পাঠাইয়া হেল্‌ফেরিখ্‌কে সতর্ক করিয়া দেন। এই নূতন পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য ১৫ই আগস্ট নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ('মার্টিন') অপর এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া বাটাভিয়া যাত্রা করেন।

বুড়ীবালামের যুদ্ধ

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পরিকল্পনা অনুসারে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং 'মাদ্রাজ-রেলপথ' অচল করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়া বালেশ্বর চলিয়া আসিয়াছিলেন। বালেশ্বরের যেখানে মহানদী বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে, মহানদীর সেই মোহনার নিকটবর্তী 'কাপ্তিপোদা' নামক স্থানের সন্নিকটস্থ এক জঙ্গলে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া তিনি অস্ত্র-বোঝাই জার্মান-জাহাজের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এদিকে কলিকাতায় যে সকল ঘটনা ঘটে তাহা কিছুই জানিতে পারেন নাই।

কলিকাতায় 'হ্যারি এণ্ড সন্‌স্'-এর দোকান খানাতল্লাস করিয়া পুলিস উক্ত কোম্পানির বালেশ্বর-শাখা 'য়ুনিভার্সাল এম্পোরিয়াম'-এর সন্ধান পায়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর পুলিস 'য়ুনিভার্সাল এম্পোরিয়াম' খানাতল্লাস করিয়া কিছু কাগজপত্র হস্তগত করে। তাহারা এই সকল কাগজপত্রের মধ্যে 'কাপ্তিপোদা' নামক স্থানটির উল্লেখ দেখিতে পায়। কাপ্তিপোদা স্থানটি ছিল ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। পুলিস খোঁজ করিতে করিতে কাপ্তিপোদায় আসিয়া উপস্থিত হয়। এই স্থানে পুলিসের এত আনাগোনা দেখিয়া যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, পুলিস তাঁহাদের গোপন ঘাঁটির সন্ধান পাইয়াছে। ইহা বুঝিতে পারিয়া যতীন্দ্রনাথ তাঁহার চারিজন সঙ্গীসহ জঙ্গলের পথে বুড়ীবালাম

নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা যখন নদী পার হইতেছিলেন তখন গ্রামের চৌকিদার, দফাদার প্রভৃতিরা তাঁহাদের দেখিয়া ফেলে। তাহারা বুঝিতে পারে যে, ইহাদের খোঁজেই পুলিস ঘুরিতেছে। তাহারা গ্রামবাসীদের সাহায্যে বিপ্লবীদের ধরিবার জন্য আগাইয়া আসে। ইহার ফলে গ্রামবাসীদের সহিত বিপ্লবীদের এক খণ্ড-যুদ্ধ হয় এবং কয়েকজন গ্রামবাসী নিহত ও আহত হয়। গ্রামবাসীরা পলাইয়া গেলে বিপ্লবীরা নদী পার হইয়া জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সংবাদ পাইয়া পুলিসের একটি বিরাট দল জঙ্গল ঘিরিয়া ফেলে। যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীরা বুঝিলেন, আর পলায়নের উপায় নাই। তাঁহারা স্থির করিলেন, তাঁহারা কিছুতেই পুলিসের নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন না, বীরের মত শত্রুর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিবেন। বিপ্লবীরা সশস্ত্র পুলিস-বাহিনীর সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর। যুদ্ধক্ষেত্র—বুড়ীবালাম নদীর তীর। একদিকে বাঙলার পাঁচজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী—যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয়[১], মনোরঞ্জন, নীরেন ও জ্যোতিষ; আর অপর দিকে অগণিত সশস্ত্র পুলিস এবং একদল রাইফেলধারী অশ্বারোহী সৈন্য। এই অসমান যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে উচিত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য লইয়া বিপ্লবীরা নদী-তীরের বালুকারাশির মধ্যে এক অপূর্ব 'ট্রেঞ্চ' তৈরি করিলেন। পুলিসদল নিকটবর্তী হইবামাত্র তাঁহারা সেই ট্রেঞ্চের মধ্যে থাকিয়া শত্রুপক্ষের উপর প্রাণপণে গুলি বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। বিপ্লবীদের গুলি বর্ষণে শত্রুপক্ষের কয়েকজন ধরাশায়ী হইল। এই অভাবনীয় যুদ্ধ ও বিপ্লবীদের সাহস দেখিয়া শত্রুরাও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল। দুই পক্ষের গুলি বর্ষণ চলিল বহুক্ষণ। পুলিস ও সৈন্যদের রাইফেলের গুলিতে বিপ্লবীদের দুই জন সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন। তাঁহাদের একজন, চিত্তপ্রিয় ততক্ষণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন, আর অপর জন হইলেন বিপ্লবীদের সেনাপতি যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তাঁহার দেহ গুলির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, প্রচুর রক্তপাতের ফলে শরীর অবসন্ন। এখনও অক্ষত রহিয়াছেন তিনজন—তিনটি বালক। তিনজনে প্রাণপণে গুলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, বীরের মত প্রাণ দিবার জন্য তাঁহারা উন্মাদ হইয়া উঠিলেন। এমন সময় সেনাপতি যতীন্দ্রনাথ যুদ্ধ বন্ধ করিয়া শান্তির শ্বেত নিশান উড়াইবার আদেশ দিলেন।

ট্রেঞ্চের মধ্য হইতে একখানি শাদা কাপড় উড়াইয়া যুদ্ধ বন্ধ করিবার সংকেত জানান হইল, শত্রুপক্ষ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। পুলিসদলের অধিনায়ক জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট আগাইয়া আসিলেন। এই বীর যোদ্ধাদের দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন, টুপি খুলিয়া মৃত যোদ্ধার প্রতি সম্মান দেখাইলেন, তাহার পর তাঁহার টুপিতে করিয়া নদী হইতে জল আনিয়া আহতদের পান করাইলেন। তখন যতীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিষ ভীষণ আহত, চিত্তপ্রিয় মৃত, আর মনোরঞ্জন ও নীরেন অক্ষতই রহিয়াছেন। পরদিন,

---

১। চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী—ইনিই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হলে পুলিস-ইনস্পেকটর সুরেশ মুখার্জিকে হত্যা করিয়াছিলেন।

১০ই সেপ্টেম্বর সকালবেলা যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরের হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। যতীন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেম ও বীরত্বের অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করিয়া ভারতের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিলেন। পরে নীরেন ও মনোরঞ্জন ইংরেজ-রাজের ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ দেন, আর জ্যোতিষ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া পরে বহরমপুর জেলে উন্মাদ অবস্থায় মারা যান।

বুড়ীবালামের যুদ্ধের সময় বাঙলাদেশের ডেপুটি পুলিস-কমিশনার কুখ্যাত টেগার্ট সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি নাকি আদালতে ব্যারিস্টার জে. এন. রায়ের প্রশ্নের উত্তরে যতীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলিয়াছিলেন :

"আমাকে আমার কর্তব্য পালন করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু যতীন্দ্রনাথকে আমি শ্রদ্ধা করি। তিনিই একমাত্র বাঙালী যিনি ট্রেঞ্চের মধ্যে থাকিয়া সম্মুখ-যুদ্ধে জীবন দান করিয়াছেন।"

বিপ্লবের শেষ চেষ্টা

এদিকে 'মার্টিন' ১৫ই আগস্ট বাটাভিয়া যাত্রা করিবার পর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া কলিকাতার বিপ্লবীরা চিন্তিত হইয়া উঠেন। ২৭শে ডিসেম্বর পোর্তুগীজ উপনিবেশ গোয়া হইতে তাঁহার নিকট এই টেলিগ্রাম পাঠান হয় : "ব্যাপার কি, কোন সংবাদ নাই কেন, আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।" এই টেলিগ্রাম পাঠান হয় 'বি. চ্যাটারটন'-এর নামে। 'বি. চ্যাটারটন' হইলেন ভোলানাথ চ্যাটার্জি। পুলিসের দৃষ্টি গোয়ার উপরেও পড়িয়াছিল। তাহারা এই টেলিগ্রামের মর্ম বুঝিয়া ফেলে এবং অপর একজন বাঙালী যুবকের সহিত ভোলানাথকে গ্রেপ্তার করে। তাঁহাকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের তিন আইন অনুসারে পুণা জেলে আটক রাখা হয়।[১]

এবার 'ম্যাভারিক' জাহাজখানির রহস্য আলোচনা করা প্রয়োজন। জার্মেনীর একটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান আমেরিকার নিকট হইতে এই তৈলবাহী জাহাজখানি ক্রয় করিয়াছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল যখন ইহা সান পেড্রো বন্দর হইতে বাটাভিয়ার দিকে যাত্রা করে, তখন ইহাতে কোন অস্ত্র ছিল না, ইহার পঁচিশ জন কর্মচারীকে 'পারস্য দেশবাসী' বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইলেও তাঁহারা সকলেই ছিলেন আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন আমেরিকার গদর সমিতির পরিচালক রামচন্দ্র, তাঁহার সহিত হরি সিং নামক একজন পাঞ্জাবী বিপ্লবী গদর সমিতির বহু প্রচার-সাহিত্য লইয়া আসিতেছিলেন। 'ম্যাভারিক' জাহাজখানি আমেরিকার এক বন্দর হইয়া 'সোকোট্রা' দ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করে। পথে 'এ্যানি লারসেন' নামে আর একখানি ছোট জাহাজের সহিত উহার সাক্ষাৎ ঘটিবার কথা ছিল। প্রকৃতপক্ষে 'এ্যানি লারসেন' জাহাজেই ছিল

১। পুণা জেলে আটক থাকা কালে, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী তাঁহার মৃত্যু হয়। সরকারী ঘোষণায় 'তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন' বলিয়া প্রচার করা হইয়াছিল।

অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-গুলি। পূর্বে স্থির হইয়াছিল যে, তৈলবাহী জাহাজ 'ম্যাভারিক'-এর একটি শূন্য স্থানে অস্ত্র ও আর একটি শূন্য স্থানে গোলা-গুলি ভর্তি করিয়া ঐ শূন্য স্থান দুইটি তেল দিয়া ভরিয়া রাখা হইবে এবং এইভাবে লুকাইয়া অস্ত্র ও গোলা-গুলি ভারতে প্রেরণ করা হইবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে 'এ্যানি লারসেন'-এর সহিত ম্যাভারিক-এর সাক্ষাৎ ঘটে নাই, 'ম্যাভারিক' ইহার জন্য পথে দীর্ঘ কাল অপেক্ষা করিয়া অবশেষে হনলুলু দ্বীপ হইয়া বাটাভিয়ার দিকে যাত্রা করে। বাটাভিয়া পৌঁছিবামাত্র স্থানীয় সরকার জাহাজ খানাতল্লাস করে এবং দোষাবহ কিছু না পাইয়া উহাকে ছাড়িয়া দেয়। ইহার কিছুদিন পরেই, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষ দিকে, 'এ্যানি লারসেন' জার্মেনী হইতে অস্ত্র লইয়া মার্কিন-অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র মার্কিন-সরকার ইহা খানাতল্লাস করিয়া অস্ত্র ও গোলা-গুলি বাজেয়াপ্ত করে। ওয়াশিংটনের জার্মান-রাজদূত বহু চেষ্টা করিয়াও উহা উদ্ধার করিতে পারিলেন না।

এদিকে 'ম্যাভারিক' জাহাজখানি বাটাভিয়া পৌঁছিবামাত্র ইহার কর্মচারীরা, অর্থাৎ প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা, জাহাজ খানাতল্লাসের পূর্বেই শহরে প্রবেশ করিয়া হেল্‌ফেরিখ্‌-এর আশ্রয় লন। কিছু দিন পরে হেল্‌ফেরিখ্‌ই তাঁহাদের আমেরিকায় ফিরিয়া যাইবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহাদের সঙ্গে 'মার্টিন'কেও আমেরিকায় পাঠান হয়। 'মার্টিন', অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'হরি সিং' নাম গ্রহণ করিয়া আমেরিকায় পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন-সরকার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে।

এই হতাশজনক ব্যর্থতার পরেও জার্মান সরকার ভারতের বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য 'হেন্‌রি এস' নামে আর একখানি অস্ত্র-বোঝাই জাহাজ প্রেরণ করে। এই জাহাজখানি অস্ত্র ও গোলা-গুলি লইয়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ম্যানিলা হইতে চীনের সাংহাই বন্দরের দিকে যাত্রা করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ইহার মালপত্র ও উদ্দেশ্য বুঝিয়া ফেলিলে জাহাজখানি গতি পরিবর্তন করিয়া পন্টিয়ানাক্‌ দ্বীপের দিকে চলিয়া যায় এবং পথে ইহার মোটর বিগড়াইয়া গেলে ইহা সেলিবিস্‌ দ্বীপপুঞ্জের একটি বন্দরে আসিয়া নোঙ্গর করে। এই জাহাজে ছিল 'ভেদে' ও 'বোয়েম' নামক দুইজন আমেরিকা-প্রবাসী জার্মান। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, জাহাজখানি ব্যাঙ্কক পৌঁছিলে তাঁহারা ইহার কিছু অস্ত্র শ্যাম-ব্রহ্ম সীমান্তের 'পাকোয়া' নামক স্থানের একটি সুরঙ্গের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবেন এবং সীমান্তে থাকিয়া একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করিবেন, তারপর সেই সৈন্যবাহিনী লইয়া ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিবেন। কিন্তু এই পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়। বোয়েম সেলিবিস্‌ হইতে বাটাভিয়া যাইবার পথে সিঙ্গাপুরে গ্রেপ্তার হন। আমেরিকার চিকাগো শহর হইতে হেরম্বলাল গুপ্ত বোয়েমকে ম্যানিলা হইতে 'হেন্‌রি এস' জাহাজে আরোহণ করিতে নির্দেশ পাঠাইয়াছিলেন। বোয়েম ম্যানিলায় আসিয়া স্থানীয় জার্মান-কন্‌সালের নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে, তিনি ঐ জাহাজ হইতে ৫০০টি মশার পিস্তল ব্যাঙ্কক-এ রাখিয়া অবশিষ্ট ৪৫০০টি মশার পিস্তল চট্টগ্রামে নামাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ভারত সরকারের গোয়েন্দা-বিভাগের মতে, 'ম্যাভারিক' জাহাজ ধরা পড়িবার পর সাংহাই-এর জার্মান-কন্‌সাল আরও দুইখানি অস্ত্র-বোঝাই জাহাজ ভারতবর্ষে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্থির হইয়াছিল, একখানি জাহাজ ২০ হাজার রাইফেল, ৮০ লক্ষ কার্তুজ, দুই হাজার পিস্তল ও হাত-বোমা এবং দুই লক্ষ টাকা লইয়া রায়মঙ্গল এবং অপর জাহাজখানি ১০ হাজার রাইফেল, ১০ লক্ষ কার্তুজ ও হাত-বোমা লইয়া বালেশ্বর যাইবে। ঠিক এই সময় 'মার্টিন' বাটাভিয়ায় উপস্থিত হন এবং বাঙলাদেশের ও বালেশ্বরের বিপজ্জনক অবস্থার সংবাদ জানাইয়া দেন। তাহার ফলে এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। তখন 'মার্টিন'-এর পরামর্শে ভারতবর্ষে অস্ত্র প্রেরণের নূতন পরিকল্পনা তৈরী হয়। এই নূতন পরিকল্পনা অনুসারে সাংহাই হইতে সরাসরি একখানা জাহাজের অস্ত্র লইয়া ডিসেম্বর মাসে হাতিয়ায় আসিবার কথা ছিল। আর একখানি জার্মান জাহাজ ইন্দোনেশিয়ার কোন বন্দর হইতে যাত্রা করিয়া পথে অন্য একখানা জাহাজ হইতে অস্ত্র লইয়া সরাসরি বালেশ্বরে আসিবার কথা হয়। আরও কথা ছিল যে, অন্য একখানা জার্মান জাহাজ সরাসরি আন্দামান দ্বীপে অস্ত্রসহ পৌঁছিয়া আন্দামানের প্রধান কেন্দ্র পোর্টব্লেয়ার আক্রমণ করিবে এবং আন্দামান-জেলের বিপ্লবী বন্দীদের ও সিঙ্গাপুরে সৈন্যবাহিনীর যে 'রেজিমেন্ট'টি[১] বিদ্রোহ করিয়াছিল সেই 'রেজিমেন্টের' বন্দী সৈন্যদলকে মুক্ত করিয়া তাহাদের লইয়া রেঙ্গুন আক্রমণ করিবে। ইহা ব্যতীত বাঙলাদেশের বিপ্লবীদের সাহায্য করিবার জন্য সাংহাই-এর জার্মান কন্‌সাল বিপুল পরিমাণ অর্থসহ একজন চীন দেশীয় লোককে হেল্‌ফেরিখ্‌-এর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। পেনাঙ্গ-এর একজন বাঙালীকে দিবার জন্য অথবা কলিকাতার কোন ঠিকানায় পাঠাই-বার জন্য একখানা জরুরী পত্রও এই লোকটির সঙ্গে পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু অর্থ ও পত্রসহ এই চীনা লোকটি সিঙ্গাপুরে পুলিসের হাতে ধরা পড়েন।

'মার্টিন'-এর সঙ্গে কলিকাতা হইতে যে বাঙালী যুবকটি আসিয়াছিলেন তাঁহাকে জার্মান-কন্‌সালের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য এই সময় সাংহাই পাঠান হয়। যুবকটি বহু কষ্টে সাংহাই পৌঁছিবামাত্র সাংহাই এর বৃটিশ পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। এই যুবকের গ্রেপ্তারের পর ভারতে অস্ত্র প্রেরণের পরিকল্পনা ও চেষ্টা পরিত্যাগ করা হয়। এদিকে যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবী নায়কদের অনেকে বৃটিশ অঞ্চল হইতে পলায়ন করিয়া চন্দননগরের ফরাসী উপনিবেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এই সময় মার্কিন পুলিস চিকাগো শহরে ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের অপরাধে বাঙালী বিপ্লবী হেরম্বলাল গুপ্ত এবং জার্মান অফিসার ভেদে ও বোয়েমকে গ্রেপ্তার করে। মার্কিন রাষ্ট্রীয় আদালতে তাঁহাদের বিচার হয় এবং বিচারে তাঁহারা দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জার্মানরা সাংহাই হইতে ভারতে অস্ত্র প্রেরণের

১। 'ব্রহ্মদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শেষ চেষ্টা করে। জার্মান কন্‌সাল-অফিসের 'নিলসেন' নামক একজন কর্মচারী দুইজন চীনা ভদ্রলোকের মারফত একটা বড় কাঠের চালানের মধ্যে করিয়া ১২৯টি মশার পিস্তল এবং ২৬ লক্ষ ৮১ হাজার কার্তুজ প্রেরণের চেষ্টা করেন। এই অস্ত্রগুলি পৌঁছাইবার কথা ছিল কলিকাতার বিপ্লবীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 'শ্রমজীবী সমবায়'-এর অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট। কিন্তু কাঠের চালান ও অস্ত্র এবং চীনা ভদ্রলোক দুইজন সাংহাই হইতে বাহির হইতে পারেন নাই। অক্টোবর মাসে সাংহাইয়ের শহর-পুলিস সকল মালপত্রসহ চীনা ভদ্রলোক দুইজনকে গ্রেপ্তার করে। এই সকল অস্ত্র নাকি রাসবিহারী বসু[1] ও অবনী মুখার্জির চেষ্টাতেই নিলসেন-দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল। পাঞ্জাবের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পর রাসবিহারী পলাইয়া আসিয়া সাংহাইতে নিলসেন-এর গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং অবনী মুখার্জিও[2] জাপান হইতে আসিয়া এখানে বাস করিতেন। তাঁহাদের অনুরোধেই নিলসেন এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অবনী মুখার্জির গ্রেপ্তারের সময় তাঁহার নোটবইতে নিলসেনের নাম পাওয়া যায়।

অবিনাশ রায় নামক আর একজন বাঙালী বিপ্লবী ভারতে জার্মান অস্ত্র প্রেরণের ব্যাপারে জড়িত ছিলেন এবং ভারতে অস্ত্র প্রেরণের জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেন। তিনিও রাসবিহারী এবং অবনী মুখার্জির সহিত সাংহাই নগরীতে নিলসেনের গৃহে বাস করিতেন। অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বাঙলাদেশে পাঠাইবার জন্য অবিনাশ রায়কে অবনী মুখার্জি চন্দননগরের মতিলাল রায়ের নাম ও ঠিকানা দেন। অবিনাশ নিজেই অস্ত্র লইয়া চন্দননগরে যাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টাও পুলিসের সতর্কতায় ব্যর্থ হয়। অবনী মুখার্জির নোটবইতে অমর সিং নামক শ্যামদেশ-প্রবাসী এক ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারের নাম পাওয়া যায়। উনিও ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত ছিলেন। 'হেনরী এস' জাহাজখানি যদি ব্রহ্ম-শ্যাম সীমান্তে অস্ত্র পৌঁছাইয়া দিতে পারিত, তবে ইনিই সেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়া একটি সুরঙ্গের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ব্রহ্মের মান্দালয় শহরে ইনি গ্রেপ্তার হন এবং বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। অবনী মুখার্জিও পরে জাপানে গ্রেপ্তার হন। এইভাবে বৈদেশিক সাহায্যে ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার প্রথম পর্ব শেষ হয়।

দ্বিতীয় পর্ব

মুসলমানদের বৃটিশ-বিরোধিতা

আমরা দেখিয়াছি, ওয়াহাবী-বিদ্রোহ ও মহাবিদ্রোহের পর হইতে ভারতের মুসলমানদের বৃটিশ-বিরোধিতার অবসান হইয়াছিল। তাহার পর স্যার সৈয়দ আহমদের দুর্বার প্রভাব ভারতের মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলন হইতে সরাইয়া বৃটিশ-শাসকদের

১। রাসবিহারী বসুর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে "যুক্তপ্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা" শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২। অবনী মুখার্জি ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত কোন কাজে যতীন্দ্রনাথ কর্তৃক জাপানে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

সহিত সহযোগিতার পথে লইয়া গিয়াছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব দেখা দেয় নাই, বঙ্গভঙ্গ রদের পর হইতে তাহাদের মধ্যে আবার নূতন করিয়া বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব দেখা দিতে থাকে। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র ভারতে যে বিরাট জাতীয় জাগরণ দেখা দেয় তাহা মুসলমান-জনসাধারণের মধ্যেও প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল। মুসলমানগণ মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের পতাকা তলে হিন্দুদের সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের দাবি লইয়া যে আন্দোলন আরম্ভ করে, তাহা বৃটিশ-শাসকগোষ্ঠীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে। সৌকৎ আলী, মহম্মদ আলী, আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি মুসলমান-নেতৃবৃন্দকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া শাসকগণ সেই আন্দোলন দমন করিবার প্রয়াস পায়।

মুসলমান-জনসাধারণের এই জাগরণ ও বৃটিশ-বিরোধী মনোভাবের বহু কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ ছিল মধ্য-প্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র। মুসলিম রাষ্ট্র তুরস্কের বিরুদ্ধে বৃটিশের 'ক্রিমিয়ার যুদ্ধ'-এর সময় হইতে সমগ্র বিশ্বের মুসলমান-সম্প্রদায়ের বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে এবং ইহা সমগ্র বিশ্বের মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাইয়া তোলে। এই ভ্রাতৃত্ববোধ আরও বৃদ্ধি পায় 'তুরস্ক-ইতালী যুদ্ধ'-এর সময় এবং ইহা চরম আকার ধারণ করে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের 'বলকান-যুদ্ধ'-এর সময় হইতে। ইহার ফলে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানগণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে শত্রু বলিয়া গ্রহণ করে। প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্বক্ষণে পারস্য সম্পর্কে রুশিয়ার সহিত বৃটিশের দুষ্ট উদ্দেশ্যমূলক সন্ধি মুসলমানদের বৃটিশ-বিরোধিতায় ইন্ধন যোগায়। সর্বশেষে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক বৃটিশের চরম শত্রু জার্মেনীর পক্ষ অবলম্বন করায় পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে মুসলমানদের মত ভারতের মুসলমান জনসাধারণও বৃটিশ-শক্তিকে চরম শত্রু বলিয়া গ্রহণ করে। এইভাবে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের বৃটিশ-বিরোধী ভ্রাতৃত্ববোধ ও নূতন বৃটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবোধ একত্রে মিলিত হইয়া ভারতের মুসলমান জনসাধারণকে বৃটিশ শাসনের শত্রু করিয়া তোলে। ইহার ফলে সকল দেশের জাতীয় সংগ্রামে মুসলমান জনসাধারণের যোগদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এইভাবে মহাযুদ্ধ ভারতের বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ-প্রচেষ্টার সুযোগ আনিয়া দেয়। শিক্ষিত হিন্দুদের মত শিক্ষিত মুসলমানদেরও একাংশ বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা আরম্ভ করে। স্বভাবতই বৃটিশের শত্রু জার্মেনীও উহার পক্ষভুক্ত তুরস্কের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের মুসলমানদের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়।

ওয়াহাবী বিদ্রোহের লুপ্তধারা

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের উত্তর-সীমান্তের ওপারের অঞ্চলটি বৃটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, উহা ছিল একটি স্বাধীন অঞ্চল। এই স্বাধীন অঞ্চলটির অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ একদিন ছিল এই ভারতবর্ষেরই মানুষ। তাহারা সৈয়দ

আমেদ-এর প্রচারিত ওয়াহাবী আদর্শে দীক্ষিত হইয়া এবং সৈয়দ আমেদের আহ্বানে এই "শত্রু-রাজ্য" বৃটিশ-ভারত ত্যাগ করিয়া সৈয়দ আমেদের সহিত ঐ স্বাধীন অঞ্চলে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার পর সেখান হইতে ভারতবর্ষকে শত্রু-কবলমুক্ত করিয়া "ধর্মরাজ্য" স্থাপনের উদ্দেশ্যে শিখ-রাজ্য পাঞ্জাব ও বৃটিশ রাজ্যের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল। তখন হইতে ঐ স্বাধীন অঞ্চলের অধিবাসীদের বলা হইত "মুহাজির" বা মুক্তিকামী মানুষ। একদিন তাহাদের প্রচারিত ওয়াহাবী বিদ্রোহের আগুন সারা ভারতবর্ষে দাবাগ্নির মত ছড়াইয়া পড়িয়া বৃটিশ শত্রুর শাসন ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল। সেই ওয়াহাবী বিদ্রোহের আগুন ১৮২৪ হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জ্বলিয়া পরে নিবিয়া গেলেও উহার উত্তাপ কখনও ভারতের মুসলমান কৃষক জনসাধারণ, বিশেষত ঐ স্বাধীন অঞ্চলটির অধিবাসীদের মন হইতে লোপ পায় নাই। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সংঘাতে সেই উত্তাপ হইতে আবার আগুন জ্বলিয়া উঠে। 'মুহাজির' বা মুক্তিকামী মুসলমানগণ আবার মুক্তির নেশায় মাতিয়া উঠে। ইহারা ভারতবাসী মুসলমানদের সহিত একত্রে মিলিয়া মহাযুদ্ধের সুযোগে ভারতের বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়া দেয়।

সংগ্রামের আহ্বান

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এই স্বাধীন অঞ্চলের অধিবাসী 'মুহাজির'গণ ভারতের বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদের সংগ্রাম আরম্ভ করিবার জন্য ভারতের সর্বত্র আবেদন প্রচার করে। এই স্বাধীন অঞ্চল হইতে দুইজন 'মুহাজির' ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে এবং প্রদেশে প্রদেশে ঘুরিয়া প্রচার-কার্য ও সংগ্রামের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকে। 'মুহাজির'দের আহ্বানে প্রথম সাড়া দেয় লাহোর কলেজের পনেরটি ছাত্র। তাহারা কলেজের পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া সীমান্ত অতিক্রম করে এবং 'মুহাজির'দের স্বাধীন অঞ্চলে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখান হইতে তাহারা বৈপ্লবিক কার্যে কাবুলে পৌঁছিলে কাবুলের পুলিস তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া নজর-বন্দী করিয়া রাখে। তাহাদের তিনজন পলাইয়া রুশিয়ায় উপস্থিত হইলে জারের পুলিস তাহাদেরও গ্রেপ্তার করিয়া বৃটিশ-সরকারের হস্তে অর্পণ করে।

রংপুর জেলা হইতেও একদল মুসলমান 'মুহাজির'দের সাহায্য করিবার জন্য ৮ হাজার টাকা লইয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে যাত্রা করে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পুলিস তাহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু 'মুহাজির'গণ সংখ্যায় অল্প, তাই তাহাদের আহ্বান কেবল ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু 'মুহাজির'দের মারফত বৈদেশিক সাহায্য লাভের সম্ভাবনাও দেখা দেয়। স্বাধীন অঞ্চল ও উহার অধিবাসী 'মুহাজির'গণ ছিল বৈদেশিক শক্তি ও দেশীয় মুসলমান বিপ্লবীদের সংযোগ-সূত্র।

ওবেদুল্লা নামক একজন মৌলবী সর্বপ্রথম পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে বৈপ্লবিক প্রচার আরম্ভ করেন। তিনি ছিলেন যুক্তপ্রদেশের সাহারাণপুর জেলায় একটি বিদ্যালয়ের

শিক্ষক। তিনি এক দিকে শিক্ষকতা করিতেন, অপর দিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে এবং বাহিরে বৈপ্লবিক প্রচার চালাইতেন। এইভাবে প্রচার চালাইয়া ওবেদুল্লা তাঁহার বিদ্যালয়ের প্রধান মৌলবী মৌলানা মামুদ হাসান এফেন্দিকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ওবেদুল্লার কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত করে। ওবেদুল্লা মৌলানা মামুদ হাসান-এর মারফত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে প্রচার ও সংগঠন চালাইতে থাকেন। মামুদ হাসানের গৃহে গোপনে সভা হইত এবং সেখানে সীমান্ত হইতে 'মুহাজির'দের প্রতিনিধিরাও আসিতেন। কিছুদিন পরে ওবেদুল্লা দিল্লীতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বৃটিশ-বিরোধী ধর্মযুদ্ধ বা 'জেহাদ'-এর কথা শিক্ষা দেওয়া হইত।

এই মুসলমান বিপ্লবীরা তাঁহাদের এই দুইটি উদ্দেশ্য প্রচার করিতেন: (১) সকল মুসলমান-রাষ্ট্র একত্র হইয়া শত্রু-শাসিত ভারতবর্ষের উপর আক্রমণ করিবে, (২) সেই আক্রমণ আরম্ভ হইবামাত্র ভারতের মুসলমানগণ হিন্দুদের সহিত মিলিত হইয়া সশস্ত্র অভ্যুত্থান আরম্ভ করিবে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপরেই প্রথম আক্রমণ করিবে। সুতরাং পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের অবিলম্বে প্রস্তুত হইতে হইবে।

দেশের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচার ও সংগঠনের ভার মৌলানা মামুদ হাসান প্রভৃতি সহকর্মীদের উপর অর্পণ করিয়া আবদুল্লা, ফতে মহম্মদ ও মহম্মদ আলি নামক তিনজন সঙ্গী লইয়া ওবেদুল্লা ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করেন। বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রকে ভারত-আক্রমণে উৎসাহিত করিয়া তোলাই ছিল ওবেদুল্লার এই বিদেশ-যাত্রার উদ্দেশ্য।

তুর্ক-জার্মান-হিন্দ্ ষড়যন্ত্র

ওবেদুল্লা তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া প্রথম আসিয়া উপস্থিত হইলেন 'মুহাজির'দের ক্ষুদ্র স্বাধীন অঞ্চলটিতে। 'মুহাজির'দের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহারা কাবুলে আসিয়া উপস্থিত হন। 'মুহাজির'দের আহ্বানে কাবুলে পূর্ব হইতেই একটি তুর্ক-জার্মান দল অবস্থান করিতেছিল। কাবুলে ওবেদুল্লার দলের সহিত তুর্ক-জার্মান দলের সাক্ষাৎ হয়। তুর্ক-জার্মান সামরিক বিভাগ পূর্ব হইতেই ভারতের মুসলমান-প্রধান উত্তর-পশ্চিম কোণটিকে কেন্দ্র করিয়া এক বৃটিশ-বিরোধী বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিল। ইতিমধ্যে হিন্দু-বিপ্লবীদের চেষ্টায় ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের জাল ভারতের পূর্বাঞ্চলেও বিস্তৃত হইয়াছিল।

তুর্ক-জার্মান দলের সহিত ওবেদুল্লার দলের আলোচনা চলিবার সময় ভারত হইতে ওবেদুল্লার সহকর্মী মৌলবী মহম্মদ মিঞা আনসারী ও মৌলানা মামুদ হাসান কাবুলে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। কিছুদিন পর আনসারী সাহেবকে সঙ্গে লইয়া মামুদ হাসান অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে আরবের দিকে যাত্রা করেন। তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে হেজাজ্

শহরে তুরস্কের সামরিক শাসনকর্তা গালিব পাশার সহিত সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের মধ্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সকল নিপীড়িত মুসলমান-জনসাধারণের সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা চলে। এই আলোচনার পর পৃথিবীর মুসলমান-জনসাধারণের নিকট একটি 'সংগ্রামের আহ্বান' রচিত হয়। এই আহ্বান-পত্রে মুসলমান-জগতের প্রতিনিধি হিসাবে গালিব পাশা স্বাক্ষর করেন। এই আহ্বান-পত্রখানি বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে 'গালিবনামা' নামে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। 'গালিবনামা'য় পৃথিবীর সকল মুসলমান-জনসাধারণের প্রতি সংগ্রামের আহ্বান জানাইয়া বলা হয় :

"এক দিন এশিয়া, য়ুরোপ ও আফ্রিকার মুসলমানগণ অস্ত্র-সজ্জিত হইয়া আল্লার নামে 'জেহাদ'-এ (ধর্মযুদ্ধে) ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। আল্লার ইচ্ছায় তুরস্কের সামরিক বাহিনী ও 'মুহাজির'গণ ইস্লামের শত্রুদের পরাভূত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।... অতএব, হে মুসলমান ভাইগণ! যে অত্যাচারী খ্রীষ্টান-শাসনের দাসত্ব-বন্ধনে তোমরা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ, সেই অত্যাচারী-খ্রীষ্টান-শাসনের উপর আক্রমণ কর। তোমরা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা লইয়া অবিলম্বে তোমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত কর। শত্রুকে পিষিয়া মার, শত্রুর প্রতি তোমাদের ঘৃণা ও ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠুক!

"তোমরা হয়ত শুনিয়াছ, (ভারতবর্ষের) মৌলবী মামুদ হাসান এফেন্দি সাহেব আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। আমরা সকলেই তাঁহার উদ্দেশ্যের সহিত একমত হইয়াছি এবং তাঁহাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়াছি। তিনি তোমাদের নিকট উপস্থিত হইলে তোমরা সকলে তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে; অর্থ প্রভৃতি যাহা কিছু তিনি চাহিবেন তাহা দিয়াই তোমরা তাঁহাকে সাহায্য করিবে।"[১]

'গালিবনামা' বহু সংখ্যায় মুদ্রিত করিয়া সমগ্র মুসলিম জগতে প্রচারের ব্যবস্থা হয়। মামুদ হাসানের সঙ্গী আনসারী সাহেব ভারত-সীমান্তের সকল মুসলমান-উপজাতি ও সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে ইহা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ভারত সীমান্তের মুসলমানগণ ইহা পাঠ করিয়া বৃটিশের বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

এদিকে কাবুলে ওবেদুল্লার সহিত আরও কয়েকজন প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী আসিয়া যোগদান করেন। ইহাদের মধ্যে মহেন্দ্রপ্রতাপ ও অধ্যাপক বরকতুল্লার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহেন্দ্রপ্রতাপ ছিলেন হাতরাসের জমিদার-বংশের সন্তান; ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে ইনি বিদেশ-যাত্রার অনুমতি লইয়া প্রথমে ইতালি, সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্স ভ্রমণ করিয়া পরে জেনেভায় উপস্থিত হন। জেনেভায় তাঁহার সহিত আমেরিকার গদর সমিতির প্রতিষ্ঠাতা হরদয়ালের সাক্ষাৎ হয়। হরদয়াল তাঁহাকে জেনেভার জার্মান-কন্সালের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। ইহার পর তিনি বার্লিনে গমন করেন। বার্লিনের সামরিক বিভাগ ও ভারতীয় বিপ্লবীদের "বার্লিন কমিটি" তাঁহাকে ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করিবার ভার দিয়া কাবুলে প্রেরণ করে। তিনি কাবুলে আসিয়া ওবেদুল্লার সহিত মিলিত হন।

১। "Ghalibnama"—Quoted from 'Sedition Committee Report', p. 179.

অধ্যাপক বরকতুল্লা ছিলেন দেশীয় রাজ্য ভূপালের একজন রাজকর্মচারীর পুত্র। তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। এই সময় বিখ্যাত বিপ্লবী কৃষ্ণ বর্মা দ্বারা তিনি বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন। কিছু দিন পরে তিনি আমেরিকায় যাইয়া হরদয়ালের মারফত গদর সমিতিতে যোগদান করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের সময় গদর সমিতির অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত ইনিও বাটাভিয়ায় আগমন করেন। ইহার পর তিনি জাপানে গিয়া টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুস্থানী-ভাষার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। জাপানে থাকাকালে 'ইস্‌লামিক ফ্রেটারনিটি' (ঐস্লামিক ভ্রাতৃত্ব) নামে একখানি ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া তিনি বৈপ্লবিক প্রচার-কার্য চালনা করেন। কিছু দিন পর জাপান সরকার এই পত্রিকাখানি বন্ধ করিয়া দেয় এবং বৈপ্লবিক কার্যের অপরাধে তিনি অধ্যাপকের পদ হইতে অপসারিত হন। ইহার পর তিনি আমেরিকা ঘুরিয়া বার্লিনে আসিয়া প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হন। বার্লিন হইতে তাঁহাকে কাবুলে প্রেরণ করা হয়। কাবুলে আসিয়া বরকতুল্লা রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ও ওবেদুল্লার সহিত একযোগে বিপ্লবের আয়োজন করিতে থাকেন।

এই বিখ্যাত বিপ্লবীদের চেষ্টায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল জুড়িয়া এক ব্যাপক বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া উঠে। সেই সংগঠনের শাখা-প্রশাখা চারিদিকে বিস্তার লাভ করে। ইহার মারফত বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইবার জন্য চারিদিকে প্রচার কার্য চলিতে থাকে। এই সংগঠনের বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ বর্ণনা করিয়া 'সিডিসন কমিটি'র রিপোর্টে বলা হয়:

এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল: "প্রথমে রাজদ্রোহ প্রচার ও পরে সশস্ত্র অভ্যুত্থান। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা বৃটেনের শত্রুদের সহিত সহযোগিতা করিতে থাকেন। বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহারা গোপন ষড়যন্ত্র, প্রকাশ্যে রাজদ্রোহ প্রচার প্রভৃতি সকল কার্যই করিতেন।"[১]

'অস্থায়ী স্বাধীন সরকার'

বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্র যাহাতে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করে এবং উহারা যাহাতে উহাদের সামরিক শক্তি লইয়া বৃটিশ ভারতের উপর আক্রমণ করে সেই সম্বন্ধে ঐ সকল রাষ্ট্রের সহিত সমান রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লইয়া আলোচনা চালাইবার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীরা ভারতবর্ষের জন্য এক 'অস্থায়ী স্বাধীন সরকার' গঠনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনায় মহেন্দ্রপ্রতাপকে করা হয় ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের সভাপতি, অধ্যাপক বরকতুল্লাকে করা হয় প্রধান মন্ত্রী, আর ওবেদুল্লা প্রভৃতিরা এক একজন এক একটি দপ্তরের মন্ত্রী নির্বাচিত হন। ইহার পর বিপ্লবীরা আনুষ্ঠানিকভাবে 'অস্থায়ী স্বাধীন সরকার' গঠন করেন। আপাতত কাবুল হইল এই 'অস্থায়ী স্বাধীন সরকার'-এর কর্মকেন্দ্র।

১। Sedition Committee Report, p. 179.

এবার 'অস্থায়ী স্বাধীন সরকার' কাজ আরম্ভ করে। প্রথমে এই 'অস্থায়ী স্বাধীন সরকার'-এর নামে দুইখানি পত্র প্রেরিত হয়—একখানি রুশ সম্রাটের নিকট ও অপরখানি তুর্কিস্থানের রুশ শাসনকর্তার নিকট। এই দুইখানি পত্রেই মহেন্দ্রপ্রতাপ 'স্বাধীন ভারত-সরকার'-এর 'প্রেসিডেন্ট' হিসাবে স্বাক্ষর করেন। রুশিয়ার সম্রাট জারের নিকট লিখিত পত্রখানি একটি স্বর্ণপত্রে খোদিত করিয়া প্রেরিত হইয়াছিল। এই পত্র দুইখানিতে রুশ সম্রাট ও তুর্কিস্থানের শাসনকর্তাকে বৃটিশের সহিত রুশিয়ার মৈত্রী-চুক্তি বাতিল করিয়া ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদের প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে অনুরোধ করা হয়।

ইহার পর 'অস্থায়ী স্বাধীন সরকার' তুরস্ক-সরকারের সহিত একটি মৈত্রী-চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব করে। এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ওবেদুল্লা মক্কায় মৌলানা মামুদ হাসানের উদ্দেশে একখানি পত্র রচনা করেন। এই পত্রখানি এবং মহম্মদ মিঞা আনসারী-লিখিত অপর একখানি পত্র এক খণ্ড হরিদ্রা-বর্ণের রেশমী বস্ত্রের উপর লিখিত হয়। ওবেদুল্লা ইহার সহিত একটি ভূমিকা যোগ করিয়া দেন। তাহার পর উক্ত দুইখানি পত্র ও ভূমিকা লিখিত রেশমী বস্ত্রখণ্ড মামুদ হাসানের হাতে পৌঁছাইবার জন্য সিন্ধুদেশের হায়দরাবাদ নামক স্থানের শেখ আব্‌দুর রহিমের নিকট প্রেরিত হয়। ওবেদুল্লা আব্‌দুর রহিমকে অনুরোধ করিয়া পাঠান যে, আব্‌দুর রহিম নিজে অথবা অপর কোন হাজী[1] দ্বারা এই রেশমী পত্রখানি যেন মক্কায় মামুদ হাসানের নিকট পৌঁছান হয়। এই উভয় পত্রের মধ্যেই ষড়যন্ত্রের বহু গোপন তথ্যের উল্লেখ ছিল বলিয়া এত সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। ওবেদুল্লার পত্রের মধ্যে ভারতবর্ষের উপর বৈদেশিক আক্রমণের প্রস্তাব ছিল, আর মহম্মদ মিঞার পত্রের মধ্যে ষড়যন্ত্রের ব্যাপক আয়োজনের বহু গোপন সংবাদ উল্লেখ করা ছিল, যেমন, জার্মেনী ও তুরস্কের সামরিক প্রতিনিধিদের কাবুলে আগমন, লাহোরের ছাত্রদের কাবুলে উপস্থিতি, 'গালিবনামা'র প্রচার, 'অস্থায়ী স্বাধীন সরকার' গঠন, ধর্মযুদ্ধের জন্য 'আল্লার সৈন্যবাহিনী' গঠন ইত্যাদি।

রেশমী পত্রখানি সিন্ধুদেশে পৌঁছিবার পর উহা ভারতীয় পুলিসের হস্তগত হয়। বিপ্লবের আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতে প্রবেশ করিবার সময় মৌলানা মামুদ আন্‌সারী, আব্দুল্লা, ফতে মহম্মদ, মহম্মদ আলি এবং আর এক ব্যক্তি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গ্রেপ্তার হন। উক্ত রেশমী পত্রের ভিত্তিতে তাঁহাদের লইয়া ভারত সরকার এক ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ করে।

এই ষড়যন্ত্রই ভারতের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ইতিহাসে "রেশমী পত্রের ষড়যন্ত্র" নামে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু মামলার বিচারে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। বিপ্লবীরা বিচারে মুক্তিলাভ করিলেও তাঁহাদিগকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের

১। মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা মক্কায় তীর্থ বা 'হজ' করিয়া ফিরিয়াছেন তাঁহাদের "হাজী" বলা হয়।

'তিন নং আইন' অনুসারে আটক করিয়া রাখা হয়। তাঁহাদের গ্রেপ্তারের পর ভারত সরকার সীমান্ত অঞ্চলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে এবং সীমান্ত অঞ্চলের মুসলমানদের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখে। মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতুল্লা, ওবেদুল্লা প্রভৃতি বিপ্লবীরাও আর আশা নাই বুঝিয়া তখনকার মত বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ত্যাগ করেন এবং উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করিতে থাকেন।

নবম অধ্যায়

পাঞ্জাবে বিপ্লব-প্রচেষ্টা

১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দ

'গদর-ই-গঞ্জ'

অতি ভয়ংকর 'পাঞ্জাব-অর্ডিনান্স' এবং সরকারের শত চেষ্টা ও সতর্কতা উপেক্ষা করিয়া পাঞ্জাবে বিদ্রোহের আয়োজন আগাইয়া চলে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে গদর বিপ্লবীরা 'গদর-ই-গঞ্জ' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া তাহা দ্বারা পাঞ্জাবের যুব-সম্প্রদায়কে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের নির্দেশ দেন। বিপ্লবের জন্য অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু ডাকাতি ব্যতীত অর্থ সংগ্রহের অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং সরকারী অর্থ ডাকাতি দ্বারা লুণ্ঠন করিতে হইবে এবং সরকার ও ইংরেজদের উপর এই প্রকারের আক্রমণের দ্বারা জনসাধারণকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং পাঞ্জাবের যুব-সম্প্রদায়ের উপর গদর সমিতির নির্দেশ হইল :

"সরকারের অর্থ ডাকাতি করিয়া সমগ্র পাঞ্জাবকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং ইংরেজের অর্থ লুণ্ঠন কর এবং সেই অর্থ বিপ্লবের কার্যে ব্যবহার কর।[১]

এই পুস্তিকায় ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলা হয় :

"ইংরেজের শিক্ষা-ব্যবস্থা কেবল দাসত্বই শিক্ষা দেয়, সুতরাং এই শিক্ষা বর্জন করিয়া ছাত্রদের বিদ্রোহে যোগদান করা কর্তব্য। যাহারা বিদ্রোহে যোগদান করিবে তাহারা উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিবে।"

ইহাতে গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্য করিয়া বলা হয়: বিদ্রোহে যোগদান করিয়া ইংরেজ-শাসনের অবসান ঘটাইলে তাহাদের সকল দুঃখ-যন্ত্রণা শেষ হইবে।

ইতিপূর্বে দিল্লীতে সরকারী নির্দেশে শিখদের একটি ধর্ম-মন্দিরের প্রাচীর ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছিল। 'গদর-ই-গঞ্জ' পুস্তিকায় সেই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া বলা হয় : বৃটিশ-সরকার শিখদের ধর্মের উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছে, ভারতবাসীদের ধর্ম আজ বিদেশী শাসকদের দ্বারা বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। অতএব ধর্ম রক্ষার জন্য,

১। Quoted from the 'Sedition Committee Report', p. 151.

জীবিকা রক্ষার জন্য, শিক্ষার জন্য সকলেরই বিদ্রোহে যোগদান করা অবশ্য কর্তব্য। বিদ্রোহ আরম্ভ হইবামাত্র নেতৃবৃন্দ উড়োজাহাজে চড়িয়া ভারতে আসিবেন এবং বিদ্রোহ পরিচালনা করিবেন। ভারত স্বাধীন হইলে তাহার পরিচালক হইবেন হরদয়াল।

পাঞ্জাবের জনসাধারণের নিকট ভবিষ্যৎ-ভারতের উজ্জল চিত্র বর্ণনা করিয়া বলা হয়: ভারতবর্ষ হইবে একটি গণতান্ত্রিক দেশ, এখানে আমেরিকার মত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। চির-দুঃখের দেশ ভারতবর্ষ একটি সুখী দেশে পরিণত হইবে। এখানে বর্তমানের মত অসাম্য, প্লেগের মহামারী ও ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের চিহ্নও থাকিবে না। এই সুখী ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিতে হইলে সবার আগে এদেশ হইতে বৃটিশকে তাড়াইতে হইবে।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাঙলাদেশব্যাপী যে প্রকারে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছিল, পাঞ্জাবেও ঠিক সেই প্রকার আয়োজন চলিতে থাকে। এই আয়োজনও অবশেষে 'ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র'-এর অংশে পরিণত হয়। 'ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র'-এর পরিকল্পনা লইয়া ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বার্লিন হইতে হরদয়াল ও অন্যান্য প্রবাসী বিপ্লবীদের দ্বারা সত্যেন্দ্রনাথ সেন নামক একজন বাঙালী ও বিষ্ণুগণেশ পিংলে নামক একজন মারাঠী যুবক কলিকাতায় প্রেরিত হন। বাঙলাদেশের বিপ্লবীদের সংবাদ দিয়া পিংলে কাশীতে আসিয়া রাসবিহারী বসুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'দিল্লী ষড়যন্ত্র-মামলা'র সময় (১৯০৮ সাল) রাসবিহারী গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য পলায়ন করিয়া কাশীতে উপস্থিত হন এবং শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সহিত একযোগে যুক্তপ্রদেশে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া তুলিতে থাকেন।

পিংলে কাশীতে আসিয়া রাসবিহারীকে 'ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র'-এর সংবাদ ও সেই ষড়যন্ত্রে বাঙলাদেশের বিপ্লবীদের যোগদানের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন। এই সময় রাসবিহারী এবং শচীন্দ্রনাথও কাশীকে কেন্দ্র করিয়া যুক্তপ্রদেশে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু পাঞ্জাবে বিদ্রোহ আসন্ন বুঝিয়া রাসবিহারী পিংলেকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং পাঞ্জাবের অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করেন। প্রথমে শচীন্দ্রনাথ লাহোরে আসিয়া গদর সমিতির পরিচালকদিগকে রাসবিহারীর আগমনের সংবাদ দেন এবং পরে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে রাসবিহারী পিংলেকে সঙ্গে লইয়া লাহোরে উপস্থিত হন। পিংলে ছিলেন আমেরিকার গদর সমিতির নেতৃবৃন্দের অন্যতম। সুতরাং তাঁহার চেষ্টায় গদর-বিপ্লবীরা রাসবিহারীর নেতৃত্ব মানিয়া লন। রাসবিহারী অমৃতসরে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া পিংলে ও অন্যান্য বিপ্লবী নেতাদের সাহায্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন আরম্ভ করেন।

প্রথমে তাঁহারা বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের এক বৈঠকের আয়োজন করেন। এই বৈঠকে বিদ্রোহের কার্যসূচী স্থির করা হয়। সরকারী কোষাগার লুণ্ঠন, ভারতীয় সৈন্যদের

বিদ্রোহের পক্ষে আনয়ন, অস্ত্র সংগ্রহ, বোমা তৈরির ব্যবস্থা, সরকার-সমর্থকদের গৃহে ডাকাতি, বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার ঠিক পূর্বক্ষণে রেল-লাইন ধ্বংস করা প্রভৃতিই হইল বিদ্রোহের কার্যসূচী। রাসবিহারী ও পিংলে পরামর্শ করিয়া বোমা ও বোমা তৈরী করিবার লোক সংগ্রহের জন্য বাঙলাদেশে লোক পাঠাইলেন। এদিকে নিজেরাও পাঞ্জাবে বোমা তৈরির ব্যবস্থা করেন। অভ্যুত্থানের তারিখ স্থির হয় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী, আর অভ্যুত্থানের প্রধান কেন্দ্র হইবে লাহোর। রাসবিহারী তাঁহার কর্মকেন্দ্র লাহোরে স্থানান্তরিত করেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী যাহাতে সারা উত্তর-ভারতে একযোগে অভ্যুত্থান আরম্ভ হয় তাহার জন্য উত্তর-ভারতের সকল সেনা-নিবাসে ও শহরে দূত প্রেরিত হয় এবং বিভিন্ন প্রদেশের গুপ্ত সমিতির সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই সময় বাঙলাদেশের যুগান্তর সমিতি এবং অনুশীলন সমিতির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করাও হইয়াছিল। যাহাতে পাঞ্জাবের গ্রামবাসীরাও এই অভ্যুত্থানে যোগদান করে তাহার জন্য রাসবিহারী গ্রামাঞ্চলে প্রচারের জন্য বিপ্লবী কর্মীদের প্রেরণ করেন। ইহা ব্যতীত স্থির হয় যে, পাঞ্জাবের লাহোর, ফিরোজপুর, রাওয়ালপিণ্ডি প্রভৃতি শহর হইতে একদিনে অভ্যুত্থান আরম্ভ হইবে।

এই অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টার আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিবার একটি ঘোষণা-পত্র ও স্বাধীন ভারতের একটি জাতীয় পতাকা উদ্ভাবন। বিপ্লবের পরিচালকগণ স্থির করেন, ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইবে স্বাধীন ভারতের নামে। এই উদ্দেশ্যে স্বাধীন ভারতের একটি রাষ্ট্রীয় পতাকা তৈরী ও একটি ঘোষণা-পত্র রচিত হয়।

অভ্যুত্থান সফল করিবার জন্য সৈন্যবাহিনীর সমর্থন অপরিহার্য। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যের ভার গ্রহণ করেন স্বয়ং রাসবিহারী ও পিংলে। রাসবিহারীর নির্দেশে পিংলে সুচা সিং নামক লুধিয়ানার এক ছাত্র ও অপর কয়েক ব্যক্তির সহায়তায় উত্তর ভারতের সকল ক্যান্টনমেন্টে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেশীয় সৈন্যদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। এইভাবে মীরাট, কানপুর, এলাহাবাদ, কাশী, ফৈজাবাদ, লাক্ষ্মৌ প্রভৃতি স্থানের সৈন্যদের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই উদ্দেশ্যে 'গদর' পত্রিকা ও অন্যান্য বৈপ্লবিক সাহিত্য দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে প্রচার করা হয়। এই সকল প্রচারে অনুপ্রাণিত হইয়া কয়েকটি দেশীয় সৈন্যদল অভ্যুত্থানে যোগদান করিতে সম্মত হয়।

বিপ্লবীরা বোমা তৈরির জন্য বিরাট আয়োজন করেন। এই উদ্দেশ্যে বাঙলাদেশ হইতে কয়েকজন দক্ষ বিপ্লবীকে পাঞ্জাবে লইয়া আসা হয়। অমৃতসরে বোমা তৈরির জন্য প্রচুর মালপত্র সংগৃহীত হয়। লুধিয়ানা জেলার 'ঝাবেওয়াল' নামক গ্রামে একটি বড় বোমার কারখানা স্থাপিত হয় এবং আর একটি বোমার কারখানা স্থাপিত হয় ঐ জেলার 'লোহাবাদী' নামক গ্রামে। এই সকল কারখানায় দিবারাত্র বোমা তৈরী হইতে থাকে।

ইহা ব্যতীত, অভ্যুত্থান আরম্ভ হইলে যাহাতে সরকার চারিদিকে দ্রুত সংবাদ পাঠাইতে না পারে এবং সৈন্যবাহিনী লইয়া আসিতে না পারে তাহার জন্য টেলিগ্রাফের তার কাটিবার ও রেলপথ ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা হয়। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানের রেল-কারখানা হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয় এবং কয়েকটি বিশেষ দল তৈরি করিয়া তাহাদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

বিদ্রোহের দিন আসন্ন বুঝিয়া বিপ্লবীরা রেলচলাচল-ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই বিপর্যস্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ৩রা, ৬ই, ৭ই, ১৫ই, ১৮ই ও ২১শে তারিখে 'উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রেলপথ', 'লাহোর-লুধিয়ানা রেলপথ' ও 'ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ'-এর গাড়ী লাইন-চ্যুত করিবার চেষ্টা হয়। ইহা ব্যতীত, অমৃতসর জেলায় একটি রেল-ব্রিজ উড়াইয়া দিবার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীরা উক্ত রেল-ব্রিজের পাঁচজন রক্ষী পুলিসকে হত্যার চেষ্টা করেন।

অন্যদিকে বিদ্রোহের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিপ্লবীরা কয়েকটি ডাকাতি করেন। ২৩শে জানুয়ারী লুধিয়ানা জেলার সানেওয়াল নামক স্থানের একটি অলংকারের দোকানে ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা প্রচুর অলংকার হস্তগত করেন এবং তাহা বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ বিদ্রোহের আয়োজনের জন্য ব্যয় করেন। ২৭শে জানুয়ারী উক্ত জেলার মনসুরণ নামক গ্রামের এক ডাকাতিতে নগদে ও অলংকারে বহু সহস্র টাকা বিপ্লবীদের হস্তগত হয়। এই ডাকাতির সময় বহু গ্রামবাসী বিপ্লবীদের বাধা দিতে আসিলে বিপ্লবীরা তাহাদের নিকট এইভাবে অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তৃতা করিয়া বলেন যে, এদেশ হইতে বৃটিশকে বিতাড়িত করিবার জন্যই তাঁহারা অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। ইহাতে বহু গ্রামবাসী চলিয়া যায় এবং ইহার পরেও কিছু লোক বিপ্লবীদের বাধা দিলে বিপ্লবীরা বোমা ও রিভলভারের সাহায্যে তাহাদের নিরস্ত করেন। ২৯শে জানুয়ারী 'মালের কোটলা' নামক দেশীয় রাজ্যে এক অত্যাচারী মহাজনের বাড়ী ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা বহু সহস্র টাকা সংগ্রহ করেন। ২রা ফেব্রুয়ারী অমৃতসর জেলার কাব্বা নামক গ্রামে এক ডাকাতিতে প্রচুর অর্থ পাওয়া যায়।

এই শেষোক্ত ডাকাতিতে গৃহস্বামী বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। এই ডাকাতিতে গ্রামের বহু যুবক বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল। গ্রামের যুবকদের মধ্যে একজন ছিল পুলিসের গোয়েন্দা। এই ডাকাতির পর হইতে উক্ত গোয়েন্দাটি বিপ্লবীদের দলে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় এবং বহু গোপন তথ্য জানিতে পারে। এই গোয়েন্দার মারফত পুলিশ আসন্ন অভ্যুত্থান সম্পর্কেও সকল সংবাদ জানিয়া ফেলে। এই সকল তথ্য হস্তগত করিয়া পাঞ্জাব-সরকার ও পাঞ্জাব-পুলিশ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। ভারত-সরকারের পরামর্শে ও সাহায্যে পাঞ্জাব-সরকার বিদ্রোহের জন্য নির্দিষ্ট ২১শে ফেব্রুয়ারীর পূর্বেই বিপ্লবীদের উপর চরম আঘাত দিয়া অভ্যুত্থানের সকল আয়োজন পণ্ড করিবার জন্য প্রস্তুত হয়।

ব্যাপক গ্রেপ্তার

২১শে ফেব্রুয়ারী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রধান নায়ক রাসবিহারীর গোপন বাসস্থান ও প্রধান কেন্দ্র পুলিস ঘিরিয়া ফেলে। রাসবিহারী কোন প্রকারে পলায়ন করিতে সক্ষম হন, কিন্তু সেখানে সাতজন বিপ্লবী নেতা পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হন। এই স্থান খানাতল্লাস করিয়া পুলিস কয়েকটি রিভলভার, কতকগুলি বোমা ও বোমার অংশ এবং চারিটি 'স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা' হস্তগত করে। একই দিনে আরও চারিটি স্থানে খানাতল্লাস হয় এবং মোট তেরজন বিপ্লবী ১২টি বোমা ও কয়েকটি রিভলভারসহ গ্রেপ্তার হন। এই সকল স্থানেও কয়েকটি 'জাতীয় পতাকা' পাওয়া যায়। লাহোরের এই সকল খানাতল্লাসের ফলে পুলিস পাঞ্জাবের অমৃতসর, ফিরোজপুর, রাওয়ালপিণ্ডি; যুক্তপ্রদেশের বেনারস ও জব্বলপুর এবং বিভিন্ন ক্যাণ্টনমেণ্ট-শহরের কর্মকেন্দ্রের সন্ধান পায়। সেই সকল কর্মকেন্দ্রেও সঙ্গে সঙ্গে খানাতল্লাস হয় এবং বহু নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী বোমা-রিভলভার প্রভৃতিসহ পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হন। রাসবিহারী ও পিংলে তখন পলাইতে সক্ষম হইলেন বটে, কিন্তু লাহোরের প্রধান কর্মকেন্দ্রে খানাতল্লাসের এক মাস পর মীরাটের সৈন্য-ব্যারাকের লাইনে দুইটি বোমাসহ পিংলে গ্রেপ্তার হন।

এই প্রাথমিক সাফল্যে মত্ত হইয়া পুলিস চারিদিকে বিপ্লবীদের খোঁজে হানা দিতে থাকে। ২০শে ফেব্রুয়ারী, অর্থাৎ প্রথম গ্রেপ্তারের পরদিন, পুলিস বিপ্লবীদের এক আড্ডায় হানা দিলে বিপ্লবীরা পুলিসদলের উপর গুলি বর্ষণ করেন। ইহার ফলে একজন হেড কনেস্টবল নিহত ও একজন দারোগা গুরুতর রূপে আহত হয়। গদর-বিপ্লবীদের অন্যতম নেতা কার্তার সিং দেশীয় রাজ্য ঝিন্দে গ্রেপ্তার হন। তাঁহার নিকট বহু 'রাজদ্রোহ'মূলক কাগজপত্র পাওয়া যায়। তাঁহার অনুচর বলিয়া কথিত পঁচিশ জন বিপ্লবী বৃটিশ-ভারতে গ্রেপ্তার হন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল পুলিস গুরুদাসপুর জেলার তিখাড়িওয়ালা নামক স্থানে বহু অস্ত্র ও 'রাজদ্রোহ'মূলক সাহিত্যের একটি গুদাম আবিষ্কার করে। পাঞ্জাব-সরকার এই সময় ভারত-সরকারের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করে তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ পর্যন্ত আমেরিকা-প্রত্যাগত শিখদের ৮৯৩ জনকে অন্তরীণ ও নজরবন্দী করা হইয়াছিল।

গ্রেপ্তারের প্রতিশোধ

এপ্রিল মাসের ২৫ তারিখে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুলিসের সহিত সহযোগিতা করিবার শাস্তিস্বরূপ হোসিয়ারপুর জেলায় চন্দ সিং নামে এক গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। এই হত্যার জন্য দুইজন বিপ্লবীর ফাঁসী হয়। বিপ্লবীদের পুলিসের হস্তে ধরাইয়া দিবার অপরাধে অমৃতসর জেলার সর্দার বাহাদুর আচার সিং ৪ঠা জুন বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হন। এই সম্পর্কে দুইজন বিপ্লবী গ্রেপ্তার হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১২ই জুন বিপ্লবীরা একটি রেলব্রিজ-রক্ষী সামরিক দলের উপর আক্রমণ করে। দলের নায়ক বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। ৩রা আগস্ট কাপুর সিং নামক এক ব্যক্তি 'লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা'য় বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের অপরাধে বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়।

লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা

এইবার ধৃত বিপ্লবীদের লইয়া ভাগে ভাগে বিচার আরম্ভ হয়। সর্বসমেত নয় ভাগে বিচার চলে। এই সকল মামলাই একত্রে 'দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা' নামে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। 'দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা'র মোট নয় ভাগে আসামীর সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ শত। এই মামলায় মোট ২৮ জনের ফাঁসী এবং অবশিষ্টদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অথবা দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়। মাত্র ২৯ জন সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করেন। এই মামলা আরম্ভ হয় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে, আর শেষ হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে।

এই ইতিহাস-বিখ্যাত মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে রাসবিহারী বসু, বিষ্ণুগণেশ পিংলে, ভাই পরমানন্দ, কার্তার সিং, হরনাম সিং, মনি সিং প্রভৃতি বিপ্লবী নায়কগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মামলা আরম্ভ হইবার পূর্বেই সর্বপ্রধান আসামী রাসবিহারী বসু ভারতবর্ষ হইতে নিরাপদে পলায়ন করিয়া জাপানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার অবর্তমানেই তাঁহার বিচার করা হয়।

মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য: 'সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম', বৈপ্লবিক প্রচার, সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের প্ররোচনা দান, স্বদেশ ও বিদেশে বৈপ্লবিক প্রচার এবং বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ, বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে নরহত্যা, ডাকাতি ও লুণ্ঠন ইত্যাদি। এই মামলায় আসামীদের বিরুদ্ধে সর্বসমেত প্রায় পাঁচ হাজার লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

এই মামলার বিচারে যাঁহাদের ফাঁসী হয় তাঁহাদের মধ্যে বিষ্ণুগণেশ পিংলে, কার্তার সিং ও মনি সিংয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা ব্যতীত দুইটি দেশীয় সৈন্য রেজিমেণ্টের কয়েকজন সৈন্যও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। ভাই পরমানন্দও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন, কিন্তু পরে তাঁহার প্রাণদণ্ড মকুব করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

'ভারত-রক্ষা আইন'-এর নাগপাশ

এই লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলার বিচারের পর 'ভারত রক্ষা আইন' অনুসারে ৭০ জনকে বিভিন্ন গ্রামে এবং ১১৩ জনকে নিজ গ্রামে আটক করা হয়। 'ভারত-প্রবেশ অর্ডিনান্স' অনুসারে মোট ৩৩১ জনকে আটক করা হয়, আর এই সকল আইনের বলে বিদেশ-প্রত্যাগত লোকদের মধ্যে মোট ২৫১৬ জনকে জেলে ও বিভিন্ন গ্রামে আটক ও অন্তরীণ করিয়া রাখা হয়। দূর-প্রাচ্য হইতে যে সকল শিখ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে আটক করা হয় মোট ৯১৪ জনকে। ইহা ব্যতীত জাফর আলি খাঁ দ্বারা পরিচালিত লাহোরের 'জমিন্দার' নামক বিখ্যাত সংবাদপত্রখানির উপর নানা বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়া উহার কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা করা হয়। এই পত্রিকাখানি সেই সময় 'ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র' ও ভারতীয় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সমর্থক ছিল এবং সরকারী দমননীতির তীব্র সমালোচনা করিতেছিল। এই জন্য সংবাদ মুদ্রণের পূর্বে উহার প্রত্যেকটি লিখিত সংবাদ সরকারের দ্বারা অনুমোদিত করাইবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই সময় বাল গঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহাদের 'হোমরুল' আন্দোলনের পক্ষে প্রচার-কার্যের জন্য পাঞ্জাবে আসিতেছিলেন। তাঁহাদের আগমনের সংবাদে ভীত হইয়া পাঞ্জাব-সরকার তাঁহাদের পাঞ্জাব-প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পাঞ্জাব প্রদেশকে কার্যত ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 'ভারত-রক্ষা আইন'-এর বেষ্টনী দ্বারা ঘিরিয়া রাখা হয়। এইভাবে পাঞ্জাব প্রদেশের এই দীর্ঘ বিপ্লব-প্রচেষ্টার অবসান ঘটে।

দশম অধ্যায়

ব্রহ্মদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা

ব্রহ্মদেশে 'গদর'

ব্রহ্মদেশে অনুষ্ঠিত বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ প্রধানত গদর সমিতির বিপ্লব-প্রচেষ্টার একটি বিশিষ্ট অংশ। 'গদর' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হইবার সময় হইতেই ভারতবর্ষ ব্যতীত শ্যামদেশ, মালয়, সাংহাই প্রভৃতি যে সকল স্থানে ভারতবাসীরা বাস করিত, সেই সকল স্থানে ইহা নিয়মিতভাবে প্রেরিত হইত। বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত ২২০ খানি 'গদর' পত্রিকা ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোকের নামে প্রেরণ করা হইত। 'গদর' পত্রিকার গুজরাটী সংস্করণের সম্পাদক ক্ষেমচাঁদ দামজি দীর্ঘ কাল রেঙ্গুনে থাকিয়া পরে সানফ্রান্সিসকো শহরে যান এবং 'গদর' পত্রিকায় যোগদান করেন। ক্ষেমচাঁদ দামজির মারফতই গদর সমিতি বিভিন্ন লোকের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করে। দামজিই রেঙ্গুনে থাকাকালে সর্বপ্রথম ব্রহ্মদেশে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন।

'জাহান-ই-ইসলাম'

ব্রহ্মদেশের বাহিরে প্রকাশিত আর একখানি পত্রিকার মারফত ব্রহ্মদেশে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচারের চেষ্টা চলে। এই পত্রিকাখানির নাম 'জাহান-ই-ইসলাম'। ইহা তুরস্কের কনস্টান্টিনোপল শহর হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে উর্দু, আরবী, তুর্কি ও হিন্দী ভাষায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। পত্রিকাখানির উর্দু-বিভাগের সম্পাদক ছিলেন পাঞ্জাবের আবু সৈয়দ নামক একজন মুসলমান বিপ্লবী। ইনিও বহু দিন পর্যন্ত ব্রহ্মের রাজধানী রেঙ্গুন শিক্ষক ও কেরানীর কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সহিত ইতালীর যুদ্ধের সময় ইনি মিশরে গমন করেন। এই পত্রিকাখানির বহু সংখ্যা রেঙ্গুন ও ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইত। প্রথমে ইহা ভারতবর্ষের লাহোর এবং কলিকাতা শহরেও প্রেরিত হইত। কিন্তু ইহার উগ্র খ্রীষ্টান-বিরোধী, বিশেষত বৃটিশ-বিরোধী

প্রবন্ধাবলীর জন্য ভারত-সরকার ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ভারতবর্ষে ইহার প্রবেশ বন্ধ করে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গদর সমিতির প্রতিষ্ঠাতা হরদয়াল কনস্টান্টিনোপ্‌ল-এ আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি এই পত্রিকার পরিচালকদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতের বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য চালাইবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলেন। উর্দু-বিভাগের সম্পাদক আবু সৈয়দ হরদয়ালের দ্বারা বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং হরদয়ালই ব্রহ্মদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টার জন্য এই দলটিকে পরিচালিত করেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এই পত্রিকার একটি সংখ্যায় হরদয়ালের একটি বৈপ্লবিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত সংখ্যায়ই মিশরের জাতীয়তাবাদী নেতা ফরিদ বে ও মনসুর আরিফৎ-এর রচিত দুইটি তীব্র বৃটিশ-বিরোধী প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর-সংখ্যায় মিশরের জাতীয়তাবাদী নেতা এনভার পাশার একটি বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বক্তৃতায় তিনি ভারতের হিন্দু-মুসলমানদিগকে আহ্বান করিয়া বলেন:

"ভারতবর্ষে 'গদর' (বিদ্রোহ) ঘোষণার উপযুক্ত সময় উপস্থিত। ইংরেজদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন কর, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লও, এবং সেই অস্ত্রের দ্বারা তাহাদের হত্যা কর। ভারতবাসীর সংখ্যা ৩২ কোটি, আর ইংরেজেরা সংখ্যায় মাত্র দুই লক্ষ; তাহাদের সকলকে হত্যা কর; তাহাদের কোন সৈন্যবলও নাই। শীঘ্রই তুর্কিরা সুয়েজখাল বন্ধ করিয়া দিবে। মাতৃভূমির মুক্তির জন্য যে ব্যক্তি প্রাণ বিসর্জন দিবে, সে অমর হইয়া থাকিবে। ভারতের হিন্দু-মুসলমান! তোমরা উভয়েই এক সৈন্যবাহিনীর সৈন্য, তোমরা দুই ভাই, আর নীচ ও অধম ইংরেজগুলি তোমাদের উভয়েরই শত্রু। তোমরা ইংরেজের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' (ধর্মযুদ্ধ) ঘোষণা করিয়া 'গাজী' (বীর) হও, তোমাদের সকল ভাইকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া ইংরেজ-শয়তানদের হত্যা কর এবং দেশের মুক্তি সাধন কর।"[১]

'জাহান-ই-ইসলাম' পত্রিকাখানি ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে বে-আইনী ঘোষিত হইবার পর ইহা 'গদর' পত্রিকার বাণ্ডিলের মধ্যে ভরিয়া পাঠান হইত। ব্রহ্মদেশ-প্রবাসী ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে এই পত্রিকাটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাবকে ভিত্তি করিয়া এবার ব্রহ্মদেশে বৈপ্লবিক সংগঠন স্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ হয়। কনস্টান্টিনোপ্‌ল-এ বসিয়া হরদয়াল এই প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতেন।

বিপ্লবের আয়োজন

আবু সৈয়দের পরামর্শে তুরস্কের 'ইয়ং-তুর্ক পার্টি'র[২] বিশিষ্ট নেতা তৌফিক বে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুনে আগমন করেন। তিনি রেঙ্গুনের মুসলমান ব্যবসায়ী-সমাজের নেতা আহম্মদ মোল্লা দাউদকে রেঙ্গুনে তুরস্কের কন্‌সাল নিযুক্ত করেন। দাউদ

১। 'Sedition Committee Report', p. 169.

২। এই পার্টি তীব্র বৃটিশ-বিরোধী বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

সাহেব ব্রহ্মদেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবেন—ইহা ভাবিয়াই তাঁহাকে কন্‌সাল পদে নিযুক্ত করা হয়।

মহাযুদ্ধের সময় তুরস্ক বৃটিশের বিরুদ্ধে জার্মেনীর পক্ষে যোগদান করিবার পর হাকিম ফৈম আলি ও আলী আহম্মদ সাদিকি নামে দুই জন ভারতীয় মুসলমান তুরস্ক হইতে রেঙ্গুনে আগমন করেন। 'বলকানযুদ্ধ''-এর সময় তুরস্ককে ঔষধপত্র দিয়া সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে 'রেড ক্রেসেণ্ট সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল। ইহারা সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরূপে তুরস্কে গিয়াছিলেন। হাকিম ফৈম আলি রেঙ্গুনে আগমন করেন তুরস্কের 'ইয়ং-তুর্ক পার্টি'র প্রতিনিধিরূপে। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব হরদয়ালের প্রেরণায় বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

গদর (বিদ্রোহ)

ব্রহ্মদেশে বৈষম্যমূলক সরকারী নীতির ফলে প্রবাসী ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব পূর্ব হইতেই তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর 'গদর' পত্রিকা ও 'জাহান-ই-ইসলাম' পত্রিকার প্রচারের ফলে তাহা বৈপ্লবিক রূপ গ্রহণ করিতে থাকে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বালুচি-স্থানের মুসলমানদের লইয়া গঠিত বালুচ-সৈন্যদের ১৩০নং রেজিমেণ্টটিকে শাস্তি হিসাবে বোম্বাই হইতে রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করা হয়। বোম্বাই-এ থাকাকালে এই সৈন্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের অত্যাচারী ইংরেজ-সেনাপতিকে হত্যা করিয়াছিল বলিয়াই এই দূরদেশে স্থানান্তরিত করিয়া তাহাদের শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। এই সৈন্যগণ রেঙ্গুনে আসিয়া পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই রেঙ্গুনের বিক্ষুব্ধ মুসলমানগণ 'গদর'-এর (বিদ্রোহের) জন্য তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। 'গদর' পত্রিকার বৈপ্লবিক প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই সৈন্যদলটিও বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়। রেঙ্গুনের মুসলমানদের প্রতিনিধিগণ ও সৈন্যদলের প্রতিনিধিগণ একত্রে পরামর্শ করিয়া জানুয়ারি মাসের শেষদিকে বিদ্রোহের সময় স্থির করেন। বিদ্রোহের আয়োজন পূর্ণোদ্যমে আগাইয়া চলে।

ইতিমধ্যে সামরিক কর্তৃপক্ষ কোন প্রকারে বিদ্রোহের আয়োজনের সংবাদ জানিয়া ফেলে এবং গোপনে বিদ্রোহ ব্যর্থ করিবার আয়োজন করে। ২০শে জানুয়ারি শেষ রাত্রে একটি ইংরেজ সৈন্যদল বালুচ-সৈন্যদের সকল ব্যারাক ঘিরিয়া ফেলে। থানা তল্লাসের ফলে 'গদর' পত্রিকার বহু সংখ্যা ইংরেজ সৈন্যদের হস্তগত হয়। বিদ্রোহের অভিযোগে দুই শত বালুচ-সৈন্যকে সামরিক বিচারে দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া আন্দামান দ্বীপে প্রেরণ করা হয়।

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার ঠিক পরেই কয়েকজন বিশিষ্ট গদর বিপ্লবী ব্যাঙ্কক ও ফিলিপাইন হইতে সিঙ্গাপুরে আগমন করেন। ইহাদের মধ্যে মুস্তাবা হোসেন ওরফে মুলচাঁদ অন্যতম। ইনি পূর্বে ছিলেন কানপুরের 'কোর্ট অফ ওয়ার্ডস'-এর একজন কর্মচারী। 'গদর' পত্রিকার বৈপ্লবিক প্রচারে অনুপ্রাণিত হইয়া ইনি বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত করেন এবং বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে সরকারী

'কোর্ট অফ ওয়ার্ডস'-এর কয়েক হাজার টাকা লইয়া উধাও হন। পরে তিনি ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা নগরীতে উপস্থিত হইয়া গদর সমিতিতে যোগদান করেন।

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র মুস্তাবা হোসেন অপর কয়েকজন বিশিষ্ট গদর-বিপ্লবীকে সঙ্গে লইয়া সিঙ্গাপুরে অবস্থিত সৈন্যদলগুলির মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচারকার্য চালাইয়া বিদ্রোহ সংগঠিত করিবার উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হন। তাঁহাদের প্রচারের ফলে সিঙ্গাপুরে অবস্থিত 'মালয় স্টেটস্ গার্ডস্' ও 'পঞ্চম পদাতিক রেজিমেণ্ট' নামক দুইটি সৈন্যদলই ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে প্রস্তুত হয়। বিদ্রোহের সময় স্থির হয় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়। ইতিমধ্যে বিদ্রোহের নায়কদের একখানি গোপন পত্র সরকারের হস্তগত হয়। কাশিম মনসুর নামক একজন গুজরাটী মুসলমান সিঙ্গাপুর হইতে রেঙ্গুনে তাঁহার পুত্রের নিকট এই পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই পত্রে সিঙ্গাপুরের 'মালয় স্টেটস্ গার্ডস্' নামক রেজিমেণ্টের বিদ্রোহের প্রস্তুতির সংবাদ দিয়া কয়েকটি যুদ্ধ-জাহাজ সিঙ্গাপুরে প্রেরণের জন্য তুরস্ক সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। এই পত্রখানি রেঙ্গুনে অবস্থিত তুরস্কের কন্‌সালের নিকট পৌঁছাইবার জন্যই কাশিম মন্‌সুর রেঙ্গুনে তাঁহার পুত্রের নিকট এই পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।

২৮শে ডিসেম্বর পত্রখানি ব্রহ্মের ইংরেজ-সরকারের হস্তগত হয়। ইংরেজ-সরকার অবিলম্বে 'মালয় স্টেটস্ গার্ডস্' রেজিমেণ্টটিকে স্থানান্তরিত করিয়া বিদ্রোহের পরিকল্পনা ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে। উক্ত রেজিমেণ্টটি অপসারিত হইবামাত্র অপর রেজিমেণ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া মালয়ের কয়েকটি অঞ্চল দখল করিয়া বসে। কয়েকদিন পর্যন্ত মালয় প্রকৃতপক্ষে এই সৈন্যদলের অধিকারে থাকে। ইতিমধ্যে ইংরেজ-সরকার রেঙ্গুন, হংকং প্রভৃতি স্থান হইতে কয়েকটি বড় সৈন্যদল লইয়া আসে এবং তাহাদের সাহায্যে মালয়ের বিদ্রোহী সৈন্যদের বন্দী করে। পঞ্চম পদাতিক রেজিমেণ্টটিও কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইংরেজদের হস্তে বন্দী হয়। ইহার পর সামরিক আদালতে বন্দী সৈন্যদের বিচার চলে। এই বিচারে প্রায় চারিশত সৈন্য বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড লাভ করে।

গুপ্ত সমিতি

এদিকে আলি আহ্‌ম্মদ ও ফৈম আলি তুরস্ক হইতে রেঙ্গুনে পৌঁছিবার পর তাঁহারা বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য লইয়া রেঙ্গুনের মুসলমানদের মধ্যে একটি গুপ্ত সমিতি গড়িয়া তোলেন। বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধনই এই গুপ্ত সমিতির উদ্দেশ্য হিসাবে প্রচার করা হয়। তাঁহারা রেঙ্গুনের মোমিন মুসলমান সম্প্রদায়ের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সাহায্যে বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে ১৫ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারা কয়েকটি রিভলভার ও পিস্তল ক্রয় করেন।

এই সময়, অর্থাৎ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে, হাসান খাঁ ও সোহনলাল পাঠক নামে গদর সমিতির দুইজন বিশিষ্ট সভ্য ব্যাঙ্কক হইতে গোপনে ব্রহ্মের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া রেঙ্গুনে উপস্থিত হন। তাঁহারা রেঙ্গুনে একখানি ঘর ভাড়া করিয়া

সেখানে গদর সমিতির কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। চিঠিপত্রের মারফত বাহিরের সহিত যোগাযোগ রাখিবার জন্ত তাঁহারা রেঙ্গুনের একটি 'পোস্টবক্স'ও ভাড়া করেন। ইতিপূর্বে মালয়ের সৈন্ত-বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর মুস্তাবা হোসেন ওরফে মূলচাঁদ প্রভৃতি গদর-বিপ্লবীরাও রেঙ্গুনে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। এবার তাঁহারাও হাসান খাঁ ও শোহনলালের সহিত মিলিত হন।

এদিকে রেঙ্গুন ও মালয়ের সৈন্ত-বিদ্রোহের পর ব্রহ্ম ও মালয়ের ইংরেজ-সরকার বিশেষ সতর্ক হইয়া গিয়াছিল। আরও বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের আশঙ্কা করিয়া তাহারা সীমান্ত ও ডাক চলাচল প্রভৃতি যোগাযোগ-ব্যবস্থার উপর বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে থাকে। দেখিতে না দেখিতে সমগ্র ব্রহ্ম ও মালয় অসংখ্য গুপ্তচরে ভরিয়া যায়। এই সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থার ফলে কয়েকখানি গোপন পত্র পুলিসের হস্তগত হয় এবং পুলিস বিপ্লবীদের 'পোস্টবক্স'-এর নম্বরটি জানিয়া ফেলে। এই সময় মালয়ের বিপ্লবীদিগকে রেঙ্গুনের 'পোস্টবক্স'-এর নম্বরটি জানাইবার জন্ত উহা উল্লেখ করিয়া মুস্তাবা হোসেন মালয়ে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রখানি মালয়-পুলিসের হস্তগত হয়। এই ঘটনাটি ঘটে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। জুন মাসে শ্যাম-ব্রহ্ম সীমান্তের নিকট ব্যাঙ্কক হইতে প্রেরিত বহু গদর-সাহিত্যপূর্ণ একটি প্রকাণ্ড বাক্‌স এবং আলি আহ্‌ম্মদ ও ফৈম আলির নিকট লিখিত দুইখানি পত্র পুলিসের হস্তগত হয়। এই সকল সূত্র হইতে গদর-বিপ্লবী ও রেঙ্গুনের মুসলমান বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগ-সম্পর্ক পুলিসের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে।

ব্রহ্মদেশের কুখ্যাত সামরিক পুলিস-বাহিনীতে ছিল ১৫ হাজার শিখ ও পাঞ্জাবী মুসলমান। বিপ্লবীরা পুলিস-বাহিনীর শিখ ও মুসলমানদের নিকট বিদ্রোহে যোগদানের প্রস্তাব করেন। তাঁহারা এই বাহিনীর মধ্যে 'গদর' পত্রিকা ও 'জাহান-ই-ইসলাম'-এর বহু সংখ্যা এবং অনেক বৈপ্লবিক ইস্তাহার প্রচার করিতে থাকেন। 'সামরিক ভাইদের নিকট ভালবাসার বাণী' শীর্ষক একখানি ইস্তাহারে ইংরেজ-শাসনের উচ্ছেদের জন্ত গদর অর্থাৎ বিদ্রোহের আহ্বান জানান হয়।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মেমিও শহরে অবস্থিত 'পার্বত্য গোলন্দাজ বাহিনী'র কয়েকজন সৈন্তের নিকট গদর এর বাণী ব্যাখ্যা করিবার সময় ব্রহ্মদেশে গদর সমিতির প্রধান পরিচালক শোহনলাল পাঠক গোয়েন্দাদের হস্তে গ্রেপ্তার হন। তাঁহার সঙ্গী নারায়ণ সিং পলায়ন করেন। গ্রেপ্তারের সময় শোহনলালের দেহ তল্লাস করিয়া তিনটি অটোম্যাটিক পিস্তল ও ২৭০টি কার্তুজ, হরদয়ালের রচিত একটি বৈপ্লবিক প্রবন্ধ, 'জাহান-ই-ইসলাম'-এর কয়েকটি সংখ্যা এবং বোমা তৈরির একটি নিয়মাবলী পাওয়া যায়। শোহনলালের গ্রেপ্তারের পাঁচ দিন পরে তাঁহার সঙ্গী নারায়ণ সিংও মেমিও শহরে গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের সময় তিনি একটি অটোম্যাটিক পিস্তল দ্বারা গুলি বর্ষণ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু বহু সশস্ত্র পুলিশের বেড়াজালে পড়িয়া তাঁহার পলায়নের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এই সময় শ্যামদেশের উত্তরভাগে একটি রেলপথ তৈরী হইতেছিল। ইহার

ইঞ্জিনিয়ারগণ সকলেই ছিল জার্মান। গদর বিপ্লবীরা জার্মান ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্যে গদর সমিতির বহু সভ্যকে এই রেলপথের কার্যে কুলী ও কর্মচারী হিসাবে প্রবেশ করাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সকল কুলী ও কর্মচারীরূপী বিপ্লবীদের জার্মান সামরিক অফিসারদের দ্বারা শিক্ষা দিয়া ইহাদের লইয়া একটি সৈন্যদল গঠন করাই ছিল গদর বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য। স্থির হইয়াছিল যে, জার্মান সামরিক অফিসারদের পরিচালনায় এই সৈন্যদল ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিয়া ব্রহ্মে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিবে। এই পরিকল্পনাটি ছিল 'ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র'-এরই একটি বিশিষ্ট অংশ। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্যই শোহনলাল পাঠক রেঙ্গুনে আসিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং নারায়ণ সিং শ্যামদেশের উক্ত রেলপথের কর্মচারী সাজিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিলেন।[১]

শোহনলাল ও নারায়ণ সিংয়ের গ্রেপ্তারের পর রেঙ্গুনের গদর সমিতির কর্মকেন্দ্রে খানাতল্লাস হয় এবং বহু মালপত্রসহ কয়েকজন বিপ্লবী গ্রেপ্তার হন। এবার ধৃত বিপ্লবীদের লইয়া 'প্রথম মান্দালয় ষড়যন্ত্র-মামলা' আরম্ভ হয়। মামলার বিচারে শোহনলালের ফাঁসী, নারায়ণ সিংয়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়।

ব্রহ্মদেশে বিদ্রোহের সর্বশেষ চেষ্টা হয় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে। এই চেষ্টা রেঙ্গুনের মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই প্রচেষ্টার উদ্যোক্তা ছিলেন কৈম আলি ও আলি আহ্‌ম্মদ। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতি ইহার আয়োজন করে। প্রথমে বিদ্রোহের তারিখ স্থির হয় অক্টোবর মাসের 'বকর-ইদ' পর্বের দিন। বিদ্রোহীরা ঘোষণা করেন যে, উক্ত পর্বের প্রথানুযায়ী বকরি বা ছাগল ও গরু কোরবানীর পরিবর্তে "ইংরেজ শয়তান"দের কোরবানী করা হইবে। কিন্তু বিদ্রোহের আয়োজন সম্পূর্ণ না হওয়ায় বিদ্রোহের তারিখ স্থির হয় ২৫শে ডিসেম্বর। ব্রহ্মের সামরিক পুলিশের একটি মুসলমান 'ব্যাটালিয়ন'ও এই বিদ্রোহে যোগদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। এই ব্যাটালিয়ন'টি অবস্থিত ছিল পিয়াবোয়া নামক স্থানে। নভেম্বর মাসে বিদ্রোহের সকল পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ জানিয়া ফেলে এবং রিভলভার, ডিনামাইট ও অন্যান্য জিনিসপত্রের একটি গুদাম আবিষ্কৃত হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বহু বিদ্রোহী ও সামরিক বাহিনীর পুলিসকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এবার ইহাদের লইয়া 'দ্বিতীয় মান্দালয় ষড়যন্ত্র মামলা' আরম্ভ হয়। মামলার বিচারে বিদ্রোহীদের দীর্ঘ কারাদণ্ড এবং পুলিস ও সৈন্যদের অন্তরীণ করা হয়। এইভাবে ব্রহ্মদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টার অবসান ঘটে।

১। 'ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

একাদশ অধ্যায়

যুক্তপ্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা (১৯০৭-১৫)

পূর্ব-ইতিহাস

বাঙলাদেশের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অগ্নিচ্ছটায় যুক্তপ্রদেশের রাজনৈতিক আকাশও লাল হইয়া উঠিতে থাকে। তখন একদিকে বোমা ও পিস্তলের গর্জনে বাঙলাদেশ মুখরিত হইতেছিল, অপরদিকে পাঞ্জাবের আকাশে বিপ্লবের ঝড় বহিতেছিল। এই দুই প্রদেশের বৈপ্লবিক সংগ্রামের উত্তাপে যুক্তপ্রদেশেও বিপ্লবের আগুন ধূমায়িত হইয়া উঠিতে থাকে।

যুক্তপ্রদেশে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য লইয়া ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এলাহাবাদে 'স্বরাজ্য' পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পত্রিকা প্রকাশের মূলে ছিলেন শান্তিনারায়ণ নামক এক ব্যক্তি। ইনি পূর্বে ছিলেন পাঞ্জাবের একখানি প্রগতিশীল রাজনীতিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের তিন আইনে পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় এবং অজিত সিংয়ের গ্রেপ্তার ও আটকের প্রতিবাদে 'স্বরাজ্য' পত্রিকায় এক 'রাজদ্রোহ'মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া শান্তিনারায়ণ যুক্তপ্রদেশের যুব-সম্প্রদায়কে বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য আহ্বান জানান। ইহার পর হইতে এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বৈপ্লবিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে থাকে। মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী কর্তৃক বোমা নিক্ষেপ উপলক্ষে এক 'রাজদ্রোহ'মূলক প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে শান্তিনারায়ণ দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু ইহাতেও 'স্বরাজ্য' পত্রিকার বৈপ্লবিক প্রচার বন্ধ না হইয়া বরং তাহা আরও তীব্র হইয়া উঠে। শান্তিনারায়ণের পর একে একে আট জন সম্পাদক গ্রেপ্তার হইয়া রাজদ্রোহ প্রচারের অপরাধে কারা বরণ করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে নূতন 'ভারতীয় প্রেস-আইন' পাস হইবার পর যুক্তপ্রদেশের সরকার 'স্বরাজ্য' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে 'কর্মযোগী' নামক আর একখানি পত্রিকা এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইয়া অনুরূপভাবে বৈপ্লবিক প্রচার আরম্ভ করে। কিন্তু ইহাও ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে নূতন প্রেস-আইনের কবলে পতিত হইয়া বন্ধ হয়।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে হোতিলাল বর্মা নামক এক ভদ্রলোক আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট প্রকাশ্যেই ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিবার আবেদন জানান। ইনি ছিলেন জাঠ-সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রথমে পাঞ্জাবের কয়েকখানি রাজনীতিক সংবাদপত্রে সহকারী সম্পাদক হিসাবে কার্য করিয়া পরে ইনি কিছুদিনের জন্য বাঙলাদেশে অরবিন্দ ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত ইংরেজী 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার আলিগড়ের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে ইনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশ ঘুরিয়া য়ুরোপে গিয়াছিলেন এবং ফরাসী দেশে যাইয়া

ভারতীয় বিপ্লবীদের দ্বারা বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে হোতিলাল আলিগড়ের ছাত্রদের লইয়া এক বৈপ্লবিক সমিতি গঠনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে 'রাজদ্রোহ'মূলক প্রচারকার্য আরম্ভ করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি যুক্তপ্রদেশ-সরকারের রোষ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়া গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের সময় তাঁহার গৃহ খানাতল্লাস করিয়া পুলিস কতকগুলি বৈপ্লবিক সাহিত্য ও বাঙলাদেশের যুগান্তর সমিতি কর্তৃক রচিত একটি বোমা তৈরির নিয়মাবলী হস্তগত করে। 'রাজদ্রোহ' প্রচার ও বৈপ্লবিক সাহিত্য রাখিবার অপরাধে তিনি দশ বৎসরের দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কাশীর বাঙালীটোলা উচ্চ ইংরেজী-বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র শচীন্দ্রনাথ সান্যাল তাঁহার স্কুলের অপর কয়েকটি ছাত্রের সহিত একত্রে বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য লইয়া একটি সমিতি স্থাপন করেন। ইহার নাম রাখা হয় 'অনুশীলন সমিতি'। এই সময় শচীন্দ্রনাথ ঢাকা 'অনুশীলন সমিতি'র কোন সভ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। সেই সভ্যের নিকট হইতেই শচীন্দ্রনাথ বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। সম্ভবত তাঁহারই পরামর্শ অনুসারে শচীন্দ্রনাথ এই সমিতির নাম "অনুশীলন সমিতি" রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অনুশীলন সমিতির ক্রিয়াকলাপ ও আলোচনা শীঘ্রই পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সমিতির সভ্যদের উপর পুলিসের উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। ইহার ফলে এই সমিতির নাম পরিবর্তন করিয়া রাখা হয় 'যুব-সঙ্ঘ' (ইয়ং মেনস্ এসোসিয়েশন)। এই সমিতির সভ্যদের চেষ্টায় কাশীর ছাত্রদের মধ্যে একটি প্রকাশ্য সংগঠন গড়িয়া উঠে। ইহার নাম রাখা হয় 'স্টুডেণ্টস্ য়ুনিয়ন লীগ'।

অনুশীলন সমিতি বা যুব-সঙ্ঘের গঠনতন্ত্রে উল্লেখ করা হয় যে, সমিতির সভ্যদের নৈতিক, শারীরিক ও মানসিক উন্নতিসাধন করাই ইহার উদ্দেশ্য। শচীন্দ্রনাথের চেষ্টার ফলেই এই সমিতি একটি বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া উঠিতে থাকে। তিনি সমিতির সভ্যদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে বাছিয়া লইয়া তাহাদের কানে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র দান করিতেন। ইহার ফলে শীঘ্রই সমিতির মধ্যে অন্যান্য সভ্যদের অলক্ষ্যে একটি বিপ্লবিদল গড়িয়া উঠে। শচীন্দ্রনাথ ইহাদের লইয়া আলোচনা-বৈঠক করিতেন। সেই সকল বৈঠকে কিশোর-বিপ্লবীদের মনে বৈপ্লবিক চেতনা ও সাহস জন্মাইবার জন্য তিনি ভগবদ্গীতার বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। বৈপ্লবিক সংগঠন সৃষ্টির নিয়ম-কানুন ও রাজনৈতিক হত্যা প্রভৃতির বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য শিখাইবার জন্য তিনি ইতালীর সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নেতা ম্যাৎসিনির জীবন-কাহিনী পাঠ করিয়া শুনাইতেন। সভ্যদের জন্য তিনি ম্যাৎসিনির জীবনীর উপর একটি টীকাও রচনা করিয়াছিলেন।

"বাৎসরিক কালীপূজায় ইহারা প্রতি বৎসর একটি শাদা লাউ বলি দিতেন। অবশ্য শাদা লাউ বলি দেওয়া কোন অন্যায় কার্য নয়। কিন্তু ইহারা শাসক শ্বেত জাতির লোক হত্যার প্রতীক হিসাবেই ইহা করিতেন। ইহা ব্যতীত ইংরেজদের বিতাড়িত করিবার শক্তি কামনা করিয়া কালীর নিকট প্রার্থনাও করা হইত।"[১]

১। Judgment of the Beneras Conspiracy Case.

শচীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার বিপ্লবী দল গঠন করিতে ব্যস্ত, তখন যুব-সঙ্ঘের পরিচালনাভার কাশীর কয়েকটি ভীরু লোকের হস্তে ন্যস্ত হয়। ইহারা কেবল বিপ্লবের বাগাড়ম্বর করিয়াই নিজেদের কর্তব্য শেষ করিত এবং নিজেদের বড় বিপ্লবী বলিয়া জাহির করিত। এই নেতাদের বিরুদ্ধে দুইটি বিরোধী দল দেখা দেয়। প্রথম দল হইল সমিতির সাধারণ সভ্যগণ। তাঁহারা সঙ্ঘের পরিচালকদের প্রকাশ্য বৈপ্লবিক আলাপ-আলোচনায় ভয় পাইয়া সমিতির সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করে। অপরটি শচীন্দ্রনাথের দল। তাঁহারা পরিচালকদের নিষ্ক্রিয় বাগাড়ম্বরে বিরক্ত হইয়া যুব-সঙ্ঘের সহিত সম্পর্ক ছেদ করেন। এইবার শচীন্দ্রনাথ নিজেই একটি গোপন বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতি এবার শচীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কাজ আরম্ভ করে।

প্রথমদিকে শচীন্দ্রনাথের সংগঠনটি ছিল বাঙলাদেশের অনুশীলন সমিতিরই একটি শাখাবিশেষ। অনুশীলন সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়াই শচীন্দ্র তাঁহার সংগঠনের কার্য পরিচালনা করিতেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ঘন ঘন কলিকাতায় আসিতে হইত। বাঙলাদেশের অনুশীলন সমিতি শচীন্দ্রের সহিত শশাঙ্কমোহন হাজরা ওরফে অমৃত হাজরার[১] মারফত যোগাযোগ রক্ষা করিত। শশাঙ্কমোহন শচীন্দ্রকে বহু টাকা ও বোমা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন।

শচীন্দ্র তাঁহার দলের সহিত প্রায়ই গ্রামাঞ্চলে গিয়া গ্রামবাসীদের লইয়া সভা করিতেন। এই সকল সভায় বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করিয়া গ্রামের চাষীদের বুঝাইতেন যে, এদেশ হইতে ইংরেজদের বিতাড়িত করিতে না পারিলে দেশের কোন উন্নতি সম্ভব নয়, আর দেশ হইতে ইংরেজ-বিতাড়নের একমাত্র উপায় সশস্ত্র অভ্যুত্থান। এই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে বিপ্লবীরা কয়েকটি ইস্তাহার বাহির করেন। ইস্তাহারগুলি কাশীর বিভিন্ন স্কুল-কলেজে, প্রতি পল্লীতে এবং গ্রামাঞ্চলে বিলি করা হয়। ডাক মারফতও বিভিন্ন স্থানে বহু ইস্তাহার পাঠান হইত।

বিপ্লবের আয়োজন

কাশীর বৈপ্লবিক সমিতি এইভাবে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্য পরিচালনা করে। ঐ বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে রাসবিহারী বসু লাহোর হইতে পলায়ন করিয়া কাশীতে আসিয়া শচীন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হন। ইতিপূর্বে তিনি লাহোরকে কেন্দ্র করিয়া পাঞ্জাব ও দিল্লীতে বিপ্লবের আয়োজন করিতেছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বড়লাট-হত্যার চেষ্টা প্রভৃতির পর 'প্রথম দিল্লী ষড়যন্ত্র-মামলা' আরম্ভ হইলে ভারত-সরকার রাসবিহারীকেই প্রধান আসামী বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাঁহার গ্রেপ্তারের জন্য একটি লোভনীয় পুরস্কার ঘোষণা করে। রাসবিহারী কোনক্রমে পুলিসের ব্যাপক বেষ্টনী এড়াইয়া লাহোর হইতে পলায়ন করেন এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কাশীতে আসিয়া শচীন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হন।

১। শশাঙ্ক ওরফে অমৃত হাজরা কলিকাতার রাজাবাজার অঞ্চলের 'বোমার ফ্যাক্টরি'তে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেপ্তার হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সম্পর্কে 'বাঙলার বিপ্লব-প্রচেষ্টা' শীর্ষক অধ্যায়ের '১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ' অনুচ্ছেদটি দ্রষ্টব্য।

শচীন্দ্রনাথ রাসবিহারীকে পাইয়া তাঁহার দলের পরিচালনা-ভার রাসবিহারীর হস্তেই অর্পণ করেন। রাসবিহারী কাশীতে থাকিয়াই শচীন্দ্রনাথের দলটিকে পুনর্গঠিত করিয়া উহার সাহায্যে সারা যুক্তপ্রদেশে বৈপ্লবিক সংগঠন বিস্তারের চেষ্টা আরম্ভ করেন। সমগ্র প্রদেশের নেতৃস্থানীয় কর্মীরা কাশীতে আসিয়া রাসবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। রাসবিহারী তাঁহাদের লইয়া আলোচনা-বৈঠক করিতেন এবং বিপ্লবের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেন। তিনি তাঁহাদের বোমা ও রিভলভার ছুঁড়িবার কৌশলও শিক্ষা দেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি একবার একটি বোমা লইয়া কর্মীদের উহা ছুঁড়িবার কৌশল শিখাইবার সময় হঠাৎ বোমাটি ফাটিয়া যাওয়ায় তিনি ও শচীন্দ্র গুরুতররূপে আহত হন। এই বোমা বিস্ফোরণের শব্দে তিনি যে পাড়ায় থাকিতেন সেই পাড়ার অধিবাসীদের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। তাহার ফলে রাসবিহারী আশ্রয় পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র ও গদর-বিপ্লবের সংবাদ লইয়া সত্যেন্দ্রনাথ সেন ও বিষ্ণুগণেশ পিংলে বার্লিন হইতে ভারতে উপস্থিত হন এবং নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কাশীতে আসিয়া রাসবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। পিংলে রাসবিহারীকে পাঞ্জাবে ফিরিয়া গিয়া আসন্ন বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। পিংলের এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন ও রাসবিহারীর গোপন আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য রাসবিহারী পিংলে ও শচীন্দ্রনাথকে পাঞ্জাবে প্রেরণ করেন। পিংলে ও শচীন্দ্রনাথ সকল ব্যবস্থা করিয়া কাশীতে ফিরিয়া আসেন।

পাঞ্জাব যাত্রা করিবার পূর্বে রাসবিহারী যুক্তপ্রদেশের নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের এক সভা করেন। এই সভায় ভারতের আসন্ন বিপ্লব ও বিপ্লবীদের আশু কর্তব্য ব্যাখ্যা করিয়া তিনি সকলকে "দেশের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে মৃত্যু বরণ করিবার জন্য" প্রস্তুত হইতে বলেন। এই সভায় স্থির হয় যে, পিংলে ও শচীন্দ্রনাথ উভয়েই রাসবিহারীর সহিত পাঞ্জাব গমন করিবেন এবং দামোদর স্বরূপ নামে এক বিপ্লবী এলাহাবাদে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া দলের পরিচালক হিসাবে বিপ্লবের আয়োজন করিবেন।

রাসবিহারী ও শচীন্দ্রনাথ পরামর্শ করিয়া বাঙলাদেশ হইতে কতকগুলি বোমা আনাইবার জন্য দুই ব্যক্তিকে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। বাঙলাদেশ হইতে সংগৃহীত বোমা লাহোরে পৌঁছাইবার জন্য বিনায়ক রাও কপিলকে নিযুক্ত করা হয়। বেনারস ক্যান্টনমেণ্টের সৈন্যদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন ও বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সময় তাঁহাদের সাহায্য লাভের চেষ্টার ভার পড়ে বিভূতি ও প্রিয়নাথ নামক দুইজন সভ্যের উপর। ইহা ব্যতীত, নলিনী মুখোপাধ্যায়[১] নামে একজন বাঙালী বিপ্লবীকে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর শহরে অবস্থিত সৈন্যদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রেরণ করা হয়। এই সকল ব্যবস্থা শেষ করিয়া পিংলে ও শচীন্দ্রনাথের সহিত

১। নলিনী মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী কার্যকলাপ সম্পর্কে "মধ্যপ্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা" শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

রাসবিহারী লাহোর যাত্রা করেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই শচীন্দ্রনাথ নিজে কাশীর বৈপ্লবিক আয়োজনের ভার গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে কাশীতে ফিরিয়া আসেন।

ইতিমধ্যে বাঙলাদেশ হইতে পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের জন্য বহু বোমা আসিয়া পৌছে। শচীন্দ্রনাথ বিনায়ক রাও কপিল[১] ও মণিলাল[২] নামক দুইজন সভ্যের মারফত লাহোরে রাসবিহারীর নিকট আঠারটি বোমা প্রেরণ করেন। মণিলাল লাহোরে পৌছিয়া রাসবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাসবিহারী তাঁহাকে জানাইয়া দেন যে, সমগ্র উত্তর-ভারতে একই দিনে সশস্ত্র অভ্যুত্থান আরম্ভ হইবে এবং ইহার তারিখ স্থির হইয়াছে ২১শে ফেব্রুয়ারী। তিনি মণিলালের মারফত শচীন্দ্রনাথকে সেই অনুযায়ী আয়োজন করিবার নির্দেশ দেন।

পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা পরে কয়েকটি কারণে এই তারিখ পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন। প্রথমত, তাঁহারা সন্দেহ করেন যে, দলের মধ্যে পুলিসের গোয়েন্দা প্রবেশ করিয়া সকল গোপন ব্যবস্থা জানিয়া ফেলিয়াছে; দ্বিতীয়ত, ইতিমধ্যেই পাঞ্জাবে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। এই সকল কারণে অভ্যুত্থানের তারিখ পরিবর্তন করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিল না। কিন্তু গোলমালের মধ্যে রাসবিহারী এই সংবাদ শচীন্দ্রনাথকে সময় মত জানাইতে পারিলেন না।

এদিকে শচীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্মীরা তারিখ পরিবর্তন ও পাঞ্জাবের গ্রেপ্তারের সংবাদ জানিতে না পারিয়া পূর্ব-ব্যবস্থা অনুসারে অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হন। তাঁহারা ২১শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাকালে কাশীর সামরিক কুচকাওয়াজের ময়দানে অস্ত্র-সজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। কিন্তু অভ্যুত্থান আরম্ভ করিবার শেষ নির্দেশ না পাইয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর তাঁহারা চলিয়া যান।

এদিকে রাসবিহারী ও পিংলে কোন প্রকারে লাহোর হইতে পলায়ন করিয়া কাশীতে উপস্থিত হন। ইহার কয়েকদিন পরেই দশটি বোমা লইয়া পিংলে[৩] চলিয়া যান এবং ২৩শে মার্চ মীরাটে সৈন্যদের ব্যারাকের লাইনে বোমাসহ গ্রেপ্তার হন।

রাসবিহারীর পলায়ন

লাহোরের গ্রেপ্তারের পর সমগ্র উত্তর-ভারত জুড়িয়া পুলিসের তাণ্ডব আরম্ভ হয়। অভ্যুত্থানের প্রধান নায়ক রাসবিহারীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিস লাহোর হইতে কাশী পর্যন্ত তোলপাড় করিতে পাকে। শচীন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁহার সহকর্মীরা তাঁহাকে অবিলম্বে কাশী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। রাসবিহারীও গ্রেপ্তার এড়াইবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া কলিকাতায় চলিয়া যান। ইহার পরেও যুক্তপ্রদেশের প্রধান বিপ্লবী কর্মীরা কলিকাতায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। এই সময় কলিকাতায় একটি বৈঠক হয়। এই বৈঠকে রাসবিহারীর ভবিষ্যৎ কর্তব্য ও যুক্তপ্রদেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠকে বহু আলোচনার পর স্থির হয় যে, রাসবিহারী অবিলম্বে ভারত

১। বৈপ্লবিক সমিতির বিরুদ্ধে পুলিসের সহিত সহযোগিতা করার শাস্তি স্বরূপ কপিল পরে বিপ্লবীদের হস্তে নিহত হন। ২। মণিলাল পরে 'বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলা'র রাজসাক্ষী হন। ৩। পরে পিংলের ফাঁসি হয়।

ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য কোন দেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবেন এবং সেখান হইতে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হইয়া ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবেন। এই সময় ব্যাঙ্কক, বাটাভিয়া ও সাংহাই হইতে বিপ্লবীরা ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র সফল করিয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। রাসবিহারীও অবিলম্বে ভারত ত্যাগ করিয়া ইঁহাদের সহিত মিলিত হইবার সিদ্ধান্ত করেন।

এই বৈঠকে যুক্তপ্রদেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টা সম্পর্কে স্থির হয় যে, শচীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে গিরিজাবাবু একত্রে যুক্তপ্রদেশের বৈপ্লবিক সংগঠন পরিচালনা করিবেন এবং এই প্রদেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিবেন। নগেন্দ্রনাথ ওরফে গিরিজাবাবু রাসবিহারী ও শচীন্দ্রনাথেরই সুযোগ্য সহকর্মী। ইহার পূর্বে, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'র বিখ্যাত পরিচালক পুলিনবিহারী দাস গ্রেপ্তার হইয়া আটক ছিলেন, তখন গিরিজাবাবুই সেই বিরাট বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন এবং যথেষ্ট বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া বৈপ্লবিক সংগঠনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। এই জন্য মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি' যুক্তপ্রদেশের বৈপ্লবিক আয়োজনে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করে।

বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলা

এই সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার কয়েকদিন পরেই ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে পূর্বগামী একখানি জাহাজে চড়িয়া রাসবিহারী সাংহাই নগরীতে উপস্থিত হন এবং অবনী মুখার্জি প্রভৃতি বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হইয়া ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার চেষ্টা করেন। ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র ও ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য তিনি সাংহাই হইতে পলায়ন করিয়া জাপানে উপস্থিত হন। সেই সময় হইতেই তিনি জাপানে থাকিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার-কার্য চালাইয়া যান।

অন্য দিকে শচীন্দ্র ও গিরিজাবাবু যুক্তপ্রদেশের বৈপ্লবিক সংগঠনের ভার গ্রহণ করিবার কয়েকদিন পরেই অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত উভয়ে গ্রেপ্তার হন। তাহার পর ইঁহাদের লইয়া এক ষড়যন্ত্র-মামলা আরম্ভ হয়। এই মামলাই 'বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলা' নামে খ্যাত। রাসবিহারীকেই এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক ও শচীন্দ্রনাথকে তাঁহার প্রধান সহকারী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ইঁহাদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত অভিযোগগুলি উপস্থিত করা হয়: (১) বোমা প্রস্তুত ও অস্ত্র সংগ্রহ, (২) বিদ্রোহের জন্য সৈন্যদের উত্তেজিত করা, (৩) 'রাজদ্রোহ'মূলক সাহিত্য প্রচার ও বক্তৃতা, এবং (৪) 'সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম'।

প্রায় দুই মাস ধরিয়া মামলার বিচার চলে। মামলার বিচারে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও নগেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে গিরিজাবাবুর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর; গণেশলাল, লক্ষ্মীনারায়ণ, নলিনী মুখোপাধ্যায়, দামোদর স্বরূপ ও প্রতাপ সিং—প্রত্যেকের

পাঁচ বৎসর, আনন্দ ভট্টাচার্য, কালীপদ ঘোষ, বঙ্কিম মিত্র—প্রত্যেকের তিন বৎসর, এবং শচীন্দ্রনাথের ভাই জিতেন্দ্রনাথের দুই বৎসর কারাদণ্ড হয়। সুরেন মুখার্জি ও রবীন্দ্র রায় নামে দুইজন মুক্তিলাভ করেন। নগেন্দ্রনাথ ওরফে গিরিজাবাবু কারাগারেই প্রাণ ত্যাগ করেন এবং শচীন্দ্রনাথ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের ঘোষণা অনুসারে মুক্তিলাভ করেন।

কাশীর বিপ্লবীদের এই বিপ্লব-প্রচেষ্টা ছিল বঙ্গীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টারই একটি অংশ-বিশেষ। ইহারা বাঙলাদেশের বিপ্লবীদের নিকট হইতেই বৈপ্লবিক প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন এবং ভারত-জোড়া একটি বিরাট বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে সরকারী অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে বলা হয়:

"এই মামলার সকল দিক বিচার করিয়া বলা যায় যে, এই বিপ্লবীরা বাঙলা-দেশ হইতে মূল প্রেরণা লাভ করিয়া ক্রমশ বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং অবশেষে রাসবিহারীর পরিচালনায় এক বিরাট বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের যোগসূত্রে পরিণত হন।..."[১]

'এলান-ই-জঙ্গ'

পাঞ্জাব ও উত্তর-প্রদেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পর একদিকে আরম্ভ হইয়াছিল 'লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা', অপর দিকে চলিতেছিল 'বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলা'র বিচার। বাহির হইতে মনে হইতেছিল যেন উত্তর-ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার অবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিপ্লবীদের কর্ম-প্রচেষ্টা আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হয়। এই প্রচেষ্টার কেন্দ্ররূপে কাজ করিতেছিলেন হরনাম সিং নামে পাঞ্জাবের জাঠ-সম্প্রদায়ভুক্ত এক শিখ। হরনাম সিং পূর্বে ছিলেন '৯নং ভূপাল পদাতিক বাহিনী'র একজন হাবিলদার। পরে তিনি 'রেজিমেণ্ট বাজার'-এ 'চৌধুরী'রূপে কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার কর্মস্থান ছিল অযোধ্যার ফৈজাবাদ শহরে। বাজারের 'চৌধুরী' হিসাবে কাজ করিবার সময়ই তিনি গদর-বিপ্লবীদের দ্বারা বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন। লাহোরে গিয়া রাসবিহারী উত্তর-ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার কর্ণধাররূপে কাজ আরম্ভ করিবার পর তিনি হরনাম সিং-এর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া তাঁহার মারফত ফৈজাবাদের সৈন্যদের মধ্যে প্রচার-কার্য চালাইতেন। লুধিয়ানার বিপ্লবী ছাত্র-নায়ক সুচা সিং রাসবিহারী ও হরনাম সিং-এর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতেন।

হরনাম সিং রাসবিহারীর নিকট হইতে বিপ্লবী স্বাধীন ভারতের প্রতীক-স্বরূপ একটি জাতীয় পতাকা ও বহু সংখ্যায় 'এলান-ই-জঙ্গ' (বিপ্লবী ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা) নামক পুস্তিকাটি সংগ্রহ করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ফৈজাবাদের দেশীয় সৈন্যদের লইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিবামাত্র হরনাম সিং এই জাতীয় পতাকাটি উড়াইবেন এবং বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ঘোষণা-পত্র হিসাবে 'এলান-ই-জঙ্গ' পুস্তিকাটি জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিবেন।

১। 'Sedition Committee Report', p. 135,

লাহোর ও বেনারসের বিপ্লবের আয়োজন ব্যর্থ হইলেও হরনাম সিং নিরুৎসাহ না হইয়া তাঁহার উপর ন্যস্ত বৈপ্লবিক কর্তব্য সম্পাদনের আয়োজন করিতে থাকেন। তিনি পূর্ব-পরিচিত সৈন্যদের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইয়া যান। তাহাদের মারফত সৈন্যদের ব্যারাকে ব্যারাকে প্রচার-কার্য চলিতে থাকে, 'এলান-ই-জঙ্গ'-এর বৈপ্লবিক বাণী—"ভারতের দস্যু শাসকদের বিরুদ্ধে সিংহের মত গর্জিয়া উঠ, ইংরেজ-শয়তানগুলিকে হত্যা কর, দেশ হইতে তাহাদের বিতাড়িত কর"—দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের চাঞ্চল্য জাগাইয়া তোলে। যেদিন ফৈজাবাদের আকাশে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকাখানি উড্ডীন হইবে, হরনাম সিং সেই দিনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

এদিকে গোয়েন্দা-পুলিসের দল হরনাম সিংয়ের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের সন্ধান পায়। তাহারা হরনাম সিংকে গ্রেপ্তার করিয়া আসন্ন সৈন্য-বিদ্রোহ ব্যর্থ করিবার আয়োজন করে। হরনাম সিং পুলিসের হস্তে গ্রেপ্তার হন। পুলিস খানাতল্লাস করিয়া হরনাম সিংয়ের গৃহ হইতে রাসবিহারীর দেওয়া স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকাটি ও 'এলান-ই-জঙ্গ'-এর কতিপয় কপি হস্তগত করে। হরনাম সিংহের সহকর্মীদের নাম জানিবার জন্য পুলিস তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াও ব্যর্থ হয়। অবশেষে সৈন্যদের মধ্যে "রাজদ্রোহ প্রচার ও ষড়যন্ত্র" এবং "সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম"-এর অভিযোগে তাঁহার বিচার চলে। এই বিচারে তিনি দশ বৎসরের দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হন।

শেষ প্রচেষ্টা

'বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলা'র বিচারে কাশীর বিখ্যাত বিপ্লবীরা কারাগারে আবদ্ধ হওয়ায় মনে হইল যেন বিপ্লবের আগুন জ্বালিবার পূর্বেই উহার সকল সম্ভাবনাই শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া কাশীর কয়েকজন বিপ্লবী আবার কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সুরনাথ ভাদুড়ী নামে কাশীর এক অভিজ্ঞ বিপ্লবী ইঁহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কাশীর বৈপ্লবিক সংগঠনের চরম দুর্দশা দেখিয়া বাঙলার বিপ্লবীরা তাঁহাদের সাহায্যে অগ্রসর হন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বাঙলাদেশের যুগান্তর সমিতি কাশীর বিপ্লবীদের নিকট কয়েকখানি বৈপ্লবিক ইস্তাহার প্রেরণ করে। ঐ মাসেই উক্ত ইস্তাহারগুলি কাশী শহরে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিলি করা হয়। এই ইস্তাহার বিলি করিবার অভিযোগে দুইজন বিপ্লবী গ্রেপ্তার হন। তাঁহাদের একজন ছিলেন নারায়ণচন্দ্র দে। নারায়ণচন্দ্র ছিলেন ঢাকা অনুশীলন সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য। বাঙলাদেশে থাকাকালে তিনি বোমাদ্বারা একটি ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে পুলিস তাঁহাকে খুঁজিতে থাকিলে তিনি সমিতির পরিচালকদের নির্দেশে কাশীতে পলায়ন করেন এবং আত্মগোপন করিয়া শিক্ষকের চাকরি করিতে থাকেন। চাকরি গ্রহণের পর হইতেই তিনি কাশীর বৈপ্লবিক সংগঠনে থাকিয়া আবার বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করেন। রাজদ্রোহমূলক 'ইস্তাহার' বিলি করিবার অপরাধে তাঁহারও দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়।

সাম্রাজ্যবাদের সহিত সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করে। কিন্তু ভারতীয় শিল্পের বিকাশে নিরবচ্ছিন্নভাবে সাম্রাজ্যবাদের বাধাদানের নীতির ফলে ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়াগোষ্ঠী এবং বেকারি প্রভৃতি বিভিন্ন আর্থনীতিক ও রাজনীতিক কারণে মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত অংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বিরোধিতার নীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী হইতে আগত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা মহাযুদ্ধের সুযোগে ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির নিকট হইতে অস্ত্র-সাহায্য লইয়া এবং দেশের মধ্যে বোমা-পিস্তলের সাহায্যে এক বিশেষ প্রকারের বৈপ্লবিক সংগ্রাম আরম্ভ করে। কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বৃহৎ বুর্জোয়াগোষ্ঠীর সহিত আপসের পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়, আর বৃহৎ বুর্জোয়ারা আর্থনীতিক সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে থাকে।

"যখন মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে ভারতবর্ষের অবস্থা এতই বিপজ্জনক ছিল যে ভারতীয় বুর্জোয়াদের অপেক্ষাকৃত ধনী অংশকে সুবিধা-সুযোগ দিয়া স্বপক্ষে আনয়ন করিবার নীতি গ্রহণ করিতে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হয়। ইহা করা হয় দুই প্রকারে—(১) এই আশ্বাস দিয়া যে, ভারতবর্ষ বৃটিশ সরকারকে যুদ্ধ পরিচালনায় সাহায্য করিলে উহাকে স্বায়ত্তশাসন দান করা হইবে, এবং (২) ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশের তুলাজাত পণ্যের উপর শতকরা ৭½ টাকা হারে আমদানি-শুল্ক ধার্য করিয়া। এই দ্বিতীয় সুবিধাটি মঞ্জুর করা হইয়াছিল এই জন্য যে, পূর্বের বৃটিশ শিল্পপতিদের অধিকৃত বাজার জাপান উহার পণ্যসম্ভার দ্বারা গ্রাস করিতেছিল। যাহাই হউক, ভারতীয় মূলধনীদের নিকট এই দ্বিতীয় সুবিধাটির আর্থনীতিক মূল্য ছিল অসাধারণ। এই সুবিধাটির ফলে বিপুল পরিমাণ নূতন মূলধন বস্ত্রশিল্পে নিয়োগ করা হয়। যুদ্ধের পূর্বে আমদানী করা তুলাজাত দ্রব্যের মোট পরিমাণের শতকরা মাত্র ৪২ ভাগ ভারতে তৈরী হইত, আর ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়া হয় শতকরা ৭৪·৬ ভাগ।

"এইভাবে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্য মহাযুদ্ধ এক নূতন যুগ সৃষ্টি করে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ অন্তত সাময়িকভাবে ভারতবর্ষকে শিল্পে পশ্চাৎপদ রাখিবার পূর্ব-অনুসৃত নীতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হয়। সাম্রাজ্যবাদী মূলধনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া যায়, আর ভারতীয় মূলধন লাভ করে ইহার বিকাশের জন্য এক অবাধ ক্ষেত্র।"[১]

যুদ্ধের কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষে মোট মিল-কারখানার সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। এই সকল মিল-কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিক-সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় কুড়ি লক্ষ। এই সময় বিকাশপ্রাপ্ত শিল্পসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল কোম্পানি'। এই কোম্পানি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রচণ্ড

১। Joan Beauchamp; British Imperialism in India, p. 166.

বৃটিশ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে কোনক্রমে টিকিয়াছিল। কিন্তু মহাযুদ্ধের সুযোগে এই শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করিয়া এক বিরাট শিল্পে পরিণত হয়। ইহাই হয় ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। যুদ্ধের শেষ ভাগে এই কোম্পানির ঢালাই লোহার উৎপাদন ছিল ৩ লক্ষ ২০ হাজার টন, আর ইস্পাতের উৎপাদন ছিল ১ লক্ষ ২৪ হাজার টন। যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের একচেটিয়া বাজারের এবং বৃটেনের চাহিদা পূরণ করিয়াই টাটা কোম্পানির এরূপ প্রসার ঘটে। কেবল টাটা কোম্পানিই নহে, ভারতের সকল শিল্পই যুদ্ধের সময় বৃটেনের যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইবার কার্যে নিযুক্ত থাকে।

স্বায়ত্তশাসন দানের আশ্বাস

ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীকে স্বপক্ষে টানিবার জন্য বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতবর্ষকে যুদ্ধের পর স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করিবার আশ্বাস দেয়। ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভারতীয় বুর্জোয়ারা বৃটেনকে উহার যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সর্বতোভাবে সাহায্য দান করে, এমনকি ভারতে সৈন্যসংগ্রহের কার্যেও তাহারা বৃটিশ সরকারকে যথেষ্ট সাহায্য করে। এইভাবে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে আর্থনীতিক সুবিধা এবং স্বায়ত্তশাসনের আশ্বাস দিয়া সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়। ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার পথ ত্যাগ করিয়া উহার সহিত সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করে। তাহারা এমনকি বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি এককালের 'চরমপন্থী' নায়কদিগকেও সংগ্রামের পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হয়।

এই সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুচর এ্যানি বেশান্ত ভারতবাসীদের বৈপ্লবিক পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাহাদের আন্দোলনকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যসূচক আন্দোলনের পথে চালিত করিবার উদ্দেশ্যে 'হোমরুল' আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিলক প্রভৃতি ভূতপূর্ব 'চরমপন্থীরা' বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া এ্যানি বেশান্তের সেই 'হোমরুল' আন্দোলনে ভিড়িয়া পড়েন। কংগ্রেসই হইয়া উঠে সেই 'হোমরুল' আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। যুদ্ধের সময় হিন্দু বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস এবং মুসলমান বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ 'হোমরুল' আন্দোলনের মধ্য দিয়া পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে 'হোমরুল' বা স্বায়ত্তশাসনই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের চরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হয়।

রুশ বিপ্লবের প্রভাব

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দেই রুশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের সংবাদ ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিতে থাকে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও রুশিয়ার সফল শ্রমিক-বিপ্লবের সংবাদ ও উহার দুর্নিবার প্রভাব ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে দ্রুত

বিস্তার লাভ করে। যে সকল ভারতীয় সৈনিক য়ুরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছিল তাহারাই হয় ভারতবর্ষে রুশ-বিপ্লবের প্রধান প্রচারক। তাহাদের মুখে মুখে রুশ-বিপ্লবের সংবাদ, বোলশেভিক পার্টির দ্বারা পরিচালিত শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ রুশিয়ার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার এবং বোলশেভিক সরকারের প্রতিষ্ঠার সংবাদ ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হয়। এই সংবাদ শুনিয়া কেবল শ্রমিক-শ্রেণীই নহে, সমগ্র সাধারণ মানুষের মধ্যে নূতন উৎসাহ-উদ্দীপনার জোয়ার বহিতে থাকে। রুশ-বিপ্লব ভারতের শ্রমিকশ্রেণী ও সংগ্রামী জনসাধারণের নিকট প্রমাণ করিয়া দেয় যে, কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশই, তাহা যত শক্তিশালীই হউক না কেন, অপরাজেয় নহে। এইভাবে যুদ্ধ-পরবর্তী কালের, অর্থাৎ ১৯১৮-২২ খ্রীষ্টাব্দের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে থাকে।

* * * *

এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ শক্তি জড়াইয়া পড়িবার ফলে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সম্মুখে এক অভাবনীয় সুযোগ দেখা দেয়। সমগ্র ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া ভারতের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য দেশব্যাপী এক সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপায়ে বৈদেশিক সাহায্য লাভের জন্যও চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দেন। তাঁহাদের এই নূতন উদ্যম ও কর্মপ্রচেষ্টা ভারতের সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করে।

মধ্যশ্রেণীর এই সন্ত্রাসমূলক বিপ্লববাদ সকল সময় শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণকে এড়াইয়া চলিয়াছিল। এই জন্যই মহাযুদ্ধের সময় এই বিপ্লববাদীরা যে বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন, একমাত্র পাঞ্জাব ব্যতীত তাহা সর্বত্র গণ-সংযোগ-বিহীন হইয়াই ছিল। কেবলমাত্র পাঞ্জাবে 'গদর সমিতি'র প্রচেষ্টায় কৃষকদের একাংশের মধ্যে বিপ্লবিক ভাবধারা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। 'গদর সমিতি'র প্রায় সকল সভ্যই ছিলেন আমেরিকা-প্রবাসী পাঞ্জাবী কৃষক। তাই তাঁহারা দেশে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদের মারফত এই বিপ্লববাদের সহিত কৃষকদের সংযোগ গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু 'গদর সমিতি'র সভ্যদেরও কৃষক-সংগ্রাম সম্পর্কে কোন বিশেষ ধারণা ও পরিকল্পনা না থাকায় পাঞ্জাবেও কৃষকদের কোন ব্যাপক সংগ্রাম গড়িয়া উঠে নাই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় জাতীয় আন্দোলন

'হোমরুল' আন্দোলন

মহাযুদ্ধের প্রথম হইতে জার্মান সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে য়ুরোপে বৃটিশ শক্তির ঘোর দুর্দিন ঘনাইয়া আসিতেছিল। সেই সময় একদিকে কংগ্রেসের তৎকালীন নরমপন্থী নেতৃত্ব বৃটিশ শাসকদের সহিত সহযোগিতার পথ বাছিয়া লয় এবং অপর দিকে ভারতের বিশাল জনসংখ্যার তুলনায় নগণ্য সংখ্যক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবপন্থীরা মহাযুদ্ধের সুযোগে ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম চালাইতে থাকেন। তাঁহাদের সেই গণ-সংযোগহীন সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম জাতীয় সংগ্রামের পর্যায়ে উঠে নাই, তাহা সম্ভবও ছিল না। অন্যদিকে বৃটিশ সরকারের সহিত কংগ্রেসের নরমপন্থী উদারনীতিক নেতৃত্বের সহযোগিতার ফলে জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে চরম সংকট ঘনাইয়া আসিতেছিল।

এই সন্ধিক্ষণে, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বাল গঙ্গাধর তিলক কারাগার হইতে বাহির হইয়া আসেন। তিলক বাহির হইয়া আসেন এক নূতন মানুষ হইয়া। বাহিরে আসিয়াই তিনি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের পথ পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং বৃটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। অবশ্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে এক আইন-সম্মত আন্দোলন আরম্ভের সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেন। তিলক মত ও পথ পরিবর্তন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, এমনকি তিনি আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতেও অস্বীকার করেন। বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রথম যুগের প্রধান নায়ক তিলকের এই প্রকার মত পরিবর্তনে ক্রুদ্ধ হইয়া ভূপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন:

"শ্রদ্ধেয় লোকমান্য তিলক, জনসাধারণের উপর যাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে তিনি গভর্নমেণ্টের সুরে সুর দিলেন। 'বার্লিন কমিটি' তাঁহার নিকট লোক পাঠাইয়াছিল, কিন্তু তিনি কিছুই করেন নাই।...মহারাষ্ট্রীয় বৈপ্লবিক খানখোজে ছদ্মবেশে ইরাণ হইতে ভারতে গিয়া বন্ধুর মারফত তাঁহার (তিলকের—সু. রা.) সহিত খবরাখবর করেন। তিনি বলেন, 'এখন রুশে গিয়া অস্ত্রাদি সাহায্য প্রার্থনার চেষ্টা কর।'

"...এই জন্যই বলি, ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞে বুর্জোয়ারা আসিবেন না। তাঁহারা 'আধ্যাত্মিক স্বরাজ,' 'দায়িত্বপূর্ণ গভর্নমেণ্ট', 'হোমরুল' প্রভৃতির দাবি করিবেন, কিন্তু স্বাধীনতার দাবি করিবেন না। কারণ, তাঁহার জন্য যে কাঠখড় দরকার, তাহা তাঁহারা জোগাইবেন না।"[১]

ইতিপূর্বে মাদ্রাজে 'থিওসোফিক্যাল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাত্রী এ্যানি বেশান্ত ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া 'হোমরুল'-এর (ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের) পক্ষে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে এই

১। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১১০-১১ পৃষ্ঠা।

সময় এ্যানি বেশান্তের আবির্ভাব এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এবং এই ঘটনাটিকে আংশিকভাবে এলান অক্টাভিয়ান হিউম-এর কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দ্বারা বৈপ্লবিক সংগ্রামের আঘাত হইতে ভারতের বৃটিশ শাসনকে রক্ষা করিবার প্রয়াসের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাযুদ্ধের চাপে ভারতের জনসাধারণের জীবনে এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগ দেখা দেয়। এই দুর্যোগ হইতে আত্মরক্ষার জন্যই জনসাধারণ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া বৈপ্লবিক গণ-সংগ্রাম আরম্ভ হইলে বৃটেনের যুদ্ধে জয়লাভ তো দূরের কথা, বৃটিশ সাম্রাজ্যই বিপন্ন হইয়া পড়িবে। এই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্যেই এলান অক্টাভিয়ান হিউমের মত এ্যানি বেশান্তও ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং জনসাধারণের আসন্ন সংগ্রামকে বৈপ্লবিক পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া উহাকে শান্তিপূর্ণ পথে পরিচালিত করিবার জন্য সচেষ্ট হন। তাঁহার এই চেষ্টাই 'হোমরুল'-আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। ভারতের বৃটিশ শাসনকে ধ্বংসের পরিবর্তে ভারতবাসীদের দ্বারা বৃটিশ শাসন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করানোই হয় তাঁহার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য।[১] ভারতের সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রথম স্রষ্টা বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল ও লালা লাজপৎ রায় এই সময় 'বিপ্লব'-এর পথ পরিত্যাগ করেন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যের পথ গ্রহণ করিয়া এ্যানি বেশান্তের সহযোগী হন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত সেবক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীও এই সময় দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে লণ্ডনে গমন করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার সংকল্প ঘোষণা করেন। ইহার পর তিনি ভারতে আসিয়া একদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে যুদ্ধের মহাসংকট হইতে উদ্ধারলাভে সাহায্য করিবার জন্য সৈন্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যে গুজরাটী কৃষকদের মধ্যে প্রচারকার্য আরম্ভ করেন এবং অপরদিকে এ্যানি বেশান্তের বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যমূলক 'হোমরুল'-আন্দোলনে যোগদান করিয়া উহাকে শক্তিশালী করিয়া তোলেন। এ্যানি বেশান্তের এই প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের সমালোচনা এবং এ্যানি বেশান্তের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন :

"...এ্যানি বেশান্তের নেতৃত্বে 'গরমদল'[২] 'হোমরুল'-আন্দোলন সৃষ্টি করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ইহা প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের নামান্তর। বৈপ্লবিকেরা যখন দেশে ও বিদেশে দুর্জয় সাহসের সঙ্গে অস্ত্র হস্তে দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করিতেছিলেন, কিছু কালের জন্য যখন তাঁহারা সিঙ্গাপুর অধিকার করিয়াছিলেন, ইরাকে কয়েদী ভারতীয় সিপাহীদের লইয়া যখন সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত করিয়াছিলেন, যখন বিদেশ হইতে অস্ত্র আমদানির ব্যবস্থা চলিতেছিল, লাহোর হইতে গৌহাটি পর্যন্ত যুগপৎ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা চলিতেছিল, যখন

১। R. P. Dutt : India Today, p. 312.

২। বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি পূর্বের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের নায়কগণ।

কুত্তালামাথারার করেমী সিপাহীদের বৈপ্লবিক দলভুক্ত করিয়া আরম্ভে বৈপ্লবিক বাহিনী পরিচালিত করিবার উদ্যম চলিতেছিল, যখন আফগান আমীরের সাহায্যে আফগান সীমান্তে বৈপ্লবিক পরিকল্পনা চলিতেছিল, যখন গভর্নমেন্ট সন্ত্রাস দ্বারা দেশকে দাবাইয়া রাখিয়াছিল, তখন দিশাহারা বুর্জোয়াদের লইয়া 'হোমরুল'-আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ইহা ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সাহায্যের পরিবর্তে ব্যাহতই করিয়াছে।

"বাঙলার স্বদেশী আন্দোলনের সময় এ্যানি বেশান্তের প্রকৃত রূপ সেই যুগের কর্মীদের অজানা নাই। বিদেশেও তিনি ভারতের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (A. I. C. C.) দিল্লী অধিবেশনে তিনি সুবিখ্যাত **Independence Resolution**-এর বিপক্ষে বক্তৃতা করেন (লেখক সভ্য রূপে উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন)। ইহা ছাড়াও, ভারতকে ইংলণ্ডের সহিত সংলগ্ন রাখিবার জন্য তিনি ভারতবাসীকে নানা প্রকার ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত করিয়া রাখেন।"[১]

এ্যানি বেশান্ত ও তাঁহার 'হোমরুল'-আন্দোলনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া রজনী পামি দত্ত লিখিয়াছেন :

"ক্রমবর্ধমান গণ-বিক্ষোভ রাজনীতিক আন্দোলনের মধ্যে প্রতিফলিত হইতে আরম্ভ করে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সেই গণ-বিক্ষোভের উত্তাল তরঙ্গ উঠিতে থাকে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিলক 'হোমরুলের জন্য ভারত লীগ'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার আন্দোলনে ইংরেজ 'থিওসোফিস্ট' এ্যানি বেশান্ত যোগদান করেন। বেশান্ত জাতীয় আন্দোলনকে সাম্রাজ্যের প্রতি 'আনুগত্যের' পথে চালিত করিবার চেষ্টা করেন এবং পরবর্তী কালে অসহযোগ-আন্দোলনের ঘোরতর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন।"[২]

ভারতবর্ষে 'হোমরুল'-আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্বে আয়ারল্যাণ্ডে এই আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। সেই দেশে এই আন্দোলন বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভই ছিল এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। তিনি প্রথমে এদেশে আয়ারল্যাণ্ডের অনুকরণে এই আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি 'কমন উইল' নামে একখানি সাপ্তাহিক ও 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামে একখানি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই দুইখানি পত্রিকায় ভারতের দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র-বিষয় ব্যতীত অবিলম্বে শাসন-ব্যবস্থার অন্যান্য সকল বিষয়ের উপর ভারতবাসীদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবি প্রচার করা হইতে থাকে। যাহাতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই এই দাবি গ্রহণ করিয়া ইহা লইয়া আন্দোলন আরম্ভ করে তাহার জন্য বেশান্ত প্রথম হইতেই চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা তখন ব্যর্থ হয়।

ঠিক এই সময় তিলক কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এই আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁহার উদ্যোগে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পুনায়

১। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, মুখবন্ধ ৮-৯ পৃষ্ঠা।

২। R. P. Dutt : Ibid, p. 312.

'হোমরুল-লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর বেশান্ত ও তিলক উভয়ে একত্রে মিলিয়া সমগ্র ভারতব্যাপী এক বিরাট আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে থাকেন। এই আন্দোলনের ফলে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে বিপুল সাড়া জাগিতে দেখিয়া সরকার ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে এবং অবিলম্বে ইহার উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। মাদ্রাজ-সরকার 'প্রেস-আইন' অনুসারে বিপুল পরিমাণ অর্থ জামিন দাবি করিয়া বেশান্তের পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করিবার চেষ্টা করে।

এদিকে তিলক তাঁহার 'মারাঠী' ও 'কেশরী' পত্রিকার মারফত বোম্বাই প্রদেশে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছিলেন। এই আন্দোলন শক্তিশালী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বক্তৃতা করেন। তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতায় জনসাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগিয়া উঠিতে থাকে। বোম্বাই সরকার ভীত হইয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিবার জন্য তাঁহার উপর এক বৎসর "সদ্ভাবে" থাকিবার জামিনস্বরূপ বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা রাখিবার আদেশ দেয়। বোম্বাই-হাইকোর্টে আপীল করিয়া তিনি এই আদেশ নাকচ করাইতে সক্ষম হন। দেশের প্রায় সর্বত্র, বিশেষত দক্ষিণ-ভারতে তিলক ও বেশান্তের প্রচারের ফলে 'হোমরুল' বা 'স্বরাজ'-এর দাবির ভিত্তিতে আন্দোলনের ঝড় বহিতে থাকে, সমগ্র দক্ষিণ-ভারত জুড়িয়া 'হোমরুল-লীগ'-এর শাখা-প্রশাখা গড়িয়া উঠে এবং লীগের সভ্য-সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলে।

"'হোমরুল'-এর প্রচার বিশেষভাবে ছাত্র ও স্কুলের বালকদের মধ্যে সাড়া জাগাইয়া তোলে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর বেশান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁহার লীগ স্থাপন করেন। তাঁহার 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার ১১ই অক্টোবরের সংখ্যায় লীগের উদ্দেশ্য, নিয়মাবলী ও সংগঠন প্রকাশিত হয়। ইহাতে দেশবাসীদের জানানো হয় যে, (পাঞ্জাব ব্যতীত) ভারতের সকল প্রধান প্রদেশগুলিতে পঞ্চাশটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে; লীগের সকল ইস্তাহার ও পুস্তিকা সকল দেশীয় ভাষায় প্রচারিত হইতেছে; লীগের সভ্য-সংখ্যা দুই হাজার হইতে তিন হাজারের মধ্যে; ১৪ই সেপ্টেম্বর বিশেষ উৎসাহের সহিত 'হোমরুল-দিবস' প্রতিপালিত হইয়াছে, ঐ দিবস মাদ্রাজের 'গোখেল-হল'-এ বিরাট জনসমাবেশ হইয়াছিল।"[১]

ভারতের সর্বত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে 'হোমরুল'-আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করে। তিলকের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর এবার ভারত-সরকারের নির্দেশে মাদ্রাজ-সরকার বেশান্তের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। দেশরক্ষা-আইনের বলে বেশান্তের বোম্বাই প্রদেশে গমন নিষিদ্ধ হয়। পরে তিনি মধ্যপ্রদেশে গমনের উদ্যোগ করিলে তাহাও উক্ত আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু এত আক্রমণেও বেশান্তের প্রচেষ্টা বন্ধ হইল না। তিনি তাঁহার দুইখানি পত্রিকার মারফত জোরের সহিত প্রচার করিতে থাকেন যে, বৃটিশ শাসনের অধীনেই অবিলম্বে ভারতে 'হোমরুল' প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

১। Sir Verney Lovett: 'A History of Indian National Movement', p. 110.

এদিকে যুদ্ধের প্রথম হইতেই ভারতের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং তাহার ফলে সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিতেছিল। এই গণ-বিক্ষোভ জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী করিয়া তোলে। কংগ্রেসের নরমপন্থী 'উদারনীতি'বাদী নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত এই গণ-বিক্ষোভে চঞ্চল হইয়া বৃটিশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে 'স্বায়ত্তশাসনের দাবি' লইয়া আলোচনা আরম্ভ করেন। মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দও বৃটিশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া "ভারতের পক্ষে উপযোগী" স্বায়ত্তশাসনের দাবি বিশেষ জোরের সহিত উপস্থিত করেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতিদের ভাষণে স্বায়ত্তশাসনের দাবি লইয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন আরম্ভ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়।[১] তখন হইতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বাৎসরিক অধিবেশনের আয়োজন একই শহরে করা হইতে থাকে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশন হয় এবং উভয় অধিবেশনেই বেশান্ত ও তিলকের 'হোমরুল'-এর দাবির উপর আলোচনা চলে। এই দাবি সম্পর্কে বিবেচনার জন্য লীগ একটি কমিটিও নিয়োগ করে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কয়েক মাস ধরিয়া কংগ্রেস ও লীগের প্রতিনিধিরা হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের চেষ্টা করেন এবং একটি সমাধানের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে সক্ষম হন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে উভয় সম্প্রদায়ের উনিশ জন নির্বাচিত সদস্য বড়লাটের আইন-পরিষদে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কারের প্রস্তাবসহ একটি স্মারকলিপি উপস্থিত করেন। এই স্মারকলিপিতে প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা অনুসারে জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থা" অবিলম্বে প্রবর্তনের দাবি করা হয়। এইভাবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সমবেতভাবে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবিটিকে পাশ কাটাইয়া জাতীয় আন্দোলনকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে পরিচালিত করেন।

লাক্ষ্ণৌ-কংগ্রেস

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লাক্ষ্ণৌ শহরে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অধিবেশন হয়। ঠিক এই সময় লাক্ষ্ণৌ শহরেই মুসলিম লীগের বাৎসরিক অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে যে সকল ঘটনা ঘটে তাহা জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নূতন অবস্থার সূচনা করে। ইহার ফলে হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের ভিত্তিতে প্রকাশ্যে হাত মিলাইলেন এবং কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দও আবার পূর্বের 'চরমপন্থী' দলের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরাট-কংগ্রেসে বিভেদের পর কংগ্রেসের নরমপন্থী ও 'চরমপন্থী'দের ইহাই প্রথম মিলন। অবশ্য এই সময়

১। Congress Presidential Speeches, Vol. I (G. A. Natesan's Collections) p.284-85.

পূর্বের 'চরমপন্থী'রা আর চরমপন্থী ছিলেন না। তাঁহারাও এখন বৃটিশ-শাসনের প্রতি অনুগত নরমপন্থী।

এই দুই অধিবেশনের ফলে নিয়মতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার পথ প্রস্তুত হয় এবং বেশান্ত ও তিলকের 'হোমরুল'-এর দাবি জাতীয় দাবি হিসাবে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

কংগ্রেস-অধিবেশনের সভাপতি নরমপন্থী নেতা অম্বিকাচরণ মজুমদার সভাপতির ভাষণে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় ভারতের বৃটিশ-শাসনের গুণগান করিলেও 'ভারত-রক্ষা আইন' এবং বিপ্লবীদের বিনা বিচারে আটক ও অন্তরীণ করিয়া রাখিবার সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া ঘোষণা করেন:

"ভারতের বর্তমান আর্থনীতিক ও রাজনীতিক অবস্থার মধ্যেই 'এ্যানার্কিস্ট' মতবাদের (বিপ্লববাদের) বীজ নিহিত। ইহা কুশাসনেরই ফল এবং ইহা দূর করিবার একমাত্র উপায় আপসনীতি। কেবলমাত্র দমননীতি চালাইয়া কোন ফল হইবে না।"[১]

সভাপতির ভাষণে তিলক ও বেশান্তের উপর সরকারী উৎপীড়নের তীব্র নিন্দা করা হয়। তিলক ও বেশান্তের 'হোমরুল'-এর প্রস্তাব উত্থাপন করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁহার প্রস্তাবে 'সরকারের নিকট "যথাসম্ভব শীঘ্র ভারতে স্বায়ত্তশাসন (হোমরুল) মঞ্জুর করিবার নীতি ঘোষণার দাবি" করেন। এই প্রস্তাব সমর্থন করেন তিলক ও বেশান্ত। অধিবেশনে এবং লাক্ষ্ণৌ শহরের সর্বত্র তিলক ও বেশান্ত বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। 'হোমরুল'-দাবির উপর তাঁহাদের ভাষণই লাক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় হইয়াছিল। বেশান্ত 'হোমরুল'-দাবির সমর্থনে বলেন যে, 'ভারতবাসীরা অসহনীয় অবস্থার মধ্যে থাকিতে আর প্রস্তুত নয়; বৃটিশ-পার্লামেন্টকে অবিলম্বে ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে হইবে; ভারতবাসীরা ভারতের আমলাতান্ত্রিক সরকারের উপর কোন ভরসা রাখে না, তাহাদের একমাত্র ভরসা বৃটিশ-পার্লামেন্টের উপর। অধিবেশনে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি বিপুল ভোটাধিক্যে পাস হয়। এই সময় হইতে 'হোমরুল'-এর দাবিই জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়।

লাক্ষ্ণৌ-কংগ্রেস হইতে তিলক ও বেশান্তের 'হোমরুল-লীগ'-এর সহিত সহযোগিতার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। মুসলিম লীগের অধিবেশনেও মুসলমান নেতৃবৃন্দ অনুরূপ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। মুসলিম লীগের অধিবেশনে মহম্মদ আলি জিন্না তাঁহার বক্তৃতায় ঘোষণা করেন:

"ভারতবাসীরা নিজেদের স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঐক্যবদ্ধ ভারতের জন্মের সূচনা করিতেছে। কংগ্রেস যে শাসন-সংস্কারের পরিকল্পনা করিয়াছে তাহা মানিয়া লইতেই হইবে এবং ইহা বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য বৃটিশ-পার্লামেন্টকে আইন পাস করিতে হইবে।"[২]

১। Congress Presidential Speeches, p. 28?.
২। Speech summarised by V. Lovett, ibid, p. 122.

'হোমরুল'-দাবির সমর্থনে মুসলিম লীগের অধিবেশনেও কংগ্রেসের প্রস্তাবের অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের নিদর্শন হিসাবে বিপিনচন্দ্র পাল লীগের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনের সভাপতির অনুরোধে তিনি 'ভারত-রক্ষা আইন'-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বাঙলার বিপ্লবীদের স্বদেশভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন, বাঙলাদেশে 'এনার্কিস্ট' বলিয়া কেহ নাই, বাঙলার বিপ্লবীরা স্বদেশভক্ত বীর; যদি স্বদেশভক্তির ক্রমবিকাশকে গলা টিপিয়া হত্যা করা না হইত, তবে কখনই বৈপ্লবিক স্বদেশপ্রেমের জন্ম হইত না।[১]

সরকারী আক্রমণ

এদিকে মহাযুদ্ধের ফলে ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ দ্রুত আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। যুদ্ধের ট্যাক্সের বোঝা, ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য ও অবাধ মুনাফা লুণ্ঠনের চাপে পিষ্ট হইয়া দেশের দরিদ্র জনসাধারণ আত্মরক্ষার শেষ উপায় হিসাবে বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে যে-কোন আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। ইহার উপর এই সময় দেশের মধ্যে ম্যালেরিয়ার মহামারীতে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল। ইহার ফলে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণও সংগ্রামের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দ্বারা স্বায়ত্তশাসনের (হোমরুল-এর) দাবি লইয়া আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে ভারতের ক্রমবর্ধমান গণ-বিক্ষোভ ও জনগণের সংগ্রামের মনোভাবই প্রতিফলিত হয়। যে গণ-বিক্ষোভ মুষ্টিমেয় বিপ্লবীদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে স্পষ্ট রূপ লাভ করিতে পারে নাই, তাহা এবার 'হোমরুল'-আন্দোলনের মধ্যে ব্যাপক আকারে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। বেশান্ত ও তিলকের নেতৃত্বে এই আন্দোলন দ্রুত সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। মাদ্রাজ হইতে বেশান্তের 'নিউ ইণ্ডিয়া' ও 'কমন উইল' পত্রিকা এবং পুনা হইতে তিলকের 'কেশরী' ও 'মারাঠা' পত্রিকার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত অসংখ্য সভা-সমিতির বক্তৃতার মারফত 'হোমরুল'-এর দাবি বিশেষ জনপ্রিয় হইতে থাকে। এই আন্দোলনে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় জনসাধারণকে অংশ গ্রহণ করিতে দেখিয়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। এই আন্দোলনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার জন্য ইংরেজ-সরকার আন্দোলনের প্রধান নেতৃবৃন্দের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। এ্যানি বেশান্ত হইলেন এই আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য। কারণ, তিনিই ছিলেন 'হোমরুল'-আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে তারিখের 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত 'জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা' শীর্ষক বিখ্যাত প্রবন্ধে তিনি ভারতে বিশেষ সুবিধাভোগী বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের শোষণের বীভৎস চিত্র জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরেন। এই সময় ইংলণ্ডের যুদ্ধ পরিচালনার জন্য আহূত 'ইম্পিরিয়াল ওয়ার কনফারেন্স'-এর

১। Speech summarised by V. Lovett, Ibid, p. 122.

অধিবেশনে বিকানীর দেশীয় রাজ্যের মহারাজ, যুক্তপ্রদেশের গভর্নর স্যার জেমস মেস্টন ও স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ভারতের জনসাধারণের "প্রতিনিধি" হিসাবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের বৃটিশ-ভক্তির জন্যই ইঁহারা শাসকদের পরম বিশ্বাসভাজন হন। ইঁহারাও এই অনুগ্রহের প্রতিদানস্বরূপ 'ওয়ার কনফারেন্স'-এর অধিবেশনে যোগদান করিয়া ভারতবর্ষে বৃটিশের বিশেষ আর্থিক সুবিধালাভের প্রস্তাবের পক্ষে এবং 'হোমরুল'-দাবির বিরুদ্ধে ভোট দেন। বেশান্ত তাঁহার 'জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা' শীর্ষক প্রবন্ধে এই তিনটি প্রতিনিধিকে "ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতক" আখ্যায় অভিহিত করেন।

২৩শে মে তারিখের 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া তিনি ভারতের নির্যাতিত বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া বলেন :

বিপ্লবী যুবকেরা "আজ মরিয়া হইয়া বয়োবৃদ্ধ নেতৃবৃন্দের সকল বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; তাঁহাদের অনেকে এখনও সেই পথে চলিতেছেন, তাঁহাদের অনেকে ফাঁসী কাষ্ঠে প্রাণ দিয়াছেন, অনেককে আন্দামান দ্বীপে মৃত্যুর মুখে পাঠান হইয়াছে, অনেককে এদেশের কারাগারে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। আজ ভারতের ছাত্র-যুবকেরা ইহা লক্ষ্য করিয়া কৌতুক বোধ করিতেছে যে, রুশিয়ার যুবক-যুবতীদের ঠিক একই প্রকারের ক্রিয়া-কলাপে বৃটিশ-প্রধানমন্ত্রী আজ আনন্দে আত্মহারা হইতেছেন, কিন্তু রুশিয়ার বিপ্লবীরাও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া ট্রেন উড়াইয়াছেন, একজন 'জার'কে (রুশিয়ার সম্রাটকে) হত্যা করিয়াছেন, অথচ তাঁহাদেরই আজ শহীদ বলিয়া প্রশংসা করা হইতেছে এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন তাঁহাদের বিজয়ীর সম্মান দিয়া রুশিয়ায় ফিরাইয়া আনা হইতেছে। কারণ, তাঁহাদের জন্যই রুশিয়ার মুক্তি সম্ভব হইয়াছে। এক সময় যাঁহাদের নাম উচ্চারণ করাও পাপ বলিয়া মনে করা হইত, আজ তাঁহাদের নাম পরম পবিত্র বলিয়া স্মরণ করা হইতেছে। আজ সেই বিপ্লবীদের সকল দুঃখ ও আত্মত্যাগ জয়ের দ্বারা সার্থক হইয়াছে।"[১]

বেশান্তের প্রচারে শঙ্কিত হইয়া ইংরেজ-সরকার তাঁহার কণ্ঠরোধ ও কর্মক্ষমতা হরণ করিবার সিদ্ধান্ত করে। জুন মাসের মধ্যভাগে মাদ্রাজের গভর্নর 'ভারত-রক্ষা আইন'-এর বলে বেশান্ত ও তাঁহার দুইজন প্রধান সহকারীর উপর এক কঠোর নির্দেশ জারি করেন। তাঁহাদের মাদ্রাজ হইতে দূরে কোথাও অন্তরীণ করিবার ব্যবস্থা হয়।

বেশান্ত একখানি পত্র প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার এই বিদায়-পত্রে ভারতীয় জনগণের উপর বিদেশী শাসকদের উৎপীড়নের স্বরূপ বর্ণনা ও তাঁহার 'হোমরুল'-দাবির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া বলেন :

"বিদেশের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ভারতীয় শ্রমিকদের টানিয়া নেওয়া হইতেছে। শাসকগণ যুদ্ধ-ঋণ হিসাবে ভারতীয় মূলধন লুটিয়া লইতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষে যতদিন স্বেচ্ছাতন্ত্র বজায় থাকিবে ততদিন এই যুদ্ধ-ঋণের দ্বারা স্বাধীনতা

১। Quoted from V. Lovett's 'History of the National Movement', p. 199.

আসিবে না। যুদ্ধ-ঋণের সুদ যোগাইবার জন্য ভারতবাসীরা ট্যাক্সের চাপে পিষ্ট হইবে। এইগুলি যখন একে একে ঘটিতে থাকিবে তখনই ভারতবাসীরা বুঝিতে পারিবে কেন আমি যুদ্ধের পর 'হোমরুল' প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছি। কেবলমাত্র 'হোমরুল'-এর দ্বারাই ভারতবাসীরা অন্যের মুনাফার জন্য কুলির জাতিতে পরিণত হইবার হাত হইতে, ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে।" তিনি এই বলিয়া পত্রখানি শেষ করেন যে, তিনি ভারতবাসীদের জাতীয় আত্ম-মর্যাদাবোধ জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন—ইহাই তাঁহার একমাত্র অপরাধ।[১]

বেশান্তের উপর এই সরকারী নির্যাতনের ফলে দেশময় প্রতিবাদের ঝড় উঠিতে থাকে। যাহারা এতদিন 'হোমরুল'-এর দাবি ও আন্দোলন সমর্থন করে নাই তাহারাও সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে এই দাবি সমর্থন করিয়া আন্দোলনে যোগদান করিতে আরম্ভ করে। দেশের সর্বত্র সভা-সমিতি করিয়া এই সরকারী উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান হয়। বড়লাটের কাউন্সিলের বেসরকারী সদস্যগণ কাউন্সিলের অধিবেশনে সরকারী কার্যের তীব্র নিন্দা করেন। কিন্তু সরকারী দমননীতি এখানেই শেষ হইল না, বিভিন্ন প্রদেশের জাতীয় নেতাদের উপর 'ভারত-রক্ষা আইন'-এর বলে নানাবিধ বাধানিষেধ আরোপ করা হয়।

মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড শাসন সংস্কার

ভারতবর্ষের গণ-আন্দোলনের দ্রুত প্রসার লক্ষ্য করিয়া বৃটিশ শাসকগণ শঙ্কিত হইয়া উঠেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, কেবলমাত্র দমননীতি দ্বারা এই আন্দোলন দমন করা সম্ভব হইবে না। তাঁহারা মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কারের অনুরূপ আর একটি শাসন-সংস্কার ঘোষণা করিলেন। তৎকালীন ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেবই এই শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব ঘোষণা করেন। ভারত-সচিবের ঘোষণায় বলা হয়:

"বৃটিশ সাম্রাজ্যের অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভারতবর্ষে ক্রমশ দায়িত্বশীল সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি শাসন-বিভাগে ভারতীয়দের অধিকতর যোগদানের ব্যবস্থা ও স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমবিকাশ সাধনই বৃটিশ সরকারের নীতি।"

"বৃটিশ সরকার ও ভারত সরকারের উপর ভারতের জনগণের মঙ্গল ও উন্নতি বিধানের দায়িত্ব ন্যস্ত বলিয়া উহারাই হইবে ভারতীয় জনগণের শাসন-সংক্রান্ত অগ্রগতির সময় ও পরিমাণের বিচারক। এই দুই সরকারের সহিত যাঁহারা সহযোগিতা করিবেন, উহারা তাঁহাদের সহযোগিতা দ্বারাই চালিত হইবে এবং তাঁহাদের হস্তেই শাসন-কার্য পরিচালনার নূতন সুবিধা অর্পণ করা হইবে, ভারতীয়দের হস্তে দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া যায় কিনা তাহা সেই সহযোগিতার পরিমাণের দ্বারাই নির্ধারণ করা হইবে।"

একই ঘোষণায় একই সঙ্গে শাসন-সংস্কারের আশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য ভীতি প্রদর্শন হইতে ভারতের জনসাধারণ বুঝিতে পারিল যে, ইহাও মর্লে-মিণ্টো সংস্কারের মতই একটি অন্তঃসারশূন্য শাসন-সংস্কার। বৃটিশ সরকারের এই শাসন-সংস্কারের

১। V. Lovett's 'History of National Movement', p. 137.

প্রস্তাবটি যে উদ্দেশ্যমূলক তাহাও শীঘ্রই বোঝা গেল। এই প্রস্তাব ঘোষণার ঠিক পরেই ভারত-সচিব মণ্টেগুর ভারতে আগমনের সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইল এবং ভারতবর্ষের নরমপন্থী 'উদারনীতি'বাদীদের সরকারের পক্ষে টানিয়া আনাই যে এই আগমনের আসল উদ্দেশ্য তাহাও প্রকাশ্যেই ঘোষিত হইল।

ভারত-সচিব মণ্টেগুর এই বিভেদ-প্রচেষ্টার সাফল্য স্পষ্ট হইয়া উঠে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে 'উদারনীতি'বাদীরা শেষবারের মত কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মণ্টেগুর শাসন-সংস্কার প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবার ফলেই এই ভাঙন দেখা দেয়। বৃটিশ শাসকদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিলেও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উহাদের শাসন-সংস্কারের দাবি পুনরায় জোরের সহিত পেশ করে। ইহার ফলেই দেখা দেয় এই ভাঙন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। তিলকের প্রস্তাব অনুসারে সদ্যমুক্ত এ্যানি বেশান্ত কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। তিলক ও বেশান্ত উভয়েই নূতন শাসন-সংস্কার প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করিয়া 'হোমরুল'-এর দাবি-ই ভারতের একমাত্র দাবি বলিয়া ঘোষণা করেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে ভারত-সচিব মণ্টেগু ভারতে পদার্পণ করিয়া জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে দিয়া তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করেন এবং নরমপন্থী নেতাদের সমর্থন লাভ করিতে সক্ষম হন। ইহার কিছু দিন পরেই নরম-পন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া 'ইণ্ডিয়ান লিবারেল ফেডারেশন' গঠন করেন।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব রিপোর্ট আকারে প্রকাশিত হয়। ঐ মাসের শেষ দিকেই বোম্বাই নগরীতে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। এই অধিবেশনে 'চরমপন্থী' নেতৃবৃন্দ শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব নাকচ করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া উপস্থিত হন। রিপোর্ট প্রকাশিত হইবামাত্র এ্যানি বেশান্ত এই প্রস্তাবকে 'দাসত্বের পরিকল্পনা' নামে অভিহিত করিয়া ঘোষণা করেন :

"এই পরিকল্পনা যে নীতি হইতে প্রসূত ইহার রচয়িতাগণ সেই নীতির ঊর্ধ্বে কোন দিনই উঠিতে পারিবেন না, সেই নীতিকে কেবলমাত্র একটা বিপ্লবের দ্বারাই ধ্বংস করা সম্ভব।"[১]

এই মনোভাব লইয়া 'চরমপন্থী' নেতৃবৃন্দ বোম্বাই নগরীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত হন। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ হাসান ইমাম। অধিবেশনে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের তীব্র সমালোচনা করিয়া ইহাকে "তুচ্ছ, বিরক্তিকর ও নৈরাশ্যজনক" বলিয়া অভিহিত করা হয়। মুসলিম লীগের অধিবেশনেও এই শাসন-সংস্কারের বদলে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১। Quoted from V. Lovett: 'History of National Movement', p. 168.